

পঞ্চকন্যা

হুমায়ূন আহমেদ





- তোমাকে
- আমার আছে ভাল
- আকাশ জোড়া মেঘ
- একজন মায়াবতী
- সে ও নর্তকী



পঞ্চকন্যা

হুমায়ূন আহমেদ



কাকলী

©
লেখক

প্রকাশক

এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

তৃতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১১

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

আলোকচিত্র
গোলাম মুস্তাফা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ফ্রব এষ

অঙ্করবিন্যাস
কাকলী কম্পিউটার ল্যাব
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা-১১০০

দাম ৪০০ টাকা

ISBN 984-70133-0334-3

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উৎসর্গ
শক্তিমান গদ্যকার
আনিসুল হক
সুকনিষ্ঠেষু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

Ladybug, ladybug,
Fly away home,
Your house is on fire
Your children all gone;
All but one,
And her name is Ann,
And she has crept under
The warming pan.

(- ANONYMOUS)

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক সকালে ‘কাকলী প্রকাশনী’র সেলিম সাহেব আমার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিলেন। কাগজে লেখা “পঞ্চকন্যা”। আমি অবাক হয়ে বললাম, পঞ্চকন্যা ব্যাপারটা কী? তিনি জানালেন এটা একটা বইয়ের নাম এবং তিনি বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। আমি বললাম, বইটা লিখেছেন কে? তিনি বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, আপনি। এই হল পঞ্চকন্যা বইটির ইতিহাস। আমার লেখা পাঁচটি নারীপ্রধান উপন্যাসের সংকলন।

হুমায়ূন আহমেদ

নুহাশপল্লী

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তোমাকে /	১
আমার আছে জল /	৬৫
আকাশ জোড়া মেঘ /	১২২
একজন মায়াবতী /	২২১
সে ও নর্তকী /	৩২১

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



তোমাকে

তোমাকে

নীলু বয়সে আমার চেয়ে এগারো মিনিটের বড়। তার জন্মের ঠিক এগারো মিনিট পর আমার জন্ম হয় এবং দারুণ একটা হৈচৈ শুরু হয়। ডাক্তার শমসের আলি অবাক হয়ে চৈঁচিয়ে ওঠেন, আরে যমজ বাচ্চা দেখি। ঠিক তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। আমরা দুই বোন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকি। ডাক্তার শমসের আলি হারিকেনের জন্যে চৈঁচাতে থাকেন। আমার নানিজান ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে পানির একটা গামলা উল্টে ফেলেন।

আমার জন্মের সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলে বাবা আমার নাম রাখেন রাত্রি। নীলু জন্মের পর পর খুব কাঁদছিল, তাই তার নাম কান্না। এইসব কাব্যিক নাম অবশ্যি টিকল না। একজন হলো নীলু। তার সাথে মিল রেখে আমি হলাম বিলু। তার চার বছর পর আমাদের তিন নম্বর বোনটি হলো। মিল দিয়ে নাম রাখলে শুধু মেয়েই হতে থাকবে, এই জন্যে তার নাম হলো সেতারা। নীলু, বিলু এবং সেতারা।

বাবার রাখা নাম না টিকলেও বাবা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। সুযোগ পেলেই চৈঁচিয়ে ডাকতেন, কোথায় আমার বড় বেটি কান্না? কোথায় আমার মেজো বেটি রাত্রি? জন্মদিনে বই উপহার দেবার সময় বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গোটা গোটা হরফে লিখতেন, ‘মামণি রাত্রিকে ভালোবাসার সহিত দিলাম’ কিংবা ‘মামণি কান্নাকে পরম আদরের সহিত দেওয়া হইল।’

বইয়ের সঙ্গে সব সময় একটা করে তার স্বরচিত কবিতা থাকত। সেই কবিতা তিনি তাঁর প্রেস থেকে ছাপিয়ে ফ্রেম করে বাঁধিয়ে আনতেন। আট বছরের জন্মদিনে আমি এবং নীলু যে কবিতাটি পেলাম, সেটা শুরু হয়েছে এভাবে—

‘সাতটি বছর গেল পর পর
আজকে পড়েছ আটে
তব জন্মদিন নয়ত মলিন
ভয়াল বিশ্বহাটে

যমজ বোন বলেই আমরা দুজন সব সময় একই কবিতা পেতাম। শুধু কবিতা নয়, গল্পের বইও একই হতো। দুজনের জন্যে দুটি ‘শিশু ভোলানাথ’ কিংবা দুটি ‘ঠাকুরমার ঝুলি।’

আমরা দুজন যে দেখতে অবিকল এক রকম— এ নিয়ে বাবার মধ্যে একটা গোপন গর্ব এবং অহঙ্কার ছিল। নতুন কেউ এলেই হাসিমুখে বলতেন— এরা যমজ।

একজনের নাম রাত্রি, একজনের নাম কান্না। যার চুল ছোট ছোট ও হচ্ছে কান্না। মা বড় বিরক্ত হতেন। ভুরু কুঁচকে বলতেন— যমজ মেয়ে নিয়ে এত ঢোল পিটানোর কী আছে? যমজ-ফমজ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, ছিঃ!

আমাদের দুজনকে যাতে দেখতে এক রকম না দেখায় এ জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আমার চুল কেটে ছোট ছোট করে দিলেন। একজনের গায়ের রং যেন অন্যজনের চেয়ে আলাদা হয় সে জন্যে নীলুকে সপ্তাহে তিনদিন কাঁচা হলুদ দিয়ে গোসল করাতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। আমরা যতই বড় হতে থাকলাম আমাদের চেহারার মিল ততই বাড়তে লাগল। নীলু যেমন লম্বা আমিও তেমন লম্বা। তার চিবুকের নিচে যে রকম একটি লাল রঙের তিল, আমারও অবিকল সে রকম তিল। তার যেমন শ্যামলা গায়ের রঙ আমারও তাই। মা পর্যন্ত ভুল করতে লাগলেন। যেমন একদিন বারান্দায় বসে তেঁতুলের খোসা ছাড়াচ্ছি, মা ঝড়ের মতো এসে প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন।

এক খিলি পান দিতে বললাম কতক্ষণ আগে?

আমি শান্ত স্বরে বললাম, আমাকে বলোনি। বোধহয় নীলুকে বলেছ। আমি বিলু।

আমার ছোট চুল যখন লম্বা হলো, তখন দেখা গেল বাবা এবং মা ছাড়া আমাদের কেউ আলাদা করতে পারে না। কেন পারে না সে-ও এক রহস্য। নীলুর সঙ্গে আমার বেশ কিছু অমিল আছে। যেমন নীলুর নাক একটুখানি চাপা। ওর চোখ দুটি একটুখানি উপরের দিকে ওঠান। তবুও দোতলার নজমুল চাচা আমাদের দু'বোনকে যখন দেখেন, তখন বলেন, কে কোন্ জন? কে কোন্ জন? নীলু তাতে খুব মজা পায়। আমার অবশ্যি রাগ লাগে। এইসব আবার কী ঢং? নজমুল চাচা সব সময়ই ঢং করেন। মা নজমুল চাচাকে সহ্যই করতে পারেন না। নজমুল চাচার গলা শুনেই মুখ কুঁচকে বলেন, ভাঁড় কোথাকার। সব সময় ভাঁড়ামি।

আমাদের নিয়ে সবচে' বেশি ভাঁড়ামি করেন অবশ্যি আমার বড় মামা। দিনাজপুর থেকে বেড়াতে এলেই মহা উৎসাহে আমাদের দুজনকে সামনে বসিয়ে উঁচু গলায় বলেন, দেখা যাক আমি নীলু-বিলুকে আলাদা করতে পারি কি-না। ওয়ান টু থ্রী— হুঁ এই জন হচ্ছে আমাদের বিলুমণি। বড় মামা ভাঁড়ামি করলে মা রাগ করতেন না, বরং একটু যেন খুশিই হতেন। সবচে' খুশি হতো নীলু। সে হেসে কুটিকুটি। নীলুর নাম কান্না না হয়ে ভালোই হয়েছে। সে হাসতেই জানে, কাঁদতে জানে না। আমরা যখন ক্লাস সেভেনে উঠলাম নীলু আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল তার হাসি নিয়ে। যা-ই দেখে তাতেই তার হাসি পায়। মা হয়তো কিছু নিয়ে ধমক দিয়েছেন। সে মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করছে। মা কঠিন স্বরে বলছেন, হাসছো কেন তুমি?

কই, হাসছি না তো।

মুখ ফেরাও। তাকাও আমার দিকে।

নীলু মুখ ফেরালে আমরা দেখতাম হাসি থামাবার চেষ্টায় তার গাল লালচে হয়ে উঠছে।

কেন তুমি শুধু শুধু হাসছো? হাসির কী হয়েছে বলো তুমি, তোমাকে বলতে হবে।

আর হাসব না মা। এখন থেকে শুধু কাঁদব।

বলেই সে আবার ফিক করে হেসে ফেলল। মা প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন।

বাঁদর কোথাকার। তোমার হাসি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দেখো।

নীলুর চোখে জল আসছে কি না দেখতে চেষ্টা করতেন। কোথায় কী! নীলু এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছু হয়নি। মা ক্লান্ত হয়ে বলতেন, ঠিক আছে যাও আমার সামনে থেকে।

নীলু এমনভাবে ছুটে যেত যেন আড়ালে গিয়ে হেসে বুক হালকা করবে। নীলুটা এমন হয়েছে কেন? এ বাড়িতে সবাই একটু গম্ভীর। সেতারা যার বয়স মাত্র পাঁচ, সে পর্যন্ত কম কথা বলে। নীলু কার কাছ থেকে এত কথা বলা শিখল? কার কাছ থেকে অকারণে হাসার এই অভুত অসুখ জোগাড় করল?

আমার এবং নীলুর খাট দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায়। নীলু ঘুমায় সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে। তার একা একা ভয় করে। আকবরের মা ঘুমায় বারান্দায়। আমরা ডাকাডাকি করলে তার উঠে আসার কথা। সে একবার ঘুমালে নিশ্চিন্ত। সারা রাতে এক সেকেন্ডের জন্যেও জাগবে না। এমনিতে অবশ্যি বলবে, ভইন, আমার সজাগ ঘুম। ইটু শব্দ হইলেই চউখ খোলা। আকবরের মা কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারে না। প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। অনেকবার তাকে বিদায় দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, লাভ হয়নি কিছু। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলেছে, যাইতাম না। দেহি কেমনে বিদায় দেয়। তামশা না? এই বুড়ো বয়সে যাইতাম কই?

আকবরের মা রাতে ভাতটাত খেয়ে ঘুমাতে এসে জিজ্ঞেস করে, কইগো মাইয়ারা, ভূতের কিচ্ছা হনতে চাও? নীলু ভীত শুনবে না, কিন্তু যেহেতু আমি শুনি কাজেই তাকেও শুনতে হয়।

আকবরের বাপের গপটা কই। শইলের মইখ্যের লোম খাড়া হইয়া যায়, বুঝহনি মাইয়ারা। শীতের সময়। খুব জার। আকবরের বাপের মাছ মারতে যাওনের কথা। আমারে কইল তামুক দে...

নীলু গল্পের মাঝখানে জিজ্ঞেস করে, তুই করে বলত?

তা ঠিক। গরিব মাইনষের কথাবার্তা তুই-তুকারি দিয়া।

আকবরের মা'র ভাষা ঠিক বোঝা না গেলেও গল্প ধরতে কোনো অসুবিধে হয় না। সব গল্পের শেষে আকবরের বাবা। যার সাহসের কোনো সীমা নেই, একটা ভূতের গলা জাপ্টে ধরে কুমড়ো গড়াগড়ি করবে। এবং সব শেষে ভূতটা জঙ্গল ভেঙে ছুটে যাবে। যাবার সময় বলবে, এইবার ছাইরা দিলাম। বুঝছ ? জানে বাঁচলি।

গল্প শেষ হলেই নীলু বলবে, ধুর, ভূত আবার আছে নাকি ?

আকবরের মা চোখ কপালে তুলে বলবে, এইটা কেমন বেকুবের মতো কথা কইলা ? দেশটা ভর্তি ভূত আর পেত্নীতে। আমার সাথে একবার যাইও আমার নীলগঞ্জের বাড়িতে। নিজের চউক্ষে ভূত দেখবা।

আকবরের মা শুধু যে আমাদের ভূতের গল্প শোনার চেষ্টা করে তাই না মাকেও শোনাতে চেষ্টা করে। সুযোগ পেলেই একটা গল্প টেনে আনতে চায়, বুঝছেন আশ্চর্য, একবার হইল কী। মা এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। আজীবনে গল্প মা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। শুধু আকবরের মা নয়, বাবাকেও এমনভাবে থামান হয়, যা বলতে চাও সরাসরি বলতে পারো না ? এত ফেনাও কেন ?

ফেনাই নাকি ?

হ্যাঁ, ফেনাও। বেশি রকম ফেনাও। যা বলার তা সহজভাবে বলতে পারা উচিত।

ও।

রাগ করলে নাকি আবার ?

না। আমি এত সহজে রাগ করি না।

বাবার এই কথাটি খুব সত্যি। বাবা রাগ করতে পারেন না। নীলু'র কারণে বাবা মোটা বলেই রাগ করতে জানেন না। মোটা মানুষদের এই একটা বড় অসুবিধে। কথাটা হয়তো সত্যি। আমাদের স্কুলের মোটা আপাগুলিকে কিছুতেই রাগান যায় না। আর চিকনা আপাগুলি কারণ ছাড়াই চিড়বিড় করছে। আমাদের মা নিজেও রোগা বলেই বোধহয় তাঁর রাগ বেশি। তিনি রাগ করেন না শুধু আমাদের প্রেসের ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। তাঁর নাম প্রণব বসু। এঁর অনেক রকম গুণ আছে। চমৎকার গান গাইতে পারেন। এবং চমৎকার গল্প করতে পারেন। তারচে' বড় কথা, চমৎকার রসিকতা করতে পারেন। এবং রসিকতাগুলি করেন গম্ভীর মুখে।

যেমন একদিন নীলুকে বললেন, এই নীলু কাল কী হয়েছে জানিস ?

না তো, কী হয়েছে ?

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের যে ওস্তাদ আছেন মুনসি মীর আলী, তিনি কাল জিলা স্কুলের মাঠে রাগ জয়-জয়ন্তি গেয়ে দুটি মেডেল পেয়েছেন। একটা বড় মেডেল। একটা

ছোট মেডেল। ছোটটা পেয়েছেন গান গাওয়ার জন্যে আর বড়টা গান থামানোর জন্যে।

প্রণব বাবুকে আমরা ডাকি ম্যানেজার কাকু। মা ডাকেন ম্যানেজার। বাবা ডাকেন 'বোস'। ভালো কিছু রান্নাটান্না হলে বাবা বলবে, দেখি বোসকে একটা খবর দাও তো। খাওয়াদাওয়ার পর একটু গান-বাজনা হবে।

ম্যানেজার কাকু অবশ্যি সহজে গান-বাজনা করেন না। তবে যদি ধরে-বেঁধে একবার বসান যায়, তখন গান চলে গভীর রাত পর্যন্ত। আমরা অবশ্যি এত রাত পর্যন্ত থাকতে পারি না। ধমক দিয়ে মা আমাদের নিচে পাঠিয়ে দেন। তবে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা জেগে থেকে গান শুনি। আমার নিজের গান শেখার খুবই শখ। মাকে বেশ কয়েকবার বলাতে মা ম্যানেজার কাকুকে বললেন, ওদের একটু গান শেখান না।

ম্যানেজার কাকু গভীর গলায় বললেন, বৌদি ওদের বয়স কম।

কম বয়স থেকেই তো শুনেছি গান-বাজনা শুরু করতে হয়।

উঁহু, সঙ্গীতের জন্যে মমতা ছাড়া কিছু হয় না। সেই মমতাটা অল্প বয়সে হয় না। আপনি যদি শিখতে চান শেখাতে পারি।

রক্ষা করো, এই বয়সে আর আঁ আঁ করতে পারব না।

ম্যানেজার কাকুকে একমাত্র নীলু ছাড়া আমরা সবাই বেশ পছন্দ করি। নীলু যদিও ম্যানেজার কাকুর রসিকতায় সবচে' উঁচু গলায় হাসে কিন্তু আড়ালে বলে, আমার ম্যানেজার কাকুকে ভালো লাগে না।

কেন, ভালো না লাগার কী আছে?

আছে একটা-কিছু। আমি জানি না কী।

নীলু মাঝে মাঝে এলোমেলো কথাবার্তা বলে এবং সেগুলি সত্যি হয়ে যায়। সেতারা যেদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে, সেদিন সকালবেলাতেই নীলু বলেছে, আমি রাতে স্বপ্ন দেখেছি সেতারা খাট থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে। ম্যানেজার কাকু প্রসঙ্গে নীলুর আশঙ্কাও সত্যি হয়ে গেল।

আমরা স্কুলে গিয়েছি। থার্ড পিরিয়ডে জিওগ্রাফি আপা এসে বললেন, নীলু-বিলু তোমরা দুজন বাসায় যাও তো, তোমাদের নিউজ এসেছে। আমরা অবাক হয়ে বাসায় এসে দেখি আকবরের মা সেতারাকে ঘুম পাড়াচ্ছে, বাসায় মা-বাবা কেউ নেই। দোতলার নজমুল চাচা শুধু বসার ঘরে মুখ কালো করে বসে আছেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। মা নাকি ম্যানেজার কাকুর সঙ্গে কোথায় চলে গেছেন। আর আসবেন না— এ রকম একটা চিঠি লিখে গেছেন।

বাবা ফিরলেন রাত এগারোটায়। আমরা জেগে বসে আছি। অনেক লোকজন এসেছে। কেউ যাচ্ছে না। সবাই গভীর মুখে বসে আছেন বসবার ঘরে। বাবা ঘরে

তুকে এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি। হাসিমুখে বললেন, রেণু ঝগড়া করে সকালের ট্রেনে দিনাজপুর তার বাবার বাড়ি চলে গেছে। আমি ছিলাম না। ভাগ্যিস প্রণব বাবু বুদ্ধি করে সঙ্গে গেছেন। নয়তো একা একা মেয়েছেলে এতদূর যাবে, দেখেন না অবস্থাটা। এই মেয়েজাতটার মতো রাগ আর কারোর নেই। হা হা হা। এদের নিয়েও চলে না। না নিয়েও চলে না।

লোকজন সব বারোটোর মধ্যে চলে গেল। আমরা নিজেদের ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন।

মামণিরা ঘুমাচ্ছ ?

আমরা কেউ জবাব দিলাম না। বাবা মৃদু স্বরে বললেন, আজ রাতে তোমরা আমার সঙ্গে ঘুমাবে মামণিরা।

নীলু শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সে সময় আমার এবং নীলুর বয়স বারো, সেতারার সাত।

মা চলে গিয়েছেন এবং আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না— এটা আমরা খুব সহজেই বুঝে ফেললাম। শুধু সেতারা বুঝতে চাইল না। সে এম্মিতেই কম কথা বলে। এখন কথাবার্তা পুরোপুরিই বন্ধ করে দিল। দিনরাত সে শুধু মাকে খুঁজত। মার শোবার ঘরের সামনে কতবার যে গিয়ে দাঁড়াত। ডাকাডাকি না কিছু না, শুধু দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। আমি একদিন দেখতে পেয়ে ডাকলাম, এই সেতারা।

উঁ।

এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

সেতারা মাথাটা অনেকখানি নিচু করে ফেলল যেন খুব একটা অপরাধ করেছে।

কী করছিস তুই ?

কিছু না।

আয় আমার সাথে নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করব, আসবি ?

না।

আমি লক্ষ করি, সে একা একা ঘুরে বেড়াতে চায়। কারো সঙ্গে থাকতে চায় না। সন্ধ্যাবেলা কেউ কিছু বলার আগেই সে ‘আমার সাথী’ বই নিয়ে বসে একমনে নিচু স্বরে পড়তে থাকে—

কমলা ফুলি কমলা ফুলি

কমলালেবুর ফুল

কমলা ফুলির বিয়ে হবে

কানে মোতির দুল ।

যখনি সে পড়তে বসে এই একটি কবিতাই সে পড়ে । তখন যদি বাড়ির সামনে কোনো রিকশা এসে থামে, সে পড়া বন্ধ করে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে । একসময় বই বন্ধ করে অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় । নিঃশব্দে চলে যায় বারান্দায় । আবার ফিরে এসে পড়তে বসে— কমলা ফুলি, কমলা ফুলি কমলালেবুর ফুল... ।

একদিন নীলু বলল, সেতারা মা আমাদের কাউকে পছন্দ করেন না তো তাই চলে গেছেন । আর আসবেন না ।

আচ্ছা ।

যে আমাদের ভালোবাসে না, আমরাও তাকে ভালোবাসি না, ঠিক না ?

হঁ ।

তুই আর মাকে খুঁজবি না— আচ্ছা ?

সেতারা মৃদু স্বরে বলল, আমাদের পছন্দ করে না কেন ?

আমরা সবাই তো মেয়ে এই জন্যে, ছেলে হলে পছন্দ হতো । আমাদের তো কোনো ভাই নেই । বুঝেছিস ?

হঁ ।

সেতারা মায়ের আদর পায়নি বললেই হয় । তার জন্মের পর পর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন । সেতারা বড় হতে থাকে আকবরের মা'র কোলে । মা'র অসুখ যখন সারল তখনো অবস্থার পরিবর্তন হলো না । মা মাঝে মাঝেই বিরক্ত স্বরে বলতে লাগলেন, ঘরভর্তি হয়ে যাচ্ছে মেয়ে দিয়ে, ভালো লাগে না । সেতারা যখন হাঁটতে শিখল, টুকটুক করে হাঁটত । মায়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়াত সুযোগ পেলেই । মা গল্পের গলায় ডাকতেন, আকবরের মা ওকে নিয়ে যাও তো, এফুনি ঘর নোংরা করবে । তার দু'বছর বয়স হতেই মা ওকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের ঘরে । মাঝে মাঝে ঘুমাবে নীলুর সঙ্গে । দুধ খাবার জন্যে কাঁদলে আকবরের মা উঠে দুধ খানিয়ে দেবে । সেতারা তখন কোনো ঝামেলা করেনি । এখনো করে না । নীলুর গলা জড়িয়ে ঘুমায় । নীলু বলে, গল্প শুনবি ?

বলো ।

এক দেশে ছিল এক রাজা । তার দুই রাণি দুয়ো ও সুয়ো...

এই পর্যন্ত আসতেই সেতারার চোখ বুজে আসে । কোনোদিন আর সে গল্প শেষ পর্যন্ত শোনা হয় না ।

ইদানীং বাবা সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতে চান । সেতারাও বেশ ভালো মানুষের মতো যায় । কিন্তু মাঝরাতে একা একা চলে আসে আমাদের ঘরে । রোজ

এই কাণ্ড। একরাতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল, সেতারা সবাইকে ডাকতে লাগল, মা এসেছে রিকশা নিয়ে। আমরা ধড়মড় করে উঠে বসলাম, কোথায়?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বলিস কী?

হেঁচৈ শুনে বাবা উঠে এলেন। কোথায় কী, খা-খা করছে চারদিক! সেতারা দারুণ অবাক হলো। বাবা বললেন, স্বপ্ন দেখেছ মা।

উঁহ স্বপ্ন না। আমি দেখলাম।

সেতারা চোখ বড় বড় করে সবার দিকে তাকাতে লাগল। সে ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। বাবা সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। সে রাতে আমি এবং নীলু এক খাটে ঘুমাতে গেলাম। এবং অনেক রাত পর্যন্ত দুজনেই নিঃশব্দে কাঁদলাম। অথচ দুজনই এমন ভাব করতে লাগলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ধীরে ধীরে অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটল বাড়িতে। বাবা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি পরিবর্তনগুলি করলেন খুব সাবধানে। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি মা'র আলনায় কোনো কাপড় নেই। সব বাবা কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন। তার দিন সাতেক পর বারান্দায় মা'র যে বড় বাঁধাই করা ছবিটি ছিল সেটিকে আর দেখা গেল না। বাবা-মা'র শোবার ঘরে তাদের বেশ কয়েকটি ছবি ছিল, সেগুলিও সরান হলো।

আমাদের ঘরে মা-বাবা এবং আমাদের তিনজনের যে ছবিটি ছিল সেটি শুধু বাবা সরালেন না। রান্নাবান্না করবার জন্যে রমজান নামের একজন বুড়ো মানুষ রাখা হলো। এই লোকটি এসেই প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু করল আকবরের মা'র সঙ্গে। দুজনেরই কী ঝাঝাল কথাবার্তা। কিন্তু রমজান লোকটি ভালো। সে সেতারাকে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ভাত খাওয়াত। আমাদের উপর তার খবরদারিরও সীমা ছিল না।

এই সইক্ষ্যা রাইতে বাগানো ঘুরাঘুরি করণ ঠিক না।

অত তেঁতুল খাওন বালা না, বুদ্ধি নষ্ট হয়।

ভাত খাওনের আগে বিসমিল্লাহ কইরা এটা লিখন মুখের মইধ্যে দেওন দরকার।

রাতেরবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সে গম্ভীর হয়ে একটা খবরের কাগজ নিয়ে আমাদের পড়ার ঘরে গিয়ে বসত। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এমন সব কথাবার্তা বলত যে, নীলু হেসে উঠত খিলখিল করে।

হুঁ, খুব সংকটময় অবস্থা। বুঝছো নীলু আপা, অবস্থা সংকটময়।

কেন?

নেপালে পাহাড়ি ঢল । হুঁ ।

এই অবস্থায় ঝগড়া লেগে যেত আকবরের মা'র সঙ্গে । আকবরের মা কোমরে দুই হাত দিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে এসে দাঁড়াত ।

বিদ্যার জাহাজ যে বইছেন পাকঘরের বাসনডি কেডা ধুইব ?

চুপ থাকো । অশিক্ষিত মূর্খ মেয়ে মানুষ, এদের নিয়া চলাফেরা মুশকিল ।

রমজান ছাড়াও একজন ভয়ঙ্কর রোগা দাঁত নেই ওস্তাদ রাখা হলো । এই ওস্তাদটির নাম মুনশি সোভাহান । তিনি আমাদের তিন বোনকে সপ্তাহে তিনদিন গান শেখাবেন । আমরা তিনজনেই গান শিখতে শুরু করলাম । সকালবেলা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে 'সারেগা রেগামা গামাপা' । খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার । ওস্তাদ সোভাহান বেশিক্ষণ গান শেখাতে পারেন না । কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাঁপানির টান ওঠে । গান থামিয়ে বলেন, ঘরে কোনো টিফিন আছে কিনা দেখোতো খুকি । না থাকলে একটা মুরগির ডিম ভেজে দিতে বলো । হাঁসের ডিম না । হাঁসের ডিম গন্ধ করে, খেতে পারি না ।

গানের উপর থেকে আমার মন উঠে গিয়েছিল, কাজেই আমাকে দিয়ে গান হলো না । সেতারা এবং নীলু শিখতে লাগল । কিছুদিন পর নীলুও কেটে পড়ল । রইল শুধু সেতারা । মাস ছয়েকের মধ্যে দেখা গেল বেগি দুলিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সেতারা গাইছে, নবীর দুলালী মেয়ে খেলে মদিনায় । ও ও ও খেলে মদিনায় ।

ওস্তাদ সোভাহান ঘাড়-টাড় দুলিয়ে বলেছেন, মারহাবা মারহাবা কী টনটনে গলা । এইবার লক্ষ্মী ময়না গিয়ে দেখো তো কোনো টিফিন আছে কি-না । না থাকলে মধুর দোকান থেকে যেন একটা আমৃতি নিয়ে আসে । আর চা দিতে বলো ।

সে বছর শীতের সময় মা আমাদের তিনবোনকে সিরাজগঞ্জ থেকে আলাদা আলাদা চিঠি লিখলেন । বাবা একদিন সন্ধ্যায় পাংশুমুখে তিনটি খামে বন্ধ চিঠি নিয়ে আমাদের ঘরে এসে দাঁড়ালেন । কাঁপা গলায় বললেন, তোমাদের মা চিঠি লিখেছেন । তোমরা কি সেই চিঠি পড়তে চাও ?

বাবার গলা কাঁপছিল । আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম বাবা চাচ্ছেন আমরা বলি, না । বাবা কপালের ঘাম মুছে নিচু স্বরে বললেন, আমরা সবাই তাকে ভুলতে চেষ্টা করছি । এখন আবার চিঠিপত্র শুরু করলে কষ্ট হবে । নতুন করে কষ্ট হবে ।

বাবা থামতেই সেতারা বলল, আমার চিঠি দাও । খানিকক্ষণ চুপ থেকে নীলুও বলল, আমার চিঠিটাও দাও । শুধু আমি কিছু বললাম না । বাবা ধরা গলায় বললেন, মামণি রাত্রি, তোমারটা ।

আমি চাই না ।

কী লেখা ছিল নীলু এবং সেতারার চিঠিতে আমি জানি না। নীলু সমস্ত কথাই আমাকে বলে। শুধু চিঠির ব্যাপারে কিছু বলল না। আর সেতারা তো তার খামই খুলল না। বন্ধ খাম হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আমি বললাম, খুলে দেব ?

না।

না খুললে পড়বি কী করে ?

আমি পরে পড়ব।

যেন পড়লেই চিঠির মজা শেষ হয়ে যাবে। আমি সমস্ত দিন ভাবলাম কী লিখেছেন মা চিঠিতে ? ক্লাসে আপারা কী পড়ালেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। অংক আপা দু'বার ধমক দিলেন, এই বিলু তোমার পড়ায় আজকে মন নেই, কী ব্যাপার ?

কিছু না আপা।

আমি কী বলছি তুমি তো কিছুই শুনছো না।

শুনছি আপা।

না শুনছো না। বলো তো আমি কী বলছিলাম ?

আমি বলতে পারলাম না। সব মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার ক্লাসের মেয়েরা বিচিত্র কারণে আমাকে অপছন্দ করে। সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকে। আমাদের বাথরুমের দেয়ালে আমাকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা লেখা। একটা নেংটা মেয়ে এবং ছেলের ছবিও আঁকা আছে। মেয়েটার গায়ে লেখা বিলু ক্লাস নাইন খ শাখা। অথচ কোথাও নীলুর নামে কিছু লেখা নেই। আমি কখনো বাথরুমে যাই না। যদি যেতেই হয়, তাহলে অনেকক্ষণ সেখানে বসে কাঁদি। ইরেজার দিয়ে লেখাগুলি তুলে ফেলতে চেষ্টা করি— কিছুতেই সেগুলি ওঠান যায় না।

বিলু মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, বুঝলে। এরকম করলে জ্ঞো হবে না।

ক্লাসের মেয়েগুলি আবার হৈচৈ করে হেসে উঠল। ঝাড়িতে ফিরে এসে অনেকক্ষণ একা বসে রইলাম। রাতে রমজান ভাইকে রুম দিলাম, খিদে নেই কিছু খাব না। অনেক রাতে ঘুমাতে গিয়ে দেখি আমার গুলিশের নিচে মায়ের পাঠানো খামটা রেখে দেয়া। নিশ্চয়ই বাবার কাণ্ড।

ঘরে কেউ নেই। নীলু এখনো পড়ছে। সেতারা রান্নাঘরে রমজান ভাইয়ের সঙ্গে কী যেন করছে। আমি দরজা বন্ধ করে খাম খুলে ফেললাম। মা আমাকে বিলু নামে সম্বোধন করেননি, প্রথমবারের মতো লিখেছেন— রাত্রি।

মামণি রাত্রি,

জানি প্রচণ্ড রাগ করেছো তুমি। কিন্তু কী করবো মা।

উপায় ছিল না। তুমি যখন বড় হবে, তখন বুঝবে। মানুষের
মন খুব বিচিত্র জিনিস। একবার কোনো কিছুতে মন বসে
গেলে তা ফেরানো যায় না। আমি বহু চেষ্টা করেছি। মানুষ
হয়ে জন্মানোর মতো কষ্টের কিছু নেই। আমি তোমাদের
ছেড়েছুড়ে এসেছি তবু রাতদিন তোমাদের কথাই ভাবি।
রাতদিন প্রার্থনা করি যে কষ্ট আমি পাচ্ছি তা যেন কখনো
আমার মামণিদের না হয়।

তোমার মা

থার্ড পিরিয়ডে অংক আপা ক্লাসে ঢুকেই বললেন, বিলু ক্লাস শেষে আজ তুমি আমার
সঙ্গে দেখা করবে।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। অংক আপা আজোবাজে প্রশ্ন করেন।
কয়েকদিন আগে হাফ টাইমের সময় অংক আপার সঙ্গে দেখা। আপা আমাকে
আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার মা শুনলাম ঐ লোকটার সঙ্গে ইন্ডিয়া চলে
গেছে, সত্যি নাকি?

না, সত্যি না।

কোথায় আছে তাহলে?

আমি চুপ করে রইলাম।

আপা গলা নিচু করে বললেন, বলতে পারো না, না?

সিরাজগঞ্জে আছেন।

ও, বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে নাকি?

আমি জানি না আপা।

আমাকে কে যেন বলল একটা ছেলে হয়েছে।

আমার নিজের ধারণা মেয়েদের মতো হৃদয়হীন পুরুষরা হতে পারে না।
ছেলেরা কেউ এখনো আমাকে আমার মা প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অথচ
চেনাজানা মেয়েদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কিছু জানতে চায়নি।

ক্লাসের বন্ধুদের কথা বাদই দিই, বন্ধুদের মা-খালাদের পর্যন্ত কৌতূহলের সীমা
নেই। কোনো না কোনোভাবে টেনেটুনে ঐ প্রশ্ন জানবেই।

বিলু, তোমরা আগে কিছু টের পাওনি? আগেই তো টের পাওয়া উচিত।

তোমার মা নাকি যাবার আগে বহু টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে?

মা গিয়েছেন প্রায় দু'বছর আগে। এখনো কেউ সেটা ভুলতে পারে না কেন
কে জানে?

অংক ক্লাসটা আমার খুব খারাপভাবে কাটল। ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র গেলাম আপার কাছে। আপার নিজের কোনো ঘর নেই। কমন রুমে একগাদা টিচারের সঙ্গে বসে আছেন। তিনি আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমাদের বাড়িতে বয়স্ক মহিলা কেউ নেই ?

কাজের একটি মেয়ে আছে। আকবরের মা।

সে ছাড়া কেউ নেই ?

জি না আপা। কেন ?

তোমরা তো বড় হচ্ছে এখন, কিছু কিছু জিনিস তোমাদের বলা দরকার, কেউ বলছে না তাই তোমাকে ডাকলাম।

আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আপা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, বিলু তোমার এবং নীলুর দুজনেরই এখন ব্রা পরা উচিত।

আমি চোখমুখ লাল করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তোমার বাবাকে বলবে কিনে দিতে। বাবাকে বলার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। আর যদি লজ্জা লাগে তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিতে পারি।

দিন, একটা চিঠি লিখে দিন।

ঠিক আছে, ক্লাস ছুটির পর চিঠি নিয়ে যেও। আরেকটি কথা, নীলু মোটেই পড়াশোনা করে না। তোমার বাবাকে বলবে কোনো প্রাইভেট টিচার রেখে দিতে। অংকে সে খুব কাঁচা। অংক জানে না বললেই হয়।

আপা আমি বলব।

ঠিক আছে তুমি যাও এখন। এইসব বললাম দেখে কিছু মনে করোনি তো ?

জি না।

মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। রাগ করার কিছু নেই বিলু। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি। এত ঝামেলার মধ্যেও যে মেয়ে প্রতি বিষয়ে সবচে' বেশি নম্বর পায়, তার প্রশংসা তো করতেই হয়।

অংক আপা একটু হাসলেন।

বিলু ?

জি।

কখনো কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে।

ঠিক আছে আপা, বলব।

শোনো আরেকটা কথা। ইয়ে কী যেন বলে তোমার বাবা নাকি আবার বিয়ে করছেন ?

জি না।

তুমি বোধহয় জানো না। বাবার বিয়ের কথা তো মেয়েদের জানার কথা নয়।

বাবার বিয়ের কথা কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। দিনাজপুর থেকে বড় মামা এসেছিলেন। তিনি পর্যন্ত নীলুকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, দুলাভাই নাকি বিয়ে করেছেন? নীলু তার স্বভাবমতো হেসে ভেঙে পড়েছে।

হাসছিস কেন?

হাসির কথা বললে হাসব না মামা?

আমি কি হাসির কথা বললাম নাকি? বিয়ে করলে তোদের অবস্থাটা কী হবে ভেবেছিস?

কী আর হবে? আমার তো মনে হয় ভালোই হবে। কথা বলার একজন লোক পাওয়া যাবে।

কথা বলার লোকের তোর অভাব?

হ্যাঁ মামা। বিলুর সঙ্গে কি আর সব কথা বলা যায়? মা জাতীয় একজন কেউ লাগে। বাবা বিয়ে করলে ভালো হয় মামা।

করছেন নাকি?

জানি না মামা। তবে দোতলার নজমুল চাচা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা এখন একটা বিয়ে করলে মনে হয় সংসার স্বাভাবিক হয়।

তুই কী বললি?

আমি বললাম, তা তো ঠিকই।

মামা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। নীলু বলল, তারপর একদিন এক বুড়োমতো ভদ্রলোক এসে বাড়িটারি ঘুরেটুরে দেখলেন। মার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কী রকম ছিল জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মামা, বিয়ে বোধহয় লেগে যাচ্ছে।

নীলু খিলখিল করে উঠল। আমি নিজেও অবাক হলাম। এসব কিছুই আমি জানি না। নীলু আজকাল অনেক কথাই আমাকে বলে দিচ্ছে। প্রায়ই সে তার বান্ধবীর বাড়ি যাচ্ছে। হঠাৎ করে তার সঙ্গে এত খাতির হল কেন— জিজ্ঞেস করাতে সে গা এলিয়ে হেসেছে। এ বাড়ির সবাই বদলে যাচ্ছে। বাবা বদলেছেন সবচে' বেশি। আমাদের জন্মদিন গেল জুন মাসের দশ তারিখ। বাবা কোনো কবিতা লিখলেন না। কয়েকদিন আগে দেখলাম সেতারাকে কী জন্যে যেন ধমকাচ্ছেন। সেতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বাবার এরকম আচরণ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। বাড়িও ফিরছেন আজকাল অনেক রাতে। গতকাল বাড়ি ফিরলেন সাড়ে এগারোটার দিকে। আমি জেগে বসে ছিলাম। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে

আছ কেন ? আর থাকবে না । দশটা বাজতেই ঘুমাতে যাবে ।

আমি শান্ত স্বরে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে এত রেগে রেগে কথা বলছে কেন ?

রেগে রেগে কথা বলছি নাকি ?

আমি উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম । বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ঘরের পাশে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, এই বিলু, বিলু । আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম । বাবা বেশ খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন ।

বাবা এরকম ছিলেন না, বাবা বদলে যাচ্ছেন । নীলু তো বদলেই গেছে । আমি নিজেও বোধহয় বদলাচ্ছি । একা একা থাকতে হচ্ছে করে । সেদিন খুব ঝগড়া করলাম নীলুর সঙ্গে । আমি মাঝে মাঝে অচেনা সব মানুষদের মন গড়া চিঠি লিখি, নীলু সেটা জানে । তবু সে একটা চিঠি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, প্রেমপত্র নাকিরে ? তারপর মুখ বাঁকা করে পড়তে শুরু করল— আপনাকে একটি কথা বলা হয়নি । এখন শ্রাবণ মাস তো, তাই খুব বৃষ্টি হচ্ছে । রাতদিন ঝঝঝঝ বৃষ্টি । নীলু বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, শ্রাবণ মাস কোথায় রে, এটা তো আশ্বিন মাস । তোর মাথাটাই খারাপ । হি-হি-হি । আমি চিঠি কেড়ে নিয়ে নীলুর গালে একটা চড় কষিয়ে দিলাম । নীলু দারুণ অবাক হয়ে গেল । আমি এরকম ছিলাম না ।

বাবা বিয়ে করলে সংসার স্বাভাবিক হলে তো ভালোই হয় । নীলু ঠিকই বলেছে, সব বাড়িতে মা জাতীয় একজন কেউ দরকার । সে সময়মতো মেয়েদের ব্রা কিনে দেবে ।

কিন্তু আমার বড় মামা সেদিকটা দেখছেন না । তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু-একটা হতে যাচ্ছে । মামা বললেন, খোঁজখবর না রাখায় এটা হচ্ছে । নানান ধাক্কা খাকি ।

খোঁজখবর নেই তা ঠিক । মামার বাড়ির সঙ্গে এখন সম্পর্ক নেই বললেই হয় । মামারা অনেকদিন ধরে আসেন না । আগে ঘনঘন আসতেন এবং যতবার আসতেন ততবারই জিদ করতেন আমাদের দিনাজপুরে নেবার জন্যে । বাবা ব্যবসাপাতির ঝামেলা তুলে এড়িয়ে যেতেন । মা স্পষ্ট বলতেন, আমাদের বৌদের সঙ্গে আমার বনে না । বাবা-মা মারা গেলে বাপের বাড়ি থাকে না । সেখানে যাওয়াও যায় না ।

বাবা আবার বিয়ে করবেন কি-না এই প্রসঙ্গে বড় মামার এরকম কৌতূহলের কারণ কী আমি ধরতে পারি না । মামাদের সঙ্গে আমার বাবার তেমন আন্তরিকতা নেই । এইসব নিয়েও মার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হতো । মা বলতেন, আমার ভাইদের তুমি সহ্য করতে পারো না, এর কারণ কী আমাকে বলো তো ?

সহ্য করতে না পারার কী আছে ?

কথা বলো না, চুপচাপ থাকো।

একেকজনের একেক রকম স্বভাব। আমার স্বভাবই হচ্ছে কথা কম বলা।

দোতলার নজমুল হুদা সাহেবের সঙ্গে তো খুব বকবক করো।

আমি বকবক করি না। উনি করেন আমি শুনি।

আমার ভাইদের সঙ্গে তো তাও করো না।

ওনার বকবকানি শোনা যায়। তোমার ভাইদেরটা শোনা যায় না।

ও— তাই বুঝি ?

বাবা চুপ। মা কাটা কাটা গলায় বললেন, বেশ তো আমি ওদের বলব যেন আর না আসে।

মামাদের আসা বন্ধ হয়নি। আমার ধারণা বাবার কাছ থেকে তাঁরা টাকা-পয়সা নিতেন। আমার সব মামারাই ব্যবসা করতেন। টাকার দরকার তাদের লেগেই থাকত। এটা অবশ্যি আমাদের অনুমান। কারণ মামারা হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেই মা গম্ভীর মুখে বলতেন, দরকার ছাড়া তো তোমাদের আসা হয় না, আবার দরকার হয়েছে বুঝি ? মামারা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতেন।

এবারো যখন এলেন সম্ভবত টাকার জন্যেই এলেন। বাবার ব্যবসাপাতির অবস্থা সম্পর্কে খুব ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর শুরু করলেন। আমার ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, দুলাভাইয়ের ব্যবসা কেমন চলছে রে ?

ভালোই বোধহয়। আমি তো এইসব ঠিক জানি না।

না জানলে হবে কেন ? খোঁজখবর রাখতে হয়। দুলাভাইয়ের ছেলে নেই। তাদেরই তো খোঁজ করতে হবে। ঠিক না ?

আমি চুপ করে থাকি। বড় মামা সিগারেট ধরান একটা। নিচু গলায় বললেন, মনে হয় দুলাভাইয়ের ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। তাদের গান-বাজনা শোনাচ্ছেন, এসব তো দারুণ খরচান্ত ব্যাপার। হাতি পোষার মতো, লাভ হয় না কিছু।

লাভ হবে না কেন ?

আরে ধুর, দুই-একদিন সারেগামা করলেই যদি লাভ হতো তাহলে কি আর কথা ছিল নাকি ?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। বড় মামা হঠাৎ করে বললেন, তাদের এখন শাড়ি পরা উচিত, বুঝলি ? তোর আর নীলুর। বড় হয়ে গেছিস।

কথাটা এমন অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলা যে আমি হকচকিয়ে গেলাম। বড় হয়ে যাচ্ছি। বড় হওয়াটা খুব-একটা কি বাজে ব্যাপার ?

রাস্তাঘাটে একা একা চলাফেরা করবি না। ঐদিন দেখলাম সন্ধ্যার পর নীলু বাড়ি আসল।

বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। জন্মদিন।

জন্মদিন-ফন্মদিন যাই হোক একা একা যেন না যায়। সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম যন্ত্রণা।

আমরা সুন্দরী বুঝি ?

হুঁ, ইয়ে সুন্দরী তো বটেই। আয়না দিয়ে নিজেদের দেখিস না ?

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, কে বেশি সুন্দর মামা ? আমি না নীলু ?

মামা জবাব দিলেন না। তাঁকে চিন্তিত মনে হতে লাগল।

ক্লাস নাইনের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষাতে নীলু অংক এবং ইংরেজিতে পাস করতে পারল না। অংকে পেল তেইশ আর ইংরেজিতে একত্রিশ। তাকে খুব বিচলিত মনে হলো না। হাসিমুখে বলল, ধুর— আমি আর পড়াশুনা করব না।

করবি না তো কী করবি ?

বিয়ে করব।

বিয়ে করবি মানে ? কাকে বিয়ে করবি ?

বিয়ে করার লোকের অভাব আছে নাকি ? আমি হ্যাঁ বললে এক্ষুনি দু'তিনটা ছেলে চলে আসবে।

তাই নাকি ?

হুঁ, তুই কী ভাবিস আমাকে ?

আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, বাবা পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে রাগ করবেন।

রাগ করবার কী আছে ? সবাই একরকম হয় ? কেউ ভালো করে, কেউ করে না।

বাবা রাগ করলেন না। প্রগ্রেস রিপোর্টটা দেখলেন অবাক হয়ে।

এরকম হয়েছে কেন নীলু ?

পড়াশুনা করতে আমার ভালো লাগে না বাবা।

আগে তো লাগত।

আগেও লাগত না। জোর করে পড়তাম।

ভালো না লাগলেও অনেক কিছু করতে হয় নীলু। তোমাদের জন্যে একজন টিচার রেখে দিলে কেমন হয় ?

নীলু কথা বলে না। বাবা বললেন, তোমার কী মনে হয় বিলু মা ?

ভালোই হবে।

নীলু হালকা স্বরে বলল, এখন থেকে আমি একা একটা ঘরে থাকতে চাই বাবা। পশ্চিমের ঐ ঘরটা পরিষ্কার করে দিলেই হবে। আমি রমজান ভাইকে বলব।

একা থাকার দরকার কী ? তোমার তো আবার ভূতের ভয়।

এখন আমার ভূতের ভয় নেই বাবা ।

আমার মনে হয় না এটা ভালো হবে ।

ভালোই হবে বাবা ।

ঠিক আছে । সেতারা কার সঙ্গে থাকবে ?

তোমার সঙ্গে কিংবা বিলুর সঙ্গে ।

নীলু উঠে চলে গেল । বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, তোর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে ?
জি না ।

স্কুলে আপারা বকাঝকা করেছে বোধহয় । জানিস কিছু ?

জি না ?

নীলু সারা দুপুর জিনিসপত্র সরিয়ে পশ্চিমের ঘরটা গোছাল । আমি কয়েকবার বললাম, এই— রাত্রিবেলা ভয় পাবি । নীলু কোনো উত্তর দিল না । বিকেলের মধ্যে দেখলাম ঘর তৈরি হয়ে গেছে । একটা খাট । পড়ার টেবিল । আলনা । মায়ের ডেসিং টেবিল দিয়ে চমৎকার সাজিয়েছে । আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এক ফাঁকে আমাদের ঘর থেকে মায়ের ছবিটাও নিয়ে গেছে ।

সেতারা পড়েছে খুব মুশকিলে । সে রাতে কার সঙ্গে ঘুমোবে বুঝতে পারছে না । আমাকে সে ঠিক পছন্দ করে না । বাবার সঙ্গেও থাকতে চায় না । কিন্তু নীলু বলে দিয়েছে সে একা একা ঘুমোবে । আমি সেতারাকে বললাম, ওর যা ভূতের ভয়, দেখবি রাত আটটা বাজলেই এই ঘরে চলে আসবে কিংবা তোকে নিয়ে যাবে ।

সেতারা খুব-একটা ভরসা পাচ্ছে না । সে মুখ কালো করে দুপুর থেকেই আমার পেছনে ঘুরছে ।

ছুটির দিন বিকালে সাধারণত নজমুল চাচা আমাদের সঙ্গে এসে চা খান । আজ তিনি খবর পাঠালেন তাঁর ঘরে গিয়ে যেন আজকের চাটা খাওয়া হয় । তিনি মুক্তাগাছার মন্ডা আনিয়েছেন । নীলু বলল, ধুর— আমি যাব না ।

যাবি না কেন ?

আমার মাথা ধরেছে ।

দুটো এসপিরিন খা ।

বললাম তো ভালো লাগছে না ।

নীলু তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ।

নজমুল চাচার শরীর ভালো ছিল না । চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন । নজমুল চাচা সাধারণত চা খেতে খেতে মজার মজার গল্পগুজব করেন । আজ সে সব কিছুই হলো না । নজমুল চাচা বিরসমুখে বললেন, তোর বাবার একটা বিয়ের কথা হচ্ছে । মেয়েটির হ্যাসবেন্ড মারা গেছে একান্তরের যুদ্ধে । একটি ছেলে আছে । ন'বছর বয়স । ছেলেটা তার নানার কাছে থাকে ।

আমি কিছু বললাম না। নজমুল চাচা বললেন, মেয়েটা খুব ভালো। আমি চিনি। প্রাইমারি স্কুলের টিচার। একদিন নিয়ে আসব এখানে। তোরা কথাবার্তা বলিস।

জি আচ্ছা।

সৎ মায়ের অত্যাচার-টত্যাচার সম্পর্কে যা শোনা যায় সে সব ঠিক না। তাছাড়া তোরা তো যথেষ্ট বড় হয়েছিস। এত বড় বড় মেয়েরা তো সাধারণত বন্ধুর মতো হয়। ঠিক না?

জানি না, হয়তো হয়।

তোরা বাবার অবস্থাটা দেখতে হবে না? রাত-বিরাতে বাড়ি ফেরার বাজে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম।

নীলু আসে নি যে?

ওর নাকি মাথা ধরেছে।

ও নাকি পরীক্ষায় খুব খারাপ করেছে?

জি।

সংসারে বিশৃঙ্খলা আসার জন্যে এটা হয়েছে। বুঝতে পারছিস তো?

চাচা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রমজান ভাই এসে বলল, ইউনিভার্সিটির একজন মাস্টার নাকি নিচে বসে আছে।

চাচা অবাক হয়ে বললেন, কিসের মাস্টার? মাস্টার এখানে কী জন্যে? বিলু তুই উপরে আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো।

বসার ঘরে গম্ভীর চেহারার একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বয়স খুব বেশি নয় কিন্তু অন্যরকমের একটি ভারি ক্লি ভাব আছে। ভদ্রলোক আমাকে দেখেই বললেন, একটু দেরি করে ফেললাম, না?

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমি আগেই আসতাম। ভাবলাম জন্মদিনে খালি হাতে আসা ঠিক না। কিন্তু তোমাদের এখানে তো কিছু পাওয়া যায় না। আমি ভূটানিক ঘোরাঘুরি করেছি। কবিতার বই পাওয়া যায়। কবিতা তো তুমি পড়ো না, নাকি পড়ো?

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি বোধহয় নীলুর কাছে এসেছেন। আমি ওর ছোট বোন বিলু। আমরা যমজ বোন। ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

নীলু আমাকে বলে নি তার যমজ বোন আছে। লোকজন কি সব চলে গেছে নাকি?

কিসের লোকজন ?

আজ নীলুর জন্মদিন না ?

না তো ।

ও আমাকে বলেছিল আসতে । সম্ভবত ঠাট্টা । আমি বুঝতে পারিনি । আমি ঠাট্টা বুঝতে পারি না ।

ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা খুলে কাচ মুছতে লাগলেন । আমি বললাম, আপনি বসুন, আমি নীলুকে ডেকে নিয়ে আসি ।

তোমাদের চেহারা অদ্ভুত মিল । যমজ বোনদের মধ্যেও কিছু ডিফারেন্স থাকে । একজন মোটা হয় অন্যজন রোগা, কিন্তু...

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন ।

আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি ।

নীলুকে ভদ্রলোকের কথা বলতেই সে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ।

এইসব কী রে নীলু ? ভদ্রলোক কে ?

মুন্নিকে তো চিনিস ? মুন্নির দূর-সম্পর্কের ভাই ।

তাকে আসতে বলেছিলি ?

হঁ ।

কেন ?

এমনি বলেছি ।

আয় তাহলে । কী যে কাণ্ড ।

আমি যেতে পারব না । আমার মাথা ধরেছে ।

নীলুর মাথা ধরেছে এবং গায়ে বেশ জ্বর শুনে ভদ্রলোক অল্প হাসলেন ।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই । ওর জন্যে দুটো বই এনেছিলাম— দিয়ে দিও ।

আপনি বসুন, চা খেয়ে যান ।

তোমার বাবা আছেন ?

জি না । উনি রাত করে ফেরেন ।

তোমার বাবা যখন থাকবেন তখন একদিন আসব ।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন । হাসিমুখে বললেন, আমি আসব এটা বোধহয় নীলু ভাবেনি । এসে পড়েছি দেখে হকচকিয়ে গেছে ।

আপনি বসুন না, চা খেয়ে যান । উপরে নজমুল হুদা চাচা আছেন, তাঁর কাছেও বসতে পারেন ।

না না, ঠিক আছে ।

আমি ভদ্রলোককে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, বেশ একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হয়ে গেল তাই না? আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি ঠাট্টা-তামাশা ঠিক ধরতে পারি না। মনে হয় আমার বুদ্ধিসুদ্ধি নিচু স্তরের।

বলেই ভদ্রলোক উঁচু গলায় হেসে উঠলেন। একজন ভারি ধরনের গম্ভীর চেহারার ভদ্রলোক এমন ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠবেন আমি কল্পনাও করি নি।

নীলু বলল সে রাতে খাবে না।

কেন খাবি না রে?

বললাম না জ্বর।

রমজান ভাই কাউকে না খাইয়ে ছাড়ে না। সে ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, রাইতে ভাত না খাইলে এক চডুইয়ের রক্ত পানি হয়।

নীলু শব্দ করল না। তার ঘরের দরজাও খুলল না। সেতারার মনে ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত তাকে ডেকে নেবে। সেসব কিছুই হলো না। রাত ন'টা বাজতেই নীলু তার ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল।

খুব বৃষ্টি হলো সে রাতে— ঝমঝম করে বৃষ্টি। আকবরের মা বলল, আশ্বিন মাসে বিষ্টি, লক্ষণ খুব বালা।

আমি অনেক রাত পর্যন্ত বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাবাকে কি সব খুলে বলা উচিত? বাবা খুব দেরি করতে লাগলেন। ঝড়বৃষ্টিতে এদিকে সব ভাসিয়ে নিচ্ছে।

বাবা ফিরলেন গম্ভীর রাতে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রমজান ভাই আমাকে ডেকে তুলে ফিসফিস করে বলল, ছোট আফা, লক্ষণ বেশি বালা না!

কেন কী হয়েছে?

মদ খাইয়া আইছে।

সমস্ত রাত আমার ঘুম হলো না।

সেতারা এক কাণ্ড করেছে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে। দুটি পত্রিকার (দৈনিক বাংলা, অবজার্ভার) প্রথম পাতায় তার ছবি ছাপা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত থেকে শিশুসংগীত সম্মেলনের গ শাখায় স্বর্ণপদক নিচ্ছে।

অথচ বাবা সেতারাকে ঢাকায় যেতেই দিতে চাননি। গানের স্যারের কত ধরাধরি, কত সুপারিশ। বাবার এক কথা, না, এইসবের দরকার নেই।

শেষ পর্যন্ত নজমুল চাচা যখন সঙ্গে যেতে রাজি হলেন তখনই শুধু গম্ভীর মুখে বাবা রাজি হলেন।

ঢাকায় গিয়ে সে যে এই কাণ্ড করেছে তাও আমরা জানি না। রমজান ভাই পত্রিকা পড়ে প্রথম জানল এবং এমন চোঁচামেচি শুরু করল—।

সেতারা যে ভেতরে ভেতরে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠেছে তা আমরা বুঝতে পারি নি। সকালবেলা ঘুম ভেঙেই অবশ্যি শুনতাম—

‘কোয়েলিয়া বলেরে মাই

অঙ্গন মোরে বারে বারে

পিয়া পরদেশ গাও কিনু

সদারঙ্গ পিয়ারাবা। তোমাবিনা নয়নানা দরশন বারে বারে।’

একই জিনিস সকালে একবার বিকেলে একবার। মাথা ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা। বাবা পর্যন্ত গানের স্যারকে একদিন বললেন, ছয় সাত মাস ধরে একই জিনিস গাচ্ছে শুনতে খুবই বিরক্ত লাগে।

গানের স্যার একগাল হেসে বললেন, সময় হলে দেখবেন। হা হা হা। সময় হোক না।

ফিরে আসবার পর সেতারার একটা সংবর্ধনাও হলো। আমি সেতারাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। বাবা কোথাও যানটান না। নীলুও যাবে না।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, আরে নীলু, এই মেয়ে তোমার বোন? তুমি তো বলোনি তোমার এমন গুণী বোন আছে। আসো তুমি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

একবার ভাবলাম বলি, আমি বিলু। কিন্তু কিছুই বললাম না।

আমি দিন দশেকের মধ্যে চলে যাব। ইউনিভার্সিটি খুলে যাচ্ছে।

ও।

পরশুদিন আসতে বলেছিলাম আসোনি তো?

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। একবার ভাবলাম যাই তোমাদের বাসায়।

আমি বিলু। নীলু আসেনি।

ভদ্রলোক চশমা খুলে কাচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

এত পরে বলছো কেন? প্রথমে বললেই হতো।

ভদ্রলোক রাগী চোখে তাকালেন আমার দিকে। আমি এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। এবার পেছন ফিরে দেখলাম তিনি কেমন যেন খড়গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমার কেন জানি খুব কষ্ট হতে লাগল।

আমাকে কেউ তেমন পছন্দ করে না। কেন করে না আমি জানি না। নীলু অন্য

ঘরে চলে যাবার পর সেতারাও চলে গিয়েছে তার সঙ্গে। আকবরের মা আগে আমার ঘরের সামনে পাটি পেতে ঘুমাত, এখন ঘুমোচ্ছে ওদের ঘরের সামনে। নজমুল চাচা সব ঈদে আমাদের উপহার দেন। আমি লক্ষ করেছি নীলুর উপহারটা হয় অনেক সুন্দর, অনেক দামি।

ক্লাসের মেয়েরাও আমাকে পছন্দ করে না। টগরের বোনের বিয়েতে টগর ক্লাসের পাঁচটি মেয়ে ছাড়া সবাইকে দাওয়াত করল। আমি ঐ চার-পাঁচজন মেয়ের মধ্যে একজন। সবাই এরকম করে কেন আমার সঙ্গে?

নীলু ইদানীং আমার সঙ্গে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে। নিজের থেকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তবেই জবাব। সেদিন দেখলাম খুব সাজগোজ করছে। আমি বললাম কোথায় যাচ্ছিস রে?

যাচ্ছি এক জায়গায়।

কোথায়? কোনো বন্ধু?

নীলু চুপ করে রইল।

ঐ ভদ্রলোকের কাছে যাচ্ছিস বুঝি?

গেলে কী হয়?

প্রায়ই যাস নাকি?

মাঝে মাঝে যাই।

এরকম যাওয়া ঠিক না। লোকজন খারাপ বলবে।

খারাপ বললে বলুক না। আমি কি পায়ে ধরে সাধছি— আমাকে খারাপ না বলার জন্যে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, ঐ ভদ্রলোকের নাম কী?

রকিব ভাই, অংক পড়ায়। খুব শিগগির আমেরিকা চলে যাবে।

উনিই বলেছেন বুঝি?

মুন্নি বলেছে। উনি মুন্নির খালাতো ভাই হন।

কোন মুন্নি? কালো মুন্নি?

হঁ।

নীলু কপালে একটা টিপ পরে অনেকক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে আবার টিপটি তুলে ফেলল। হালকা গলায় বলল, মুন্নির ধারণা রকিব ভাই ওকে বিয়ে করবে।

করবে নাকি?

কী জানি করতেও পারে। আমার কিছু যায় আসে না। করতে চাইলে করবে।

যায় আসে না, তাহলে যাস কেন?

নীলু খেমে খেমে বলল, আমি ওদের বাড়ি গেলেই মুন্নি রাগ করে। দারুণ রাগ করে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। আমার খুব মজা লাগে। সেই জন্যে যাই।

ছিঃ, নীলু এইসব কী ?

শুধু মুন্নি না, ওর মাও রাগ করেন। সেদিন কী বলছিলেন শুনবি ?

কী বলছিলেন ?

বলছিলেন, মুন্নির সঙ্গে রকিব ভাইয়ের বিয়ের কথা সব পাকাপাকি হয়ে আছে, শ্রাবণ মাসে। বিয়ে ? ডাহা মিথ্যা। কোনো কথাই হয় নি।

তুই জানলি কী করে কোনো কথা হয়নি ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কাকে জিজ্ঞেস করলি ?

রকিব ভাইকে। আবার কাকে ?

খুব খারাপ হচ্ছে নীলু।

খারাপ হলে আমার হচ্ছে, তোর তো হচ্ছে না। তুই আমার সঙ্গে বকবক করিস না। যা ভাগ।

নীলু আজকাল স্কুলেও নিয়মিত যাচ্ছে না। সকালবেলা স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি-টৈরি হয়ে হঠাৎ বলবে, আজকে আর যাব না। পেটব্যথা করছে।

সেদিন সেলিনা আপা (আমাদের হেড মিস্ট্রেস) আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। রাগী গলায় বললেন, তুমি কি গত শুক্রবারে কালোমতো রোগা একটা ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলে ? বিউটি লন্ড্রির সামনে ?

কই, না তো আপা।

আমিও তাই ভাবছিলাম। ঐটা নীলু। আজোবাজে ছেলের সঙ্গে আজকাল খুব মিশছে মনে হয়। তোমার বাবাকে বলবে। ঐ সব লোফার টাইপের ছেলে। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, মেয়ে দেখলে শিস দেয়। বলবে তুমি তোমার বাবাকে।

জি বলব।

ঠিক আছে তোমার বলার দরকার নেই। তুমি বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

জি আচ্ছা।

তাছাড়া ও তো রেগুলার ক্লাসেও আসে না। বাড়িতে শাসন না থাকলে যা হয়।

নীলু এসব শুনে গা দুলিয়ে হাসতে লাগল, ধুর— ঐ ছেলের সঙ্গে আমি ঘষাঘষি করব কেন ? আমাকে জিজ্ঞেস করল ক'টা বাজে। আমি বললাম। তারপর আমি বললাম— আপনার হাতে তো ঘড়ি আছে, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ? সে

ব্যাটা একদম ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল— আমার ঘড়ি নষ্ট। আমি বললাম— মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে, না? ছেলেটার যে কী অবস্থা। দূর থেকে অন্য বন্ধুগুলি তাকে দেখছে। হি-হি-হি। ঐ পাঁজিগুলি আগে আমাকে দেখলেই শিস দিত। এখন আর দেয় না।

আর কথা হয় নি ঐ ছেলের সাথে?

আর কথা হবে কেন?

সেলিনা আপা বাবার সঙ্গে কথা বলবেন।

বলুক।

বাবা খুব রাগ করবেন।

করলে করবে।

বাবা সত্যি সত্যি রাগ করলেন। বেশ রাগ। চিৎকার চোঁচামেচি। শুধু তাই না, এক পর্যায়ে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। নজমুল চাচা ছুটে এলেন, ছিঃ ছিঃ এসব কী কাণ্ড! মেয়ে বড় হয়েছে না?

বাবা ঝাঁঝাল স্বরে বললেন, ওর স্কুল এখন বন্ধ। তুমি একটা ছেলে দেখো তো, ওর বিয়ে দিয়ে দেব।

আচ্ছা সেটা দেখা যাবে। বিয়ে দিতে চাইলে বিয়ে দেবে। বিলু মা, তুমি আমাদের দু'কাপ চা দাও তো। লেবু দিয়ে।

নীলু যেন কিছুই হয় নি ভঙ্গিতে বলল, আমাকেও এক কাপ চা দিস তো।

পরদিন নীলু স্কুলে গেল না। সন্ধ্যাবেলা বাবার সামনেই তার সমস্ত বই-খাতা বারান্দায় জমা করতে লাগল। বাবা ইজিচেয়ারে বসে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

কী করছিস নীলু?

বইপত্রগুলি সব ফেলে দিচ্ছি বাবা। পড়াশোনা তো আর করছি না। বই দিয়ে কী হবে?

পড়াশোনা করবি না আর?

না। তুমি নিষেধ করলে। তাছাড়া আমারও ভাল লাগে না।

কী করবি ঠিক করেছিস?

এখনো কিছু ঠিক করি নি।

বাবা আর কিছু বললেন না। রাতে ভাত খাবার সময় হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, রাগের মাথায় অনেক অনেকে কিছু বলে, সে সব মনের মধ্যে পুষে রাখা ঠিক না।

নীলু মুখ না তুলেই বলল, আমি মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখিনি।

আর কোনো কথাবার্তা হলো না।

সে রাতে বাবা বাইরে গেলেন না। গম্ভীর হয়ে সেতারার পড়া দেখিয়ে দিতে বসলেন। সেতারা ক্লাস সিলে উঠেছে। নতুন ক্লাসে উঠেছে বলেই পড়াশোনার খুব আগ্রহ। সে হাসি মুখে তার বইপত্র দেখাতে লাগল। বাবা একসময় আমার পড়াশোনারও খোঁজ নিলেন, পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে তো ?

জি হচ্ছে।

প্রি-টেস্ট কবে ?

এখনো দেরি আছে।

কোন কলেজে পড়বি কিছু ভেবেছিস ? ঢাকায় যেতে চাস নাকি ?

নাহ্।

ঢাকা না যাওয়াই ভালো, যা গোলমাল। এই স্ট্রাইক ওই স্ট্রাইক।

তা ঠিক।

নীলু আমাদের কাছেই কী-একটা গল্পের বই নিয়ে উবু হয়ে আছে, যেন কোনো কিছুই তার কানে যাচ্ছে না।

নীলু এত মন দিয়ে কী পড়ছিস ?

ভূতের গল্প।

নাম কী ?

ডাকবাংলা রহস্য।

খুব ভয়ের নাকি ?

খুব না। কিছু ভয়ের।

বাবা হঠাৎ বললেন, তোরা সবাই মিলে আমার বাড়ি থেকে ঘুরে আয় না। একটা চেঞ্জ হবে। সেতারার তো বোধহয় মনেই নেই।

মনে আছে বাবা, পুকুর পাড়ে দুটো তাল গাছ আছে। সেই পুকুরের ঘাটে বসে থাকলে একরকম মাছ আসে। চোখগুলো বড় বড়। ঠিক না নীলু আপা ?

হঁ। চ্যালা মাছ।

বাবা আবার বললেন, কী রে যাবি নাকি তোর ? যাস যদি তোর মামাকে লিখি। এসে নিয়ে যাবে।

তুমি যাবে না ?

নাহ্। আমার ব্যবসা-ট্যবসা খুব খারাপ। তোরা তো জানিস না। অবশ্যি আমি নিজেই বলি না কিছু। প্রেসটা আমি খুব সম্ভব বিক্রি করে দেব। বয়স হয়ে গেছে, এইসব ঝামেলা এখন আর ভালো লাগে না।

নীলু বাবার কথা শুনল, কিন্তু কিছু বলল না।

যাবি মামার বাড়ি ?

যাওয়া যায় ।

আচ্ছা ঠিক আছে, লিখে দেব তোর মামাকে । পৌষ মাসের দিকে গেলে ধান কাটা দেখবি ।

সে রাতে ঘুমোতে গেলাম দশটার দিকে । সেতারা তার বালিশ নিয়ে এসে হাজির । আপা, আজ তোমার সঙ্গে ঘুমাব ।

আয় । হঠাৎ আমার সঙ্গে যে ।

নীলু আপা বলেছে আজ সে একা একা ঘুমোতে চায় ।

বাতি নেভাতে সেতারা ফিসফিস করে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপা, রাগ করবে না তো ?

না রাগ করব কেন ?

আগে গা ছুঁয়ে বলো রাগ করবে না ।

রাগ করব না, বল ।

সেতারা বেশ খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, মেয়েদের যখন শরীর খারাপ থাকে তখন কোনো ছেলেকে চুমু খেলে নাকি পেটে বাচ্চা হয় ?

বলেছে কে এসব ?

বলো না হয় কি না ?

না, হয় না । এইসব জিনিস নিয়ে না ভাবাই ভালো ।

তাহলে বাচ্চা কীভাবে হয় ?

জার্নি না কীভাবে হয়, ঘুমা তো ।

সেতারা ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে । সেতারাও অনেকটা আশার মতো, এ বাড়িতে তার কথা বলার কেউ নেই । স্কুলে তেমন বন্ধুবান্ধব নেই । সেদিন দেখলাম টিফিনের সময় ওদের ক্লাসের সব মেয়ে মিলে চুলটানা বিবিরানা সাহেববাবুর বৈঠকখানা খেলা খেলছে । সেতারা দূরে দাঁড়িয়ে তৃষিত নম্রমে দেখছে ।

আমি সেতারার গায়ে হাত রাখতেই সেতারা ঘুমল, মাকে কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আপা । খুব লম্বা লম্বা চুল ।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুই ঘুমাসনি ?

উঁহ ।

আয় দুজনে মিলে এক কাজ করি, নীলুকে ভয় দেখিয়ে আসি ।

সেতারা উত্তেজনায় উঠে বসল । কীভাবে ভয় দেখাবে ? জানালার কাছে গিয়ে ‘হুম’ করবে ।

তা করা যায় । যাবি ?

চল।

আমরা দরজা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে এসে দেখি বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। তার পাশে মোড়ায় গুটিগুটি মেরে নীলু বসে আছে। বাবা নীলুর মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। নীলু সম্ভবত কাঁদছে। বাবা আমাদের দেখে হালকা গলায় বললেন, কিরে সেতারা— বাথরুমে যাবি নাকি?

না বাবা, আমরা নীলু আপাকে ভয় দেখাবার জন্যে এসেছি।

বাবা হেসে উঠলেন। দীর্ঘদিন পর বাবা এমন উঁচু গলায় হাসলেন।

নীলু চোখ মুছে বলল, আমাকে ভয় দেখান এত সস্তা না।

আমাদের বাড়িটির একটি নাম আছে ‘উত্তর দিঘি’। বাড়ির কত সুন্দর সুন্দর নাম থাকে কিন্তু এ বাড়িটি দেখতে যেমন অদ্ভুত, নামটিও তেমনি। মায়ের খুব শখ ছিল শ্বেতপাথরের একটা নতুন নেম প্লেট লাগাবেন, ‘মাধবী ভিলা’ লেখা থাকবে সেখানে।

বাড়িটি কিনেছিলেন আমার দাদা। তিনি ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক ছিলেন। দাঙ্গার সময় যখন ময়মনসিংহ শহরের বেশির ভাগ ধনী হিন্দু জলের দামে বাড়ি বিক্রি করে কোলকাতায় চলে গেল, আমার দাদা তখন ‘উত্তর দিঘি’ ও ‘শ্রীকালি প্রেস’ কিনে ফেললেন। টাকা যা দেয়ার কথা তার অর্ধেকও নাকি দেননি। এইসব আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। মা নাকি বিয়ের পর অনেকদিন দেখেছেন বাড়ির মালিক বাকি টাকার জন্যে এসে বসে আছে এবং দাদা নানান রকম টালবাহানা করছেন। তার কিছুদিন পর দাদা মারা যান। আমার ধারণা লোকটিকে টাকা-পয়সা না দেয়ার জন্যেই নিদারুণ যন্ত্রণায় দাদার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পেটে ক্যানসার হয়েছিল।

আমাদের ‘উত্তর দিঘি’ বাড়িটি প্রকাণ্ড। দোতলা বাড়ি। তরো ছাদে ওঠার কোনো সিঁড়ি নেই। মার খুব শখ ছিল ছাদে ওঠার সিঁড়ি করবেন। জোছনা রাতে ছাদে হাঁটাহাঁটি করা যাবে। হাঁটাহাঁটি করার জায়গার অভাব এ বাড়িতে নেই। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি। কাঁঠাল, পেয়ারা, আখ এবং তেঁতুল গাছ দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। বাড়ির সামনে ফুলের গাছ আছে বেশ কয়েকটা এবং জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট দিয়ে উঁচু বেদির মতো করে বাঁধান। সেখানে বসে খুব আরাম করে গল্পের বই পড়া যায়। আমার যখন কিছু ভালো লাগে না তখন আমি লাল বেদিগুলোর কোনো-একটিতে বসে থাকি। নীলুর মতো ওগুলো আমার গোসাঘর।

আজ আমার মন খুব ভালো ছিল। মন ভালো হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। কিন্তু ভালো লাগছিল। তবু আমি গোসাঘরে এসে চুপচাপ বসে রইলাম। সেতারা দোতলার বারান্দায় বসে গলা সাধছিল। বেশ লাগছিল শুনতে। এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। নীলুর সেই রকিব ভাই হঠাৎ করেই যেন আমার সামনে এসে

উপস্থিত হলেন। এখানে আসতে হলে গেট খুলে অনেকখানি হাঁটতে হয়। কখন গেট খুললেন এবং কখনই বা এলেন।

ভালো আছ ?

আপনি ভালো আছেন ?

আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিলাম, তুমি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছ। তোমার বাবা বাসায় আছেন ?

জি না। সন্ধ্যা নাগাদ আসবেন।

আমি তার সঙ্গে দেখা করব আজকে, কী বলো ?

ঠিক আছে।

আমি পরশুদিন সকালে ঢাকা চলে যাব। ভাবলাম যাবার আগে দেখা করে যাই। আর আসা হবে কি-না জানি না।

আর আসবেন না বুঝি ?

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি কি আসতে বলো ?

আমি চুপ করে রইলাম।

কী, কথা বলছো না যে ?

আমি কিন্তু বিলু, আপনি আমাকে নীলু ভাবছিলেন।

ভদ্রলোক চশমা খুলে কাচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

নীলু কি বাসায় আছে ?

জি আছে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

না ঠিক আছে ডাকতে হবে না।

ডাকতে হবে না কেন ? আপনি তো ওর সঙ্গেই কথা বলতে এসেছেন ?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

ঠিক তা না। আমি নদীর ধার দিয়ে অনেকখানি হাঁটি। আর ও তাই করছিলাম। হঠাৎ তোমাকে দেখলাম। ভাবলাম নীলু।

ও।

নীলু অনেকদিন মুন্সিদের বাড়িতে যায় না। যেনই ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমি জানো কিছু ?

জি না। ওর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ।

ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমরা যে বাচ্চা মেয়ে এটাও মনে থাকে না।

আমি বুঝি বাচ্চা মেয়ে ?

হঁ। তোমরা আড়ি দাও এবং ভাব দাও। ঠিক না ?

আমি দেই না, নীলু দিতে পারে। আসুন, ভেতরে এসে বসুন। নজমুল চাচা আছেন, দোতলায় তাঁর ঘরেও বসতে পারেন।

নজমুল চাচা কে ?

আমাদের একজন ভাড়াটে। দোতলায় একটা ঘর নিয়ে থাকেন।

নীলু শোনো, আমি এখন আর ঘরে ঢুকব না।

আমি কিন্তু বিলু।

ও হ্যাঁ বিলু। তুমি এক কাজ করো, আমি নীলুর জন্যে একটা গল্পের বই এনেছিলাম, ‘ঘনাদার গল্প’, এটা ওকে দিয়ে দিও।

আমি অল্প হাসলাম। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, হাসছো কেন ?

আপনি একটু আগে বলেছিলেন নীলুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসেননি, এখন বলছেন বই নিয়ে এসেছেন তাই হাসছি।

ঠিক তখন দোতলার বারান্দা থেকে নজমুল চাচা ডাকলেন, এই— এই বিলু উনি কে ?

নজমুল চাচার গলা ভয় ধরান, যেন হঠাৎ ভূত দেখেছেন। অনেকক্ষণ থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন হয়তো।

পরিচয় করিয়ে দেবার পর নজমুল চাচা অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আরে আপনি জমির আহমেদ সাহেবের ছেলে ? আপনাকে চিনব না বলেন কী ? আপনার বাবা ছিলেন কালিনারায়ণ স্কলার।

আমি বাবার মতো হইনি অবশ্যি।

আরে আপনিই কম কী। অংকের প্রফেসর। কী সর্বনাশ।

প্রফেসর না। লেকচারার।

আমার কাছে লেকচারারও যা প্রফেসরও তা। কী আশ্চর্য কণ্ঠ বলেন দেখি। নীলুর সঙ্গে আলাপ হলো কীভাবে ?

ও আমাকে একটা অংক জিজ্ঞেস করেছিল, আমি করতে পারিনি।

বলেন কী! কী অংক ?

ও জিজ্ঞেস করল— পাঁচের সঙ্গে দুই যোগ করলে কখন হয় হয় ?

কখন হয় ?

যখন ভুল হয় তখন হয়। অংকটা আসলে সহজ।

নজমুল চাচা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, যা নীলুকে আসতে বল। বলবি প্রফেসর সাহেব এসেছেন। চা-টীর ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি ঘর থেকে বেরোবার সময় শুনলাম ভদ্রলোক বলছেন, আপনি কি বুঝতে পারেন কে বিলু কে নীলু ?

পারি। নীলুটা খুব হাত নেড়ে কথা বলে।

রকিব সাহেব দোতলায় বসে আছেন শুনে নীলু দারুণ অবাক হলো।

সে কী, আমি তো বলেছি এ বাড়িতে যেন কখনো না আসেন।

কী জন্যে বলেছিস?

ধুর, ভাল্লাগে না।

ভাল্লাগে না কেন?

এমনভাবে কথা বলে যেন আমি বাচ্চা মেয়ে।

যাবি না তাহলে?

উঁহু।

নীলু যদিও বলল উঁহু কিন্তু আমি দেখলাম সে কামিজ বদলে শাড়ি পরছে।

শাড়ি পরছিস কেন?

ইচ্ছা হয়েছে পরছি। তোকে জিজ্ঞেস করে কাপড় পরতে হবে?

নীলু অনেক সময় নিয়ে মুখে পাউডার দিল। এবং একসময় চিরুনি হাতে এসে বলল, চুল বেঁধে দিবি?

আমি চুল বেঁধে দিয়ে বললাম, আজ আর তোকে কেউ বাচ্চা মেয়ে বলবে না।

নীলু রাগী স্বরে বলল, তুই কি ভাবছিস আমি দোতলায় যাচ্ছি? মোটেই না, আমি বাগানে হাঁটতে যাচ্ছি। সেতারার গলা সাধা শেষ হলোই যাব।

আমি দেখলাম নীলু সত্যি সত্যি সেতারাকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব লাগছে তাকে। আমার মনে হলো এমন রূপবর্তী মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি।

বড় মামার চিঠি এসেছে।

সুদীর্ঘ চিঠি। যার বক্তব্য হচ্ছে— এ সময় গ্রামের বাড়িতে নীলু-বিলুদের বেড়াতে আসা ঠিক হবে না। কী কারণে ঠিক হবে না তা স্পষ্ট করে বলা নেই। শুধু লেখা— গাঁয়ের লোকজন এদের দেখতে এসে নানান কথা বলবে, এটা ওদের ভালো লাগবে না। মনের উপর চাপ পড়বে। এইসব আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগল। চিঠি শেষে পুনশ্চতে লেখা— যা ইহার হইয়াছে, এখন দুলাভাই আপনি যদি হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখাইয়া সব ভুলিয়া যান তাহা হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। ভুল মানুষ মাত্রই করে। ইহাই মানব ধর্ম।

এর মানে কী? নতুন করে এইসব কথা তোলা হচ্ছে কেন?

নীলুকে জিজ্ঞেস করতেই সে হেসে বলল, বুঝতে পারছিস না? মা এখন মামার বাড়িতে।

তার মানে?

মানে-টানে জানি না। মা এখন মার ঘাড়ে চেপে বসে আছে। মামা ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে।

বুঝলি কী করে ?

এখানে না বোঝার কিছু আছে নাকি ?

নীলু তরল গলায় হাসল।

শেষ পর্যন্ত দেখবি বাবা বলবেন, ঠিক আছে চলে আসুক। আর মা তার ছেলে কোলে নিয়ে এ বাড়িতে উঠে আসবেন। খুব কান্নাকাটি হবে কিছুদিন। তারপর সব ঠিকঠাক। মাঝখান থেকে আমরা একটা ভাই পেয়ে যাব।

তোর কথার কোনো ঠিকঠিকানা নেই নীলু।

না থাকলে কী আর করা। তবে এ রকম হলে মন্দ হয় না। কী বলিস ? বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে না ?

হঁ।

বাবা যে হারে মদ-টদ খাচ্ছে। একেবারে দেবদাসের মতো—

নীলু হেসে উঠল।

এর মধ্যে হাসির কী আছে ?

কান্নারও কিছু নেই।

নীলু গম্ভীর মুখে বই নিয়ে পড়তে বসল। ইদানীং তার পড়াশোনায় খুব মনোযোগ হয়েছে। এই নিয়ে কিছু বললে সে গম্ভীর হয়ে বলে, তোরা সব স্টার-ফার পেয়ে পাস করবি আর আমি বুঝি ফেল করব ? সেটা হচ্ছে না।

এখন আমাদের স্কুলটুল নেই। পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে জোরেসোরে। সপ্তাহে তিনদিন কোচিং ক্লাস হয়। সেখানে মেয়েরা সবাই ভান করে যে কিছু পড়াশোনা হচ্ছে না। কে কোন কলেজে পড়বে সে নিয়েও ক্ষীণ আলোচনা হয়। হলিক্রস কলেজ ভালো না ইডেন ভালো সব মেয়েরাই সেটা জানে।

এমন সিরিয়াস পড়াশোনার সময়টাতেও আমাদের ক্লাসের রুবিনার বিয়ে হয়ে গেল। সেলিনা আপা খুব রাগ করলেন— বাবা-মাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি ? সেলিনা আপা খুব কাটা কাটা কথা বলে অপমান করলেন রুবিনার বাবাকে। বাঁঝাল গলায় বললেন, আপনাদের মতো শিক্ষিত মুখের জন্যে দেশের এমন খারাপ অবস্থা।

রুবিনা খুবই কান্নাকাটি করতে লাগল। গায়েহলুদের দিন দেখি কেঁদে মুখটুক ফুলিয়ে ফেলেছে। রুবিনার এক মোটাসোটা খালা পানভর্তি মুখ নিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন, মেট্রিক ক্লাসটা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের বয়স। এরপর আর রসকষ থাকে না। নীলুটা ফস করে বলে বসল, কেন, তখন রস কী হয় ?

রুবিনার খালা চোখ বড় বড় করে বললেন, এই ফাজিল মেয়েটা কে ?

নীলু হাসিমুখে বলল, ফাজিল বলছেন কেন ?

খুব হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। রুবিনার খালা রেগেমেগে অস্থির। কয়েকবার বললেন, আজকালকার মেয়েগুলি এমন কেন ?

অনেকদিন পর রুবিনার গায়েহলুদ উপলক্ষে আমরা খুব হৈচৈ করলাম। বিয়েটিয়ে এই জাতীয় অনুষ্ঠান আমার ভালো লাগে না। গাদাগাদি ভিড়। মেয়েদের লোক দেখান অহ্লাদীপনা। খাবার টেবিলে তাড়াহুড়ো করে বসতে গিয়ে শাড়িতে রেজালার ঝোল ফেলে দেয়া। অসহ্য! কিন্তু রুবিনার গায়েহলুদ আমার কেন যে এত ভালো লাগল। বরের বাড়ি থেকে ‘এলা’ নামের একটি মেয়ে এসেছিল, সে ঢাকায় ‘ও’ লেবেলে পড়ে। ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। জন্নের বন্ধুত্ব। এর আগে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়নি। আমরা দুজন এক ফাঁকে ছাদে চলে গেলাম। মেয়েটি নানান কথা বলতে লাগল। একটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। ছেলেটি মেডিক্যালে পড়ে। এক বিয়ে বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। খুব নাকি লাজুক ছেলে। আর দারুণ ভদ্র। এলা নিচু স্বরে বলল, জানো ভাই, ও একবার যা অসভ্য কথা লিখেছিল আমাকে। আমি খুব রাগ করলাম। ওর সঙ্গে দেখা করাই বন্ধ করে দিলাম। টেলিফোন করলে টেলিফোন নামিয়ে রাখতাম। শেষে কী করল সে জানো ?

কী করল ?

বলল সে বিষ খাবে। আমি তো জানি তাকে। খাবে বলেছে যখন তখন খাবেই। ছেলেরা দারুণ সেন্টিমেন্টাল হয় ভাই।

তখন তুমি কী করলে ?

কী আর করব, দেখা করলাম।

আমি ইতস্তত করে বললাম, অসভ্য কথাটা কী লিখেছিল ?

এলা তরল গলায় হেসে উঠল, দূর তা বলা যায় নাকি ? বিয়ের দিন তুমি আসবে তো ? ঐ দিন তোমাকে ওর ঐ চিঠিটাই পড়ার। দেখবে ছেলেরা কী রকম অসভ্য হয়।

রুবিনার বিয়ের দিন আমরা কেউ ও-বাড়িতে গেলাম না। নীলুর জন্যেই যাওয়া হলো না। সে কিছুতেই যাবে না এবং আমাকেও যেতে দেবে না।

তুই না গেলে না যাবি। আমি যাই।

না, বললাম তো যেতে পারবি না।

কেন, অসুবিধেটা কী ?

ওরা আজীবাজে কথা বলছিল, তোকে বলতে চাই না।

বলতে চাস না কেন ?

কারণ শুনলে তোর খারাপ লাগবে।

লাগুক খারাপ।

নীলু মৃদু স্বরে বলল, ওরা বলছিল সেতারার চেহারার সঙ্গে নাকি ঐ লোকটির খুব মিল। আর সেতারা গান-বাজনাও ঐ লোকটির মতো জানে।

কখন বলছিল?

রুবিনার খালা বলছিল, আমি পাশের ঘরে ছিলাম।

আমি চুপ করে রইলাম।

নীলু বলল, তোর মন খারাপ লাগবে বলেছিলাম না। তবুও তো শোনা চাই।

আমি সে রাতে ঘুমোতে পারলাম না। বাবা ফিরলেন অনেক রাতে। সিঁড়িতে ধূপধাপ শব্দ হতে লাগল। রমজান ভাইয়ের গলা শোনা গেল, ছিঃ, আপনার শরম করে না?

চুপ থাক।

আপনে চুপ থাকেন।

ধূপ করে একটা শব্দ হলো। বাবার গলা।

ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেব। শুয়োরের বাচ্চা। বেশি সাহস হয়েছে।

মেয়েরা বড় হইছে না? হায়া-শরম নাই?

চুপ থাক।

আপনে চুপ থাকেন।

পানি ঢালার শব্দ। আকবরের মা উঠে গেল। বানবান করে কী যেন পড়ল। আবার পানি ঢালা হচ্ছে। কী হচ্ছে এসব?

বাবা আজকাল বড্ড ঝামেলা করছেন। আবার একটা বিয়ে করলে তার জন্যে ভালোই হতো। নজমুল চাচা যাকে বাসায় নিয়ে এসেছিলেন, সেই মহিলাটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। ছোটখাট মানুষ, লম্বা চুল। কথা বললে টেনে টেনে। আমাদের সঙ্গে বেশ আগ্রহ করে কথা বললেন। নীলু যখন বিজল, আচ্ছা আপনি কি আমাদের দুজনকে আলাদা করতে পারবেন? আমার নাম নীলু ওর নাম বিলু। কিছুক্ষণ পর যদি আমরা দুজন এক রকম কাপড় পরে আসি তাহলে কি বলতে পারবেন কে বিলু কে নীলু?

তিনি হাসিমুখে বললেন, আরে এ মেয়ে তো দেখি খুব পাগলি!

আমাদের দু'জনারই ভদ্রমহিলাকে খুব পছন্দ হলো। শুধু সেতারা মুখ গাঁজ করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি ডাকলেন, এই কী যেন নাম তোমার?

সে উঠে চলে গেল।

আমরা তাঁকে বাগান দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলাম। সেতারা কিছুতেই যাবে

না। আমরা সেতারাকে ছাড়াই বাগানে বেড়াতে গেলাম। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তেঁতুল গাছ দুটি দেখে তিনি খুব অবাক হলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, বসতবাড়ির কাছে কেউ তেঁতুল গাছ লাগায় নাকি ?

নীলু বলল, লাগালে কী হয় ?

বুদ্ধি কমে যায়। তেঁতুল খেলেও বুদ্ধি কমে।

এটা কিন্তু ঠিক না। রকিব ভাই খুব তেঁতুল খান। কিন্তু তাঁর খুব বুদ্ধি।

রকিব ভাই কে ?

নীলু চুপ করে গেল। তিনিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একবার শুধু বললেন, এত বড় বাড়িতে থাকো, ভয় লাগে না ?

আমরা কিছু বললাম না। ভদ্রমহিলা যাবার আগে নীলুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন, তোমাদের মার সঙ্গে কি তোমাদের যোগাযোগ আছে ?

নীলু বলল, না নেই।

তোমরা চিঠি লিখলেই পারো। তোমরা কেন লিখবে না ? তোমরা লিখবে।

আমাদের খুব আশা ছিল ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাবার বিয়ে হবে। কিন্তু বিয়ে হয় নি। বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না। নজমুল চাচার উপর রেগে গিয়ে আজীবনে কথা বলতে লাগলেন, তোমরা পেয়েছো কী ? আমাকে না বলে এই সব কী শুরু করেছ ?

নজমুল চাচাও কী সব যেন বললেন। তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল।

এক পর্যায়ে বাবা বললেন, যাও তুমি আমার বাড়ি থেকে এক্ষুনি বিদেয় হও।

নজমুল চাচাও চৈততে লাগলেন, আমি তোমার দয়ার উপর আছি নাকি ? নগদ ভাড়া দিয়ে থাকি।

সে এক বিশী অবস্থা। নজমুল চাচা সেই রাতেই ঠেলা গাড়ি নিয়ে এলেন। মালপত্র পাঠান হতে লাগল। আমরা বসে বসে দেখলাম। ঠেলা গাড়ি এসেছে দুটি। নজমুল চাচার জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব তোলা হয়ে গেল। আমরা দেখলাম বাবা দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির কাছে আর নজমুল চাচা একটা বেতের ঝুড়ি হাতে নিয়ে নেমে যাচ্ছেন।

নীলু তখন ছুটে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় তাঁকে জোপ্টে ধরল।

নজমুল চাচা বললেন, আরে মা, কী করিস তুই, ছাড় ছাড়।

নীলু ছাড়ল না।

নজমুল চাচা বললেন, এ তো বড় মুসিবত হলো দেখছি। আরে বেটি কী করিস।

তাঁর হাত থেকে বেতের ঝুড়ি ছিটকে পড়ে গেল।

নজমুল চাচা ভারী গলায় বললেন, এই মালপত্র সব তুলে রাখ। সাবধানে তুলিস।

নজমুল চাচা আমাদের কোনো আত্মীয় নন। দোতলার তিনটি কামরা ভাড়া নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন পনেরো বছরের মতো। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন ষোলে-সতেরো বছর আগে। একটিমাত্র মেয়ে, অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়ে নেদারল্যান্ড না কোথায় যেন থাকে। বছরে দু'তিনটি চিঠি দেয়। চিঠিতে খুব স্বাস্থ্যবান কিছু ছেলেমেয়ের ছবি থাকে। নজমুল চাচা সেই চিঠি পড়ে গভীর হয়ে বলেন, উফ এয়ারন বাংলাটা এখনো শেখে নাই। খুব খারাপ, খুব খারাপ।

এয়ারন তাঁর নাতনি।

নীলু অনেক কিছুই করতে পারে যা আমি পারি না। নজমুল চাচা যখন চলে যাচ্ছিলেন আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে তাঁকে ফেরাই। কিন্তু আমি গেলাম না, ছুটে গেল নীলু। আমরা দুজনে দেখতে অবিকল একরকম, কিন্তু দুজন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে উঠছি। আমরা এ রকম কেন?

কাল রাতে আমি চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখেছি। এমন চমৎকার স্বপ্ন যে ঘুম ভেঙে খানিকক্ষণ কাঁদলাম। একবার ইচ্ছে হলো নীলুকে ডেকে তুলি। স্বপ্নের কথাটা বলি ওকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করলাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে স্বপ্নটার কথা ভাবলাম। ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্নটিকে অর্থবহ মনে হচ্ছিল জেগে থেকে তা আর মনে হলো না। আমি দেখেছিলাম একটি নদী। নদীর চারপাশে ঘন বন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বন অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখলাম শুধুই নদী। সেই নদীতে বালি চিকচিক করছে। কোথাও কেউ নেই। আমার একটু ভয়ভয় করছে। তবু আমি নদীতে নামতেই নদীটি আমাদের নানার বাড়ির পুকুর হয়ে গেল। সে পুকুরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুমির কুমির খেলছে। স্বপ্নের নদীর পুকুর হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমি একটুও সন্দেহ না হয়ে ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে কুমির কুমির খেলতে লাগলাম। একটি পাঁজি ছেলে ডুবসাঁতার দিয়ে কেবলই আমার পা জড়িয়ে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে চাচ্ছিল। আমার রাগ লাগছিল কিন্তু কিছুই বলছিলাম না। কারণ স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছিল এই ছেলেটি যেন আমার স্বামী। একসময় ছেলেটি টেনে আমাকে মাঝপুকুরে নিয়ে গিয়ে চাঁচিয়ে বলল, এই সুশী তোমাকে এখন ছেড়ে দেই?

কেন মানুষ এমন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে? আমি জেগে এই ছেলেটির মুখ খুব মনে করবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই মনে পড়ল না। শুধু মনে পড়ল ছেলেটির চোখগুলো মেয়েদের চোখের মতো টানা টানা। আর ওর হাত দুটি লম্বা এবং খুব ফরসা। কে জানে এ রকম একটি ছেলের সঙ্গেই হয়তো আমার বিয়ে হবে। সে আমাকে আদর করে ডাকবে 'সুশী'। কী আশ্চর্য এরকম একটা অদ্ভুত নাম এল

কোথেকে ? ভাবতে ভাবতে আবার আমার চোখ ভিজে উঠল। বাকি রাত এক ফোঁটা ঘুম এল না।

এত ভোরে কখনো আমি আগে উঠিনি। অদ্ভুত লাগছিল আমার। আলোটাই অন্যরকম। কেমন মায়া মায়া আলো, স্বপ্নের মধ্যে যে-রকম আলো দেখা যায় সে রকম। আমি নিচে বাগানে নেমে গেলাম। কদম গাছের নিচটায় তখনো খুব অন্ধকার। আমার একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু গাছের নিচে এসে দাঁড়ান মাত্র দেখলাম নীলু জেগে উঠেছে। টুথব্রাশ নিয়ে ঘুমঘুম চোখে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। নীলু সব সময় খুব ভোরে ওঠে। কিন্তু সে যে এ রকম অন্ধকার ভোর তা জানা ছিল না। আমি ডাকলাম, এ্যাঁই নীলু।

নীলু আমাকে দেখতে পেল না। সে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর একটি কাণ্ড করল, মা এসেছে মা এসেছে বলে ছুটে গেল গেটের দিকে।

আমি এগিয়ে এসে বললাম, এ্যাঁই নীলু কী হয়েছে রে ?

নীলু খুব অবাক হলো। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। একসময় থেমে থেমে বলল, আমি ভাবলাম মা বুঝি। গলার স্বর অবিকল সে রকম লাগল।

নীলুর কি কিছুটা আশাভঙ্গ হয়েছে ? কী জানি হয়তো হয়েছে। মা'র কথা সে হয়তো সারাক্ষণই ভাবে। মুখে বলে না।

আজ এত সকালে উঠেছিস যে ?

দেখলাম একদিন উঠে কেমন লাগে।

কেমন লাগে ?

ভালোই তো।

নীলু চুপচাপ দাঁত ঘষতে লাগল। আমি বললাম, তুই কি মা'র কথা খুব ভাবিস ? নাহ্।

তাহলে আজ এ রকম ছুটে গেলি যে ?

আমার ইচ্ছা হয়েছে গিয়েছি। তোর তাতে কী ?

রাগ করছিস কেন ?

নীলু জবাব না দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। তখন সন্ধ্যা পড়ল নীলুর সঙ্গে আমার ঝগড়া চলছে। গত এক সপ্তাহ ধরে কথাবাতা বন্ধ। ঝগড়ার কারণটি অতি তুচ্ছ। আমি নীলুর একটি চিঠি খুলে পড়ে ফেলেছি। কিছুই নেই সে চিঠিতে। ছয় লাইনের একটি চিঠি। নীলুর পরিচিত প্রফেসরটি লিখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার যে বইটি নীলু পড়তে চেয়েছে সেটি তিনি দোকানে খুঁজে পাননি। পেলেই পাঠাবেন।

এমন কী আছে সেই চিঠিতে যে নীলু রাগ করল ? কিন্তু সে এমন ভাব করতে লাগল যেন আমি তার কাছে লেখা খুব গোপন একটি প্রেমপত্র পড়ে ফেলেছি। আমি

যখন বললাম কী আছে এই চিঠিতে যে তুই এ রকম করছিস ?

যাই থাকুক, কেন আমার চিঠি পড়বি ?

বেশ, আর পড়ব না।

পড়বি না শুধু না, তুই আমার ঘরেও কোনোদিন ঢুকবি না।

বেশ, ঢুকব না।

আর আমার সঙ্গে কথাও বলবি না।

ঠিক আছে, বলব না।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলো না। সন্ধ্যাবেলা বাবা প্রেস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে নালিশ করল, বাবা বিলু আমার সব চিঠিপত্র পড়ে ফেলে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তুমি ওকে ডেকে নিষেধ করে দাও।

ঠিক আছে করব।

না, এখনই করো।

বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত স্বরে বললেন, একজনের কাছে লেখা চিঠি অন্যের পড়াটা ঠিক না মা। আমি লজ্জায় বাঁচি না। নীলুটা এমন হচ্ছে কেন কে জানে। আগে এ রকম ছিল না। তার কাছে চিঠি এলেই আমাকে সে চিঠি পড়তে দিতো। একবার সে পেনফ্রেডশিপ করল বুলগেরিয়ার কী একটা ছেলের সঙ্গে। সেই ছেলেটা সবুজ রঙের কাগজে লম্বা লম্বা চিঠি লিখত ভুল ইংরেজিতে। চিঠির শেষে একটা ঠোঁটের ছবি ঐকে লিখত 'Kiss'। নীলু আমাকে সেই চিঠি পড়তে দিয়ে বলত, মাগো কী অসভ্য! নীলুর সেইসব চিঠির জবাবও লিখে দিতাম আমি। একদিন সে লজ্জায় লাল হয়ে বলল, বিলু চিঠির শেষে তুইও লিখে দে 'Kiss'। ঐ বাঁদরটার সাথে তো আর দেখা হচ্ছে না। কী বলিস ? আমি লিখলাম 'Kiss'। নীলু বহু যত্নে একটা ঠোঁটের ছবিও আঁকল। তারপর ঐ ছেলে ছবি পাঠাল। মাথায় চুল নেই একটিও। গালে এত বড় একটা আঁচল। হাতের কানের অতো বড় বড় কান। ছবি দেখে দারুণ রেগে গেল নীলু। ছেলেটি লিখেছিল সুযোগ পেলেই সে তার বাংলাদেশী পেনফ্রেড নীলুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। নীলু বলল, লিখে দে হাদারাম তুমি বাংলাদেশে এলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। বাঁদর কোথাকার।

নীলু চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলেও আমি ঠিকলিয়ে যেতে লাগলাম। মজাই লাগত আমার। বানিয়ে বানিয়ে কত কিছু যে লিখেছি। যেমন একবার লিখলাম, কাল আমরা সমুদ্রে নৌকা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কী যে সুন্দর সমুদ্র আমাদের। খুব মজা হয়েছে। একবার সে লিখল, তোমার কি কোনো ছেলেবন্ধু আছে ? আমি লিখলাম, হ্যাঁ আছে। আমার ছেলে-বন্ধুটি একজন কবি। সে আমাকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছে।

ছেলেটা সত্যি সত্যি হাঁদারাম। যা লিখতাম তাই বিশ্বাস করত। তারপর একদিন সে হঠাৎ লিখে বসল, আসছে সামারে আমি বাংলাদেশে আসব। কী সর্বনাশ। ভয়ে আমি এবং নীলু দুজনই অস্থির। একি ঝামেলা হলো। কী যে ভয়ে কেটেছে সেই সময়টা। রাতে ভালো ঘুম পর্যন্ত হতো না। নীলু অবশ্যি খুব একটা ভয় পায়নি। ও বলত, খামোকা ভয় পাচ্ছি, আসবে-টাসবে না। আর যদি এসেও পড়ে, তাহলে বলব নীলু নামের মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।

ছেলেটি অবশ্যি আসেনি। এবং চিঠিপত্রও দেয়নি আর। হয়তো অন্যকোনো দেশের কোনো মেয়ের সঙ্গে আবার পেনফ্রেন্ডশিপ করেছে।

নীলুর যন্ত্রণায় আরো সব চিঠি লিখতে হয়েছে আমাকে। একবার সে বলল, খুব ভাষা-টাষা দিয়ে একটা চিঠি লিখে দে তো বিলু। কার কাছে, কী— কিছুই বলবে না। লিখলাম একটা চিঠি। সেটা তার পছন্দ হলো না। আবার একটা লিখলাম। কত কাণ্ড হলো সে চিঠি নিয়ে। ক্লাসের মেয়েরা সেই চিঠির লাইন বলে বলে নীলুকে খ্যাপাতে লাগল। কোথায় পেয়েছে তারা সেই চিঠি কে জানে। নীলু যে ছেলেকে লিখেছিল সে-ই হয়তো বলে দিয়েছে। নীলু বাসায় এসে কেঁদে-টেদে অস্থির। সেই সময় নীলুর সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। নীলু হঠাৎ করেই অন্যরকম হয়ে গেল। আমার কোনো বন্ধুটুকু নেই। নীলু দূরে সরে যেতেই আমি একা হয়ে গেলাম। এরকম একটি অদ্ভুত সুন্দর সকালে একা থাকতে ইচ্ছে করে না। আমি নীলুর খোঁজে বাগানের পেছনের দিকে এসে দেখি নীলু কাঁদছে। কী আশ্চর্য! আমি বললাম, কী হয়েছে রে?

কিছু হয় নি।

কাঁদছিস কেন?

তোর কাছে সব কিছু বলতে হবে নাকি?

বললে দোষ কি?

নীলু কোনো জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে বাগান ছেড়ে চলে গেল। সকালটা হঠাৎ করেই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। লোকজন সবাই জেগে উঠেছে। রমজান ভাই ঘটাং ঘটাং করে টিউবওয়েলে পানি তুলছে। আকবরের মা ময়লা থালা-বাসন এনে জমা করছে টিউবওয়েলের পাশে। একসময় রুমড়া লেগে গেল দুজনের মধ্যে। এরা দুজন দুজনকে সহ্যই করতে পারে না। তবু কেমন করে থাকে এক সঙ্গে? এদের চোঁচামেচিতেই বোধহয় বাবার ঘুম ভাঙল। বাবা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চারদিক আবার চুপচাপ। বাবা বললেন, আমাকে চা দাও এক কাপ। এরা দুজনে কেউ কোনো উত্তর করল না। আকবরের মা বেড়ালের মতো ফাঁসফাঁস করে কী বলতেই আবার বেঁধে গেল রমজান ভাইয়ের সঙ্গে। বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। আজকাল কেউ আর বাবাকে তেমন গ্রাহ্য করে না। আমি এগিয়ে এসে বললাম,

আমি বানিয়ে আনছি বাবা ।

তুই আবার চা বানাতেও জানিস নাকি ?

জানব না কেন ?

বাবা অবাক হয়ে বললেন, কার কাছে শিখলি ?

কী আশ্চর্য কাণ্ড, চা বানান আবার শিখতে হয় নাকি ? বাবা এরকম ভান করতে লাগলেন যে খুব অবাক হয়েছেন ।

আর কী জানিস, রান্নাবান্না করতে পারিস ? ভাত-মাছ এইসব ?

নাহ্ ।

এগুলিও শিখে ফেল । রমজানকে বল শিখিয়ে দিতে ।

আচ্ছা বলব ।

নীলুকে সঙ্গে নিয়ে শিখে ফেল । একদিন বিয়েটিয়ে হবে । রান্নাবান্না না জানলে বিয়ে দেয়াই যাবে না, হা হা হা ।

অনেক দিন পর বাবা হাসলেন । মানুষের হাসির মতো সুন্দর কি কিছু আছে ? বাবার হাসির সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রোদ ঝলমল করে উঠল ।

মা একটা কথা সবসময় বলতেন, মানুষ যখন হাসে তখন তার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী হাসে । কিন্তু সে যখন কাঁদে, তার সঙ্গে আর কেউ কাঁদে না । কাঁদতে হয় একা একা ।

চা বানাতে বানাতেই শুনলাম সেতারা গলা সাধা শুধু করেছে । নিসা গামা পামা গামা । গামা পামা গারে সা । গান-টান কিছু না, সামান্য সারে গামা, কিন্তু কী যে ভালো লাগছে শুনতে ।

বাবাকে চা নিয়ে দিতেই বাবা বললেন, ভাবছি তোদের নিয়ে কোথাও ঘুরেটুরে আসব । যাবি নাকি ?

কোথায় ?

গারো পাহাড়ে গেলে কেমন হয় ? জাড়িয়ে জাঙ্গাইল লাইনে বেশি দূর হবে না । ছয়-সাত ঘন্টা লাগবে ট্রেনে । বন বিভাগের একটা রেস্টহাউস আছে । যাবি নাকি ?

যাব বাবা ।

জায়গাটা সুন্দর । রাতেরবেলা একটু ভয়ভয় লাগে ।

কেন ?

বন্য হাতির শব্দটুকু পাওয়া যায় । এখন বোধহয় আর সে রকম নেই । তোরা যদি যেতে চাস তাহলে একটা প্রোগ্রাম করি ।

যাবে কবে ?

দুই দিনের মাত্র ব্যাপার, একটা তারিখ করলেই হয়। তুই নীলুকে জিজ্ঞেস করে আয় ও যাবে কি-না।

নীলু সব শুনে লাফিয়ে উঠল। বেড়ানোর ব্যাপারে নীলুর মতো উৎসাহী আর কেউ নেই। গারো পাহাড় দেখতে যাওয়া হবে শুনেই তার সব রাগ পড়ে গেল। নানান রকম পরিকল্পনা করে ফেললাম আমরা। যেমন সম্পাদের ক্যামেরাটা নিয়ে যাব এবং খুব ছবি তুলব। সেখানে আমরা দুজনেই শাড়ি পরব। এবং এ উপলক্ষে বাবাকে বলব দুটি শাড়ি কিনে দিতে। বন বিভাগের রেন্ট হাউসে রাতের খাবার-টাবার হয়ে যাবার পর বাবাকে বলব গল্প বলার জন্যে। বাবা অবশ্যি গল্পটোল তেমন বলতে পারে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা হারিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকব। হারিকেনের আলো কী যে ভালো লাগে আমার।

একেকটা দিন এমন অন্যরকম হয়। মনে হয় দুঃখ-টুঃখ সব বানান ব্যাপার। চারদিকে শুধু সুখ এবং সুখ। সন্ধ্যাবেলা আমরা দু'বোন শাড়ি পরে বারান্দায় হাঁটছি, নজমুল চাচা ডেকে পাঠালেন।

কিরে বেটিরা শুনলাম দল বেঁধে নাকি পাহাড়ে যাচ্ছিস ?

জি চাচা।

তা আমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করিল না ? আমারও তো পাহাড়-টাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সত্যি সত্যি যাবেন আমাদের সাথে ?

এরকম পরীর মতো মেয়েদের পাহারা দিয়ে রাখার জন্যেও তো লোকজন দরকার।

পরের কয়েকটি দিন আমাদের দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। একদিন শুনলাম বন বিভাগের ডাকবাংলোটা পাওয়া গেছে। তারপর দিনক্ষণ ঠিক হলো। ন'তারিখে ভোরের ট্রেনে যাব, পৌঁছব বিকাল নাগাদ। নজমুল চাচা যাবেন। রমজান যাবে। বাবার প্রেসের একজন কম্পোজিটর মাখন মিয়া সেও যাবে। কারণ মাখন মিয়ার বাড়ি ঐ অঞ্চলে, সে সব খুব ভালো চেনে।

আট তারিখ রাতে বাবা বাড়ি ফিরলেন না। রাত একটায় নজমুল চাচা খোঁজ নিতে গেলেন। আমরা তিন বোন বসার ঘরে বসে রইলাম চুপচাপ। নজমুল চাচা ফিরলেন দু'টার দিকে এবং হালকা গলায় বললেন, কাজে আটকা পড়ে গেছে, সকাল বেলাতেই চলে আসবে। ঘুমিয়ে পড়ো। নীলু শান্ত স্বরে বলল, বাবার কী হয়েছে বলেন ?

কী আবার হবে ? কাজ থাকে না মানুষের ?

নজমুল চাচা রেগে গেলেন। নীলুও রেগে গেল।

বাবার কী হয়েছে বলেন।

কাল সকালে আসবে, তখন জিজ্ঞেস করিস। কিছু হয় নি, ভালোই আছে।

নীলু তেজি গলায় বলল, আপনাকে এখন বলতে হবে।

এরকম করে তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন?

নীলু কেঁদে ফেলল। বাবা ফিরলেন পরদিন দুপুরে। কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে। তাঁর রাত কেটেছিল থানা হাজতে। মদ খেয়ে খুব নাকি হৈচৈ করছিলেন বা এই জাতীয় কিছু। খুবই কেলেংকারি ব্যাপার। আমরা সগুহখানেক কেউ স্কুলে গেলাম না। ঠিক করলাম বাবার সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলব না। ডাকলেও সাড়া দেব না। এমন ভাব করব যেন শুনতে পাইনি। কোনো লাভ অবশ্যি তাতে হলো না। বাবা আমাদের ডাকাডাকি বন্ধ করে দিলেন। যতক্ষণ বাসায় থাকেন চুপ করে থাকেন।

একদিন দেখি একটি টেলিভিশন কিনে আনলেন। সেতারার খুব শখ ছিল টিভির। কথা ছিল সেতারার আগামী জন্মদিন ঢাকা থেকে এটি কিনে আনা হবে এবং সেই উপলক্ষে আমরা সবাই দল বেঁধে ঢাকা যাব। তিনি বোধহয় আমাদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যেই আগে-ভাগে কিনে ফেললেন। সন্ধ্যাবেলা টিভি চালু হলো। আমরা কেউ দেখতে গেলাম না। আকবরের মা এবং রমজান ভাই মোড়া পেতে টিভির সামনে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে রইল।

বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম আমরা। সেই সময় বড় মামার চিঠিতে জানলাম মা'র একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম কাজল।

মায়ের শরীর খুব খারাপ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছেন। কী যে কষ্ট হলো আমার। কত লক্ষ বার যে বললাম— মা ভালো হয়ে যাক। মাকে ভালো করে দাও। রোজ রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখতাম। রক্তশূন্য একটি লম্বাটে ফর্সা মুখ। চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। স্বপ্নে দেখে রোজ রাতেই কাঁদতাম। আমরা তিন বোনই নিশ্চিত ছিলাম মা মারা যাবেন। কিন্তু তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। চিঠি লিখল মা নীলুকে। নীলু তার কোনো চিঠি আমাকে পড়তে দেয় না। কী লেখা ছিল সে চিঠিতে তা জানলাম না। নীলু শুধু বলল, কাজল খুব মিস করছে, রাতে মাকে ঘুমাতে দেয় না।

এসএসসি পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করলাম। এত ভালো যে, সেলিনা আপা একদিনের জন্যে স্কুল ছুটি দিলেন। এবং একটি গোল্ড মেডেল দেবার ব্যবস্থা করলেন। খায়রুন্নেসা গোল্ড মেডেল। খায়রুন্নেসা তাঁর মায়ের নাম। এই গোল্ড মেডেলটি সেবারই প্রথম ঘোষণা করা হলো। আমাদের স্কুলের কোনো ছাত্রী যদি এসএসসি পরীক্ষায় সমস্ত বোর্ডে প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকতে পারে, তবেই সে এই গোল্ড মেডেল পাবে। ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে আমাকে 'পাঁচশ' টাকা

দেয়া হলো। শুধু তাই না, একদিন সকালবেলা একজন স্থানীয় সংবাদদাতা আমার ইন্টারভ্যু নিতে এলেন। নজমুল চাচার উৎসাহের সীমা নেই। শাড়ি খুলে একটা কামিজ-টামিজ পর, বয়স কম দেখা যাবে। কানের দুলগুলি খুলে ফেল তো, ভালো ছাত্রীদের এইসব গয়না-টয়না মানায় না। মুখে হালকা করে পাউডার দে।

ইন্টারভ্যু পর্ব সমাধা হতে অনেক সময় লাগল। বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন নজমুল চাচা। যেমন ভদ্রলোক যখন জিজ্ঞেস করলেন, দৈনিক ক'ঘন্টা পড়াশুনা করতে? আমি কিছু বলার আগেই নজমুল চাচা বললেন, ঘন্টার কি কোনো হিসাব আছে ভাই? রাতদিনই পড়ছে। যখনই দেখি তখনই মুখের ওপর একটা বই। হা হা হা।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কোনো প্রাইভেট টিচার ছিল?

নজমুল চাচা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই মেয়ের প্রাইভেট টিচার লাগে? কী যে বলেন ভাই!

কথাটি পুরোপুরি মিথ্যা। আজিজ স্যার আমাকে আর নীলুকে সপ্তাহে চারদিন অংক করাতেন। নলিনীবাবু স্যার পড়াতেন ইংরেজি।

পাঠ্যবই ছাড়া বাইরের বই কেমন পড়েছ তুমি?

বাইরের বই তো বেশি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় সব আপনার নিচের ক্লাসেই পড়ে শেষ করেছে। হা হা হা।

ইন্টারভ্যু হলো আসলে নজমুল চাচার সঙ্গে। আমি শুধু হাসিমুখে তাঁর পাশে রইলাম। এবং সেই ইন্টারভ্যুর খানিকটা ছাপাও হলো একটি ইংরেজি পত্রিকায়। তার পরপরই একটি চিঠি পেলাম আমরা দু'বোন।

কল্যাণীয়ায় নীলু অথবা বিলু

তোমাদের দু'বোনের একজনের ছবি দেখলুম পত্রিকায়। ছবির সঙ্গে ডাকনাম দেয়া ছিল না। কাজেই বুঝতে পারছি না ছবিটি কার।

যার ছবি তার জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। মফস্বলের একটি স্কুল থেকে এমন চমৎকার রেজাল্ট করা দারুণ ব্যাপার। আমার খুবই ভালো লাগছে। এর মধ্যে একবার ময়মনসিংহ এসেছিলাম। তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছি। গেট বন্ধ ছিল। কাজেই ভেতরে আর ঢুকিনি। পরে ভেবেছি গেট খুলে ঢুকলেই হতো।

অনেক সময় আমরা যা করতে চাই করতে পারি না। কেন পারি না তাও জানি না। পরে তা নিয়ে কষ্ট পাই। ঠিক না?

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমরা দু'বোন আমার চিঠি পড়ে খুব হাসবে। অবশ্যি একটি ক্ষীণ আশা যে এই চিঠিটি তোমাদের হাতে পৌঁছবে না। কারণ তোমাদের ঠিকানা আমার জানা নেই। শুধু জানি তোমাদের দু'বোনের একজন হচ্ছে নীলু, একজন বিলু এবং তোমাদের বাড়িটির নাম 'উত্তর দিঘি।' এরকম সংক্ষিপ্ত ঠিকানায় চিঠি যাওয়ার কথা নয়। ঠিক না?

রকিব হাসান

কত অসংখ্যবার যে সেই চিঠি আমি পড়লাম। প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে এই চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তার বাইরেও কিছু আছে। আর একবার পড়লেই তা বোঝা যাবে।

চিঠিটি নজমুল চাচাও পড়লেন এবং বললেন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। খুব আদব-কায়দা। একটা ভালো সংবাদ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিয়েছে। এইসব ভদ্রতা কি দেশে আজকাল আছে? সংবাদ শুনলে লোকজন আজকাল বিরক্ত হয়। মা সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লেখো। বানান ভুল যেন না থাকে। সাবধান। ডিকশনারি দেখবে। আর শোনো, এই চিঠি যত্ন করে তুলে রাখবে। রেজাল্ট নিয়ে যত চিঠি, যত টেলিগ্রাম আসবে সব তুলে রাখবে। আলাদা একটা ফাইল করে রাখবে। আমি অফিস থেকে ফাইল নিয়ে আসব।

নীলু চিঠিটির শুরুটা পড়েই গম্ভীর মুখে বলল, তোর চিঠি আমাকে দিচ্ছিস কেন? আমি অন্যের চিঠি পড়ি না।

পড়া যাবে না এমন কিছু এখানে লেখা নেই।

না থাকুক।

নীলু পাশ ফিরে বালিশে মুখ ঢাকল। তার বেশ ক'দিন ধরে জ্বর থাকছে। তেমন কিছু নয়, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠছে না। আমার ধারণা, সে আশা করেছিল তার রেজাল্ট অনেক ভালো হবে। রেজাল্ট মোটেও ভালো হয়নি। ফাস্ট ডিভিশন দেখা শেষ করে আমরা যখন সেকেন্ড ডিভিশন দেখতে শুরু করেছি সে তখন দৌড়ে পালিয়েছে। নজমুল চাচা তাকে পাসের খবর দিতেই সে কেঁদে-টেদে একটা কাণ্ড করেছে।

পরেরবার অনেক ভালো হবে দেখবি।

আর দেখতে হবে না।

সবাই কি আর ফাস্ট-সেকেন্ড হয় নাকি রে বোকা? আমি নিজে তিনবারের বার মেট্রিক পাস করলাম। কিন্তু আইএ-তে আবার ফাস্ট ডিভিশন!

থাক, আপনাকে আর বকবক করতে হবে না।

বাবা নিজে এসেও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

আরে সেকেন্ড ডিভিশন খারাপ নাকি ?

খারাপ হবে কেন ? খুব ভালো, তুমি যাও তো এখন।

নীলুকে আমরা খুব শক্ত মেয়ে হিসেবে জানতাম। এই ব্যাপারটায় যে সে এতটা মন খারাপ করবে ভাবতেও পারিনি। কিছু দিন পরই সে জুরে পড়ে গেল। অল্পদিনের জুরেই শুকিয়ে-টুকিয়ে অন্যরকম হয়ে গেল। এক রাতে ঘুমুতে এল আমার ঘরে। একা একা তার নাকি ভয় লাগছে। কে যেন বারবার তার জানালার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দুজন অনেকদিন পর এক সঙ্গে ঘুমুতে গেলাম। সেতারা শুয়েছে একা একটি খাটে। আমরা দুজন একটিতে। আমি নরম স্বরে বললাম, এত মন খারাপ করছিস কেন ?

জানি না কেন।

তুই তো পড়াশোনাই করিসনি, রেজাল্ট কোথেকে ভালো হবে ?

তা ঠিক।

নীলু একটি হাত আমার গায়ের ওপর রেখে বলল, দুজন এবার আলাদা হয়ে যাব। তুই যাবি ঢাকায় আর আমি এখানে কোনো ভাঙা কলেজে।

আমি ঢাকায় যাব না, এইখানে থাকব।

তুই ঢাকায় পড়তে যাবি এটা তো জানা কথা। সেটাই ভালো। তুই এত ভালো ছাত্রী, তোর তো ভালো কলেজেই যাওয়া উচিত।

আমরা দুজন হালকা গলায় নানান কথাবার্তা বলতে লাগলাম। অনেক রাতে শুনলাম বাবা ঘরে ফিরেছেন। গুনগুন করে কী বলছেন। রমজান ভাই রাগী গলায় কী-সব বলছেন। নীলু ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, চল ঘুমিয়ে পড়ি।

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছি, তখন নীলু বলল, বিলু একটা কথা। জেগে আছিস তো ?
হঁ।

আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোকে।

কী প্রতিজ্ঞা ?

নীলু চুপ করে রইল। আমি অবাক হয়ে বললাম, কিসের প্রতিজ্ঞা ?

ঢাকায় গিয়ে রকিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবি না।

এসব কী বলছিস, আমি দেখা করব কেন ?

আর ওর চিঠির জবাব দিবি না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নীলু কাঁদতে শুরু করল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, কথা দে আমাকে আমার গা ছুঁয়ে বল।

কী যে কাণ্ড তোর।

আমি নীলুকে জড়িয়ে ধরলাম। এমন বোকা কেন নীলুটা ?

সেদিন আকাশের রঙ ছিল ঘন নীল।

আমরা এমনিতে কখনো আকাশ দেখি না। আমরা আকাশের দিকে তাকাই মন খারাপ হলে। মন বিষণ্ণ হলে আকাশও বিষণ্ণ হয়। হেমন্তের এই ঝকঝকে সকালে আকাশটা অসম্ভব বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমি তবু মুখে হাসি টেনে রাখলাম। ভোরবেলা নাশতা খাবার সময় খুব হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করলাম। নজমুল চাচাও আজ আমাদের সঙ্গে নাশতা খেলেন। নীলু বসে রইল পাথরের মতো মুখ করে। বাবা একবার সাবধানে চলাফেরার কথা বললেন।

একা একা কোথাও যাবার দরকার নেই। কোথাও যেতে হলে বন্ধু-বান্ধব কাউকে সঙ্গে নিবি।

নজমুল চাচা বললেন, চিন্তার কিছু নেই, সফদর সাহেব প্রতি শুক্রবারে এসে বাসায় নিয়ে যাবেন। আর ছুটিছাঁটা হলে নিজে ময়মনসিংহে এসে পৌঁছে দেবেন। অতি ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি।

আমি তাদের কথায় হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না। ঠিক যখন যাবার সময় হলো তখন ইচ্ছে করল চৌচিয়ে বলি— আমি এইখানেই থাকব। এখানকার কলেজে ভর্তি হব। কিছুই বলা হলো না।

নজমুল চাচা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন ছাড়তে খুব দেরি করতে লাগল। বাবা প্লাটফর্মের দাঁড়িয়ে রইলেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। নীলু সেতারা কেউ আসে নি। ওরা খুব কাঁদছিল। বাবা বলেছিলেন, তোরা আসিস না। তোরা থাক এখানে। আর এত কান্নাকাটির কী আছে। দুই মাস পরে তো আসছেই।

ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় বাবা মনে হলো খুব অবাক হয়ে পড়েছেন। যেন ভাবতে পারেননি ট্রেন একসময় ছেড়ে দেবে। তিনি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলেন। নজমুল চাচা বললেন, আরে করো কী, হাত ছেড়ে দাও। বাবা হাত ছাড়লেন না। যেন শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে হলো আমি চলে যাচ্ছি। তিনি ট্রেনের লোকজন, প্লাটফর্মের গাদাগাদি ভিড় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফুঁপিয়ে উঠলেন, আমার আশ্বি। আমার রাত্রিমনি। ওরে বেটি টুনটুন।

আমি পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলাম। পৃথিবীতে এত কষ্ট কেন থাকে ? কেন এত দুঃখ চারদিকে ? জানালার ওপাশে কী সুন্দর সব দৃশ্য। গাঢ় নীল রঙের ডোবা একটি। তার ওপর সাদা মেঘের ছায়া পড়েছে। কঞ্চি হাতে একটি ছোট্ট ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ট্রেনের দিকে। পাট বোঝাই একটি গরুর গাড়ির চাকা

আটকে গেছে। গরুটি ধবধবে সাদা। একসময় নজমুল চাচা বললেন, ছিঃ মা কাঁদে না।

বিলু,

তোর দুটি চিঠিই পেয়েছি। প্রথমটির জবাব সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলাম। রমজান ভাইকে পোস্ট করতে দিয়েছি। ওমা, দুই দিন পরে দেখি তার বাজারের ব্যাগ থেকে চিঠি বেরুল। ভিজে ন্যাতা ন্যাতা। অথচ রমজান ভাই আমাকে বলেছে সে নিজ হাতে চিঠি ফেলেছে। দেখ অবস্থা। তারপর তোমার দু'নম্বর চিঠিটি এল। ভাবলাম রাতে জবাব লিখব। রাত ছাড়া চিঠি লিখতে ভালো লাগে না। কিন্তু রাতে বাবার খুব জ্বর এল। মাথায় পানি ঢালতে হলো, ডাক্তার আনতে হলো। ডাক্তার বলছেন ম্যালেরিয়া। দেশে কি এখন ম্যালেরিয়া আছে নাকি যে ম্যালেরিয়া হবে। ডাক্তারটির বয়স খুব কম, আমার মনে হয় নতুন পাস করেছে। আমার মতো পাস। বইটাই ভালোমতো পড়েনি। আমার সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বলছিল।

মিস নীলু, ভয়ের কিছু নেই। আমি আবার এসে দেখে যাব।

আমি হেসে বাঁচি না। মিস নীলু আবার কী! কলেজে ওঠার পর দেখি অনেকেই সম্মান-টম্মান করছে। বিশেষ করে আমাদের কলেজের একজন লজিকের স্যার— নজিবুর রহমান ভুঁইয়া। উনি সব সময় আপনি আপনি করছেন। ছাত্রীরা তাঁর নাম দিয়েছে প্রেমকুমার। কারণ তিনি নাকি সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করেন। তাঁকে প্রতি বছর পাঁচ হাজার হাফসোল খেতে হয়। হাফসোল কী জানিস তো? নাকি তোদের কলেজে এসব কথা বলে না?

যাই হোক নজিবুর রহমান স্যার কী করল তোকে বলি। ক্লাসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, ইচ্ছা নজিবুর রহমান স্যারের সঙ্গে দেখা। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, তুমি ফাস্ট ইয়ারের না? জি স্যার।

গত ক্লাসে আস নি কেন?

বাবার জ্বর ছিল তাই আসিনি।

লজিকের কতগুলি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন পড়েয়েছি। মিস করলে পরেরগুলি ধরতে পারবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। নজিবর রহমান স্যার গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ মাথা দুলিয়ে বললেন, ঠিক আছে আমার কাছে প্রিপেয়ারড নোট আছে। একবার এসে নিয়ে যেও।

আমি অবশ্যি নোট নিতে যাই নি। গেলেই আমার নাম হয়ে যেত প্রেমকুমারী। হি হি হি। উঁচু ক্লাসের মেয়েদের কাছে শুনেছি তাঁর কাছে ক্লাস নোটের দশ-বারোটা কপি তৈরি থাকে। যাদের সঙ্গে তাঁর প্রেম করার ইচ্ছে হয় তাদের তিনি ডেকে ডেকে দেন। ভদ্রলোক কিন্তু পড়ান খুব ভালো। আমাদের আরেকজন স্যার আছে খুব ভালো পড়ান। তাঁর নাম কি জানিস? তাঁর নাম 'মুরগির গু'। কী জন্যে বেচারার এই নাম হলো? অনেকদিন ধরে তাঁর এই নাম চলছে। ছোটখাট মানুষ, খুব পান খান। ক্লাস শুরু করবার আগে ডাক্টার দিয়ে টেবিলে একটা প্রচণ্ড বাড়ি দিয়ে বলেন, নিস্তরুতা! ছাত্রীগণ নিস্তরুতা হিরন্ময়! প্রথমদিন তো আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম, কিন্তু পরে দেখি সাংঘাতিক ভালো পড়ান। তাঁর একটা ভালো নাম হওয়া দরকার ছিল।

ক্লাসের অনেক কথা লিখলাম। আরো মজার ব্যাপার আছে, পরে লিখব। একজন আপা আছেন তাঁর নাম 'মিস চাটা'। দারুণ অসভ্য অসভ্য সব গল্প আছে তাঁকে নিয়ে। চিঠিতে লেখা যাবে না।

এবার অন্য খবর বলি। মুন্নির বিয়ে হয়ে গেছে। জেদে পিভিবির ইঞ্জিনিয়ার। খুব নাকি বড়লোক। আমি অবশ্যি বিয়েতে যাই নি। কারণ আমাকে যেতে বলেনি। মুন্নি ক্লাসের প্রায় সব মেয়েকে বলেছে, আমাকে বলে দিও রকিব ভাই এসেছিলেন ঢাকা থেকে। আমার অবশ্যি দারুণা ছিল আসবেন না। বিয়ের পরদিন আমাদের বাড়িতে এলেন। কখন এসেছেন আমি কিছুই জানি না। কী জন্যে রাসার ঘরে গিয়েছি, দেখি তিনি বসে বসে বাবার সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর গায়ে নীল রঙের স্ট্রাইপ দেয়া একটা শার্ট ছিল। এমন মানিয়েছিল তাঁকে কী বলব।

আমার গায়ে ছিল বোম্বে প্রিন্টের ঐ জংলী শাড়িটা। আমাকে নিশ্চয় ভূতের মতো লাগছিল। কারণ ঐ দিন আমি

চুলও বাঁধিনি, কিছুই করিনি। আকবরের মাকে বলেছিলাম চুল বেঁধে দিতে। সে দিতাছি আপা বলে সেই যে গিয়েছে গিয়েছেই। আর দেখা নেই। আমি গিয়ে দেখি দিব্যি ঘুমাচ্ছে। তারপর আমিও ঘুমাতে গেলাম। এখন চিন্তা করে দেখ অবস্থা। চুল বাঁধা নেই। ঘুমঘুম ফোলা মুখ, পরনে জংলী শাড়ি। কী ভাবলেন উনি কে জানে। আমি তো একদম হতভম্ব হয়ে গেছি। উনি বললেন, তুমি কে নীলু না বিলু ?

আর বাবার যা কাণ্ড। বাবা বললেন, সালাম কর নীলু, সালাম কর।

সালাম করব কী। আমি বললাম, আপনি বসুন, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

উঁহু, আমি বেশিক্ষণ বসতে পারব না।

উনি অবশ্যি অনেকক্ষণ বসলেন। চা'টা খেলেন। যাবার আগে আমাকে দুটো বই দিয়ে গেলেন। একটা হচ্ছে— ঘনাদার গল্প (দেখো না কাণ্ড, ঘনাদার গল্প পড়ার বয়স এখন আছে ?) অন্যটি হচ্ছে একটি কবিতার বই, নাম— পালক। আজ আর লিখব না, ঘুম পাচ্ছে।

নীলু

পুনশ্চ তোর সঙ্গে যে রকিব ভাইয়ের দেখা হয়েছিল ঢাকায় এই কথাটি তুই কোনো চিঠিতেই লিখিস নি।

প্রিয় আপা,

আমি তোমাকে চারটি চিঠি দিয়েছি, তুমি মাত্র দুটি চিঠির জবাব দিয়েছ। এরকম করলে আমি আড়ি নেব। তখন মজা টের পাবে। বাবার খুব অসুখ। ডাক্তার বলেছেন ম্যালেরিয়া। খুব দুর্বল হয়ে গেছেন। এখন আর বাইরে যান না। আর বাবা তার প্রেসটা বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু কাউকে সেটা বলেননি। নজমুল চাচা এটা শুনে খুব দুঃখ করেছেন।

আরেকটা খুব খারাপ খবর আছে। আমার গানের স্যারের ছোট ছেলেটা পানিতে ডুবে মরে গেছে। ছেলেটার বয়স সাত। তার নাম দীপন। তুমি তাকে দেখেছিলে। তোমার মনে আছে। তবলা বাজিয়েছিল। তুমি বললে ওমা এইটুকু ছেলে আবার তবলা বাজায়। তোমার কলেজ কবে ছুটি হবে ?

সেতারা

প্রিয় মা বিলু,

দোয়া নিও। তোমার বাবার অসুখের সংবাদ পাইয়াছ। এখন কিছুটা সুস্থ, তবে পুরাপুরি সারে নাই। চিন্তার কোনো কারণ নাই। ইতিমধ্যে তোমার লোকাল গার্জেন সফদর সাহেবের একখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি নাকি তাঁকে বলেছো— তুমি ছুটির দিনে হোস্টেলেই থাকতে চাও। এটা ঠিক না। সফদর সাহেব অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর কথা শুনিবে। এবং সেই মতো চলিবে।

তোমার বাবার ব্যবসা কিঞ্চিৎ মন্দা যাইতেছে। তিনি খুব সম্ভবত প্রেস বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। কাজটা ঠিক হয় নাই। চালু প্রেস বিক্রয় করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি কোনোরূপ চিন্তা করিও না। তোমাদের অন্য অংশটি ভাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি। দুই একজনের সঙ্গে কথাবার্তা হইয়াছে। যে-কোনো ভাড়াটেকে হুট করিয়া ঢুকানো ঠিক হইবে না, তাই বিলম্ব হইতেছে।

ভালো থাকিও ও ঠিকমত পড়াশুনা করিও।

তোমার চাচা

নজমুল ইসলাম

নীলু,

তোর চিঠি পেয়েছি আজ বিকেলে।

এখন রাত প্রায় এগারোটা। অনেক রাতে উত্তর লিখিতে বসেছি, কারণ আমার রুমমেট কিছু লেখার সময় খুব বিরক্ত করে। ঘাড়ের কাছে মাথা এনে সে চিঠি পড়বে। আমি এতটুকুও পছন্দ করি না, তবু সে এটা করবেই। তার ধারণা আমি কোনো ছেলেকে চিঠি লিখছি। আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

বাবার অসুখের খবর পেয়ে খুব খারাপ লেগেছে। এতদিনে সেরেছে নিশ্চয়ই। সব জানাবি। নজমুল চাচা লিখেছেন প্রেস বিক্রি হয়ে গেছে। শুনে যা ভয় লাগছে। এখন আমাদের চলবে কী করে? আজ সমস্ত দিন আমার এইসব ভেবে খুব খারাপ লেগেছে। তার উপর আজ বায়োলজি ল্যাব ছিল। আমাদের ডেমনস্ট্রেটর একটা ব্যাঙ এনে ক্লোরফর্মড

করলেন। আমরা শুধু দূর থেকে দেখলাম। তারপর উনি সেটা কচ করে কেটে ফেললেন। ব্যাণ্ডের হৃৎপিণ্ডটা তখনো লাফাচ্ছে। কী যে খারাপ লেগেছে।

বিকলে হোস্টেলে ফিরে এসেও বমি বমি লাগছিল। রাতে ভাত খাইনি। আমার রুমমেট তখন ফ্রেন্স টোস্ট করে খাওয়া। ওর একটা কেরোসিন কুকার আছে। খাটের নিচে লুকিয়ে রাখে। কারণ হলে এইসব এলাউ করে না। কিন্তু বেচারির খুব রান্নার শখ। কয়েকদিন আগে গাজরের হালুয়া বানাল। এটা বানান যে এত সহজ তা জানতাম না। খেতেও খুব ভালো হয়েছিল। মেয়েটির নাম মালা। রাজশাহী থেকে এসেছে। অনেক রকম রান্না জানে। দারুণ স্মার্ট মেয়ে। হোস্টেল সুপারের পারমিশন না নিয়েই সে দু'দিন তার এক আত্মীয় বাড়ি থেকে এসেছে।

এখানে নিয়মের খুব কড়াকড়ি। তবে সিনিয়র মেয়েদের বেলায় এতটা নয়। সিনিয়র মেয়েরা দোতলায় থাকে। ওদের সঙ্গে আমাদের তেমন যোগ নেই। ওরা অনেক রকম কাণ্ডকারখানা করে। গত শুক্রবারে কী হয়েছে জানিস? রাত একটায় হঠাৎ শুনি দারুণ হৈচৈ হচ্ছে। পরে শোনা গেল, দোতলার ক'টি মেয়ে প্ল্যানচেট করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মা নিয়ে এসেছে। সে আত্মা আবার কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। হোস্টেল সুপারটুপার এলেন। হলস্থল কাণ্ড।

তুই লিখেছিস তোর রকিব ভাইয়ের সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু লিখিনি। ইচ্ছে করেই লিখিনি। তুই আবার কী ভাবতে কী ভাববি। যাক এখন লিখছি। সৈদিন কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যাল খাতা কিনতে ন্যুমার্কটে গিয়েছি। আমার সঙ্গে আছে আমার রুমমেট মালা। সে চুল ঝাঁপার রাবার ব্যান্ড আর টিপ কিনবে। কেনাকাটা শেষ হবার পর আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ মালা বলল— দ্যাখ ঐ ভদ্রলোক তখন থেকে আমাদের পিছে পিছে আসছে আর মিচকি মিচকি হাসছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। আমাকে তাকাতে দেখেই সে বলল— তুমি নীলু না বিলু?

আমি তখনো চিনতে পারিনি। তখন ভদ্রলোক রাগী গলায় বললেন— চিঠির জবাব দাওনি কেন? তখন চিনলাম। খুব

অবাক হয়েছিলাম। এ রকম দাড়িগোঁফ কল্লনাও করিনি। তারপর উনি আমাদের আইসক্রিম খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। মালা কিছুতেই যাবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি গেল। তিনি সারাক্ষণই তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তার কী ধারণা জানিস? তার ধারণা— না বলব না।

শোন নীলু একটা কথা— তুই ঐ ভদ্রলোককে বলবি উনি যেন দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলেন। যা জঘন্য লাগছিল ওঁকে।

এই যা— একটা বেজে যাচ্ছে, শুয়ে পড়ি। কাল পরশু আবার চিঠি লিখব।

বিলু

মা বিলু,

দোয়া নিও। নীলুর নিকট হইতে শুনিলাম তোমাদের দোতলার মেয়েরা প্ল্যানচেটে আত্মা আনিয়াছে। উহাদের সহিত কোনোরূপ সম্পর্ক রাখিবে না। সব কিছু নিয়া ছেলেখেলা ভালো না।

তোমাদের উপরের তলায় নতুন ভাড়াটে আসিয়াছে। অতি সজ্জন ভদ্রলোক। স্বামী-স্ত্রী ও একটি ছেলে। ছেলেটি ঈষৎ দুরন্ত।

তোমার বাবার অসুখ অল্প বাড়িয়াছে। তবে চিন্তার কারণ নাই। শরীরের ওপর অযত্ন ও অবহেলার এই ফল। কিছুদিন ভুগাইবে। আর সব সংবাদ ভালো। জনৈক লোক মারফত আমি মুক্তাগাছার কিছু মণ্ডা পাঠাইলাম। বন্ধু-বান্ধব নিয়া খাইও। আর তোমাদের হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের নিকট একটি পৃথক পত্র দিলাম। পত্রটি তাহাকে পৌঁছাইও এবং আমার সালাম দিও। ইতি।

তোমার চাচা

নজমুল ইসলাম

হোস্টেল সুপার।

জনাবা,

সবিনয় নিবেদন এই যে, জানিতে পারিলাম আপনার হোস্টেলের কতিপয় ছাত্রী প্ল্যানচেট না কী যেন করিতেছে। এইসব বিষয় নিয়া ঠাট্টা-তামাশা শুভ নয়। ছাত্রীর অভিভাবক

হিসাবে আমি চিন্তাযুক্ত আছি। আপনি যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া চিন্তামুক্ত করিবেন। আপনার নিকট এই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইতি

নজমুল ইসলাম

আপা,

তুমি নীলু আপাকে এত লম্বা লিখেছ, আমাকে লেখোনি কেন? আমি খুব রাগ করেছি। আর কোনোদিন তোমাকে চিঠি লিখব না। আল্লাহর কসম।

বাবার অসুখ খুব বেড়েছে। আর আকবরের মার হাতের আঙুলের নিচে ঘা হয়েছে। নজমুল চাচা বলেছেন বেশি পানি ঘাঁটাঘাঁটির জন্যে এটা হয়েছে।

দোতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে করিম সাহেব। ভদ্রলোক খুব মোটা। তাঁর ছেলেটি দারুণ দুষ্ট। এবং খুব ফাজিল। সে আমাদের কাচের জগটা ভেঙে ফেলেছে। ভেঙে আবার দাঁত বের করে হাসে। এমন ফাজিল।

সেতারা

পুনশ্চ আপা তোমরা যে রবীন্দ্রনাথের আত্মা এনেছ সে কী করেছে? আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে বলেছে সেও নাকি প্ল্যানচেট করতে পারে। আমার বিশ্বাস হয় না, সে খুব গুল ছাড়ে। এই জন্যে আমরা তার নাম দিয়েছি গুল বাহার।

প্রিয় বিলু,

তোদের হোস্টেলের মেয়েরা ভূত এনেছে শুনে নজমুল চাচা খুব রাগ করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি হোস্টেল সুপার এবং প্রিন্সিপ্যালকে চিঠি লিখবেন।

আমাদের দোতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নীনা। ভদ্রমহিলা নাকি-স্বরে কথা বলেন। প্রথম দিন বাড়িতে এসে বললেন— বাঁড়ি ত খুব বড়। তঁবে চাঁরদিকে খুব জঁঙ্গলা। আমি বহু কষ্টে হাসি সামলেছি। তবে ভদ্রমহিলা খুব ভালো। বাবার জন্যে স্যুপ করে পাঠান। এবং খুব খোঁজখবর করেন। তবে ভদ্রমহিলার গুচিবাযু আছে। রোজ তিন-চারবার ঘর ধোয়া-মোছা করেন।

বিলু, তোকে এখন একটা কথা বলি— আমি রকিব ভাইয়ের একটা খুব চমৎকার চিঠি পেয়েছি। এত সুন্দর চিঠি যে আমি খুব কাঁদলাম। কত লক্ষ্যবার যে পড়লাম সেই চিঠি। আমার কী ইচ্ছে করে জানিস? ইচ্ছে করে একদিন হুট করে ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে খুব চমকে দেই। তারপর তিনি যখন বলবেন— তুমি কে, নীলু না বিলু? আমি তখন বলব, আমি বিলু। এবং অনেকক্ষণ বিলু হিসেবে কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ বলব, আমি কিন্তু নীলু। ভদ্রলোকের মুখের অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখ।

বিলু, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কী করে আমার পরিচয় হলো তোকে বলি। মুন্নিদের বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। অপলারাও গিয়েছে। মুন্নি বলল, আমার এক ভাই এসেছেন, ইউনিভার্সিটির টিচার। অংকের টিচার, যা গম্ভীর। আমরা আড়াল থেকে দেখলাম সত্যি গম্ভীর। মুন্নি তখন করল কী জানিস? আমাকে বলল— এই নীলু, তুই যদি আমার ঐ ভাইয়ের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে খেতে পারিস তো বুঝব তোর সাহস। আমি বললাম— আমি শুধু শুধু তাঁর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে খাব কেন?

তুই তো টেনেছিস সিগারেট। স্কুলের বাথরুমে। এখন দেখি তোর সাহস। যদি সিগারেট চাইতে পারিস তাহলে প্রমাণ হবে আমাদের ক্লাসে তোর চেয়ে সাহসী মেয়ে নেই।

আমি ইতস্তত করে ঢুকে পড়লাম ভদ্রলোকের ঘরে। কোনোমতে বললাম— মুন্নির সঙ্গে আমার একটা বাজি হয়েছে। সেই বাজিতে আমি জিতব, যদি আপনি আমাকে একটা সিগারেট দেন।

ভদ্রলোক কিছুই বুঝতে পারলেন না, তবে একটা সিগারেট বের করে দিলেন। আমি বললাম, আপনি রাগ করবেন না। সিগারেটটা আমাকে পরাতে হবে। ভদ্রলোক দিয়াশলাই বের করে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

নীলু।

ও নীলু। তোমার কথা বলেছে আমাকে মুন্নি।

কী বলেছে?

বলেছে যে তুমি খুব তেজি মেয়ে ।

আরো অনেক কিছু বলেছে নিশ্চয়ই ।

ভদ্রলোক তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে । আমি বললাম,
আর কিছু বলেনি মুন্নি ?

আর কী বলবে ?

বলেনি আমার মা পালিয়ে গেছে ? আমাদের সম্পর্কে যখন
কেউ কিছু বলে সেটাই সবার আগে বলে ।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন । আমি বললাম, মুন্নি বলেনি
সে সব ?

বলেছে ।

আমি দেখলাম জানালার আড়াল থেকে মুন্নি ও অপলা
অবাক হয়ে দেখছে আমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ।

আমি বললাম, আজ উঠি । আপনি আমার ওপর রাগ
করেননি তো ।

রাগ করব কেন ?

আপনার সামনে সিগারেট টানলাম যে!

না, রাগ করি নি । মাঝে মাঝে এই সব ছেলেমানুষি
দেখতে ভালোই লাগে ।

আমি উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক বললেন— নীলু বসো,
তোমার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালো লাগছে । প্লিজ বসো ।
আমি অবাক হয়েই বসলাম । আর আমার কী যে ভালো
লাগল । এখনো মনে আছে সে রাতে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম
পারিনি । শেষ রাতের দিকে ঘুম এল এবং আমি ঐ ভদ্রলোককে
স্বপ্নে দেখলাম । যেন আমি চা বানাচ্ছি, তিনি এসে বললেন—
নীলু, আমার আজ ফিরতে দেরি হবে, তুমি খেয়ে নিও ।
অপেক্ষা করবার দরকার নেই । আমি রাগের ভঙ্গি করে
বললাম— না, আজ কোথাও যেতে পারিব না । আজ আমরা
বাগানে হাঁটব ।

অদ্ভুত মিষ্টি স্বপ্নের ভেতরই আমি কেঁদে বুক ভাসিয়েছি ।
কাউকে এই স্বপ্নের কথা বলতে পারিনি । তাকে বলার ইচ্ছে
হয়েছে, কিন্তু সাহস হয় নি । যদি তুই হাসাহাসি করিস ।

তাকে আমি অনেক কথা বলতে চাই বিলু । ছুটি হতে
তো অনেক দেরি । একবার চলে আয় না । তাছাড়া এমনিতেও

তোর আসা উচিত। বাবার শরীর খুব খারাপ, কেউ তোকে জানাচ্ছে না। কাল রাতে আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন, কে রেনু? আমি বললাম— বাবা আমি নীলু। বাবা কেমন চোখে তাকালেন আমার দিকে, তারপর বললেন— নীলু, তোর মা বোধহয় এসেছে। বসতে-টসতে দে। পুরনো কথা মনে রেখে লাভ নেই।

বিলু চলে আয়।

তোর
নীলু

বাড়ি ফিরে অবাক হলাম।

সব কিছুই অন্যরকম লাগছে। চারদিকে কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। সব কিছুই অন্যরকম হয়ে গেছে। সেতারাকেও মনে হলো এই তিন মাসে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। সবচে' বদলেছেন বাবা। কী যে খারাপ হয়েছে তাঁর স্বাস্থ্য। চোখ হলুদ। মাথার সামনের দিকের চুল সব পড়ে গেছে। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতেই তিনি বললেন, কে, রেনু?

আমি অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, বাবা আমাকে চিনতে পারছেন না?

চিনতে পারব না কেন? কখন এসেছিস?

এই তো কিছুক্ষণ আগে।

বস মা আমার কাছে।

বাবা তাঁর রোগা একটা হাত আমার কোলে তুলে দিলেন।

তুমি আমাকে একটা চিঠিও লেখোনি বাবা।

শরীরটা খারাপ মা। খুব খারাপ।

ঠিক তখন নীলু চা নিয়ে ঢুকল। বাবা মাথা তুলে বললেন, কে রেনু?

নীলু অত্যন্ত যত্নে বাবাকে বালিশে হেলান দিয়ে বসাল। পিরিচে ঢেলে ঢেলে চা খাওয়াল। নীলু দেখি অনেক কাজ শিখেছে। গিনি গিনি ভাব।

সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছুটোছুটি করে অনেক কাজ করছে। এক ফাঁকে বলল, সংসারের হাল ধরেছি।

তাই দেখছি।

কী যে ঝামেলা গেছে তুই তো জানিস না। তোকে কিছু জানান হয়নি।

তা জানাবি কেন, আমি কে?

তাও ঠিক ।

নীলু হাসল ।

আমি বললাম— তুই খুব সুন্দর হয়ে গেছিস নীলু । নীলু কিছু বলল না । অন্য সময় হলে সে কিছু-একটা ঠাট্টার কথা বলত । আজ দেখলাম লজ্জা পাচ্ছে ।

নীলু তুই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস ।

অন্যরকম মানে কী রকম ?

তোর মধ্যে কেমন একটা মা মা ভাব চলে এসেছে ।

নীলু, এবারও লজ্জিত ভঙ্গিতে আবার হাসল । সত্যি সত্যি সে বদলে গেছে । কিন্তু এই নীলুকেও ভালো লাগছে । আমি মৃদু স্বরে বললাম, আজ রাতে আমরা দুজন এক সঙ্গে শোব, কেমন নীলু ?

ঠিক আছে ।

সারারাত গল্প করব ।

নীলু হাসল । ছোট বোনদের পাগলামি কথাবার্তা শুনে বড় বোনরা যেমন প্রশয়ের হাসি হাসে সে রকম হাসি । ওরা আমার ঘরটি ঠিক আগের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে । টেবিলের ওপর বইপত্র যা ছিল সব সে রকমই আছে । একটা বাজারের লিষ্ট করেছিলাম, সেই লিষ্টটা পর্যন্ত বুলিয়ে রেখেছে ।

আমার বিছানায় এখন কে শোয় নীলু ? সেতারা ?

হুঁ সেতারা বুঝি সে রকম ? ও এখনো আমার সঙ্গে ঘুমায় । আরো অনেক মজার ব্যাপার আছে সেতারার ।

সেতারা বলল, ভালো হবে না আপা ।

আমি বললাম, কী ব্যাপার ?

সেতারাকে কে যেন প্রেমপত্র লিখেছে । রুল টানা কাগজে ।

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠল । কে বলবে এই বাড়িতে কোনো দুঃখ-কষ্ট আছে ?

নীলু বলল, নজমুল চাচা তাঁর মেয়ের কাছে যাচ্ছেন জানিস ?

নাতো ।

সামনের মাসের মাঝামাঝি যাবেন । ওর মেয়ের কী যেন একটা অপারেশন হবে । গলারাড়ার না কী যেন, ঠিক জানি না । মেয়ে বাবার জন্যে টিকিট পাঠিয়েছেন ।

নজমুল চাচা নিশ্চয়ই খুব খুশি ?

না, খুব না । এত দূর একা একা যেতে ভয় পাচ্ছেন ।

ভয়ের কী ?

কী জানি চাচার হেন তেন কত কথা, আসলে যাবার ইচ্ছা নেই।

যাচ্ছেন তো ?

তা যাচ্ছেন।

নজমুল চাচার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। নজমুল চাচা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলেন। যেন আমি তাঁর হারিয়ে-যাওয়া একটি মেয়ে, কোনোদিন ফিরে পাবেন ভাবেন নি, হঠাৎ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কাণ্ড দেখে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নীলু হাসতে লাগল। চাচা রাগী গলায় ধমক দিলেন, হাসছিস কেন ?

নীলু মুখ টিপে বলল, এমি হাসছি। কাঁদলে দোষ নেই, হাসলে দোষ।

তুই নিচে যা তো নীলু।

ঠিক আছে যাচ্ছি। কিন্তু বিলু ভেবে যাকে জড়িয়ে ধরে কাদা হচ্ছে সে কিন্তু বিলু নয়। আমি বিলু।

নজমুল চাচা হকচকিয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মনে সন্দেহ ঢুকে গেল।

তুই কে ? নীলু না বিলু ?

আমি বিলু।

সত্যি করে বল।

সত্যি বলছি।

না, তুই নীলু। বড় ফাজিল হয়েছিস, যা বিলুকে পাঠিয়ে দে। আমি হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেলাম। বাড়িতে এসে বড় ভালো লাগছে।

দোতলার নতুন ভাড়াটেকদের সঙ্গেও দেখা হলো। নীলু বলেছিল নাকি-স্বরে কথা বলেন। কোথায় কী দিব্যি ভালো মানুষের মতো কথাবার্তা। নীলুটা এমন বানাতে পারে। ভদ্রমহিলাকে আমার বেশ পছন্দ হলো। তবে একটি কথা বেশি বলেন। আমার সঙ্গে দু'তিন মিনিট কথা হলো, এর মধ্যে হুড়বুড় করে একশ' গুণ্ডা কথা বলে ফেললেন। তবে যে সব মেয়েরা বেশি কথা বলে ওদের মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ থাকে না। এইটা খুব সত্যি। বেশি কথা বলা মেয়েরা খুব দিলখোলা হয়।

সমস্ত দিন আমি অন্য একধরনের ভালো লাগ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুপুরে নীলু আমাকে বাগানে নিয়ে গেল। পেয়ারা গাছে নাকি ডাঁসা পেয়ারা হয়েছে। খুব মিষ্টি।

বাগান পরিষ্কার করেছে কে ?

দোতলার ঐ ভদ্রমহিলা করিয়েছেন। এখন ভালো লাগছে না ?

হঁ। চমৎকার লাগছে।

ঐ ভদ্রমহিলা আর তার হাসবেস্ত প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা বাগানে বসে চা খান।

একদিন দেখি হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন। খুব রোমান্টিক।

আমি ঘাসের ওপর বসতে বসতে বললাম, তোর রকিব ভাই আর চিঠি-ফিঠি লেখে না ?

নীলু লাল হয়ে বলল, লেখে মাঝে মাঝে।

কী লেখেন ?

এইসব আজেবাজে তেমন কিছু না।

তুই নিশ্চয়ই খুব লিখিস ?

নীলু জবাব দিল না।

কি রে, লিখিস না তুই ?

লিখি মাঝে মাঝে।

তুই কী লিখিস নীলু ?

নীলু চুপ করে রইল।

বল না ?

যা মনে আসে তাই লিখি। বাবার কথা লিখি, মার কথা লিখি। তোর কথা সেতারার কথা সবার কথা লিখি।

লিখতে খুব ভালো লাগে ?

হুঁ।

আমি একটি ছোট্ট নিশ্বাস গোপন করে হালকা স্বরে বললাম, তোদের বিয়ে হলে বেশ মানাবে। দুজনেই চিঠি লেখার ওস্তাদ।

নীলু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হয়তো তার চোখে পানি আসছে। চাচ্ছে না আমি দেখে ফেলি।

সন্ধ্যাবেলা আমরা তিন বোন নদীর পাড়ে হাঁটতে গেলাম। মা যখন ছিলেন তখন আমরা প্রায়ই হাঁটতে আসতাম। প্রায় মাইলখানিক হাঁটি হয়ে যেত। একসময় ক্লান্তিতে পা ভারী হয়ে আসত, তবু মায়ের হাঁটার পেষ্ট্রনেই।

নীলু বলত, আর পারব না। ক্ষমা চাই। আমি এখানে বসে থাকব, তোমরা যাও। মা বলতেন, অল্প কিছুদূর যাব। সামনেই নদীটা খুব সুন্দর। একই রকম নদী। একই দৃশ্য দু'পাশে। তবু কিছু কিছু জায়গায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলতেন, আহ কী সুন্দর! তেমন বিশেষ সৌন্দর্যের কিছু আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু মা'র মুগ্ধ ভাব আমাদেরও স্পর্শ করত। নীলু হাই তুলে বলত, মন্দ না, ভালোই। মা চলে যাবার পর আমরা আর নদীর কাছে আসিনি। না, কথাটা ঠিক না। বাবার সঙ্গে এসেছিলাম একদিন। গত শীতের আগের শীতে বাবার হঠাৎ শখ হলো আমাদের

নিয়ে বেড়াবেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব। নদীর পাড়ে বসে চা খাব, কী বলিস? আমরা কেউ তেমন উৎসাহ দেখালাম না। শুধু সেতারা খুব উৎসাহ দেখাতে লাগল।

প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বেড়াতে বের হলাম। বাবার কাঁধে ফ্লাস্ক। আমরা তিন বোন হাত ধরাধরি করে তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছি। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। দেখার মতো কিছুই নেই। নদীটিও শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। বাবার উৎসাহ মিইয়ে এসেছে। মৃদু স্বরে বললেন, ফিরে যাবি নাকি? নীলু বলল, কোথাও বসে চা শেষ করি। এত কষ্ট করে ফ্লাস্কটা আনলে। কোথাও বসার মতো জায়গা পাওয়া গেল না। সব শিশিরে ভিজে আছে। বাবা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। সেই আমাদের শেষবারের মতো যাওয়া।

বাবা সুস্থ থাকলে বাবাকে নিয়ে আসা যেত। তিনি আমাদের তিন বোনকে বেরুতে দেখে আগ্রহ নিয়ে বলেছিলেন, কোথায় যাচ্ছিস তোরা? সেতারা বলেছে, নদীর পাড়ে হাঁটতে যাচ্ছি বাবা। তিনি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভালো, খুব ভালো।

বেশিক্ষণ থাকব না। যাব আর আসব।

যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিস মা। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি ভালোই আছি। খুব ভালো।

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। দু'একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক সেতারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভালো আছ?

নীলু বলল, সেতারাকে সবাই চেনে। ইশ আগে যদি মন দিয়ে গানটা শিখতাম।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষ প্রান্তে চলে এলাম প্রায়। সেখানে প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকড়া রেন্টি গাছ। তার শিকড় নেমে গেছে নদীর দিকে। কয়েকজন কলেজের ছেলে-টেলে হবে গাছের গুঁড়ির ওপর বসে সিগারেট টানছিল। ওরা আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়াল। একজন এগিয়ে এসে বলল, আপনারা বসবেন? নাহ।

বসুন না একটু আমাদের সঙ্গে। বসুন।

সেতারা বলল, কিন্তু আপনারা গান গাইতে বলতে পারবেন না।

সব ক'টি ছেলে একসঙ্গে হেসে উঠল। আমরা তিন বোন পাশাপাশি বসলাম। ছেলেগুলি বসল আমাদের সামনে।

নীলু বলল, আপনারা রোজ এখানে আসেন? জায়গাটা খুব সুন্দর।

ছেলেগুলি কোনো উত্তর দিল না।

সেতারা বলল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাড়ি যাওয়ার দরকার।

আমরা আপনাদের পৌঁছে দেব। আমরা 'উত্তর দিঘির' পাশ দিয়েই রোজ যাই।

আমরা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ছেলেগুলি সেতোরাকে গান গাইতে বলল না। কিন্তু সেতারা নিজ থেকেই গুনগুন করতে শুরু করল। খোলা মাঠ। অদূরেই শীর্ণকায় ব্রহ্মপুত্র। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাখিরা ডানা ঝাঁপটাচ্ছে গাছে গাছে। এর মধ্যে সেতারার কিন্নর কণ্ঠ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—

‘চাহিতে যেমন আগের দিনে

তেমনি মদির চোখে চাহিও

যদি গো সেদিন চোখে আসে জল

লুকাতে সে জল করিও না ছল...’

আমাদের তিন বোনের চোখ ভিজে উঠল। আমরা কতগুলি অপরিচিত ছেলেকে সামনে বসিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। কান্নার মতো গভীর তো কিছু নেই। একজনের দুঃখ অন্যজনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু একজনের চোখের জল অন্যকে স্পর্শ করে। ছেলেগুলি দেখলাম একে একে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাচ্ছে। পুরুষরা তাদের চোখের জল মেয়েদের দেখাতে চায় না।

একটি ছেলে কোমল স্বরে বলল, আরেকটা গাইবেন ?

কোন অলৌকিক জগৎ থেকে সেতারার গান আসে ? বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে শুনলাম সে গাইছে, নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি জল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা মিলিয়ে এল। ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে লাগল শীতল হাওয়া। অন্ধকার ঝোপগুলিতে চিকমিক করতে লাগল জোনাকি। ছেলেগুলি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সেতারা বলল, ভেতরে আসবেন ?

জি না, জি না।

কিন্তু ওরা চলেও গেল না। গেটের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

একজন মৃদু স্বরে বলল, আপনার বাবার শরীর কি এখন ভালো ?

নীলু বলল, একটু ভালো।

কিন্তু বাবার শরীর ভালো নয়। আমি জানি বাবা মারা যাবেন খুব শিগগিরই। মৃত্যু টের পাওয়া যায়। তার পদশব্দ ক্ষীণ কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বাবা মারা যাবার পরপরই আমরা একা হয়ে যাব। কেউ কি তখন এগিয়ে আসবে আমাদের কাছে ? একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে রকিব ভাই হাসিমুখে বলবেন— কে বিলু আর কে নীলু ? গাঢ় ভালোবাসার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করবেন আমাদের দিকে ? হয়তো করবেন, হয়তো করবেন না। এখানে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বসবার ঘরে বাতি জ্বলছিল। আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম আমাদের লাল রঙের সোফাটিতে মা বসে আছেন। কেমন অদ্ভুত একটি শান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গি। মা মাথা নিচু করে বললেন, তোমাদের বাবাকে দেখতে এলাম। নজমুল সাহেব টেলিগ্রাম করেছিলেন।

মার পরনে সাদার উপর নীল নকশার একটা শাড়ি। মাথায় আঁচল দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। বয়সের ছাপ পড়েছে চোখেমুখে। কপালের কাছে এক গোছ রূপালি চুল। তবুও কী চমৎকারই না লাগছে তাকে।

মা বললেন, তোমরা কেমন আছ ?

কেউ কোনো জবাব দিলাম না। মা কি আমাদের তুমি করে বলতেন না তুই করে বলতেন কিছুতেই মনে পড়ল না।

সবাই অনেক বড় হয়ে গেছে। এবং খুব সুন্দর হয়েছেো সবাই। বসো। কথা বলি তোমাদের সঙ্গে।

আমরা বসলাম।

মা বললেন, তোমরা নাকি নদীর পাড়ে গিয়েছিলে ?

আমরা সে কথার জবাব দিলাম না।

মা থেমে থেমে বললেন, কয়েকদিন আগে সেতারার গান শুনলাম রেডিওতে। বিশ্বাসই হয়নি আমার একটি মেয়ে এত সুন্দর গান গায়।

সেতারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কিছু-একটা দেখতে চেষ্টা করছে মার মধ্যে। নিজের মনের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে হয়তো।

তুমি মা খুব নাম করবে। দেশের মানুষের ভালোবাসা তুমি পাবে— এখনই অবশ্যি পেয়েছ, আরো পাবে।

নীলু বলল, আপনি কখন এসেছেন ?

কিছুক্ষণ আগে এসেছি।

বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

মা ইতস্তত করে বললেন, না।

যান, বাবার কাছে যান। উনি আপনার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন।

মা নড়লেন না। বসেই রইলেন।

আমি বললাম, আসুন, আপনাকে বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বাবার ঘরে ঢোকা মাত্র বাবা তার অভ্যাসমতো বললেন, কে, রেনু ?

মা দরজার পাশে থমকে দাঁড়াল। বাবা বললেন, ভালো আছ রেনু ?

সেই রাতে বাবার অসুখ বেড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে বহু কষ্টে টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগলেন। কথাবার্তা জড়িয়ে গেল। তবু একটু কোনো শব্দ হতেই মাথা তুলে

বলতে লাগলেন, কে, রেনু ?

মা তাঁর এত পাশে দাঁড়িয়ে কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না।

আমি চলে এলাম আমার ঘরে। নীলুর বিছানার ওপর দেখি একটি নীল খাম পড়ে আছে। রকিব ভাইয়ের লেখা চিঠি নিশ্চয়ই। নীলু হয়তো আজই পেয়েছে। রেখে দিয়েছে গভীর রাতে একা একা পড়বার জন্যে।

চারদিকে সুনসান নীরবতা। আমি বসে আছি চুপচাপ। আমার পাশেই ভালোবাসার একটি নীল চিঠি। আমি হাত বাড়িয়ে চিঠিটি স্পর্শ করলাম। ঠিক তখনি নিচ থেকে একটি তীব্র ও তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ ভেসে এল।

মা কাঁদছেন।



The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



আমার আছে জল

আমার আছে জল

রেলস্টেশনের এত সুন্দর নাম আছে নাকি ? ‘সোহাগী’—এটা আবার কেমন নাম ? দিলু বলল, আপা, কী সুন্দর নাম দেখেছ!

নিশাত কিছু বলল না। তার ঠান্ডা লেগেছে। সারা রাত জানালার পাশে বসে ছিল। খোলা জানালায় খুব হাওয়া এসেছে। এখন মাথা ভারভার। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো নাক দিয়ে জল ঝরতে শুরু করবে। দিলু বলল, আপা, স্টেশনের নামটা পড়ে দেখ না। প্রিজ।

পড়েছি। ভালো নাম।

দিলুর মন খারাপ হয়ে গেল। সে আশা করেছিল নিশাত আপাও তার মতো অবাক হয়ে যাবে। চোখ কপালে তুলে বলবে—ও মা, কেমন নাম! কিন্তু সে আজকাল কিছুতেই অবাক হয় না। কথাবার্তা বলে স্কুলের জিওগ্রাফি আপার মতো। নিশাত বলল, দিলু, দেখ তো বাবু কোথায় ? দুধ খাবে বোধহয়।

দিলু বাবুকে কোথাও দেখতে পেল না। এমন দুই হয়েছে। ওয়েটিং রুমে ঘাপটি মেরে বসে আছে হয়তো। কাছে গেলেই টু দেবে। ধরতে গেলেই আবার ছুটে যাবে।

ওয়েটিং রুমের সামনে একগাদা জিনিসপত্রের সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বিরক্ত মুখ। তিনি দিলুকে দেখেই বললেন, একেকজন একেক দিকে চলে গেছে। ব্যাপারটা কী ? তোর মা কোথায় ?

জানি না তো।

তোর মাকে খুঁজে বের কর।

আমি পারব না বাবা, আমি বাবুকে খুঁজছি।

বাবুকে খুঁজলে তোর মাকে খোঁজা যাবে না—এরকম কথা কোথাও লেখা আছে ?

সবাই আজ এরকম করে কথা বলছে কেন ? কোথাও বেড়াতে গেলে সবার খুব হাসিখুশি থাকা উচিত। কিন্তু এখানে সবাই কেমন রেগে কথা বলছে। রাগটা তার উপরই। ট্রেনে মা তিনবার বললেন, দিলু, পা নাচাচ্ছ কেন ? পা নাচানো একটা অসভ্যতা। চুপ করে বসো।

পা নাচানোর মধ্যে আবার সভ্যতা-অসভ্যতা কী! মত আজগুবি কথা।

দিলু।

বলো।

তোর মাকে খুঁজে বের কর। আমার পাইপের তামাক রেখেছে কোথায় সে ?

আমি কী করে জানব ? আমি রাখলে আমি জানতাম। আমি তো রাখিনি।

দিলুর বাবা ওসমান সাহেব রাগী চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। ওসমান সাহেবের বয়স আটান্ন। কিন্তু দেখায় আরও বেশি। শরীর হঠাৎ করে ভারী হয়ে

গেছে। মাথার সমস্ত চুল পাকা। মেজাজের পরিবর্তনও হয়েছে হঠাৎ করেই। এখন আর কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারেন না। তিনি দিল্লুর উপর ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন। দিল্লুর বয়স এই মাঠে চৌদ্দ হবে। নাকি পনের? মেয়েদের এই বয়সটা অন্যরকম। এই বয়সে চেনা মেয়েগুলোকেও অচেনা লাগে। মনে হয় অন্য বাড়ির মেয়ে। এদের উপর কিছুতেই রাগ করা যায় না।

দিলু পরেছে একটা ধবধবে সাদা স্কার্ট। পায়ের মোজা ও জুতা দুই-ই লাল। মাথায় দুটি লম্বা বেণি। শীতের সকালের রোদে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে বড় অচেনা লাগছে। এর উপর রাগ করা যায় না। ওসমান সাহেব বাস্ত্র-পেটরা হাতড়াতে লাগলেন। পাইপ ধরানোর ইচ্ছা হচ্ছে। অনিয়ম করা যায়। ছুটি হচ্ছে অনিয়মের জন্যে।

দিলু ওয়েটিং রুমে কাউকে দেখল না। তবে ওয়েটিং রুমের বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। কেউ আছে নিশ্চয়ই। মা বোধহয় বাবুকে বাথরুম করাচ্ছেন। দিলু ডাকল, বাথরুমে কে? জল পড়ার শব্দ থেমে গেল। দিলু আবার বলল, বাবু তুমি? কোনো সাড়া নেই। তার মানে মা। মা একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাথরুম থেকে কথা বলবেন না।

দিলু যদি বলে—মা, গায়ে মাখার সাবানটা আছে? মা জবাব দেবেন না। বাথরুম থেকে কথা বলা নাকি অসভ্যতা। এর মধ্যে অসভ্যতার কী আছে?

খুট করে দরজা খুলল। দিলু দেখল ভেজা মুখে জামিল ভাই বের হয়ে আসছেন।

কী-রে দিলু, ইমার্জেন্সি নাকি? যা ঢুকে পড়।

ছি, কী অসভ্যতা! জামিল ভাইয়ের একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান নেই। মেয়েদের কেউ বাথরুমে যাওয়ার কথা ওভাবে বলে নাকি? সে যে বড় হচ্ছে এটা কি জামিল ভাইয়ের চোখে পড়ে না। এখন শাড়ি পরলে অনেকেই তাকে ‘আপনি’ করে বলে। জামিল ভাই বোধহয় তাকে কখনো শাড়ি পরা দেখেনি।

জামিল ভাই, বাবুকে দেখেছেন?

না।

মা-কে দেখেছেন?

না। কেন?

আপা খুঁজছে বাবুকে। বাবা খুঁজছে মা-কে।

ওরা মনে হয় স্টেশনের বাইরে হাঁটতে গেছে। চল যাই খুঁজে নিয়ে আসি। তোকে তো দারুণ লাগছেরে দিলু। ট্রেনে কি এই ড্রেসেই ছিলি নাকি?

হঁ।

মাই গড! তখন তো চোখেই পড়েনি।

জামিল দেখল দিলু খুব লজ্জা পাচ্ছে। এর কারণ সে ঠিক বুঝতে পারল না। মেয়েটি কি বড় হয়ে যাচ্ছে নাকি?

‘দেখতে দারুণ লাগছে’—এই কথায় কানটান লাল করার মানেটা কী ? জামিল তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ।

দিলু, তুই যেন কোন ক্লাসে এবার ?

ক্লাস নাইনে । ইস আপনি যেন জানেন না !

কোন গ্রুপ, সায়েন্স না আর্টস ?

সায়েন্স ।

বাপরে বাপ, সায়েন্স ! ইলেকটিভ অংকে গোল্লা খাবি তো ।

কেন, গোল্লা খাব কেন ?

মেয়েরা অংক-মানসাংক এসব জানে নাকি ?

জামিল পাঞ্জাবির পকেট থেকে চিরুনি বের করে বাথরুমের আয়নায় চুল আঁচড়াতে গেল । দরজা পর্যন্ত বন্ধ করল না । কী বাজে অভ্যাস । দিলু শুনল চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জামিল ভাই গুনগুন করে গান গাচ্ছে—‘আজি এ বসন্তে, এত ফুল ফোটে, এত পাখি গায় ।’

এই শীতে বসন্তের গান ? দিলু বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখল । সুরেরও কোনো ঠিকঠিকানা নেই । বাথরুমে ঢুকলেই গান গাইতে হবে এমন কোনো কথা আছে ?

চল দিলু, দেখি কাউকে পাওয়া যায় কি না ।

ওসমান সাহেব একটা কালো ট্রাকের উপর বসে আছেন । তাঁর মুখে বিরক্তির ভাব এখন আর নেই । পাইপের তামাক পাওয়া গেছে । পাইপ তৈরি করা হয়েছে । বাতাসের জন্যে আগুন ধরাতে পারছেন না । জামিলদের বেরুতে দেখে হাসিমুখে বললেন, জামিল, আমাকে এখানে বসিয়ে একেকজন একেক দিকে কেটে পড়েছে, ব্যাপারটা কী বলো তো ?

সম্ভবত ছুটির দিনে আপনাকে কেউ ভয়-টয় পায় না । আপনাকে নিরীহ মনে করে ।

ওসমান সাহেব শব্দ করে হাসলেন । এত শব্দে তিনি কখনো হাসেন না । দিলুও হাসল । কাউকে হাসতে দেখলেই দিলুর হাসি পায় । ওসমান সাহেব বললেন, কী রকম মিসম্যানাজমেন্ট হয়েছে দেখলে ? স্টেশনে জিপ নিয়ে থাকার কথা । জিপ তো নেই-ই, একজন মানুষ পর্যন্ত নেই ।

এসে পড়বে ।

কিছু মুখে দেওয়া দরকার । এত বেলা হয়েছে, সবার ক্ষিধে পেয়েছে ।

বেলা কিন্তু চাচা বেশি হয়নি, মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে । সকাল হয়েছে মাত্র ।

তাই নাকি ! ওসমান সাহেব বেশ অবাক হলেন ।

জামিল বলল, আমি দেখি চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ঐখানে একটা চায়ের দোকান আছে।

ঐ চা কি মুখে দেওয়া যাবে ?

চেষ্টা করতে দোষ কী। লেট আস ট্রাই।

ওসমান সাহেব আবার শব্দ করে হাসলেন। তাঁর মেজাজ সম্ভবত ভালো হতে শুরু করেছে। দিলু হাসল। এখন বেশ পিকনিক পিকনিক লাগছে।

২

নিশাত একটা কাঠের বেঞ্চিতে লাল চাদর গায়ে দিয়ে বসে ছিল। রোদ পড়েছে তার মুখে। শীতের বাতাসে তার কপালে ছোট ছোট কিছু চুল নাচছে। সে বসে আছে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে। তার ফর্সা গালে লাল চাদরের আভা পড়েছে। দিলু ফিসফিস করে বলল, আপা কত সুন্দর দেখেছেন ?

হ্যাঁ, দেখলাম।

আপাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাই ?

ডাক। ডাকলেই হয়।

দিলু ডাকল, আপা, এই আপা। নিশাত ওদের দুজনকে দেখল। কিছু বলল না। মুখ ঘুরিয়ে নিল। মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিটি রাগী ভঙ্গি। সে এমন রেগে আছে কেন ?

আপা, আমাদের সঙ্গে যাবে ? আমরা স্টেশনের বাইরে হাঁটতে যাচ্ছি।

না, বাবু কোথায় ?

বাবু মা'র সঙ্গে। ওদেরই খুঁজতে যাচ্ছি। তুমিও চল।

না, আমি যাব না।

চল না আপা।

এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। তোরা যা।

দিলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আপা মাঝে মাঝে এমন কড়া করে কথা বলে। এত সুন্দর একটি মেয়ে এরকম করে কথা বলবে কেন ? দিলু হাঁটতে শুরু করল।

জামিল ভাই, এগুলো কী গাছ ?

জানি না কী গাছ।

কৃষ্ণচূড়া নাকি ?

না, কৃষ্ণচূড়া না। কৃষ্ণচূড়ার পাতা তেঁতুল গাছের পাতার মতো। এগুলো খুব সম্ভব জারুল। কচুরিপানার মতো ফুল হয় এদের। লালচে বেগুনি রঙের। খুব সুন্দর।

এই স্টেশনের নামটা কত সুন্দর দেখেছেন ?

নামটার একটা গল্প আছে, জানো ?

কী গল্প ?

এখানে এক রাজা ছিলেন। রাজার একটি মাত্র মেয়ে। মেয়ের নাম সোহাগী। রাজ্যে পানির খুব কষ্ট। রাজা ঠিক করলেন এমন এক পুকুর কাটবেন যে, রাজ্যে পানির কষ্ট থাকবে না। তিনি সত্যি প্রকাণ্ড এক পুকুর কাটালেন। কিন্তু আশ্চর্য, একফোঁটা পানি নেই। সেবছর খুব খরা। রাজ্যের লোক হাহাকার করেছে। রাজা শুকনো মুখে পুকুরপাড়ে বসে আছেন, তখন শুনলেন কে যেন বলছে—রাজন, তোমার কন্যাকে পানিতে নামিয়ে দাও, জল আসবে। রাজা সোহাগীকে নামিয়ে দিলেন এবং বললেন—কোনো ভয় নেই মা, জল আসতে শুরু করলেই তোমাকে টেনে তুলে ফেলব।

মেয়ে পুকুরে নামামাত্রই চারিদিক থেকে হ-হ করে জল আসতে লাগল। রাজা আর তাকে টেনে তুলতে পারলেন না। পুকুরটির নাম হলো সোহাগী পুকুর। জায়গাটার নাম হলো সোহাগী।

যান, এটা সত্যি না। বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।

বানাব কেন ? সোহাগী পুকুর সত্যি সত্যি আছে। জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। আর তুমি যদি ভরা পূর্ণিমার রাতে পুকুরপাড়ে বসে থাক তাহলে সোহাগীর কান্নাও শুনবে। ঐ মেয়েটি ভরা পূর্ণিমায় কাঁদে।

কেন ?

পূর্ণিমার রাতে সে পুকুরে নেমেছিল তাই। প্রতি পূর্ণিমাতেই সে আসে।

দিলু অন্যদিকে মুখ ফেরাল। তার চোখ ভিজে আসছে। তার খুব অল্পতেই কান্না পায়।

নিশাত দেখল—ওরা লোহার গেট পার হয়ে স্টেশনের ওপাশের কাঁচা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জামিল ভাই গল্প করছেন হাত নেড়ে নেড়ে। কী গল্প কে জানে। মুগ্ধ হয়ে শুনছে দিলু। দিলুকে আজ অন্যদিনের চেয়েও একটু বড় লাগছে। এত বড় মেয়ের স্কাট পরা ঠিক না। চোখে লাগে। মাকে বলতে হবে।

লোকজন বিশেষ নেই চারদিকে। শুধু একজন বুড়ো খুব মন দিয়ে নিশাতকে দেখছে। এই প্রচণ্ড শীতেও তার গায়ে শুধু একটি গেঞ্জি। নিশাত ভেবেছিল ভিক্ষা চায় বুঝি। কিন্তু না, এ ভিক্ষুক নয়। ভিক্ষুকদের এতটা কৌতূহল থাকে না। তারা সরাসরি ভিক্ষা চায়। না পেলে চলে যায় অন্য কোথাও।

নিশাতের নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। দুটি প্যারাসিটামল খেয়ে নেওয়া দরকার। নিশাত উঠে দাঁড়াল। বুড়োটি বলল, কই যাইবেন গো মা ? আশ্চর্য, কত সহজই ‘মা’ ডাকল। প্রশ্ন করাতেও কোনো সংকোচ নেই। যেন কতদিনের চেনা।

আমরা যাব নীলগঞ্জ ।

ডাকবাংলায় ?

জি ।

নিশাত চলতে শুরু করল । তার পেছনে পেছনে গেঞ্জি গায়ে বুড়োটি আসছে । আরও কিছু জানতে চায় হয়তো । গ্রামের মানুষদের খুব কৌতূহল । ওরা প্রশ্ন করতে ভালোবাসে ।

জামিল একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল । দিলু বলল, এখানে চা খাবেন ? যা ময়লা! জামিল বলল, গ্রামে ঝকঝকে তকতকে রেস্টুরেন্ট কোথায় ? এটা মন্দ কী!

বারো-তেরো বছরের একটা ছেলে চা বানাচ্ছিল । তার সামনে কাঠের একটা লম্বা বেঞ্চে পিঠ মেলে দু'জন লোক বসে চা খাচ্ছে । তাদের একজন বলল, আপনারা যাইবেন কোনখানে ?

নীলগঞ্জ ।

মেলা দূর । যাইবেন ক্যামনে ?

জিপ আসার কথা ।

রাস্তা তো ঠিক নাই । জিপগাড়ি আওনের পথ নাই ।

তাই নাকি ?

জি । এইজন কি আপনার মাইয়া ?

না, আমার বোন ।

দিলু দেখল দুটি লোকই গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে । তার বড় অস্বস্তি লাগতে লাগল । জামিল ভাই এই বেঞ্চে বসেই চা খাবেন নাকি ? লোক দুটির কৌতূহলের সীমা নেই । একজন বলল, সাব, আপনার নাম ?

আমার নাম জামিল ।

আপনে করেন কী ?

মাস্টারি করি ভাই । দেখি, একটু বসার জায়গা দেন ।

দিলু অবাক হয়ে দেখল ওরা সবাই বেঞ্চে ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসল । আগের মতোই তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে । এতটুকু সংকোচ নেই । জামিল বলল, দেখি, দু'কাপ চা দাও তো । দিলু খাবি তো ?

খাব ।

লোক দু'জনের একজন বলল, বজলু, সাবরে আর মাইয়াডারে কুকি বিসকুট দে । খালি পেড়ে চা খাওন ঠিক না । ছেলেটি দুটি লম্বা বিসকিট হাতে করে এগিয়ে দিল । দিলু নিল না, কিন্তু জামিল নিল এবং চায়ে ভিজিয়ে বাচ্চাদের মতো খেতে লাগল । কী যে সব কাণ্ড জামিল ভাইয়ের । দেখতে মজা লাগে ।

রেহানা বাবুকে নিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সাব্বির। সাব্বির তাঁর দূরসম্পর্কের ভাগ্নে। সাব্বিরের এখানে আসার কথা ছিল না। হঠাৎ করেই এসেছে। এই হঠাৎ করে আসার অন্য কোনো অর্থ আছে কি না রেহানা তা বুঝতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাব্বির ছেলেটি হয় খুব চাপা কিংবা অতিরিক্ত চালাক। তার হাবভাবে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

রেহানার ধারণা ছিল ট্রেনে সাব্বির নিশাতের আশেপাশে বসতে চেষ্টা করবে। এবং গল্পটোল্ল করবে। সে তেমন কিছু করেনি। বসেছে কোণার দিকে। কিছুক্ষণ অত্যন্ত মন দিয়ে একটা কমিক পড়েছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের একজন মানুষ মুগ্ধ হয়ে কমিক পড়েছে, ব্যাপারটা তার ভালো লাগেনি। কমিক শেষ হওয়া মাত্র সে জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করেছে কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশাতের দিকে তার কোনোরকম আগ্রহ বোঝা যায়নি। তবে এও হতে পারে যে, সে চেষ্টা করে তার আগ্রহ গোপন রাখছে। নিশাতকে ভালোরকম জানতে চায়।

আজ ভোরে তিনি দেখলেন সাব্বির ক্যামেরা হাতে একা একা যাচ্ছে। বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেও এগুলেন। অল্পকিছু কথাবার্তা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দেশে কতদিন থাকবে?

বেশি দিন না। ক্রিসমাসের ছুটির পর যাব। জানুয়ারির তিন-চার তারিখের মধ্যে পৌছতে হবে।

তাহলে তো খুব অল্পদিন।

জি।

রেহানা ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, বিয়ে করে বউ নিয়ে ফিরবে নাকি? অনেকে তো তাই করে।

এখনো কিছু ঠিক করিনি। আমার মা অবশ্যি মেয়ে-টেয়ে দেখছেন। বিয়ে করতেও পারি।

রেহানা কিছু বললেন না। দেখলেন সাব্বির ক্রমাগত ছবি তুলছে। গাছের ছবি। নদীর ছবি। নৌকার ছবি। কুয়াশায় সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। ভালো ছবি আসার কথা নয়। তবু ছবি তুলছে। রেহানা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন—এই ছেলেটি অত যে ছবি তুলছে, একবারও বলেনি—আসুন মামি, আপনার একটা ছবি তুলে দেই। এই বয়সে ছবি তোলার তাঁর কোনো শখ নেই। তবু এটা সাধারণ ভদ্রতা। সাব্বির বলল, আপনার নাতি খুব শান্ত। খুব চুপচাপ।

খুব শান্ত না। বিরক্ত করে। নতুন জায়গা দেখে চুপ করে আছে। অপরিচিত মানুষের সামনে সে ভেজা বেড়াল।

ওর বয়স কত?

পাঁচ বছরে পড়ল।

রেহানা আশা করছিলেন সাক্ষির এবার বাবুর সম্পর্কে কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একটা বকের ছবি ফোকাসে আনতে চেষ্টা করল। টেলিস্কোপিক লেন্স থাকা সত্ত্বেও বকের ছবিটি স্পষ্ট হচ্ছে না। বেশ কুয়াশা। মোটামুটি স্পষ্ট হলে ছবিটি ভালো হতো। বকের ধ্যানী ছবিটি হালকা সবুজের ব্যাকগ্রাউন্ডে ভালো আসছে। রোদ আরেকটু চড়ে গেলে ছবি ভালো হবে না।

সাক্ষির, চল যাই। তোমার মামা বোধহয় রেগে যাচ্ছেন।

চলুন।

বাবুকে কোলে নিয়ে হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। একবার বললেন—বাবু, আমার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে চল। বাবু শক্ত করে তাঁর গলা চেপে ধরল। তার মানে সে কিছুতেই নামবে না। রেহানা আশা করছিলেন সাক্ষির বলবে—আমার কোলে দিন। আমি নিয়ে যাব। কিন্তু সাক্ষির সে-সব কিছুই বলল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। মেয়েদের সঙ্গে এত দ্রুত হাঁটা যায় না। এই সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানও কি ওর নেই? রেহানা মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেন।

স্টেশনের কাছে এসে তিনি দিলু এবং জামিলকে দেখলেন। নোংরা একটি বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। তাদেরকে ঘিরে চার-পাঁচজন গ্রামের মানুষ বসে আছে মাটিতে। দিলু স্কাট পরে থাকায় তার ফর্সা পা অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটি তার ভালো লাগল না। গ্রামের মানুষগুলি বোধ করি বসে আছে ফর্সা পা দেখার জন্যে। তিনি একবার ভাবলেন দিলুকে ডাকবেন। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। দিলুর জামাকাপড় কী কী এনেছেন তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন। মনে পড়ল না। জামাকাপড় সব গুছিয়েছে নিশাত, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

দিলু তাদের দেখেই ডাকল, মা, কোথায় ছিলে তোমরা? তারপর ছুটে এল তাদের দিকে। আমরা ভাবলাম তোমরা বোধহয় হারিয়েই গেছ।

হারিয়ে যাব কেন? নে, বাবুকে কোলে নে।

দিলু বাবুকে কোলে নিয়েই বলল, সাক্ষির ভাই, আমাদের একটা ছবি তুলে দিন তো। এই বাবু, উনার দিকে তাকিয়ে হাস তো লক্ষী ছেলের মতো।

সাক্ষির ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে লাগল। এবং ছবি তুলল বেশ কয়েকটি। রেহানার মনে হলো এই একটি ব্যাপারে ছেলেটির আগ্রহ আছে। ছবি তোলায় তার কোনো ক্লান্তি নেই।

ওসমান সাহেব ভেবে রেখেছিলেন রেহানার উপর খুব রাগ করবেন। সেটা সম্ভব হলো না। সাক্ষির রয়েছে। তার সামনে কোনো সিন ক্রিয়েট করার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও বিরক্ত স্বরে বললেন, তোমারা ছিলে কোথায়?

কাছেই। তোমার জিপ তো এখনো আসেনি। এত তাড়া কিসের?

জিপ আসবে না। নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে।

গরুর গাড়ি?

দু'টা গরুর গাড়ি, একটা মহিষের গাড়ি। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার।
পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যা হবে।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন, তিনটা গাড়ি কেন ?

পাগল-ছাগলের কাণ্ড। যতগুলো পেয়েছে, নিয়ে এসেছে।

তোমার পুলিশের লোকজন কেউ আসেনি ?

না।

ওসমান সাহেবের মনে হলো রেহানা মুখ টিপে হাসছে। কেউ নিতে আসেনি
ব্যাপারটা দুঃখজনক। এ নিয়ে হাসবে কেন ? রেহানা বললেন, তোমার খবর বোধহয়
পায়নি। পেলে আসত।

ওয়ারলেস ম্যাসেজ দিয়েছি। পাবে না মানে ?

তোমাদের নীলগঞ্জ থানায় হয়তো ওয়ারলেস নেই।

প্রতিটি থানায় ওয়ারলেস সেট আছে। কী বলছ এসব ?

দিলু বলল, বাবা, আমি কিন্তু মহিষের গাড়িতে করে যাব।

ওসমান সাহেব একটা ধমক দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা
করে বের হয়েছেন, ছুটির সময়টায় কোনো রাগারাগি করবেন না।

কিন্তু মেজাজ ঠিক রাখা যাচ্ছে না। কেন কেউ নিতে আসবে না ?
থানাওয়ালাদের এত বড় স্পর্ধা থাকা ঠিক নয়।

8

গাড়িতে গুছিয়ে বসতে বসতে ন'টা বেজে গেল। প্রথম কথা হয়েছিল একটিতে যাবে
শুধু মালপত্র। অন্য দুটির একটিতে জামিল ও সাকিবর এবং আরেকটিতে দিলুরা।
কিন্তু নিশাত বলল, আমি মা-বাবুকে নিয়ে একটি গাড়িতে একা যেতে চাই।

কেন ?

কোনো কেন-টেন নেই। এম্মি যেতে চাই।

সবসময় তুই একটা ঝামেলা করতে চেষ্টা করিস।

ঝামেলা করতে চেষ্টা করি না। কমাতে চেষ্টা করি। আমি মা একা যেতে চাই।

নিশাত শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট একা একা গাড়িতে উঠল। রেহানা উঠেছেন তার
সঙ্গে। প্রথম গাড়িতে বাবা, দিলু ও বাবু। মহিষের গাড়িতে জামিল ও সাকিবর।

গাড়ি চলা শুরু করা মাত্রই সাকিবর মাথার নিচে একটা হ্যান্ড ব্যাগ দিয়ে কুণ্ডলী
পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। জামিল বলল, কি, ঘুমুচ্ছেন নাকি ?

হ্যাঁ। রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

এই ঝাঁকুনিতে ঘুম হবে ?

হবে। আমার অভ্যেস আছে।

ঘুমুবার আগে একটা সিগারেট খাবেন ?

জি-না, আমি সিগারেট খাই না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাক্ষির ঘুমিয়ে পড়ল। জামিল একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা বোধ করল। এত সহজে কেউ অমন ঘুমিয়ে পড়তে পারে ? একা বসে থাকা ক্লাস্তিকর ব্যাপার। নেমে গিয়ে প্রথম গাড়িটিতে উঠা যেতে পারে। সেখানে সিগারেট খাওয়া যাবে না এই একটা ঝামেলা। তাছাড়া সঙ্গী হিসেবে ওসমান সাহেব বেশ বোরিং হবেন বলেই তার ধারণা। লোকটির রসবোধ নেই। অফিসের বাইরে যে আরও কিছু থাকতে পারে তা খুব সম্ভব তিনি জানেন না।

এক পর্যায়ে জামিলের মনে হলো, এখানে আসা কি সত্যি দরকার ছিল ? মানুষ বেড়াতে যায় ফুর্তি করবার জন্যে। এখানেও কি সেরকম কিছু হবে ? সম্ভাবনা খুব কম। জামিল গাড়োয়ানের পাশে এসে বসল। রাস্তায় ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ি খুব ধীরে চলে বলে যে ধারণা আছে সেটা ঠিক নয়। বেশ দ্রুতই চলছে। গান শুনতে শুনতে যেতে পারলে হতো। কিন্তু ক্যাসেট প্লেয়ারটি নিশাতদের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবে নাকি ?

নিশাতের নাক ভার হয়ে আছে। মাথায় একটা ভোঁতা যন্ত্রণা। সে বলল, মা, তোমার কাছে প্যারাসিটামল আছে ?

আছে। তোর জ্বর নাকি ?

না সর্দি। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রেহানা তার গায়ে হাত দিলেন—গা তো বেশ গরম। শুয়ে থাক।

শুয়ে থাকতে হবে না। তুমি দুটো ট্যাবলেট দাও।

পানি তো নাই। পানির বোতল পেছনের গাড়িতে।

পানি লাগবে না। তুমি দাও।

রেহানা দুটি ট্যাবলেট দিলেন। নিশাত একটুও মুখ বিকৃত করল না। ট্যাবলেট দুটি গিলে ফেলল।

শুয়ে থাক।

আমার শুয়ে থাকার যখন প্রয়োজন হবে আমি শুয়ে থাকব। তোমার বলতে হবে না।

তুই এত রেগে আছিস কেন ?

নিশাত মায়ের চোখে চোখ রেখে শীতল গলায় বলল, সাক্ষির সাহেব আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে কেন ? ঠিক করে বলো তো মা।

বেড়াতে যাচ্ছে, আবার কেন ? ও বাংলাদেশের অনেক ছবি তুলে নিতে চায়। আমরা গ্রামের দিকে যাচ্ছি শুনে সে-ও আগ্রহ করে যেতে চাইল।

না, সে কোনো আশ্রয় দেখায়নি। তুমি খুলাখুলি করছিলে।

যদি করেই থাকি তাতে অসুবিধা কী? আমাদের আত্মীয়, এতদিন পর দেশে এসেছে। ঘুরেফিরে দেখতে চায়।

আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয় মা।

আসল ব্যাপারটা কী শুনি?

তুমি চাচ্ছ ঐ ছেলেটি যাতে আমাকে পছন্দ করে ফেলে। এবং পুরনো দুঃখ-কষ্ট ভুলে আমি তাকে বিয়ে করে ফেলি।

যদি চেয়েই থাকি সেটা কি খুব অন্যায়?

ই্যা অন্যায়। তুমি যা ভাবছ সেটা ঠিক নয়।

আমি কী ভাবছি?

তুমি ভাবছ—আমার স্বামী নেই, একটা বাচ্চা আছে। কাজেই আমার একটি অবলম্বন দরকার। এটা মা ঠিক না। আমি তোমাদের বিরক্ত করব না, আমি নিজের দায়িত্ব নিজে নেব। অনেকবার তো তোমাদের বলেছি।

নিশাত দেখল জামিল এগিয়ে আসছে। সে চুপ করে গেল।

ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোমাদের কাছে?

জি-না, দিলুর কাছে।

জামিল এগিয়ে গেল। সামনের গাড়িটি অনেক দূর চলে গেছে। নিশাত দেখল জামিল দৌড়াতে শুরু করেছে। এই দৃশ্যটি তার কেন জানি ভালো লাগল। রেহানা বললেন, জামিলকে বলে দে পানির বোতলটা দিয়ে যাক।

কেন?

ওষুধ খেয়ে তোর মুখ তেতো হয়ে আছে না?

মা, আমার জন্যে তোমাকে এত ভাবতে হবে না।

দিলু ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছিল। ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, তিনি দিলুর কথা বেশ মন দিয়ে শুনছেন এবং তাঁর ভালো লাগছে।

সোগাহী নাম কেমন করে হয়েছে শুনবে বাবা?

বল শুনি।

আমার দিকে তাকাও বলছি। অন্যদিকে তাকিয়ে আছ কেন?

ওসমান সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন। দিলু হাত নেড়ে নেড়ে গল্পটা বলল। ওসমান সাহেব বললেন, এই জাতীয় মিথ প্রায় সব পুকুর সম্পর্কেই থাকে। এটা ঠিক নয়। একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় মাটি কাটলেই পানি আসবে। শীতের সময় যদি নাও আসে বর্ষার সময় বৃষ্টির পানিতে ভরে যাবে।

দিলুর মন খারাপ হলো। গল্পটা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ওসমান সাহেব বললেন, রাজার মেয়ের নাম সোহাগী—এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন ?

রাজাদের মেয়ের এমন সাধারণ নাম থাকে না। ওদের গালভরা নাম থাকে। ফুলকুমারী, রূপকুমারী, নূরজাহান, নূরমহল।

দিলুর বেশ মন খারাপ হলো। সে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল এবং অবাক হয়ে দেখল জামিল ভাই আসছেন।

ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোর কাছে ?

হ্যাঁ।

ওটা নিতে এসেছি।

জামিল গরুর গাড়ির পেছনে পা বুলিয়ে বসল।

দিলু, ভালো দেখে কয়টা ক্যাসেট দে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

না হিন্দি-ফিন্দি।

দিলু ক্যাসেট বাছতে বাছতে বলল, বাবা কিন্তু সোহাগী পুকুরের গল্পটা বিশ্বাস করেননি। বাবা বলছেন, মাটি কিছুদূর খুঁড়লেই পানি আসবে।

এটা ঠিক নয়। ঢাকা আর্ট কলেজে একটা বিরাট পুকুর আছে। খুব গভীর। বর্ষাকালে পর্যন্ত সেখানে একফোঁটা পানি থাকে না।

সত্যি ?

হ্যাঁ। এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় কেউ যদি সেই পুকুরে নামে তাহলে খিলখিল হাসির শব্দ শোনে।

ওসমান সাহেব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, জামিল, সত্যি নাকি ?

পুকুরে পানি নেই বর্ষাকালেও এটা সত্যি, আমি নিজে দেখেছি। তবে হাসির কথাটা জানি না, ওটা বানানোও হতে পারে।

দিলু বলল, আমাকে ঐ পুকুরটা দেখাবেন ?

একদিন গিয়ে দেখে এলেই হয়। তোদের কামর কাছেই তো।

জামিল ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে নেমে গেল। দিলু বলল, জামিল ভাই অনেক কিছু জানে। ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না।

জামিল ভাই আমাকে একটা ধাঁধা জিঙ্গেস করেছিল, সেটা দারুণ মজার, তোমাকে জিঙ্গেস করব ?

কর।

আচ্ছা মনে করো তোমার কাছে দশ সের পানি দেওয়া হলো। এখন তুমি কি পারবে এই দশ সের পানি একবারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে? বালতি-টালতি কিছু ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু হাত দিয়ে নেবে এবং একবারে নেবে।

ওসমান সাহেব ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। দিনু মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, খুব সহজ বাবা। চেষ্টা করলেই পারবে। একটু হিন্টস দেব?

না, হিন্টস দিতে হবে না।

ওসমান সাহেব সত্যিই গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

জামিল নিজের গাড়িতে ফিরে এসে দেখে সাকিবর উঠে বসেছে। ক্যামেরা নিয়ে কী সব যেন করছে।

কি, ঘুম হয়ে গেল?

হ্যাঁ।

কী করছেন?

একটা ব্লু ফিল্টার লাগাচ্ছি।

ব্লু ফিল্টার দিয়ে কী হয়?

দিনের বেলা ছবি তুললে মনে হয় জ্যোৎস্না রাত্রিতে ছবি তোলা হয়েছে।

আপনি নিজে তো একজন ইঞ্জিনিয়ার?

জি।

আপনাকে দেখে মন হয় ছবি তোলাই আপনার একমাত্র কাজ।

এটা আমার একটা হবি।

খুব বড় ধরনের হবি মনে হচ্ছে?

সাকিবর শান্ত স্বরে বলল, আমি কিন্তু খুব নামকরা ফটোগ্রাফার। আমার নিজের তোলা ছবি নিয়ে আমেরিকান এক পাবলিশার একটি বই বের করেছে, নাম হচ্ছে, *অন দি টপ অব দি ওয়ার্ল্ড*।

আপনার কাছে কপি আছে?

আছে, দিচ্ছি।

সাকিবর আহমেদ তিনশ' পৃষ্ঠার একটি বই বের করল তার সুটকেস থেকে। জামিলের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

এই বইটির কথা কি দিলুরা জানে?

না। নিজের কথা বলতে ভালো লাগে না।

সাকিবর ছবি তুলতে শুরু করল। ক্যামেরার শাটার পড়ছে। কোনো কিছু যে সে দেখছে মন দিয়ে তা মনে হচ্ছে না।

একটি গ্রাম্য বধূ লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাটার পড়তে লাগল খটাখট।

ছাগলের গলার দড়ি ধরে একটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। খটাখট শাটার পড়তে শুরু করল। জামিল বলল, এই ছবিটা আপনার ভালো হবে না। জোহনা রাতে কেউ ছাগল চড়াতে বের হয় না। আপনি বরং ব্লু-ফিল্টার বদলে নিন।

সাকিবর হালকা গলায় বলল, উল্টোটাও হতে পারে, ছবি দেখে মনে হতে পারে রাতের রহস্যময়তায় মুগ্ধ হয়ে একটি শিশু তার পোষা প্রাণীটি নিয়ে বের হয়েছে। দু'জনের চোখেই বিষ্ময় ও ভয়, তাদের ঘিরে আছে জোহনা।

আপনি কি ফটোগ্রাফার না কবি?

আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার।

জামিল বইটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, আপনার এই বইটিতে তো মানুষের কোনো ছবি নেই। শুধুই জড়বস্তুর ছবি। মানুষের ছবি বেশি তোলেন না?

আমার অন্য একটি বইতে মানুষের ছবি আছে। সবই অবশ্যি 'নুড' ছবি।

বইট আছে?

আছে।

আমেরিকায় আপনি কতদিন ধরে আছেন?

প্রায় এগারো বছর।

দেশে ফিরবেন না?

না।

কেন?

থাকবার জন্যে ঐ জায়গাটি ভালো। বিশাল দেশ, ঘুরে বেড়ানোর চমৎকার সুযোগ। এরকম পাওয়া যায় না। তা ছাড়া...

তা ছাড়া কী?

সাকিবর কথা শেষ করল না। মাঠের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, এগুলো সর্ষে ফুল না? হলুদ রঙের কী চমৎকার ভেরিয়েশন।

তারা নীলগঞ্জ ডাকবাংলোয় এসে পৌছল বিকেল চারটায়, তখন আলো নরম হয়ে এসেছে। শীতের উত্তরী হাওয়া বইছে।

ডাকবাংলোটি চমৎকার। ফিসারিজের বাংলো। হাফ বিন্ডিং। উপরের ছাদ টালির, মন্দিরের গম্বুজের মতো উঁচু হয়ে গেছে। বাড়ি যত বড় তার চেয়েও বড় তার বারান্দা। সেখানে কালো একটি গোল টেবিলের চারপাশে গোটাপাঁচেক ইজিচেয়ার।

দেখলেই গুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। বাড়িটির চারপাশে রেন্ট (রেইন ট্রি) গাছ। বিকেল বেলাতেই বাড়িটিকে অন্ধকার করে ফেলেছে। পেছনে বেশ বড়সড় একটা পুকুর। কাকের চোখের মতো কালো জল।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন, এই জঙ্গলে এত চমৎকার বাড়ি গভর্নমেন্ট কেন বানিয়েছে? ওসমান সাহেব নিজেও হকচকিয়ে গেছেন। এদিকে তাঁর প্রথম আসা। খোঁজখবর এসেছে জামিলের কাছ থেকে।

জামিল, এই ডাকবাংলো তৈরি হয় কবে?

এটা সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার শিকার বাড়ি। পরে সরকার মিয়ে নেয়। এখন ফিসারিজ ডিপার্টমেন্টের হাতে দেওয়া হয়েছে। আগে আরও সুন্দর ছিল।

এরচেয়ে সুন্দর আর কী হবে?

একটা কাচঘর ছিল। গোটা ঘরটাই কাচের তৈরি। লোকজন কাচটাচ সব নিয়ে গেছে। অনেক ঝাড় লগুন ছিল। বড় বড় অফিসার একেকজন এসেছেন, একেকটা করে নিয়ে গেছেন। পেছনের পুকুরের ঘাটে মার্বেল পাথরের একটি দেবশিশু ছিল, ঢাকা মিউজিয়াম নিয়ে গেছে।

তুমি এত কিছু জানো কীভাবে?

আমি তো এখানে প্রায়ই আসি।

দিলু বলল, বাবা, আমি একা একটা ঘরে থাকব। ওসমান সাহেব উত্তর দিলেন না। জামিল বলল, তা পারবি না দিলু। সব পুরনো ডাকবাংলোয় ভূত থাকে।

আপনাকে বলেছে!

সন্ধ্যা হলেই টের পাবি। সন্ধ্যা নামুক। তখন দেখা যাবে।

বাবুর্চি আছে দু'জন। তারা রান্নাবান্না সেরে ফেলেছে। খাবার ঘরে খাবার দিতে শুরু করেছে। খাবার ঘরটা তুলনামূলকভাবে অন্ধকার। একটা হ্যাঞ্জার বাতি জ্বালানো হয়েছে। সবাই হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছে। শুধু নিশাত নেই। রেহানা খোঁজ নিতে গেলেন। নিশাত গুয়ে ছিল। সে ক্লান্ত গলায় বলল, আমি কিছু খাব না।

কেন খাবি না?

খেতে ইচ্ছে করছে না, তাই খাব না।

সারা দিন তো কিছুই মুখে তুলিসনি। কিছু মুখে দে।

আমি গোসল না করে কিছু মুখে দেব না। আমার গা ঘিনঘিন করছে।

জ্বর গায়ে গোসল করবি কী!

প্লিজ মা, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না। বাবুকে খাওয়াও। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করো।

রেহানা মুখ কালো করে বের হয়ে এলেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করল নিশাত। ঠান্ডা পানি। গায়ে জ্বর থাকার জন্যে পানি বরফশীতল মনে হচ্ছে। তবু ভালো লাগছে। ঝকঝকে বাথরুম। পিতলের বালতিতে পরিষ্কার জল। মোড়ক খোলা নতুন সাবান।

নিশাত যখন বেরিয়ে এল তখন সত্যি সত্যি অন্ধকার নেমে এসেছে। নিশাত একটি ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিল। উঁকি দিল মায়ের ঘরে। বাবু অবেলায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। আজ সারা দিন বাবুর সঙ্গে তার কোনো কথাবার্তা হয়নি। বাবু কি ক্রমেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? রাতে সে এখন তার সঙ্গে ঘুমায় না। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, দাদির কাছে যাব। রেহানাকে সে দাদি বলে। কেন বলে কে জানে!

নিশাত বলল, ও কি কিছু খেয়েছে?

ভাত মুখে দেয়নি। দুধ খেয়েছে।

নিশাত নিচু হয়ে ছেলের কপালে চুমু খেল। রেহানা বললেন, কিছু খাবি মা?

না। চা খাব এক কাপ।

বস তুই এখানে। আমি চায়ের কথা বলে আসি। মশারি খাটানোর কথাও বলতে হবে। খুব মশা এদিকে।

দরজায় কার যেন ছায়া পড়েছে। নিশাত মুখ তুলে দেখল জামিল ভাই।

নিশাত, তোমার নাকি জ্বর?

ব্যস্ত হবার মতো কিছু না।

ব্যস্ত হইনি নিশাত, খোঁজ নিচ্ছি। খোঁজ নেওয়াটা অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।

আমি ভালো আছি।

জামিল ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। চলে যেতে চাইল। নিশাত বলল, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে জামিল ভাই।

বলো।

আপনি বারান্দায় বসুন, আমি আসছি।

ঝগড়া করবে মনে হচ্ছে।

নিশাত জবাব দিল না। বাবুর গালে একটা মশা বসেছিল। হাত দিয়ে সেটিকে উড়িয়ে দিল। ছেলেটিকে বড় রোগা রোগা লাগছে। এ ক'দিন ওর দিকে একটুও নজর দেওয়া হয়নি। নিশাতের মনে হলো সে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। বাবু এখন আর মা'র জন্যে খুব ব্যস্ত নয়। শিশুরা অবহেলা খুব সহজেই টের পায়। নিশাত বাবুর চুলে হাত রাখল। পাতলা লালচে ধরনের চুল। বাবার মতো। কবিরের চুলও এরকম ছিল। তবে বাবুর মতো পাতলা ছিল না। কবিরের চেহারার সঙ্গে বাবুর খুব বেশি মিল নেই। কবিরের নাক ছিল খাড়া, বাবুর তা নয়। সে হয়েছে মা'র মতো।

নিশাত নিচু হয়ে বাবুর ঠোঁটে চুমু খেল। কেমন দুধ দুধ গন্ধ। নিশাত আবার নিচু হলো। বাবু ঘুমের মধ্যেই তাকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল।

বারান্দা অন্ধকার। এখানে কোনো বাতি দিয়ে যায়নি। জামিল বসে ছিল একা। নিশাত এসে ঢুকতেই সে সোজা হয়ে বসল। হালকা গলায় বলল, ভেতরে বসলেই হতো, এখানে বড় হাওয়া।

থাকুক হাওয়া। বারান্দাই ভালো।

আলো দিতে বলব ?

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। সহজভাবে বলল, বলো কী বলবে ?

আপনি আমাদের এই বাংলায় কেন নিয়ে এসেছেন ?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কী মিন করছ।

আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন। এখন ভান করছেন বুঝতে পারছেন না।

দেখ নিশাত, আমি ভান করি না। ঐ একটা জিনিস আমি কখনো করি না।

তাহলে বলুন—এত ডাকবাংলো থাকতে আপনি এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন কেন ?

কবির এবং আমি অনেক রাত এই ডাকবাংলোয় কাটিয়েছি। এই ডাকবাংলোর উপর ওর একটা দুর্বলতা ছিল। আমি জানি বিয়ের পর ও অনেকবার তোমাকে নিয়ে এখানে আসতে চেয়েছে। আসা হয়ে ওঠেনি। আমি তাই ভেবেছিলাম এখানে এলে তোমার ভালোই লাগবে।

আমি ওর সঙ্গেই এখানে আসতে চেয়েছিলাম, আর কারও সঙ্গে নয়।

ভেবে নাও ও তোমার সঙ্গেই আছে।

সবকিছু কি ভেবে নেওয়া যায় ? জীবন এত সহজ মনে করেন ?

জীবন সহজও নয়, জটিলও নয়। জীবন জীবনের মতো। আমরাই একে জটিল করি, সহজ করি। তুমি একে ক্রমেই জটিল করছ।

নিশাত চুপ করে গেল। জামিল হালকা সুরে বলল, দুঃখ শুধু কি তোমার একার ? আমাদের সবারই দুঃখ আছে।

আপনার আবার কিসের দুঃখ ? দুঃখের আপনি কী জানেন ?

নিশাত উঠে দাঁড়াল। বাবু জেগে উঠে কাদছে। কে একজন এসে বারান্দায় একটি হারিকেন রেখে গেল। হারিকেনের আলোয় সব কেমন অদ্ভুত লাগছে।

জামিল সাহেব, আপনি যেভাবে বসে আছেন বসে থাকুন। একটা ছবি তুলব। নড়বেন না, শাটার স্পিড খুব কম।

অনেকখানি সময় নিয়ে সাবির ছবি তুলল।

পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ধাঁধাটি ওসমান সাহেবের মাথায় ঘুরতে শুরু করেছে দুপুর থেকে। ওসমান সাহেব নিজের উপরই বিরক্ত হচ্ছিলেন। ধাঁধার মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এই বয়সে কেউ এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে না। কিন্তু তিনি হচ্ছেন। এটা কি বয়সজনিত স্থবিরতা? তিনি কেমন যেন চ্যালেঞ্জ বোধ করছেন। এর মধ্যে চ্যালেঞ্জ বোধ করার কী আছে! ধাঁধার উত্তর জানতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

তিনি পাইপ হাতে বারান্দায় এসে বসলেন। তাঁর গায়ে ভারী একটা ওভারকোট। গলায় মাফলার। তবু তাঁর শীত করতে লাগল। বয়স! বয়স বাড়ছে। এখন একদিন একটা মাইল্ড স্ট্রোক হবে। তার লক্ষণও টের পাওয়া যাচ্ছে। ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। ঘুম কমে গেছে। খিদে কমে গেছে। চিন্তাও পরিষ্কার করতে পারছেন না। পারলে এই সহজ ধাঁধার জবাব বের করতে পারতেন। কিংবা কে জানে এটা হয়তো সহজ নয়। হয়তো বেশ জটিল।

বারান্দায় রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। ওসমান সাহেব রেহানার ডানদিকের খালি চেয়ারটিতে বসলেন। রেহানা বললেন, নিশাতের বেশ জ্বর।

তাই নাকি?

একশ' দুই-টুই হবে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছ?

না।

তাহলে বুঝলে কীভাবে একশ' দুই?

অনুমান করে বলছি।

অনুমান করে আমাকে কিছু বলবে না।

তুমি এরকম করছ কেন?

কী রকম করছি?

এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন?

মেজাজ কোথায় দেখালাম?

থানার ওসি ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করলে কেন?

খারাপ ব্যবহার তো করিনি। আমি বিরক্ত হয়েছি। এই বিরক্তির ব্যাপারটি তাকে জানিয়েছি। সে জানে আজ ভোরে আমি আসব, কিন্তু সে স্টেশনে আসেনি। আমি ডাকবাংলোয় পৌঁছানোর পর সে এসেছে। আমাকে সে কী ভেবেছে?

তুমি কোনো সরকারি ট্যুরে আসনি। তুমি ছুটি কাটাতে এসেছ। কেন সে আসবে?

সে আসবে। তার পুরো দলবল নিয়ে আসবে। কারণ আমি পুলিশের আইজি।

রেহানা একবার ভাবলেন বলবেন না, শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন। এবং বললেন বেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠেই, তুমি এখন আর আইজি নও। রিটার্মেন্ট নিয়েছ। রিটার্মেন্টের আগে পাওনা ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি পুলিশের আইজি এটা এখন যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পার ততই ভালো।

ওসমান সাহেবের পাইপ নিভে গেছে। নিভে যাওয়া পাইপ হাতে তিনি মূর্তির মতো দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। রেহানা শীতল স্বরে বললেন, এখন আর তোমাকে দেখামাত্র পুলিশের অফিসাররা ছোটোছুটি করবে না। এটা মানসিকভাবে একসেন্ট করার চেষ্টা করো। তোমার জন্যেও ভালো। আমাদের সবার জন্যেও ভালো। ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। দূরের রেন্টি গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রেহানার মনে হলো এই কথাগুলি হয়তো না বললেও চলত। তিনি গলার স্বর স্বাভাবিক করতে করতে বললেন, চা খাবে ?

না।

শীতের মধ্যে ভালো লাগবে।

আমাকে এক ঢোক হুইস্কি দিতে বলো।

হুইস্কি এখানে কোথায় পাবে ?

আছে, আলিম নিয়ে এসেছে। আলিমকে বলো।

আলিম ওসমান সাহেবের বাসায় গত বিশবছর ধরে আছে। তার বয়স ওসমান সাহেবের চেয়েও বেশি। কিন্তু গৃহভৃত্যদের কোনো পেনশনের ব্যবস্থা নেই, কাজেই তাকে একদিন আগেই রান্নার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নীলগঞ্জে আসতে হয়েছে। আজ প্রচণ্ড দাঁতব্যথা থাকা সত্ত্বেও সারা দিন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। রেহানা বললেন, আলিম শুয়ে আছে। ওর শরীর ভালো না। তাহাড়া এখানে এসব করতে পারবে না।

কেন, এখানে অসুবিধা কী ?

অসুবিধা আছে। ঘরে তুমি যা করো, তাই বলে বাইরে এসেও করবে ?

রেহানা, এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি। রিলাক্স করতে এসেছি।

তুমি একা আসনি। তোমার সঙ্গে বাইরের মানুষ আছে।

বাইরের মানুষ এখানে কেউ না। জামিল ঘরের জাল, সে আমার অভ্যাস জানে আর সাক্ষির এগারো বছর ধরে বাইরে আছে।

আমি তোমাকে মদ খেতে দেব না।

রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে উঠে গেলেন। যাওয়ার সময় হারিকেন হাতে করে তুলে নিয়ে গেলেন। ওসমান সাহেব অন্ধকার বারান্দায় একা একা বসে রইলেন। এখানে মশা আছে। বন্য মশা। মানুষ কামড়িয়ে অভ্যেস নেই বোধহয়। কামড়াচ্ছে না। শুধু বিরক্ত করছে। ওসমান সাহেব আবার ধাঁধা নিয়ে ভাবতে বসলেন। পানি

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হবে। শুধু হাতে নিতে হবে এবং একবারে নিতে হবে। কোনো মানে হয় ?

বাবা, তুমি অঙ্ককারে বসে কী করছ ?

দিলু ঢুকল। ওসমান সাহেব মিষ্টি একটা গন্ধ পেলেন। দিলু পাউডার মেখেছে কিংবা গায়ে সেন্ট-টেন্ট দিয়েছে। গন্ধটা হালকা এবং চেনা। পরিচিত কোনো ফুলের গন্ধ। কী ফুল ওসমান সাহেব সেটা মনে করতে পারলেন না। অনেকদিন সচেতনভাবে কোনো ফুলের গন্ধ নেওয়া হয় নি। দিলু তার পাশের চেয়ারে বসল এবং আবার বলল, অঙ্ককারে একা একা বসে কী করছ ?

তোর সমস্যা নিয়ে ভাবছি।

আমার ? আমার আবার কী সমস্যা ?

দিলু বেশ অবাক হলো। ওসমান সাহেব নরম গলায় বললেন, ঐ যে পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ব্যাপারটা।

ও আল্লা, তুমি এটা নিয়ে এখনো ভাবছ ?

হ্যাঁ, ভাবছি।

বলে দেব ?

না, বলিস না। নিজেই বের করব।

আরেকটা সহজ ধাঁধা ধরব ? জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি। দারুণ মজার।

না, আর না। যেটা দিয়েছিস সেটাই আগে সল্ভ করি।

দিলু হাসল খিলখিল করে।

হাসছিস কেন ?

বলা যাবে না।

যা আলিমকে একটু আসতে বল।

আমি পারব না বাবা।

পারবি নে কেন ?

কী অঙ্ককার—দেখছ না ? ভয় ভয় লাগে। বাবা

কী ?

একটা ভূতের গল্প শুনবে ? সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি।
উনার নিজের লাইফের ঘটনা।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। পাইপ ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খুব হাওয়া। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে।

বাবা বলব ?

বল।

দিলু তার বাবার কাছে ঘেঁসে এল। একটা হাত রাখল বাবার হাতে। গলার স্বর নিচু করে গল্প শুরু করল।

বুঝলে বাবা, তখন শ্রাবণ মাস। জামিল ভাই গিয়েছেন তার বন্ধুর বাড়ি। গ্রামের দোতলা বাড়ি। জামিল ভাইকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়েছে তার জানালাগুলো খুব ছোট ছোট। বাবা শুনছ তো ?

শুনছি।

তাহলে হুঁ বলবে একটু পরপর। না বললে মনে হবে গল্প শুনছ না।

ঠিক আছে বলব। তারপর কী হলো ?

মাঝরাতে হঠাৎ খুব ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। ঘরে হারিকেন ছিল, হারিকেনটা গেল নিভে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না।

তারপর ?

তারপর হলো কী শোনো। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। জামিল ভাই বললেন, কে ? একজন মেয়েমানুষের গলা শোনা গেল—দয়া করে দরজা খুলুন।

তারপর কী হলো ?

জামিল ভাই দরজা খুলতেই ঘরে একটা মেয়ে ঢুকল, ষোল-সতের বছর বয়স। বাইরে এত ঝড়বৃষ্টি কিন্তু মেয়েটি খটখটে শুকনো।

ওসমান সাহেব বললেন, ঘুটঘুটে অন্ধকারে জামিল কী করে দেখল মেয়েটি শুকনো এবং বুঝলইবা কী করে ওর বয়স সতের-আঠার ?

দিলু থমকে গেল। এটা সে ভাবেনি। ওসমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, গল্পটার মধ্যে একটা ফাঁকি আছে। তাই না দিলু ? দিলু জবাব দিল না। তার একটু মন খারাপ হয়ে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, গল্পটা শেষ কর।

না, থাক!

থাকবে কেন ? বাকিটা শুন।

তোমাকে শুনতে হবে না।

দিলুর গলার স্বর ভারী। যেন সে এশ্বুণি কেঁদে ফেলবে। সে উঠে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছিস ?

জামিল ভাইকে কথাটা জিজ্ঞেস করে আসছি।

পরে জিজ্ঞেস করলেও হবে।

না, আমি এখন জিজ্ঞেস করব। কেন সে আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে ?

গল্প তো গল্প। গল্প কখনো সত্যি হয় ?

জামিল ভাই বলেছিল এটা সত্যি গল্প।

দিলু প্রথমে গেল খাবার ঘরে। সেখানে একজন অপরিচিত রোগা লোক হাজাক লাইট ঠিক করতে চেষ্টা করছে। এক একবার দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে, লোকটি ‘খাইছেরে’ বলে এক লাফে পেছনে সরে। ব্যাপারটা দিলুর কাছে খুব মজার লাগল। দিলু হাসিমুখে বলল, আপনার কী নাম ?

আমার নাম বাদলা।

বাদলা আবার নাম হয় ?

বাপ-মায় দিছে, কী করমু কন ?

তারা বোধহয় নাম দিয়েছিল বাদল।

দিলুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাজাকটা ঠিক হয়ে গেল। বাদলা দাঁত বের করে বলল, আফা, আপনার খুব পয়। দিলু বলল, আপনি কি জামিল ভাইকে দেখেছেন ? ঐ যে লম্বা। গায়ে পাঞ্জাবি আর ক্রিম কালারের চাদর।

জি দেখছি।

কোথায় দেখেছেন ?

এই সাব আরেকজন কোট পরা সাব বইসা আছে পুকুরঘাটে। গফ করতাকে।

আপনি যান তো, জামিল ভাইকে ডেকে নিয়ে আসুন। বলবেন, দিলু আপনাকে ডাকছে। আমার নাম দিলু। দিলশাদ থেকে দিলু।

লোকটি চলে গেল। দিলু মুখ গম্ভীর করে বসে রইল। রাত বেশি হয় নি। মাত্র আটটা কিন্তু মনে হচ্ছে গভীর রাত। ঝাঁঝি ডাকছে চারদিকে। বাবুর কান্না শোনা যাচ্ছে। সে সারা দিন ঘুমিয়েছে। কাজেই সারা রাত সে জেগে থাকবে। একটু পরে পরে কাঁদবে। মা-কে কোলে নিয়ে হাঁটাইটি করতে হবে। দিলু শুনল মা তাকে গল্প বলার চেষ্টা করছেন। তুলারশি কন্যার গল্প। এই গল্পটি ছোটবেলায় সে-ও শুনেছে। এক রাজকন্যার ওজন মাত্র এক ছটাক। কিন্তু এক রাতে হঠাৎ তার ওজন বেড়ে গেল।

কী ব্যাপার দিলু! জরুরি তলব কেন ?

জামিল ভাই, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন ? কেউ আমাকে মিথ্যে বললে আমার খুব খারাপ লাগে।

কোনটা মিথ্যে বলেছি বল তো ? মিথ্যে আমি তেমন বলি না।

ঐ যে, একটা সত্যি ভূতের গল্প বললেন, ওটা আসলে মিথ্যে ভূতের গল্প।

কোন গল্পটি ?

ঐ যে, বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছেন। ঝড়বৃষ্টির সময়। শোল-সতের বছরের একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিথ্যে হবে কেন ? ওটা সত্যি গল্প।

না, সত্যি না। এই অন্ধকারে আপনি কী করে বুঝলেন ওর বয়স ষোল-সতের।
ওর কাপড় ভেজা না।

জামিল গম্ভীর গলায় বলল, ঐ রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। ঝড়ের সময় ঘনঘন
বিদ্যুৎ চমকায়। বিদ্যুতের আলো শহরের ইলেকট্রিকের আলোর চেয়েও কড়া।

দিলু তাকিয়ে রইল চোখ বড় করে। জামিল বলল, তবে মেয়েটির বয়সের
ব্যাপারটা আমার কল্পনা। আমি নিজে তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম, কাজেই সব মেয়ের
বয়সই মনে হতো ষোল-সতের।

দিলু কিছু বলল না।

কি, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। জামিল ভাই—

বল।

আরেকটা সত্যি গল্প বলেন।

আরেকদিন বলব।

জামিল ভাই, আপনি কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

না, রাগ করব কেন?

দিলু হঠাৎ উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। জামিল হাসল। দিলু নিশাতের মতো হয়
নি। সে হয়তো এখন কিছুক্ষণ কাঁদবে।

৭

রাতের খাবার দেওয়া হলো নটার দিকে। দেখা গেল কারোই খাওয়ার দিকে মন
নেই। শুধু সাক্ষির, খাবার দেওয়া হয়েছে শোনামাত্র, এসে বসেছে এবং খেতে শুরু
করেছে। রেহানা বাবুকে কিছু-একটা মুখে দেওয়াবার জন্যে আব্বাসের মায়ে এসে
সাক্ষিরের একা একা খাওয়ার দৃশ্যটি দেখলেন। সাক্ষির ঘনঘন পানি খাচ্ছে। রেহানা
বললেন, খুব ঝাল হয়ে গেছে নাকি?

একটু হয়েছে, অসুবিধা নেই।

এরা বেশ ঝাল দেয়। আলিম রান্না করলে এটা সমস্যা না। আলিম অসুখ হয়ে
পড়ে আছে।

কী অসুখ?

দাঁতে ব্যথা।

সাক্ষির গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছে। রেহানা লক্ষ করলেন সে একবারও বলল না—
অন্যরা কেউ খেতে আসছে না কেন? এটা একটা সাধারণ ভদ্রতা। দশ-এগার বছর
বিদেশে থাকলেই কেউ অভদ্র হয়ে যায় না। বরং আরও ভদ্র হয়। সেটাই স্বাভাবিক।
রেহানা বললেন, এতকিছু রান্না হয়েছে কিন্তু কেউ খেতে চাচ্ছে না। সব নষ্ট হবে।

দিলু ঘরে ঢুকল। সে এসেছে নিশাতের জন্যে এক গ্লাস পানি নিতে। রেহানা দেখলেন, পানি ঢালতে গিয়ে সে অনেকখানি পানি টেবিলে ফেলল। মেয়েটা কাজকর্মে এত আনাড়ি হয়েছে। পানি গড়িয়ে যাচ্ছে সাক্ষিরের দিকে। তাকে অল্প সরে বসতে হলো। দিলু বলল, সাক্ষির ভাই, আপনি এত পেটুক কেন, সবাইকে ফেলে খেতে বসেছেন।

রেহানার কপালে ভাঁজ পড়ল। মেয়েটা এমন রুচিহীন কথাবার্তা বলে। লজ্জায় পড়তে হয়।

দিলু চলে যেতেই সাক্ষির বলল, আপনার এই মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ। ওর মধ্যে একধরনের সরলতা আছে।

রেহানা কিছু বললেন না। মনে মনে সাক্ষিরের কথাটার অন্য কোনো অর্থ হয় কিনা বুঝতে চেষ্টা করলেন। এই মেয়েটিকে তার পছন্দ—এর মানে কি এই নয় যে, বড় মেয়েটিকে পছন্দ নয়। বড় মেয়েটির মধ্যে সরলতা নেই। প্রথমদিকে সাক্ষিরকে যতটা ভালো লেগেছিল এখন আর ততটা ভালো লাগছে না। ছেলেটি অভদ্র, অমিশুক। অবশ্য সে অত্যন্ত সুপুরুষ। চেহারায়ে অন্য ধরনের কাঠিন্য আছে যা সহজেই চোখে পড়ে।

কবির এরকম ছিল না। কবিরের মধ্যে একটা হালকা ফুর্তির ভাব ছিল যা কোনো বয়স্ক মানুষকে ঠিক মানায় না। এটা ভাবতে ভাবতে রেহানা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি ঠিক এই মুহূর্তে কবিরকে অপছন্দ করার চেষ্টা করছেন। এটা অন্যায়। কবিরকে অপছন্দ করার উপায় নেই। সে এ বাড়ির সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। ওসমান সাহেব, যিনি পৃথিবীর কোনো কথাই প্রায় বিশ্বাস করেন না, তিনি পর্যন্ত কবিরের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন। একবার কবির এসে বলল, খবর শুনেছেন নাকি? মালয়েশিয়ায় একটা মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে।

কী ধরা পড়েছে?

মৎস্যকন্যা। মারমেইড। মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল পত্রিকায় ক্রীট ছবি ছাপা হয়েছে। ছলছল কাণ্ড!

বলো কী!

অন্যকেউ এ কথা বললে ওসমান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। কবিরের বেলায় সেরকম কিছুই হলো না। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো তিনি বিশ্বাসও করছেন না, আবার ঠিক অবিশ্বাসও করছেন না। রাতে শোবার সময় গম্ভীর মুখে স্ত্রীকে বললেন, দুনিয়ায় কত অদ্ভুত জিনিসই না হয়। রেহানা বললেন, জামাইয়ের কথার কি কোনো ঠিক আছে? তুমি এটা বিশ্বাস করে আছ? ওসমান সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, কোন কথাটা এ পর্যন্ত সে মিথ্যে বলেছে শুনি? ওসমান সাহেব কবিরের কোনো বদনাম সহ্য করতে পারতেন না। এখনো পারেন না। যে লোক জীবনে কোনোদিন নামাজ-রোজা করেছে বলে রেহানার মনে পড়ে না সেই

লোকও দেখা যায় একুশে আগস্টে একটা জায়নামাজ টেনে বের করেন। এবং গভীর রাত পর্যন্ত টুপি মাথায় বসে থাকেন। অপরিচিত এই পোশাকে তাঁকে অদ্ভুত দেখায়। একুশে আগস্ট কবিরের মৃত্যুদিন।

পানি আনতে এতক্ষণ লাগল ?

দিলু পানি আনতে দেরি করে নি। গিয়েছে, নিয়ে এসেছে। নিশাত আজ অকারণে রাগ করছে। দিলু বলল, নাও, পানি নাও।

লাগবে না, যা। তৃষ্ণা মরে গেছে।

এটা কেমন কথা! তৃষ্ণা কখনো মরে যায় ? তৃষ্ণা থাকেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। দিলু নরম স্বরে বলল, আপা, খেয়ে নাও, পিজ। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। নিশাত পানির গ্লাস হাতে নিল।

তুমি রাতেও কিছু খাবে না ?

না।

কেন ?

দেখছিস না আমার শরীর ভালো না।

মাথা টিপে দেব ?

না, লাগবে না। তুই এখন যা।

অন্ধকারে একা বসে থাকবে কেন ? আমিও থাকি তোমার সঙ্গে।

দিলু খাটের উপর পা উঠিয়ে বসল। অন্ধকারে পা নামিয়ে বসতে তার ভালো লাগে না। সবসময় মনে হয় কেউ-একজন খাটের নিচ থেকে চুপি চুপি এসে পা চেপে ধরবে।

আপা, একটা ভূতের গল্প শুনবে ?

নিশাত জবাব দিল না।

সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের নিজের জীবনে ঘটেছিল।

নিশাত তবুও চুপ করে রইল।

এ গল্প শুনলে তুমি আর একা একা অন্ধকারে বসে থাকতে পারবে না। এবং রাতে ঘুমও আসবে না।

এত ভয়ের গল্প শুনতে চাইনে। থাক। মধ্যাহ্নের মধ্যে গল্প শুনতে ভালো লাগে না।

আপা, তোমার মাথার চুল টেনে দেই ?

দে। আস্তে আস্তে টানবি।

দিলু নিশাতের কপালে হাত দিয়েই চমকাল। বেশ জ্বর গায়ে। এতটা জ্বর তা বোঝা যায়নি।

আপা, তোমার গা তো খুব গরম ।

হঁ ।

জানালা বন্ধ করে দেই, ঠান্ডা হাওয়া আসছে ।

না থাক । জানালা বন্ধ থাকলে আমার কেমন যেন লাগে । মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না ।

মশারি ফেলা নেই । মাঝে মাঝে মশা কামড়াচ্ছে । দিলু হালকা স্বরে বলল, জানো আপা, আমি কখনো মশা মারি না ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ । কারণ যেসব মশা মানুষকে কামড়ায় তারা সব স্ত্রী মশা । পুরুষ মশারা কামড়ায় না । আমি নিজে মেয়ে হয়ে একটা মেয়ে মশাকে কী করে মারি, বলো ?

পুরুষ মশারা কামড়ায় না—এ কথাটা তোকে বলেছে কে ?

জামিল ভাই বলেছেন ।

নিশাত বিছানায় উঠে বসল । নিচুস্বরে বলল, জামিল ভাইয়ের সঙ্গে তোর এত মাখামাখি কেন ?

দিলু অবাক হয়ে বলল, এই কথা কেন বলছ ?

সব সময় তোর মুখে জামিল ভাই, জামিল ভাই । এটা ভালো নয় ।

ভালো নয় কেন ?

তোর বয়স কম । এই বয়সে মেয়েরা খুব সহজে নানান রকম দুঃখ-কষ্ট পায় ।

নিশাত চুপ করে রইল । দিলু বলল, পরিষ্কার করে বলো আপা ।

নিশাত কঠিন স্বরে বলল, তোর মতো বয়েসী মেয়েরা খুব সহজে মুগ্ধ হয় । দুঃখ-কষ্ট আসে সেজন্যেই ।

তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না ।

আমার মনে হয় তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস । আমার যখন তোর মতো বয়স ছিল তখন তো আমি সবই বুঝতাম । তুই জামিল ভাইয়ের সঙ্গে বেশি মিশবি না ।

কেন, সে কি খারাপ লোক ?

না, সে খারাপ লোক না । ভালো মানুষ । বেশ ভালো মানুষ । সে-জন্যেই ভয় । এক সময় তুই তাকে ভালোবাসতে শুরু করবি । তোর জন্যে সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে ।

দিলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না । নিশাতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল । অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু নিশাতের মনে হলো দিলু কাঁদছে ।

তুই কাঁদছিস নাকি ?

দিলু কোনো উত্তর দিল না । সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল ।

চলে যাচ্ছিস ?

দিলু সে-কথারও কোনো জবাব দিল না। নিশাতের মনে হলো দিলুকে এসব কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন আর মনে করে কী লাভ? যা বলা হয়ে গেছে তা আর ফেরানোর উপায় নেই।

হারিকেন হাতে রেহানা ঢুকলেন। তার কোলে ঘুমন্ত বাবু। তিনি বাবুকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেলেন। নিশাত বলল, ওকে তোমার কাছে রাখ মা। আমি আজ এ ঘরে একা শোব।

কেন, একা শুবি কেন?

সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।

তোর শরীর ভালো নেই, একজন কেউ তোর সাথে থাকা দরকার। আমি থাকি কিংবা দিলু থাকুক।

কাউকে থাকতে হবে না।

রেহানা একটি কঠিন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন—রাতে কী খাবি?

কিছু খাব না।

খাবি না কেন? তোর রাগটা আসলে কার উপর? ঠিক করে বল তো?

কারও উপর আমার কোনো রাগ-টাগ নেই। শরীর ভালো নেই, তাই খাব না।

ঠিক আছে।

রেহানা চলে যাচ্ছিলেন, নিশাত বলল, দিলুকে একটু পাঠিও তো মা।

দিলু আসবে না। তুই ওকে কী বলেছিস জানি না। দিলু কাঁদছে।

কাঁদার মতো আমি কিছু বলিনি।

রেহানা শীতল স্বরে বললেন, তোর কথাবার্তা শুনে আমারই কাঁদতে ইচ্ছে হয়, আর ও তো বাচ্চামেয়ে।

ও বাচ্চামেয়ে নয়। এই বয়সে মেয়েরা বাচ্চা থাকে না।

সবাই তোর মতো নয়। কেউ কেউ বাচ্চা থাকে।

এ কথার মানে কী, মা?

মানে-টানে কিছু নেই। তুই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ নিশাত। যার দুঃখে আজ এরকম করছিস তার সঙ্গে তোর আচার-ব্যবহার কেমন ছিল?

তার মানে?

ক'টা দিন তুই কবিরের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছিস?

মানুষ সব সময় হাসিমুখে থাকতে পারে না।

তা পারে না। কিন্তু তুই ভালোমতো ভেবে দেখ তো কবিরের সঙ্গে তোর ব্যবহারটা কেমন ছিল।

তুমি যাও তো মা ।

রেহানা চলে এলেন । নিশাত অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে দরজার ছিটকিনি লাগল । দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘ সময় । বাবু ঘুম ভেঙে কাঁদতে শুরু করেছে—মা'র কাছে যাব । মা'র কাছে যাব । রেহানা তাকে সামলাবার চেষ্টা করছেন । নিশাত শুনল মা বলছেন—কেন যে মরতে এখানে এলাম!

নিশাতের চোখ জ্বালা করছে । আজকাল তার চোখে জল আসে না । চোখ জ্বালা করে । মা একটু আগে যা বলে গেলেন সেটা কি ঠিক ? মা কি ইঙ্গিত করতে চেষ্টা করছেন না যে, সে এখন যা করছে তা করার তার কোনো অধিকার নেই । মা একটা মোটা দাগের ইঙ্গিত করেছেন । স্থূল ধরনের কথা বলেছেন ।

সবার স্বভাব এক রকম নয় । সব মেয়েরাই তাদের স্বামীকে নিয়ে আহ্বাদ করে না । কেউ কেউ গম্ভীর স্বভাবের থাকে । সহজে উচ্ছ্বসিত হয় না । তাছাড়া কবিরের মধ্যে কি সত্যি সত্যি উচ্ছ্বসিত হবার মতো কিছু ছিল ?

সে ভালো ছেলে এতে সন্দেহ নেই । আমুদে ছেলে । হৈচৈ করত । প্রচুর মিথ্যে কথা বলত । টিভি'র প্রতিটি বাংলা সিনেমা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখত এবং শেষ হওয়ামাত্র বলত—শালা, সময়টাই মাটি । আগে জানলে কে বসে থাকত ? কবির এমন একটি ছেলে যে পৃথিবীর যে-কোনো মেয়েকে বিয়ে করেই সুখী হতো । এই সব ছেলেদের সুখী হবার ক্ষমতা অসাধারণ । এরা হয় সুখী স্বামী, সুখী বাবা এবং বুড়ো বয়সে একজন সুখী দাদা । সূক্ষ্ম রুচির মানুষ এত সহজে সুখী হয় না । সংসারে সুখী হবার মতো উপকরণ ছড়ানো নেই ।

বাবু খুব কাঁদছে । নিশাত দরজা খুলে বের হলো । হাজাক লাইটটি বারান্দায় এনে রাখা হয়েছে । জামিল বাবুকে কোলে নিয়ে বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটছে ।

জামিল ভাই, ওকে আমার কাছে দিন ।

জামিল ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করল । বাবুর ঘুমিয়ে পড়ার একটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে । মায়ের কথা শুনে জেগে উঠতে পারে । নিশাত অপেক্ষা করতে লাগল ।

আচ্ছা, কবির বেঁচে থাকলে কি এরকম করত ? ঘুমিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াত ? এটি কখনো জানা হবে না । কিন্তু সবাই বলবে—বেঁচে থাকলে কত আদর করেই না ছেলে মানুষ করত । মৃত মানুষদের স্পর্শে সব সময় ভালো ভালো কথা ভাবতে হয় । মৃত মানুষেরা অনেক সুবিধা ভোগ করেন । সবার বয়স বাড়ে কিন্তু মৃত মানুষদের বয়স কখনো বাড়ে না । নিশাত একসময় বুড়ো হয়ে যাবে । কিন্তু কবিরের বয়স সাতাশ বছরেই থেমে থাকবে । তার কোনোদিন চুলে পাক ধরবে না । চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হবে না । কোনো মানে হয় না ।

নিশাত, বাবু ঘুমিয়ে পড়ছে। কোথায় রাখবে ?

মা'র কাছে দিয়ে আসুন।

জামিল হাঁটছে কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। হাঁটার ভঙ্গিটাও কেমন চেনা চেনা। কবির কি এমন করেই হাঁটত ? এখন তার অনেক কিছুই মনে পড়ে না। স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে। একদিন হয়তো কিছুই মনে থাকবে না।

নিশাত, ওকে গুইয়ে দিয়ে এসেছি।

থ্যাংকস।

তোমার জ্বর কেমন ?

আমার জ্বরের খবর মনে হচ্ছে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জামিল তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। মৃদুস্বরে বলল, বেড়াতে এসে অসুখে পড়াটা খুব খারাপ।

আমি বেড়াতে-টেড়াতে আসিনি। সবাই এসেছে, বাধ্য হয়ে আমিও এসেছি।

জামিল হালকা স্বরে বলল, অবস্থা এরকম হবে জানলে আমি তোমাদের সঙ্গে জুটতাম না।

জুটেছেন কেন, আপনাকে তো কেউ সাধাসাধি করেনি। নাকি করেছে ?

না, করেনি। আমি নিজে থেকেই এসেছি।

কেন এসেছেন ?

নিশাত, তোমার শরীর ভালো না। যাও তুমি গুয়ে থাক।

না, আপনি আমাকে বলুন আপনি কেন এসেছেন ? ইউ গট টু টেল মি দ্যাট!

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। সে লক্ষ করল—নিশাত অল্প অল্প কাঁপছে।

জামিল ভাই, আমি আপনাকে আগেও পছন্দ করিনি, এখনো করি না। আমার মনে হয় আপনি সেটা জানেন না।

নিশাত, যাও ঘুমাতে যাও।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে উঠে এলেন—এই নিশাত কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি বাবা।

জামিলকে কী বলছিলি ?

কিছু বলছিলাম না।

নিশাত ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, জামিল, ও চোঁচামেচি করছিল কেন ?

জানি না চাচা। আপনি এখনো বারান্দায় বসে আছেন কেন ? ঠান্ডা লাগবে তো।

ঠান্ডা অলরেডি লেগে গেছে। কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকতে ভালোই লাগছে। জামিল, তুমি একটা কাজ করো তো, দেখ, আলিমকে কোথাও পাও কি না। আর

শোন, এই হাজাকটা এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করো। আলো চোখে লাগছে।
তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো ?

হয়েছে।

সাক্ষির কোথায় ? ওকে এখানে আসার পর একবারও দেখিনি।

উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

আলিম ওসমান সাহেবের সামনে তাঁর প্রিয় গ্লাসটি রাখল। লম্বা গ্লাস। জার্মান
ক্রিস্টালের অপূর্ব গ্লাস। এই গ্লাস ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি তৃপ্তি পান না। ওসমান
সাহেব স্পষ্ট একটা সুখের নিঃশ্বাস ফেললেন। আলিম মনে করে এনেছে। আলিম
দ্বিতীয়বারে একটা বড় বাটিতে একগাদা বরফ নিয়ে এল।

আরে তুই বরফ পেলি কোথায় ?

আসার সময় নেত্রকোণা থেকে বিশ সের বরফ কিনলাম।

বলিস কী! গলে নাই ?

কাঠের গুঁড়া দিছি চাইর দিকে। তবু গলছে। এখন আছে অল্প।

আলিম খুব সাবধানে হোয়াইট হর্সের বোতল খুলে হুইস্কি ঢালল। ওসমান
সাহেবের পেগ সাধারণ পেগের চেয়ে একটু বড়। আলিম মাপটা জানে। তবু
অন্ধকারে কিছু বেশি পড়ল। অন্য সময় হলে ধমকে দিতেন। আজ কিছুই বললেন
না। বরফের ব্যাপারটা তাকে অভিভূত করেছে।

তোর দাঁতের ব্যথার কী অবস্থা ?

ব্যথা আছে।

রেহানার কাছ থেকে নিয়ে তিনটা অ্যাসপিরিন খা, ব্যথা কমে যাবে।

আলিম কথা বলল না। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন, তোর এখানে
থাকার দরকার নেই। যা শুয়ে পড়।

স্যার, আপনি ঘরে বসেন, বাইরে ঠান্ডা।

বাইরেই ভালো। শোন আলিম, দুটো পানির সোতল আর কিছু বরফ দিয়ে
যাস।

আচ্ছা।

আলিম চলে যেতেই বিদ্যুতের মতো ওসমান সাহেব দিল্লুর ধাঁধার রহস্য ভেদ
করলেন। অত্যন্ত সহজ উত্তর। বরফ। দশ সের পানিকে প্রথমে জমিয়ে বরফ করতে
হবে। তারপর সেই বরফের টুকরোটি হাতে করে যেখানে যাওয়ার সেখানে যেতে
হবে।

ওসমান সাহেব গভীর আনন্দ বোধ করলেন। নীলগঞ্জ ডাকবাংলোটি তার কাছে হঠাৎ করে বড় প্রিয় হয়ে গেল। যেন তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়াটি এই ডাকবাংলোয় পেয়ে গেলেন। যেন তার আর কিছু পাওয়ার নেই। জীবনের সমস্ত সাধ পূর্ণ হয়েছে।

বাবা!

দিলু একটি কন্ঠল গায়ে জড়িয়ে উঠে এসেছে, শীতে কাঁপছে অল্প অল্প।

কী-রে দিলু?

তুমি এখানে বসে কী করছ?

কিছু করছি না। বসে আছি।

আমার ঘুম আসে না বাবা। তোমার সঙ্গে একটু বসি?

বোস।

হুইষ্টি খাচ্ছ, না? মা জানলে খুব রাগ করবে।

ওসমান সাহেব একটি হাত মেয়ের পিঠের উপর রাখলেন। দিলু হালকা স্বরে বলল, বাবা, চা চামুচ দিয়ে এক চামুচ খেয়ে দেখি? আমার খুব খেতে ইচ্ছে করে।

ওসমান সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন—যা একটা চামুচ নিয়ে আয়। বলতে পারলেন না।

দিলু বলল, তোমার শীত করছে না?

করছে। তোর মা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

হ্যাঁ। সবাই ঘুমুচ্ছে। শুধু আমরা দুজন জেগে আছি।

জায়গাটা কেমন লাগছে?

ভালো।

পুকুরটা দেখেছিস?

হুঁ।

বিরাট পুকুর, তাই না?

হুঁ। এরকম একটা বাড়ি আমাদের থাকলে খুব ভালো হতো—তাই না বাবা? পেছনে বিরাট একটা পুকুর থাকবে। সামনে থাকবে প্রকাণ্ড সব রেন্টি গাছ।

এগুলো রেন্টি গাছ নাকি?

হুঁ।

কে বলেছে?

জামিল ভাই বলেছেন।

দিলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর খুব হালকা গলায় বলল, আপা আমার সঙ্গে আজ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।

আমরা সবাই কখনো না কখনো খারাপ ব্যবহার করি।

কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি তো কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি না। করি ? তুমি বলো ?

ঘুমুতে যা দিলু।

দিলু উঠে গেল। ওসমান সাহেবের হঠাৎ মনে পড়ল, আরে তাই তো, ধাঁধার উত্তরটা তিনি জানেন এটা দিলুকে বলা হলো না। উঠে গিয়ে ডাকবেন নাকি ? কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। গাছে জোনাকি পোকা জ্বলছে-নিভছে। শীতল উত্তরী হাওয়া। ওসমান সাহেব চতুর্থ পেগটি ঢাললেন। অনেক বেশি পড়ে গেল, অন্ধকারে অনুমান ঠিক হয় না।

দিলু ঘুমিয়েছে নিশাতের সঙ্গে। প্রকাণ্ড একটা খাট। খাটের নিচে আলো কমিয়ে হারিকেনটা রাখা। ঘরময় আবছা অন্ধকার। পায়ের দিকের জানালার একটা কাঁচ ভাঙা। সেই ভাঙা গলে শীতের হাওয়া আসছে। দুটি কঞ্চল আছে গায়ে, তবু শীত মানছে না। দিলু নিশাতের দিকে আরও একটু সরে এল। নিশাত শীতল স্বরে বলল, গায়ের উপর এসে পড়ছ কেন, দিলু ? সরে শোও। এত ঘেঁসাঘেঁসি আমার ভালো লাগে না। দিলু অনেকখানি সরে গেল। পাশের ঘরে বাবু কাঁদছে। বিড়বিড় করে কী সব যেন বলছে। বোঝা যাচ্ছে না। দিলু বলল, আপা, বাবু কাঁদছে।

কাঁদছে কাঁদুক।

ওকে এখানে নিয়ে এসো না। অনেক জায়গা তো।

ভ্যানভ্যান করিস না। চুপ করে থাক।

দিলুর চোখ ভিজে উঠল। এমন বাজে করে কথা বলে কেন আপা কী করেছে সে ? কিছুই তো করেনি। শুধু বলেছে, বাবু কাঁদছে। এটা বলা কি দোষের ? দিলু কঞ্চলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ফেলল। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। বাবুর কান্নার শব্দও সেখানে যাচ্ছে না। অন্ধকার দিলুর ভালো লাগে না। অন্ধকারে তার মৃত্যুর কথা মনে হয়। দাদিজান মারা যাওয়ার সময় থেকেই তার এরকম হয়েছে। দাদিজান মারা গিয়েছিলেন রাত ন'টায়। সবাই যখন কান্নাকাটি করছে তখন হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। কী ভয়াবহ অবস্থা! সবাই কান্না থামিয়ে 'মোমবাতি মোমবাতি' বলে চেঁচামেচি শুরু করল। দিলু বসে ছিল সোফায়। হঠাৎ তার মনে হলো দাদিজান যেন উঠে আসছেন তার দিকে। কী অবস্থা! ভাগ্যিস বাবা তখন লাইটার জ্বালিয়ে দিলুর পাশে এসে বসলেন।

নিশাত মৃদুস্বরে ডাকল, দিলু, ঘুমিয়ে পড়েছিস ? দিলু জবাব দিল না। নিশাত কঞ্চলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলুকে কাছে টানল। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে

মেয়েটা। এত অভিমানী হয়েছে কেন? নিশাতের ইচ্ছা হলো দিলুকে ডেকে তুলে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে। সে আবার ডাকল, এই দিলু, এই পাগলি। দিলুর ঘুম ভাঙল না। নিশাত ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আর ঠিক তখনই জামিলের হাসির শব্দ শোনা গেল। কী আশ্চর্য, অবিকল কবিরের মতো ঘর কাঁপিয়ে হাসি। জামিল ভাই তো এরকম কখনো হাসেন না। তার সবকিছুই মাপা। এবং কোনো কিছুর সঙ্গেই কবিরের কোনো মিল নেই। তবু আজ এরকম মিল পাওয়া গেল কেন? নাকি সব মানুষের মধ্যেই অদৃশ্য কোনো মিল আছে?

রাত বাড়ছে। বাবু কাঁদছে না। চারদিকে সুনসান নীরবতা। নিশাত হাত বাড়িয়ে দিলুকে কাছে টানল। দিলু ঘুমের মধ্যেই কাঁদছে। কোনো মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে হয়তো। কতদিন হয়ে গেল নিশাত কোনো স্বপ্ন দেখে না!

৮

নিশাত খুব ভোরে জেগে উঠল।

তখনো অন্ধকার কাটেনি। পূর্বের আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। ঘন কুয়াশা চারদিকে। নিশাত দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মাথার যন্ত্রণা আর নেই। শরীর ঝরঝরে লাগছে। প্রচণ্ড ক্ষিধে। এত ভোরে নিশ্চয়ই আর কেউ জাগেনি।

নিশাত টুথব্রাশ হাতে বারান্দায় হাঁটতে লাগল। এত সুন্দর বাড়ি। রাতে ঠিক বোঝা যায়নি। নিশাত হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পেছনের দিকে চলে এল। প্রকাণ্ড পুকুরটি চোখে পড়ল তখন। কুয়াশার জন্যে পুকুরটি পুরোপুরি দেখা যায় না। মনে হয় বিশাল সমুদ্র। পানি দেখলেই ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। নিশাত এগিয়ে গেল।

এই ভোরেও পাতলা একটা উইন্ডব্রেকার পরে বাঁধানো ঘাটে সাক্ষির বসে আছে। তার পাশেই স্ট্যান্ড-ক্যামেরা বসানো। নিশাত বলল, এত ভোরে ক্যামেরায় কার ছবি তুলছেন?

কুয়াশার ছবি। আপনার জ্বর সেরে গেছে?

হ্যাঁ।

নিশাত সিঁড়ি বেয়ে শেষ পর্যন্ত নেমে গেল। হাত বাড়িয়ে পানিতে আঙুল ডুবাল। তার ধারণা ছিল পানি বরফশীতল হবে। কিন্তু তেমন ঠান্ডা নয়।

আপনি যেমন বসে আছেন ঠিক তেমনভাবে বসে থাকুন, আমি আপনার একটা ছবি তুলব।

অনুমতি প্রার্থনা নয়। যেন আদেশ। নিশাত বলল, মুখে টুথব্রাশ ঝুলতে থাকবে?

হ্যাঁ। থাকুক। আপনি হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করছেন। এটাই আমার ছবির থিম।

সাক্ষির ক্যামেরা হাতে কয়েকটা ধাপ নেমে এল। নিশাতের কি রাগ করা উচিত না? বলা উচিত—এভাবে আমি ছবি তুলি না। কিন্তু নিশাত রাগ করতে পারছে না।

কেন পারছে না সে-ও এক রহস্য। সাক্ষির বলল, আজ ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনে হচ্ছিল ছবির জন্যে একটা ভালো কম্পোজিশন পাব।

আপনি ছবি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না ?

ভাবতে পারি হয়তো কিন্তু ছবির কথা ভাবতেই ভালো লাগে।

নিশাত হাসতে হাসতে বলল, আপনার মাথার মধ্যে শুধু কম্পোজিশন ঘুরে, তাই না ? সাক্ষির তার জবাব দিল না। ক্রমাগত ছবি তুলতে লাগল। পানিতে হাত ডুবিয়ে বসে রইল নিশাত। সে একটা ব্যাপার লক্ষ করল, সাক্ষির অন্য ফটোগ্রাফারদের মতো নয়। অন্য ফটোগ্রাফাররা বলত—একটু বাঁ দিকে ফিরুন, একটু হাসুন। মাথাটা একটু উপরে তুলুন। শাড়ির আঁচল টেনে দিন। সাক্ষির কিছুই বলছে না। শুধু ছবি তুলছে! নিশাত হাসতে হাসতে বলল, এত ছবি তুলছেন একটা তো ভালো হবেই।

সবসময় হয় না। ছত্রিশটি ছবির মধ্যে যার একটি ছবি ভালো হয় সে একজন বড় ফটোগ্রাফার।

আপনি একজন বড় ফটোগ্রাফার ?

হ্যাঁ।

নিশাত লক্ষ করল সে ‘হ্যাঁ’ বলেছে খুব জোরের সঙ্গে। যেন সে মনেপ্রাণে কথাটা বিশ্বাস করে। সাক্ষির বলল, যে ছবিটি দিয়ে আমি প্রথম নাম করি তার কথা শুনতে চান ?

বলুন।

ছবির নাম ‘সরলতা’। ইনোসেন্স।

সাক্ষির সহজভাবেই নিশাতের পাশে বসল। যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ পাশাপাশি বসেছে।

আমি তখন থাকি নর্থ ডাকোটার। একবার রুজভেন্ট ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে গিয়েছি। একা একা গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। সেখানে দেখলাম ছোট্ট একটা জলা জায়গা। চারদিকে বড় বড় সব উইলি গাছ। উইলি গাছের ছায়া পড়েছে পানিতে। অপূর্ব পরিবেশ। এবং সেই অপূর্ব পরিবেশে অল্পবয়সী একটি মেয়ে লাঞ্চবক্স হাতে নিয়ে বসে আছে। ওর বক্সটি বোধহয় কাছেই কোথাও গেছে। আমি মেয়েটিকে বললাম—তোমার কয়েকটি ছবি তুলতে চাই। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আমি বললাম—তুমি কি ঘুমিয়ে পড়বার মতো একটা ভঙ্গি করতে পার ? সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। অসংখ্য ছবি তুললাম, কিন্তু মনে হলো কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ছবিটি অসম্পূর্ণ। ঠিক তখনই একটা বুনো প্রজাপতি এসে বসল লাঞ্চবক্সে, তৈরি হয়ে গেল ছবি। বিখ্যাত ছবি।

বুনো প্রজাপতি আবার কী ? সব প্রজাপতিই তো বুনো । পোষা প্রজাপতি আবার আছে নাকি ?

ঐ প্রজাপতিটির পাখায় কোনো রঙ ছিল না । কালো কালো দাগ । কাজেই বুনো প্রজাপতি বলছি । আপনি কি ঐ ছবিটি দেখতে চান ?

আছে আপনার কাছে ?

হ্যাঁ । বসুন আপনি, আমি নিয়ে আসছি ।

সাক্ষির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ।

সাক্ষিরকে নিশাত কি আগে ভালো করে লক্ষ করেনি নাকি ? বেশ লাগছে একে । মনে হচ্ছে এর মধ্যে ভান নেই । শুধু কথাবার্তা নয়, চোখের দৃষ্টিও বেশ স্বচ্ছ । মেয়েদের মতো বড় বড় চোখ । না, কথাটা ঠিক হলো না । সব মেয়ের চোখ বড় বড় নয় । বরং বলা উচিত মেয়েলি চোখ । পুরুষ মানুষকে এত বড় বড় চোখে মানায় না । না, এটাও ঠিক হলো না । সাক্ষির সাহেবকে তো ভালোই মানিয়েছে । নিশাত বেশ আগ্রহ নিয়ে ছবির বইটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল । যেন এই আগ্রহ থাকাটা ঠিক নয় । এটা অন্যায় ।

এত চমৎকার একটা ফটোগ্রাফির বই নিয়ে সাক্ষির ফিরবে নিশাত আশা করেনি । সে দু'বার বলল, এ বইয়ের সব ছবি আপনার তোলা ?

হ্যাঁ । ব্যাক কভারে ফটোগ্রাফারের ছবি আছে । দেখুন না ।

আপনি তো বিখ্যাত ব্যক্তি ।

হ্যাঁ । আমি মোটামুটি বিখ্যাত । ঐ দেশে অনেকেই আমাকে চেনে ।

নিশাত পাতা উল্টাতে লাগল । অপূর্ব সব ছবি । মন খারাপ করিয়ে দেওয়ার মতো ছবি ।

তিপ্পান পৃষ্ঠায় ঐ ছবিটি আছে । দেখুন । ঐ ছবিটি দিয়ে আমি ফটোগ্রাফির জগতে প্রথম এন্ট্রি পাই ।

নিশাত তিপ্পান পৃষ্ঠা খুলে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না ।

ছবিটা ভালো লেগেছে ?

হ্যাঁ । কিন্তু মেয়েটির গায়ে কোনো কাপড় ছিল না— এই কথা আপনি আগে বলেননি । ও কি এইভাবে বনে বসে ছিল ?

হ্যাঁ ।

এবং আপনি ছবি তুলতে চাইতেই রাজি হয়ে গেল ? কোনো আপত্তি করল না ? না, কোনো আপত্তি করেনি ।

ঐ মেয়েটির কী নাম ?

নাম জানি না। ছবির জন্যে মেয়েটির নামের কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মেয়েটির নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সাক্ষির হেসে উঠল। রোদ উঠে গেছে। কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে। কেমন চমৎকার লাগছে চারদিক। নিশাত নরম গলায় বলল, এই বইটি আমার কাছে থাকুক ?

থাকুক।

নিশাত উঠে দাঁড়াল। নিচুস্বরে বলল, যাই।

সাক্ষির বলল, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন।

দয়া করে রাগ করবেন না বা মন খারাপ করবেন না।

এমন কী কথা যে আমি রাগ করব ?

সাক্ষির অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলল, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। শুধু ভালো লেগেছে বললে কম বলা হয়। আমার আরও কিছু বলা উচিত। কিন্তু শুছিয়ে কিছু বলতে পারি না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমার ভালো লাগার ব্যাপারটা আপনার মা'কে বলতে পারি।

নিশাত ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু কিছু বলল না। ঘাটের ধাপ ভেঙে উপরে উঠে এল।

আপা, তুমি এখানে—আর আমি সারা বাড়ি খুঁজছি।

কেন ?

দিলু হাত নেড়ে নেড়ে বলল, আমরা সবাই মিলে শিকারে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছিস ?

শিকারে। বালিহাঁস মারব আমরা। এসো, তাড়াতাড়ি নাশতা খেয়ে নাও। রোদ বেশি কড়া হলে হাঁস পাব না।

বাবু কোথায় রে ?

জনি না কোথায়। তোমার জ্বর নেই তো ?

নাহ্।

তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন আপা ?

সুন্দর—সেই জন্যে সুন্দর লাগছে।

নিশাত হাসল। আজকের দিনটি চমৎকারভাবে শুরু হয়েছে।

কুয়াশা নেই। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আকাশ চৈত্রের আকাশের মতো ঘন নীল। আহ, চমৎকার একটি দিন!

শিকারে যাওয়ার প্রোগ্রাম হঠাৎ করেই হয়েছে। নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেব সকালবেলা একটি দোনলা বন্দুক আর একগাদা ছব্বা গুলি নিয়ে উপস্থিত—স্যার, শিকারে যাবেন নাকি? বড় গাঙের চরে বালিহাঁস পড়েছে। কায়দামতো একটা গুলি করতে পারলে বিশ-পঁচিশটা পাখি পড়বে।

বলেন কী?

স্যার, একটা স্পিডবোটের ব্যবস্থা করেছি।

ওসমান সাহেব বছরদিন পর উৎসাহিত বোধ করেন। শিকার করা অনেক দিন হয় না। শেষ শিকারে গিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ বছর আগে।

ওসি সাহেব, তাহলে তো তাড়াতাড়ি রওনা হতে হয়।

জি স্যার।

চা-টা খেয়েই রওনা দেব, কী বলেন ওসি সাহেব?

ঠিক আছে স্যার।

ওসমান সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন পর রক্তে যৌবনের উত্তেজনা অনুভব করেন। থানার ওসির মতো একজন অধস্তন অফিসারকেও হঠাৎ করে বন্ধুস্থানীয় মনে হয়।

ওসি সাহেব।

জি স্যার।

দিনটাও আজ শিকারের জন্যে ভালো। কুয়াশা নেই, কিছু নেই।

না স্যার, কুয়াশা থাকলেই ভালো। পরিষ্কার দিন শিকারের জন্যে না। একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার স্যার।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল সবাই যাবে। পাখি শিকার হোক না হোক নৌকাভ্রমণ হবে। কিন্তু সাক্ষির যেতে রাজি হলো না। তার নাকি শিকারে তেমন উৎসাহ নেই। রেহানাও থেকে গেলেন। কারণ বাবুর গা গরম হয়েছে। সকালে একবার বমি করেছে। রেহানা ধরেই নিয়েছিলেন নিশাত বাবুকে রেখে যাবে না। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, নিশাত দিলুর মতোই উৎসাহ নিয়ে সাজ করেছে। অনেকদিন পর তার চোখ ঝলমল করেছে।

স্পিডবোটটি আহামরি কিছু নয়। দেশী নৌকায় বারো হর্স পাওয়ারের একটা মেশিন বসানো, বসবার জায়গা নেই। চারদিক ভেজা। এটা বোধহয় মাছ আনা-নেওয়া করে। মাছের বোটকা গন্ধ। তবু দিলুর ভীষণ ভালো লাগছে। সে বসেছে জামিলের পাশে। বেগি দুলিয়ে দুলিয়ে ক্রমাগত গল্প করছে। ওসমান সাহেব হাসি মুখে বললেন, মেয়েটা তো বড্ড বকবক করতে পারে। সবাই হেসে উঠল। দিলু মোটেও

অপ্রস্তুত হলো না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার এক বান্ধবীর গল্প করতে শুরু করল। তার নাম লীনা, কিন্তু সবাই তাকে ডাকে বক লীনা। কারণ সে বকের মতো মাথা নিচু করে হাঁটে। দিলু মাথা নিচু করে ব্যাপারটা দেখাল। ওসমান সাহেব বললেন, আয় মা, তুই আমার পাশে বসে গল্প কর। কিন্তু দিলু নড়ল না। সে জামিলের পাশেই বসে রইল।

বড় গাঙের চর পর্যন্ত স্পিডবোট নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। পানি কম। তাছাড়া ভট ভট শব্দ হচ্ছে। শব্দে পাখি উড়ে যাবে। ওসি সাহেব বললেন, এখান থেকে যেতে হবে পায়ে হেঁটে। অসুবিধা হবে না তো স্যার ?

না, অসুবিধা কী ?

খানিকটা পানি ভেঙে যেতে হবে।

বেশি পানি ?

জি-না স্যার। খুব বেশি হলে হাঁটুপানি। জুতো খুলে ফেলেন।

ওসমান সাহেব জুতা খুলে ফেললেন। দিলুও জুতা খুলল। ওসি সাহেব অবাক হয়ে বললেন, তুমিও যাবে নাকি খুকি ?

জি।

কষ্ট হবে। একটু পরেই রোদ উঠবে কড়া।

উঠুক।

ওসমান সাহেব বললেন, শখ করে এসেছে, চলুক। নিশাত, তুই যাবি নাকি ?

আমি হাঁটু পানি ভেঙে যাব ? পাগল হয়েছ বাবা ?

দিলু বলল, চলো না আপা। আমি তো যাচ্ছি। তোমার ভালোই লাগবে।

এখানে বসে থাকতেই আমার ভালো লাগছে।

ওসমান সাহেব বললেন, একা একা বসে থাকবি, খারাপ লাগবে না ?

একা একা থাকব না। জামিল ভাই থাকবেন। কি জামিল ভাই আমাকে একা ফেলে নিশ্চয়ই আপনি পাখি শিকারে যাবেন না ? নাকি আপনিও যেতে চান ?

না, আমি আছি।

রোদের তাপ বাড়ছে। মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে মাঠ থেকে। এ অঞ্চল বেশ নির্জন। মাঝে মাঝে দু-একটা মাছ ধরার নৌকা শুধু মনে পড়ে। নৌকায় বসে থাকা লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু খুব-একটা অবাক হচ্ছে না। স্পিড বোট নিয়ে শহরের লোকজন হয়তো প্রায়ই এদিকে শিকারে আসে।

নিশাত হাত বাড়িয়ে হাসি মুখে বলল, জামিল ভাই, এই কি সেই বিখ্যাত কাশফুল ?

হঁ। তবে এখনো ফুল ফোটেনি। সময় হয়নি।

কই, তেমন কিছু তো লাগছে না।

বাতাসে যখন ঢেউয়ের মতো উঠানামা করে তখন ভালো লাগে। তুমি কি বোটেই বসে থাকবে, না নামবে?

চলুন নামি। হিল পরে হাঁটা যাবে তো?

হিল পরে এসেছ?

হ্যাঁ, দেখছেন না কত লম্বা লাগছে আমাকে।

জামিল ঠিক বুঝতে পারছে না। নিশাতকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে। সাজগোজের মধ্যেও যথেষ্ট যত্নের ছাপ। ঠোঁটে কড়া করে নিপস্টিক দিয়েছে।

নিশাত বলল, গ্রাম-নদী এইসব কিন্তু আমার কাছে তেমন এক্সাইটিং মনে হয় না।

একেকজনের দেখার ক্ষমতা একেক রকম। সাক্ষির সাহেব যা দেখে মুগ্ধ হবেন তুমি হয়তো তা দেখে মুগ্ধ হবে না। তাছাড়া...

সাক্ষির ভাইকে আপনার কেমন লাগে?

চমৎকার। ভদ্রলোক অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে দারুণ ইমপ্রেশন করেছেন। এই একটি লোক দেখলাম যার মধ্যে ভান নেই।

নিশাত ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এত তাড়াতাড়ি একটা ডিসিশনে আসা ঠিক না। আপনি মানুষ সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে চলে আসেন।

নিশাত খুব সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগল। জামিল বলল, জুতো পরে তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। জুতো খুলে ফেল।

খালি পায়ে হাঁটব?

হ্যাঁ। খারাপ লাগবে না। শুকনো পথঘাট।

নিশাত হিল খুলে ফেলল, খালি পায়ে হাঁটতে তার ভালোই লাগল। খুশি খুশি গলায় বলল, ফ্লাক্সটা নিয়ে এলে ভালো হতো। কোথাও বসে চা খাওয়া যেত।

শাড়ি পরা আট-ন' বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে কোথেকে হঠাৎ এসে উদয় হয়েছে। চোখ বড় বড় করে দেখছে। নিশাত বলল, এ্যাঁই, তোমার নাম কী? মেয়েটি জবাব দিল না।

বাড়ি কোথায় তোমার?

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে যদিকে দেখাল সেদিকে কোনো ঘরবাড়ি নেই।

জামিল ভাই, মেয়েটি কি হারিয়ে গেছে নাকি?

না, ওরা হারাবে না। গ্রামের মেয়ে, সমস্ত অঞ্চল এদের খুব ভালো করে চেনা। নিশাত, কোনদিকে যেতে চাও?

চলুন, ঐ গাছটার নিচে বসি। কী গাছ ওটা? বিরাট বড় তো।

শিমুল গাছ।

শিমুল গাছে এত বড় বড় কাঁটা থাকে নাকি ?

থাকে ।

জামিল সিগারেট ধরাল । নিশাত হ্যান্ডব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে চোখে দিল । হালকা স্বরে বলল, একটা হাসির গল্প বলুন তো । দিলুকে রোজ কী-সব গল্প বলেন । দেখি এবার আমি একটা শুনি ।

দিলুকে হাসির গল্প বলি না । দিলুকে বলি ভূতের গল্প । ভূতের গল্প শুনতে চাইলে বলতে পারি ।

নিশাত খিলখিল করে হেসে ফেলল । তার হাসি দেখে ছোট্ট মেয়েটাও হাসতে শুরু করল । জামিল নিজেও হাসল ।

না জামিল ভাই, বলুন একটা হাসির গল্প । দেখি আপনি আমাকে হাসাতে পারেন কিনা ।

হাসাতে পারলে কী দেবে ?

আপনি আগে বলুন, তারপর দেখা যাবে ।

টেলিফোনের খুঁটি বসানো হচ্ছে । সারা দিন ধরে কাজ চলছে । সন্ধ্যাবেলা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কাজ দেখতে এলেন । জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা ক'টা খুঁটি পুঁতলে ? ওরা বলল, স্যার বারোটা । ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, মন্দ না, বারোটা খারাপ না । তারপর গেলেন অন্য একটা দলের কাছে—তোমরা ক'টা পুঁতলে ? ওরা বলল, স্যার একটা । ইঞ্জিনিয়ার রেগে আগুন—এত কম! ঐ দল তো বারোটা পুঁতলো । দলের সর্দার বলল, আমাদের কাজ আর ওদের কাজ ? ওদের খুঁটির সবটাই মাটির উপর, আর আমাদেরটা দেখুন । মাটির উপর আছে চার আঙুল । সবটাই ঢুকিয়ে দিয়েছি ।

নিশাত গল্প শুনে হাসল না । গম্ভীর হয়ে বলল, এই গল্পটা জামিল ভাই আপনি আমাকে ইচ্ছে করে বললেন ।

ইচ্ছে করে বলব কেন ?

গল্পটা বাবুর আকার ।

হ্যাঁ, আমি কবিরের কাছ থেকে শুনেছি । এটা একটা চমৎকার গল্প, তাই তোমাকে বললাম । অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না । সব কিছুতেই তুমি এত উদ্দেশ্য খোঁজ কেন ?

নিশাত উঠে দাঁড়াল—চলুন, বোটে ফিরে যাই ।

ফেরার পথে কেউ কোনো কথা বলল না । ছোট মেয়েটি আবার পেছনে পেছনে আসছে । খুব কৌতূহল মেয়েটির । ছোট্ট শাড়িটা পরেছেও খুব গুছিয়ে । শাড়ির রঙ গাঢ় সবুজ । তার মধ্যে লাল পাড় । জামিল বলল, নিশাত, তুমি কি লক্ষ করেছ বেশির ভাগ গ্রামের মেয়ের শাড়ির রঙ সবুজ ?

না, আমি লক্ষ করিনি। গ্রামই দেখিনি। গ্রামের মেয়ে দেখব কোথায় ?

গ্রামের মেয়েরা যে সবুজ শাড়ি পরে এটাও কিন্তু প্রথম নোটস করে কবির। তার ধারণা, এরা সবুজ দেখতে দেখতে সবুজ রঙের প্রতি একটা উইকনেস জন্মিয়ে ফেলে। আমার ধারণা কিন্তু তা নয়।

আপনার কী ধারণা ?

আমার ধারণা, সবুজ রঙের কাপড় ময়লা হয় কম, সে-জন্যেই এরা সবুজ কাপড় পরে।

আপনার ধারণাটাই প্রাকটিক্যাল। কিন্তু হঠাৎ করে আপনি রঙের প্রসঙ্গ আনলেন কেন ?

জামিল কিছু বলল না। স্পিডবোটে উঠে বসল। স্পিডবোটের ড্রাইভার রোদের মধ্যে পা মেলে দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। নিশাত ফ্লাক্স খুলল—চা দেব জামিল ভাই ?

দাও।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু ? কেক আছে। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে।

নিশাত এক পিস কেক বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল। সে নিল না। পিছিয়ে গেল অনেকখানি। জামিল বলল, এ ভিথিরি নয়, কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়া এর অভ্যেস নেই।

আপনি চট করে সবকিছু বুঝে যান কীভাবে ?

জামিল হাসল। ঠিক তখনই পর পর দুটি গুলির শব্দ হলো। ওরা পাখি পেয়েছে কিনা কে জানে। স্পিডবোটের ড্রাইভার চোখ কচলে উঠে বসল। শিকারিরা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। নিশাত অবাক হয়ে দেখল তার মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, এত পাখি! তারা ডাকছে কর্কশ গলায়। শুনতে ভালো লাগে না।

ওরা কোথায় যাবে ?

নিরাপদ কোনো জায়গায় যাবে। তারপর সেখানেও শিকারিরা যাবে। সেখান থেকেও এদের উড়ে যেতে হবে।

নিশাত তাকিয়ে রইল। জামিল বলল, সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পাখির জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে গিয়ে। মানুষের জন্যেও এটা সত্যি। আমরাও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি।

মাস্টারি করতে করতে বক্তৃতা দেওয়া আপনার অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই না ?

হ্যাঁ।

এবং আপনি মনে করেন, জগতসংসারের সমস্ত রহস্য আপনি বুঝে ফেলেছেন ? না, তা বুঝিনি। তবে বুঝতে চেষ্টা করি। তোমার মতো চোখ বন্ধ করে থাকি না।

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। নিজেই হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে বড়সড় একটা বক্তৃতা দেবে, কিন্তু জামিল তেমন কিছুই করল না। সিগারেট টানতে টানতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। স্পিডবোটের ড্রাইভার নেমে গিয়ে ছোট মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এতক্ষণ যে মেয়ে একটি কথাও বলেনি, তার মুখে এখন খই ফুটছে।

তোর নাম কী ?

ফুলি।

তোর বাপের নাম কী ?

কসির শেখ।

কোন গ্রাম ?

আতরা, মিয়াবাড়ি।

ভাই-ভাইন কয়জন ?

ছয়জন।

নিশাত খুব মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে। এই মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল কেন ?

জামিল ভাই।

বলো।

এই মেয়েটি এতক্ষণ কোনো কথাবার্তা বলেনি, কিন্তু দেখুন ঐ লোকটির সঙ্গে কেমন জমিয়ে গল্প করছে।

জামিল কোনো উত্তর দিল না।

জামিল ভাই, আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন ?

না, রাগ করিনি। রাগ করতে হলে একটা অধিকার থাকতে হয়। আপনার উপর আমার সেরকম কোনো অধিকার নেই।

দিলুর উপর আছে ?

হ্যাঁ, আছে। ওর সঙ্গে আমি কিন্তু প্রায়ই রাগ করি।

আপনারা কী নিয়ে এত কথা বলেন ?

যা মনে আসে তাই বলি। ওর সঙ্গে তো আমি হিসাব করে কথা বলতে হয় না।

নিশাত গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, আমার কিন্তু মনে হয় ওর সঙ্গেই আপনার সবচেয়ে সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।

কেন ?

এই বয়সে মন অন্যরকম থাকে। আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাচ্ছি ?

পারছি।

আপনি কি এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান ?

চাই। নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করা ঠিক নয়।

তার মানে ?

দিলুর মতো যখন তোমার বয়স ছিল তখন তুমি আমার প্রতি অন্যরকম ধারণা পোষণ করতে।

এসব আপনি কী বলছেন ?

স্কুল ছুটির পর ক'দিন এসেছ আমাদের বাড়িতে মনে আছে ?

কেন আপনি এখন এসব পুরনো কথা তুলছেন ?

জমিল চুপ করে গেল।

দেখা গেল শিকারিরা ফিরে আসছে। ওসি সাহেবের হাতে কয়েকটা হাঁস। ওদের জবাই করা গলা দিয়ে তখনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। দিলু ওসমান সাহেবের শরীরে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে। জামিল বলল, কী হয়েছে দিলু ?
পায়ে কাঁটা ফুটেছে।

শিকার কেমন লাগল ?

ভালো না।

ওসমান সাহেব উল্লাস বোধ করছিলেন। তার চোখে-মুখে ক্লাস্তির কোনো চিহ্নই নেই। ওসি সাহেব বললেন, স্যার, কাল আবার যাব নাকি ?

চলেন যাই। নতুন কোনো স্পটে চলেন।

স্যার, যেতে হবে কিন্তু আরও সকালে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি শেষ রাতে উঠতে পারেন।

উঠব। শেষ রাতেই উঠব। নো প্রবলেম।

ওসমান সাহেব নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন বোধ করেন।

ওসি সাহেব, রাতে খান আমাদের সঙ্গে।

জি-না স্যার। জি-না।

দিলু বসে নিশাতের পাশে। গাছের গুঁড়িতে বসে থাকা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে— এই, নাম কী তোমার ?

ফুলি।

বাহ্ কী সুন্দর নাম ! ফুল থেকে ফুলি।

ছোট্ট মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল। দিলু বলল, সাক্ষির ভাই থাকলে এই মেয়েটির ছবি তুলতে বলতাম। কী সুন্দর মেয়ে, দেখেছ আপা ? নিশাত জবাব দিল না। দিলু বলল, গ্রামের মেয়েরা কী সুন্দর হয়! বড় মায়া লাগে।

ওসমান সাহেব হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছেন। তাঁর ভাগ্য ভালো বরফের জোগাড় হয়েছে। ওসি সাহেব জিপ পাঠিয়ে রবফ আনিয়েছেন। শুধু বরফ নয়, তিনি এক কেস বিয়ার এনেছেন। ওসমান সাহেব বিয়ার খান না। তবু খুশি হলেন। প্রথম দিনে এই ওসির উপর এতটা বিরক্ত হওয়া ঠিক হয়নি।

ওসমান সাহেব সত্যিকার অর্থেই ছুটির আনন্দ ভোগ করলেন। আলিম এসে পেঁয়াজ, মরিচ ও ভিনিগার মাখানো এক প্লেট চিনাবাদাম রেখে গেছে। হুইস্কির সঙ্গে এই প্রিপারেশনটি অপূর্ব।

গ্রাসে চুমুক দিয়ে তাঁর মনে হলো বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। গভীর আনন্দে তাঁর শরীর কাঁপছে। হুইস্কি নিয়ে তো প্রায়ই বসেন, এরকম কখনো হয় না। আজ হচ্ছে কেন? হচ্ছে হচ্ছে হেসে হেসে সবার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে। চাঁদ উঠেছে কিনা কে জানে। যদি চাঁদ উঠে তাহলে ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে একটু হেঁটে আসলে হয়তো ভালো লাগবে।

বারান্দার কাছে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। অপরিচিত কেউ। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবু তিনি পরিষ্কার বুঝলেন লোকটির গায়ে ইউনিফর্ম।

খট শব্দে স্যানুট হলো—স্যার, আমি। ওসি সাহেব পাঠিয়েছেন।

কী ব্যাপার?

কিছু না স্যার। পাহারার জন্যে। ফিল্ড সেন্সি।

পাহারা লাগবে না, তুমি চলে যাও।

সে ইতস্তত করতে লাগল। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন, যাও যাও, পাহারার কোনো দরকার নেই। আমি কি মিনিষ্টার?

এই বলেই তিনি প্রচুর হাসতে লাগলেন। খালি পেটে দু'পেগ পড়ার জন্যেই বোধহয় তাঁর কিঞ্চিৎ নেশা হয়েছে।

আলিমের দাঁতের ব্যথা কমে। আজ সারা দিনে আরও বেড়েছে। ডান দিকের গাল ফুলে গেছে অনেকখানি।

আলিম, গোটা চারেক প্যারাসিটামল খাও।

স্যার খাইছি।

লবণ-পানি দিয়ে কুলকুচি করো।

করেছি স্যার।

গরম সেক দাও। সেকটা খুব উপকারী।

স্যার, আর কিছু লাগবে?

না, লাগবে না। খানা তৈরি হতে দেরি হবে নাকি?

জি স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে ।

আজ রাতে রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে সাক্ষির । ওয়াইল্ড ডাক রোস্টের সে নাকি একটি চমৎকার প্রিপারেশন জানে । দুপুরবেলাতেই সে বালিহাঁসগুলির চামড়া তুলে টক দৈ-এ ডুবিয়ে রেখেছে । টক দৈ-এ আট ঘণ্টা ডুবানো থাকতে হবে, এক মিনিটও এদিক-ওদিক হতে পারবে না ।

আট ঘণ্টা পার হয়েছে রাত আটটায় । এখন হাঁসগুলোকে স্টিম করা হচ্ছে । কেটলিতে পানি ফুটানো হচ্ছে । কেটলির নল দিয়ে যে বাষ্প বেরিয়ে আসছে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে স্টিম করবার জন্যে । কায়দাটা ভালোই । দিলু সমস্ত ব্যাপারটা দেখছে মুগ্ধ হয়ে । সে রান্নাঘরে একটা চেয়ার নিয়ে চেয়ারের উপর পা তুলে আরাম করে বসে আছে । এবং সারাক্ষণই কথা বলছে ।

সাক্ষির ভাই, স্টিম দিচ্ছেন কেন ?

স্টিম দেওয়ার জন্যে মাংস নরম হবে ।

টক দৈ-এ ডুবিয়ে রাখলেন কেন ?

রেসিপিতে বলা হয়েছে তাই । টক দৈ না পেলে ভিনিগারেও ডুবিয়ে রাখা যেত । টক দৈ ভিনিগারের চেয়ে ভালো ।

এরপর কী করবেন ?

পেটের ভেতর রসুন ভরে আগুনে ঝলসাব । ব্যস ।

এই রান্না কার কাছ থেকে শিখলেন ?

আমার এক মেক্সিকান বান্ধবী ছিল— ও রাঁধত । ও অনেক রকম রান্না জানত ।

দিলু একটু লজ্জা পেল । কেউ এভাবে বান্ধবীর কথা বলে নাকি ? কিন্তু সাক্ষির ভাই এমন সহজভাবে বলছেন যেন বান্ধবী থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই ।

উনার নাম কী সাক্ষির ভাই ?

ওর নাম মারিয়া ।

মারিয়া ? কী বিশ্রী নাম ।

বিশ্রী কোথায় ? মেরী থেকে মারিয়া ।

উনি দেখতে কেমন ?

আমার কাছে তো ভালোই লাগত । খুব লম্বা, বড় বড় কালো চোখ । খুব শব্দ করে হাসত ।

উনার ছবি আছে ?

আছে । দেখতে চাও ?

হঁ ।

আচ্ছা দেখাব ।

সাক্ষির ভাই, আমার কয়েকটা সুন্দর ছবি তুলে দেবেন তো ?

দেব ।

কবে দেবেন ?

যখন চাও । কাল ভোরেই দিতে পারি । এক কাজ করো—তোমার লাল শাড়ি আছে ?

না, লাল স্কার্ট আছে ।

ঠিক আছে, ঐ লাল স্কার্ট পরে পুকুরে সাঁতার দেবে । আমি ছবি তুলব । সবুজ পানির ব্যাকথাউন্ডে লাল স্কার্ট চমৎকার আসবে । তবে আমার ফিল্ম হাই স্পিড এ.এস.এ. ফাইভ হানড্রেড । আরেকটু কম হলে ভালো হতো ।

আমি তো সাঁতার জানি না ।

ইস, সাঁতার দেওয়া ছবি ভালো আসত । জলকন্যার এফেক্ট পাওয়া যেত ।

রাত-দিন আপনি শুধু ছবির কথা ভাবেন । তাই না ?

হঁ, ভাবি ।

দিলু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল । দেখল সাক্ষির কীভাবে হাঁসের গায়ে স্টিম লাগাচ্ছে । দেখে মনে হয় লোকটা এ কাজ দীর্ঘদিন ধরে করছে । দিলু বলল, মারিয়া বুঝি খুব ভালো মহিলা ছিলেন ?

হ্যাঁ । বাঙালি মেয়েদের মতো ।

বাঙালি মেয়েরা বুঝি ভালো ?

হ্যাঁ । বাঙালি মেয়েরা খুব সেন্টিমেন্টাল । সেন্টিমেন্টাল না হলে মেয়েদের মানায় না ।

আচ্ছা সাক্ষির ভাই, আমি সেন্টিমেন্টাল ?

হ্যাঁ ।

কীভাবে বুঝলেন ?

জামিল সাহেবের সঙ্গে বসে তুমি গল্প করছিলে, আমি শুনছিলাম ।

কথা শুনেই বুঝে গেলেন ?

দিলু, কথা শুনে অনেক কিছুই বোঝা যায় । আমি বুঝতে পারি ।

দিলু ভয়ে ভয়ে বলল, আর কী বুঝেছেন ?

বুঝলাম যে, তুমি জামিল সাহেবের প্রেমে পড়েছ । এডোলেসেন্স লাভ । চমৎকার জিনিস ।

দিলুর কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল । মিনিট পাঁচেক কোনো কথাবার্তা না বলে সে চুপচাপ বসে রইল । সাক্ষির হাসিমুখে বলল, কি দিলু, ঠিক বলিনি ?

দিলু কোনো জবাব দিল না ।

রেহানা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন চোখমুখ লাল করে দিলু চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে আছে। তিনি বিরক্ত স্বলে বললেন, তুই এখানে কী করছিস ?

দেখছি।

বাবুকে একটু সামলাবার চেষ্টা করলেও তো পারিস। আমি কতক্ষণ দেখব ?

দিলু নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। রেহানা বললেন, সাক্ষির, তোমার রান্নার কতদূর ?

হয়ে এসেছে। এখন শুধু আগুনে ঝলসাব।

খাওয়া যাবে তো ?

আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো না লাগলে এতটা কষ্ট শুধু শুধু করতাম না।

রেহানা বললেন, আমাকে কিছু করতে হবে ?

না, আপনি বিশ্রাম করুন।

রেহানা চলে গেলেন। পুরুষমানুষ রান্নাঘরে হাঁড়িপাতিল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এটা তাঁর দেখতে ভালো লাগে না। অসহ্য লাগে। রেহানা বারান্দায় থমকে দাঁড়ালেন। নিচুগলায় বললেন, আজও বসেছ ?

হ্যাঁ, বসলাম।

বোতল ক'টা এনেছ ?

বেশি না, দুটো মাত্র। রেহানা, একটু বসো আমার পাশে।

না।

কেন এরকম করছ ? বেশিদিন তো আর বাঁচব না। শেষ ক'টা দিন আরাম করতে দাও।

বেশিদিন বাঁচবে না—এই তথ্যটা আবার কবে জোগাড় করলে ?

এক পামিস্ট আমার হাত দেখে বলেছে আমি বাঁচব মাত্র ষাট বছর। ভালো পামিস্ট। যা বলে তাই ঠিক হয়। একটু বসো রেহানা।

রেহানা বসলেন। ওসমান সাহেব হুস্ট গলায় বললেন, একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি, দেখি বলতে পার কিনা।

ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে হবে না। বসে থাক চুপচাপ।

দারুণ ধাঁধা, দিলুর কাছ থেকে শিখেছি এবং নিজে নিজেই উত্তর বের করেছি। আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখছি, তুমি শরীফ না। কি, বলব ?

ওসমান সাহেব দিলুর পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ধাঁধাটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন।

কাচঘরের পাশে ফাঁকা জায়গাটায় হাঁস ঝলসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন তেমন জ্বলছে না। বাঁশের চাটাই দিয়ে হাওয়া আটকানোর ব্যবস্থা করা

হয়েছে। জামিল তদারক করেছে মোড়ায় বসে। দিলু বারান্দা থেকে তাদের দেখল। একবার ভাবল কাছে যাবে। কিন্তু গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। জামিল ডাকল— এই দিলু, এদিকে আয়। দিলু এগিয়ে গেল।

আমাদের ফটোগ্রাফার সাহেব কি হাঁসকে বাতাস দিয়ে শেষ করেছেন ?

দিলু জবাব দিল না।

কী ব্যাপার, এত গম্ভীর কেন ?

মাথা ধরেছে।

আগুনের পাশে বস। মাথা ধরা সেরে যাবে। চেয়ারটা টেনে আন।

দিলু বসল।

গল্প শুনাব নাকি বল ? মারাত্মক একটা ভূতের গল্প জানি। বলব ?

না।

না কেন ? তোর কী হয়েছে ?

দিলু মৃদুস্বরে বলল, জামিল ভাই, আপনি আমাকে তুই করে বলবেন না।

কেন ? বলব না কেন ?

আমার খারাপ লাগে।

আপনি করে বলব। তাই চাস ?

দিলু জবাব দিল না।

তোর কী হয়েছে ?

তুই করে বললে আমি জবাব দেব না।

আপনার কী হয়েছে ?

দিলু গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। জামিল তাকে হাত ধরে টেনে বসাল।

দিলু, তোমার কী হয়েছে ?

কিছু হয়নি।

না, কিছু-একটা হয়েছে। আমাকে বলো।

আমার খুব মন খারাপ লাগছে। মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

দূর বোকা মেয়ে।

জামিল শব্দ করে হাসল। একটা হাত তুলে দিলুর গিঠে। নিশাত দূর থেকে দৃশ্যটি দেখল। একবার ভাবল—দিলুকে সে ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। আগুনের পাশে বসে থাকা মানুষ দুটিকে সুন্দর লাগছে। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। রেহানা এসে বললেন, বাবুকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দে না নিশাত।

আমি পারব না।

দাঁড়িয়েই তো আছিস।

দাঁড়িয়ে আছি না মা । দেখছি ।

কী দেখছিস ?

দিলুকে দেখছি । দিলু কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে, দেখেছ মা ?

রেহানা তাকালেন । তিনি দিলুর বড় হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখলেন না । দিলু চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে । এটা একটা অভদ্রতা, দিলুকে বলতে হবে । তিনি বাবুর কাছে গেলেন । নিশাত চড়া গলায় বলল, দিলু, তুই একটু আয় ।

দিলু শান্ত স্বরে বলল, না ।

জামিল বলল, যাও না, শুনে আস কী জন্যে ডাকছে ।

না, আমি যাব না ।

জামিল কৌতূহলী হয়ে তাকাল । তার মনে হলো দিলু কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেছে । দিলু মৃদুস্বরে বলল, জামিল ভাই ।

কী!

চলুন, আমরা আজ সারা রাত এরকম আগুনের পাশে বসে গল্প করি ।

কী নিয়ে গল্প করবে ?

আগে বলুন আপনি রাজি আছেন কিনা ?

না । দারুণ ঘুম পাচ্ছে । তার উপর সারা রাত এরকম ঠান্ডায় বসে থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে ।

দিলু উঠে দাঁড়াল । জামিল বলল, কোথায় যাও ? দিলু তার জবাব দিল না ।

১১

রোস্ট ডাক জিনিসটি যে খেতে এতটা ভালো হবে রেহানা কল্পনাও করতে পারেননি । তাঁর আফসোস হতে লাগল তিনি পাশে বসে রান্নার পুরো ব্যাপারটা কেন দেখলেন না । সাব্বির বলল, আমি খুব শুছিয়ে লিখে রেখে যাব, আপনার যখন ইচ্ছা রান্না করতে পারবেন ।

বালি হাঁস ছাড়া সাধারণ হাস দিয়ে রান্না হবে ?

জানি না । হওয়া তো উচিত । আমি অবশ্যি কখনো ট্রাই করিনি ।

জামিল বলল, আমার মনে হয় না সাধারণ হাস দিয়ে এটা হবে । সাধারণ হাঁসগুলোর গায়ে প্রচুর চর্বি থাকে । বালি হাঁসের গায়ে চর্বি থাকে না ।

নিশাত হাসিমুখে বলল, আপনি বুঝি পৃথিবীর সব জিনিস জানেন ?

না, আমি খুব কমই জানি, মাঝে মাঝে লজিক খাটিয়ে দু'একটা কথা বলতে গিয়ে সবাইকে বিরক্ত করি ।

ওসমান সাহেব বললেন, দিলুকে দেখছি না যে । দিলু কোথায় ?

ও খাবে না। ওর মাথা ধরেছে।

চেখে দেখুক। ডেকে নিয়ে আয় তো নিশাত।

অনেক বলেছি বাবা।

জামিল বলল, আমি নিয়ে আসছি।

দিলু কন্ঠ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। জামিলকে ঢুকতে দেখে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। আলো চোখে লাগে বলে হারিকেন ডিম করে রাখা হয়েছে। জামিল বলল, দিলু, আমাদের সঙ্গে এসে বসো! জিনিসটা বেশ ভালো হয়েছে। তোমার ভালো লাগবে। দিলু জবাব দিল না।

তুমি হয়তো লক্ষ করনি—আমি ‘তুমি’ করে বলছি। এসো দিলু। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা অনেক রাত পর্যন্ত আগুনের পাশে বসে গল্প করব।

আমার মাথা ধরেছে জামিল ভাই।

এমন মজার গল্প বলব যে মাথা ধরা সেরে যাবে। এসো!

দিলু উঠে এল। গল্প খুব জমে উঠল খাবার টেবিলে। ওসমান সাহেব পর্যন্ত একটা হাসির গল্প বলে ফেললেন। নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্প। সবারই জানা, তবু সবাই হাসল। কিছু কিছু সময় আসে যখন সব কিছুই ভালো লাগে।

সাকিবর বলল নিউইয়র্কে এক হোটেলে তার অভিজ্ঞতার গল্প। তার বিছানার সঙ্গে একটি যন্ত্র ফিট করা। সেখানে লেখা—গা ম্যাসাজ করতে হলে এখানে দুটি কোয়ার্টার ফেলুন। বেচারী সরল মনে দুটি কোয়ার্টার ফেলল। তারপর বিছানায় শোয়ামাত্র বিছানা কাঁপতে শুরু করল। সে কী কাঁপুনি! বসে থাকা যায় না, ছুড়ে ফেলে দিতে চায়। মিনিট দশেক পর কাঁপুনি থামল। কিন্তু যন্ত্রটির বোধহয় কিছু একটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হলো কাঁপুনি। থামে, আবার শুরু হয়। আবার থামে, আবার শুরু হয়।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে রেহানা বিষম খেলেন এবং মনে মনে স্বীকার করলেন ছেলোটো রসিক। প্রচুর রসজ্ঞান না থাকলে গল্পটি এত সুন্দরভাবে বলা সম্ভব নয়। ওসমান সাহেব বললেন, সবাই একটা না একটা গল্প করছে। নিশাত চুপ করে আছে কেন?

বাবা আমি শুনছি।

শুধু শুনলে হবে না। বলতেও হবে।

নিশাত মৃদুস্বরে বলল, একটা মজার জিনিস লক্ষ করলাম আমি। জামিল ভাই হঠাৎ করে দিলুকে ‘তুমি তুমি’ করে বলছেন।

জামিল শান্ত স্বরে বলল, দিলু বড় হচ্ছে, এখন আর ওকে তুই বলা ঠিক না।

বড় কোথায়, ওর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স।

দিলু শীতল কণ্ঠে বলল, নভেম্বরে আমার পনের হয়েছে আপা। তোমার কিছু মনে থাকে না।

পনের হলেই যদি তুমি বলতে হয় তাহলে তো আমাদেরও তুমি বলতে হয়।

দিলু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, দিলু মা'র মনটা মনে হয় খারাপ।

নিশাত বলল, ওর মন ভালোই আছে। লোকজন ওকে তুমি করে বলা শুরু করেছে। মন খারাপ হবে কেন?

আমার মন ভালোই আছে।

সাকিবর বলল, মন ভালো থাকলে আমাদের একটা হাসির গল্প শোনাতে হবে।

দিলু সবাইকে অবাধ করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করল। পরীক্ষায় গুরু সম্পর্কে রচনা এসেছে। সবাই লিখছে। একটি ছেলে বলল, স্যার, জহির নকল করেছে। স্কুলের মাঠে একটা গুরু বাঁধা আছে। জহির জানালা দিয়ে গুরুটা দেখছে আর লিখছে।

ওসমান সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মদ্যপানজনিত কারণে তিনি ঈষৎ তরল অবস্থায় আছেন। ছোট ছোট হাসির ব্যাপারগুলো তাঁর কাছে অসাধারণ মনে হলো।

আরেকটা বল তো মা দিলু।

ইতিহাসের স্যার প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলো তো, শেরশাহ কোথায় মারা গেছেন? ছাত্র বলল, ইতিহাস বইতে স্যার। পনের পাতায়।

রেহানার মনে হলো তার এই মেয়েটি একটু অন্যরকম হয়েছে। কারও সঙ্গেই ঠিক মেলে না। একটু যেন আলাদা। নিশাত বলল, দুটি গল্পই জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা, তাই না?

হ্যাঁ। তাতে কোনো অসুবিধা আছে?

দিলু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে যেন সে সত্যি জবাবটি শুনতে চায়। সাকিবর বলল, এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হতো না। কেউ কি কষ্ট করে চা বানাবে?

নিশাত উঠে দাঁড়াল—আমি বানাব। দিলু, তুমি আর তো আমার সঙ্গে, একা একা ভয় লাগে।

কেটলিতে চায়ের পানি ফুটেছে। নিশাত এবং দিলু বসে আছে চুপচাপ। দিলুর মুখ থমথম করেছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদবে। নিশাত বলল, তুমি চা খাবি নাকি দিলু?

না।

আয় আমরা বরং কফি খাই। ইন্সটেন্ট কফির পটটা কোথায় দেখেছিস ?

আপা, আমি কফি খাব না। তুমি কী বলবে বলো।

আমি আবার কী বলব ?

কিছু-একটা বলবার জন্যেই আমাকে রান্নাঘরে এনেছ। এখন বলো কী বলবে।

দিলু, তুই কি রাগ করেছিস ?

দিলু চুপ করে রইল। নিশাত বলল, চল দু'জনে দু'কাপ চা নিয়ে পুকুরঘাটে বসি। যা, গরম চাদর একটা গায়ে জড়িয়ে আয়।

তুমি কি ওখানে নিয়ে আমাকে কিছু বলতে চাও ?

আয় না গিয়ে বসি, তারপর বলা যাবে। যা চাদর-টাদর কিছু-একটা গায়ে দিয়ে আয়।

দিলু উঠে গেল। লাল রঙের একটা শাল বের করে গায়ে দিল। কাচঘরের পাশে জামিল সিগারেট টানছে। সে উঁচু গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছিস রে ?

দিলু জবাব দিল না। জামিল ভাই 'তুই' বললে সে আর জবাব দেবে না। জামিল বলল, দিলু কোথায় যাচ্ছ ?

পুকুরঘাটে।

একা একা ? একটু সাবধানে থাকবে।

কেন ?

ভূত আছে।

আপনার মাথা আছে।

জামিল শব্দ করে হাসল—তুমি চাইলে আমি সাহস দেওয়ার জন্যে সঙ্গে থাকতে পারি।

সাহস দিতে হবে না।

পুকুরঘাটটি বড় বেশি নির্জন। মাঝে মাঝে হাওয়া আসে, গাছের পাতায় সরসর শব্দ হয়। ক্রমাগত ঝিঝি ডাকে, আবার কোনো-এক বিচিত্র কারণে ইঠাৎ ঝিঝির ডাক বন্ধ হয়ে চারদিকে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। নিশাত ফেলল, একটু যেন ভয় ভয় লাগে।

ফিরে যাবে ?

নাহ্, বস।

তারা বসল। নিশাত ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। দিলু বলল, আপা, তুমি কী বলতে চাও বলো। নিশাত চাপাস্বরে বলল, আমার যখন তোর মতো বয়স তখন জামিল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। জামিল ভাইরা তখন আমাদের পাশের বাসায় থাকতেন। মগবাজারে।

আপা, আমি জানি।

না, সবটা তুই জানিস না। তারপর কী হলো শোন। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সটা তো খুব খারাপ। সেই বয়সে কাউকে ভালো লাগলে সেটা যে কত তীব্র হয় তা তুই বুঝতে পারছিস কিছুটা। পারছিস না?

দিলু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। নিশাত বলল, অল্প বয়সের ভালো লাগার অনেক রকম ব্যাপার আছে। যখন কলেজে উঠলাম তখন লক্ষ করলাম জামিল ভাইকে আর ভালো লাগছে না। এরকম হয়। বি.এ. পড়বার সময় বিয়ে হয়ে গেল। যার সঙ্গে বিয়ে হলো সে জামিল ভাইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু।

এসব তো আপা আমি জানি।

সবটা জানিস না। শোন মন দিয়ে। তোর দুলাভাই একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন। পৃথিবীর যে-কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারত। কিন্তু আমি হইনি। আমার সারাক্ষণই জামিল ভাইয়ের কথা মনে হতো।

নিশাত চোখ মুছল। দিলু বলল, আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন আপা?

জানি না কেন।

আমার এসব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

নিশাত চুপ করে রইল। কাছেই কোথাও সরসর শব্দ হচ্ছে। দিলু বলল, চল আপা ঘরে যাই।

আরেকটু বস। তোকে একটা মজার গল্প বলি। ক্লাস টেনে উঠলাম যেবার সেবার আমি আর জামিল ভাই মিলে ঠিক করলাম পালিয়ে যাব।

কোথায় পালিয়ে যাবে?

সে-সব কিছু ঠিক হয়নি। ঐ বয়সে ভেবেচিন্তে তো কিছু কখনো করা হয় না। ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারলে এত ঝামেলা হয়?

নিশাত হাসতে চেষ্টা করল।

গল্প-উপন্যাসের মতো সত্যি সত্যি একদিন স্কুলে যাওয়ার সময় করে চলে গেলাম কমলাপুর রেলস্টেশন।

তোমরা যাওনি নিশ্চয়ই?

না, জামিল ভাই আসেননি।

ভালোই করেছ, যাওনি।

না, ভালো করিনি। এখনো তার জন্যে মনে একটা কষ্ট আছে আমার।

দিলু ছোট্ট করে বলল, তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও?

নিশাত জবাব দিল না। দিলু দ্বিতীয়বার বলল, তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে চাই।

দিলুর মনে হলো নিশাত কাঁদছে। গলার স্বর যেন ভাঙা ভাঙা। নিশাত খুব শক্ত মেয়ে। সে কি সত্যি সত্যি কাঁদবে? বিশ্বাস হয় না। দিলু মৃদুস্বরে বলল, জামিল ভাইকে কিছু বলেছ?

না।

বলো তাকে। তিনি তোমার জন্যেই আসেন।

নিশাত দিলুকে বুঝতে চেষ্টা করল। শান্ত ভাবলেশহীন মুখ। উজ্জ্বল চোখ। বড় মায়াবতী চেহারা দিলুর।

নিশাতের মনে হলো, আজ ঠিক এই মুহূর্তে দিলুর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে।

লেবু ফুল ফুটেছে কোথাও, মিষ্টি গন্ধ আসছে। গাড়ি অন্ধকার চারদিকে। নিশাত কাঁদতে শুরু করল। দিলু বসে রইল চুপচাপ। নিশাত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বেঁচে থাকা বড় কষ্ট।

আপা, চল যাই। শীত লাগছে।

আরেকটু বস! গ্লিজ।

তারা দুজন বসে রইল প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। এক সময় হাতে টর্চ নিয়ে তাদের খুঁজতে এল জামিল।

পানিতে ডুবে গেছ কিনা তাই দেখতে এলাম। মনে হচ্ছে ঠিকমতোই আছ। কাজেই ডিসটার্ব না করে চলে যাচ্ছি। শুধু একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে—এ বাড়িতে ভূত আছে। ঠাট্টা না, সত্যি।

নিশাত কিছু বলল না। দিলু বলল, জামিল ভাই, আপনি বসুন এখানে। আপা কী যেন বলবেন আপনাকে। টর্চটা দিন। আমি চলে যাই।

যেতে পারবে একা?

পারব।

দিলু যেতে যেতে থমকে পেছনে ফিরে তাকাল। অন্ধকারে জামিল ভাইয়ের জ্বলন্ত সিগারেট উঠানামা করছে। এর বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কত কাহাকাছি বসে তারা দুজন! নিশাত আপা যদি আজ বলে—জামিল ভাই, চলুন আজ সারা রাত আমরা গল্প করি—তাহলে জামিল ভাই কী বলবেন?

রাত অনেক হয়েছে। ওসমান সাহেবের বিমুনি ধরে গেছে। তিনি উঠব উঠব করছিলেন কিন্তু আবার ঠিক উঠতেও চাচ্ছিলেন না।

দিলু একসময় এসে দাঁড়াল তার পাশে।

ঘুমোসনি মা?

না বাবা ।

কোথায় ছিলি ?

পুকুরঘাটে বসে ছিলাম আপার সঙ্গে । বাবা, আমি তোমার পাশে একটু বসি ?

ওসমান সাহেব হাত বাড়িয়ে পাশের চেয়ারটি টানতে গেলেন । দিলু বলল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে বসব । আমাকে একটু জায়গা দাও । ওসমান সাহেব সরে জায়গা করে দিলেন । নরম স্বরে বললেন, দিলু, তোর কী হয়েছে ?

বাবা, আমার বড় কষ্ট!

কিসের কষ্ট ?

জানি না বাবা ।

ওসমান সাহেব মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর মনে হলো দিলু কাঁদছে । কিন্তু দিলু কাঁদছিল না ।

ওসমান সাহেব ভরাট গলায় বললেন, যাও মা, ঘুমুতে যাও । ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শরীর খারাপ করবে ।

রেহানা বাবুকে ঘুম পাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলেন । দিলুকে দেখে বললেন, তোর কি শরীর খারাপ ? তোকে এমন লাগছে কেন ?

শরীর ভালোই আছে ।

নিশাত কোথায় ?

পুকুরঘাটে ।

রেহানা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, এত রাতে একা একা সেখানে কী করছে ?

একা একা না মা । জামিল ভাই আছেন ।

রেহানা উঠে বসলেন । তাঁর ধারণা ছিল জামিলকে নিশাত সহ্য করতে পারে না । তিনি কিছু-একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও জিজ্ঞেস করলেন না । দিলু বলল, মা, আমি তোমার পাশে একটু শুয়ে থাকি ?

দিলু মা-কে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল । ফিসফিস করে বলল, নিশাত আপার সঙ্গে জামিল ভাইয়ের বিয়ে হলে ভালোই হবে মা ।

কী বলছিস বিড়বিড় করে । পরিষ্কার করে বল ।

কিছু বলছি না মা ।

দিলু আরও শব্দ করে মা-কে জড়িয়ে ধরল । চারদিকে আবছা অন্ধকার । ঝিঁঝি ডাকছে । শীতের হিমেল হাওয়া । বাবু ঘুমের মধ্যেই কেঁদে উঠল । একটা টিকটিকি ডাকল—টিক টিক টিক ।

দিলু ভাসছিল মাঝপুকুরে ।

তার পরনে লাল একটা স্কার্ট । মাথার কালো চুল চারদিকে ছড়ানো । দীঘির সবুজ জলের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি অসাধারণ কম্পোজিশন । একজন ফটোগ্রাফার এরকম একটি দৃশ্যের জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে ।

সাক্ষির দীর্ঘ সময় দিলুর ভেসে থাকা শরীরটির দিকে তাকিয়ে রইল । ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে । স্কার্টের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে । সাক্ষির ছবি তুলতে গিয়েও তুলতে পারল না । পাগলের মতো চেষ্টাতে লাগল—তোমরা কে কোথায় আছ এই মেয়েটিকে বাঁচাও!

দমকা একটা হাওয়া এল তখন । সে হাওয়ায় দিলু ভেসে আসতে লাগল ঘাটের দিকে । যেন সে বলছে—‘ছবি তুলুন সাক্ষির ভাই ।’

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আকাশ জোড়া মেঘ



হুমায়ূন আহমেদ
আকাশজোড়া মেঘ

ছাপান্ন মিনিট পার হল।

ফিরোজ বসে আছে। কারো কোনো খোঁজ নেই। ঘুমন্ত রাজপুরীর মতো অবস্থা। কোনো শব্দটুকুও পাওয়া যাচ্ছে না, যা থেকে ধারণা করা যায় এ-বাড়িতে জীবিত লোকজন আছে। সে যে এসেছে, এ-খবরটি ছাপান্ন মিনিট আগে পাঠানো হয়েছে। বেঁটেখাটো এক জন মহিলা বলে গেল—আফা আসতাকে। ব্যস, এই পর্যন্তই। ফিরোজ অবশ্যই আশা করে না যে, সে আসামাত্র চারদিকে ছোটোছুটি পড়ে যাবে। বাড়ির কতী স্বয়ং নেমে আসবেন এবং ‘এনাকে চা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?’ বলে চোঁচামেচি শুরু করবেন। তবে এক ঘণ্টা শুধুশুধু বসে থাকতে হবে, এটাও আশা করে না। সময় এখনো এত সস্তা হয় নি।

‘আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন?’

পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ফিরোজ মনে-মনে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। চমৎকার মেয়েগুলি সব এমন-এমন জায়গায় থাকে যে, ইচ্ছা করলেই হট করে এদের কাছে যাওয়া যায় না। দূর থেকে এদের দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হয় এবং মনে-মনে বলতে হয়—আহা, এরা কী সুখেই না আছে!

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। সালামের মতো একটা ভঙ্গি করল। এটা করতে তার বেশ কষ্ট হল। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে এ-রকম সম্মানের সঙ্গে সালাম করার কোনো মানে হয়।

ফিরোজ বলল, ‘আমি আপনার বাবার কাছে এসেছি।’

‘বাবা তো দেশে নেই, আপনাকে কি এই কথা বলা হয় নি?’

‘হয়েছে।’

‘তাহলে?’

মেয়েটির চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। যেন কৈফিয়ত তলব করছে, কেন তাকে

ডাকা হল। ফিরোজ ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘আপনার বাবা নেই বলেই আপনাকে খবর দিতে বলেছি। গল্পগুজব করার উদ্দেশ্যে খবর দেয়া হয় নি।’

অপালা পর্দা ছেড়ে ঘরের ভেতর ঢুকল। লোকটিকে চট করে রেগে যেতে দেখে তার বেশ মজা লাগছে। বয়স্ক মানুষেরা মাঝে-মাঝে খুবই ছেলেমানুষি করে।

‘আপনার বাবা আমাকে কমিশন করেছেন বসার ঘরটি বদলে নতুন করে সাজিয়ে দিতে। এই সাজ তাঁর পছন্দ নয়।’

‘আপনি কি একজন আর্টিস্ট?’

‘না। আর্টিস্টরা মানুষের ঘর সাজায় না। তারা ছবি আঁকে। আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের মতো পয়সাওয়ালাদের ঘর সাজিয়ে দেয়া।’

‘বেশ, সাজিয়ে দিন।’

‘আপনি জানেন তো, আপনার বাবা ড্রইংরুমটা বদলাতে চাচ্ছেন?’

‘না, জানি না। বাবার মাথায় একেকটা খেয়াল হঠাৎ করে আসে, আবার হঠাৎ করে চলে যায়। আপনি বসুন।’

ফিরোজ বসল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এইসব পরিবারের মেয়েরা অসম্ভব অহঙ্কারী হয়। এক জন হাউস ডেকোরেটরের সঙ্গে এরা বসবে না। এতে এদের সম্মানের হানি হবে।

‘আমি ভাবছিলাম আজই কাজ শুরু করব।’

‘করুন।’

‘আপনার বাবা আমাকে টাকাপয়সা কিছু দিয়ে যান নি। জিনিসপত্র কিনতে আমার কিছু খরচ আছে।’

‘আপাতত খরচ করতে থাকুন। বাবা এলে বিল করবেন।’

‘এত টাকা তো আমার নেই। আপনি কি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন?’

‘আমি কী ব্যবস্থা করব?’

‘আপনার বাবা বলেছিলেন, ‘যে-কোনো প্রয়োজনে আপনাদের এক জন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে-নিশানাথবাবু। কিন্তু তাঁর ঠিকানা আমাকে দিয়ে যান নি।’

‘আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ম্যানেজার কাকুকে খবর দিয়ে নিয়ে আসছি। আপনাকে কি ওরা চা দিয়েছে?’

‘না।’

‘চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

‘আপনার অসীম দয়া।’

অপালা হেসে ফেলল। অসীম দয়া বলার ভঙ্গির জন্যে হাসল, না অন্য কোনো কারণে, তা বোঝা গেল না। সে দোতলায় উঠে ম্যানেজার সাহেবকে টেলিফোনে আসতে বলল। নিশানাথবাবুকে এ-বাড়িতে সবাই ম্যানেজার ডাকে, তবে ম্যানেজারি ধরনের কোনো কাজ উনি করেন না। উনি বসেন মতিঝিল অফিসে। গুরুত্বহীন কাজগুলি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করেন। টাটকা মাছ কেনার জন্যে প্রায়ই ভোররাতে দাউদকান্দি চলে যান। এই জাতীয় কাজে তাঁর সীমাহীন উৎসাহ।

অপালার টেলিফোন পেয়েই বললেন, ‘এক্ষুণি চলে আসছি মা। এই ধর পাঁচ

মিনিট। এর সঙ্গে আরো দু'মিনিট যোগ করে নাও, রাস্তাঘাটের অবস্থা তো বলা যায় না! ঠিক না মা?’

‘তা তো ঠিকই।’

‘এক মাইল চওড়া রাস্তা; এর মধ্যেও ট্রাফিক জ্যাম। দেশটার কী হচ্ছে, তুমি বল? একটা অনেস্ট অপিনিয়ন তুমি দাও . . .

নিশানাথবাবু বক-বক করতে লাগলেন। তিনি দশ মিনিটের আগে টেলিফোন ছাড়বেন না। কথার বিষয় একটিই-দেশ রসাতলে যাচ্ছে। মুক্তির কোনো পথ নেই। দেশের সব ক’টা মানুষকে বঙ্গোপসাগরে চুবিয়ে আনতে পারলে একটা কাজের কাজ হত ইত্যাদি।

অপালা রিসিভার কানে নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল কখন বলা যাবে, কাকা, টেলিফোন রাখলাম।

ফিরোজ ভেবেছিল একটি খুব সুদৃশ্য কাপে এক কাপ চা-ই শুধু আসবে। অন্য কিছুই থাকবে না। অসম্ভব বড়লোকরা এককথার মানুষ—যখন চায়ের কথা বলেন তখন শুধু চা-ই আসে, অন্য কিছু আসে না। অথচ প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। ভোর সাতটায় পরোটা-ভাজি খাওয়া হয়েছিল, এখন বারটা দশ। খিদেয় নাড়ি পাক দিয়ে উঠছে। মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে এতটা হৃদয়হীন হবে না। সঙ্গে কিছু-না-কিছু থাকবে। এদের ফ্রিজ খাবারদাবারে সবসময় ভর্তি থাকে। চট করে চমৎকার একটা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দেয়া এদের কাছে ছেলেখেলা। দু’টি রুটির মাঝখানে কয়েক টুকরো পনির, শসার কুচি, এক চাকা টমেটো। ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং-এর আধচামচ। গোলমরিচের গুঁড়ো। চমৎকার।

কাজের মেয়েটি ট্রে নিয়ে ঢুকল। যা ভাবা গিয়েছে তাই। সুদৃশ্য কাপে চা এবং রুপোর একটা গ্লাসে এক গ্লাস হিমশীতল পানি। খিদে নষ্ট করার জন্যে ফিরোজ সিগারেট ধরাল। সেন্ট্রাল টেবিলে চমৎকার একটি অ্যাশট্রে। নিশ্চয়ই অনেক টাকা খরচ করে কেনা। একটি পরী নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরীটির গা থেকে কাপড় খুলে যাচ্ছে। সে কাপড় সামলাতে ব্যস্ত। অগোছালো কাপড়ের কারণে লজ্জায় তার গাল রক্তিম। এ-জাতীয় অ্যাশট্রেগুলিতে কেউ ছাই ফেলে না। এতটা দুঃসাহস কারো নেই। ফিরোজ ছাই দিয়ে সেটা মাখামাখি করে ফেলল। তার খুব ইচ্ছা করছে উপস্থিতির সময় এদের কোনো একটা ক্ষতি করতে। কার্পেটের খানিকটা সিগারেটের আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, কাপটা ভেঙে ফেলা। এ-রকম ইচ্ছা তার প্রায়ই হয়।

ম্যানেজার নামক জীবটির এখনো কোনো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটি খবর দিয়েছে কি না কে জানে। নিজের ঘরে গিয়ে হয়তো গান শুনছে কিংবা ভিসিআর-এ ‘আকালের সন্ধান’ চালু করে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের চিন্তায় মগ্ন।

ফিরোজ কাপ হাতে নিয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। ছাগল-দাড়ির এক লোক দু’টি অ্যালসেশিয়ানকে গোসল দিচ্ছে। সাবান দিয়ে হেভি ডলাডলি। কুকুর দু’টি বেশ আরাম পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। নড়াচড়া করছে না। লোকটি কুকুর দু’টির সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে। কাম কাম, সিট ডাউন, নটি বয়, বি কোয়ায়েট জাতীয় শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুকুররা বিদেশি ভাষা এত ভালো বোঝে কেন কে জানে। দেশি ঘিয়ে ভাজা কুত্তাকেও ‘কাম হিয়ার’ বললে কুঁই-কুঁই করে এগিয়ে আসে। ফিরোজের বাথরুম

পেয়ে গেল। কোনো বাড়িতে গিয়ে ফট করে বলা যায় না—ভাই, আপনাদের বাথরুম কোথায়? মালদার পার্টিদের ডুইং রুমের পাশেই ব্যবস্থা থাকে। এখানে নেই। ডুইং রুম নাম দিয়ে কুৎসিত একটা জিনিস বানিয়ে রেখেছে। ছাদ পর্যন্ত উঁচু শো-কেসে রাজ্যের জিনিস। যেন একটা মিউজিয়াম। পয়সার সঙ্গে-সঙ্গে রুচি বলে একটা বস্তু নাকি চলে আসে। ডাহা মিথ্যে কথা। এই জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে জন্মাতে হয়।

একটা পাঁচ বাজে। ম্যানেজারবাবুর দেখা নেই। ফিরোজের উচিত স্লামালিকুম বলে উঠে যাওয়া। স্লামালিকুম বলারও কেউ নেই। অহঙ্কারী মেয়েটি এ-ঘরে আর ঢোকে নি। হয়তো ভেবেছে এ-ঘরে ঢুকলেই থার্ড রেট একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়ে যাবে। আরে বাবা, প্রেম এত সস্তা নয়! হুট করে হয় না। হুট করে প্রেম হয় কনজারভেটিভ ফ্যামিলিগুলিতে। ঐ সব ফ্যামিলির মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে মিশতে পারে না, হঠাৎ যদি সুযোগ ঘটে যায়—তাহলেই বড়শিতে আটকে গেল। উপরতলার মেয়েদের এই সমস্যা নেই। কত ধরনের ছেলের সঙ্গে মিশছে!

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। শো-কেসটির সামনে কিছুক্ষণ কাটানো যায়। তদ্রলোক দেশ-বিদেশ ঘুরে এত সব জিনিস এনেছেন, কেউ এক জন দেখুক। এই বাড়িতে যারা বেড়াতে আসে তাদের শো-কেসও এ-রকম জিনিসে ভর্তি। এরা নিশ্চয়ই দেখার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ বোধ করে না। আর থাকা যায় না, চলে যাওয়া উচিত। ডেকোরেশনের ফার্মটা তার হলে এতক্ষণে চলেই যেত। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ফার্মটা তার নয়। এক দিন যে এ-রকম একটা ফার্ম তার হবে, সে-রকম কোনো নমুনাও বোঝা যাচ্ছে না।

ম্যানেজার বাবু ঠিক দেড়টার সময় এলেন। ফিরোজ প্রথম যে-কথাটি বলল, তা হচ্ছে—বাথরুমটা কোথায়, আপনার কি জানা আছে?

অনেকক্ষণ থেকেই টেলিফোন বাজছে।

অপালা বারান্দায় ছিল, শুনতে পায় নি। ঘরের দিকে রওনা হওয়ামাত্র শুনল। টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে, আহা—না জনি কে! টেলিফোনের রিং হলেই অপালার কেন জানি মনে হয়, কেউ ব্যাকুল হয়ে ডাকছে। তার খুব একটা বড় সমস্যা। এই মুহূর্তেই তার কথা শোনা দরকার। এক বার সত্যি-সত্যি হলও তাই। রিসিভার তুলতেই তারি মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে বলল, 'সালাম ভাইকে কি একটু ডেকে দেবেন? আমার খুব বিপদ।'

অপালা বলল, 'সালাম ভাই কে?'

'আপনাদের একতলায় থাকে। প্লীজ, আপনার পায়ে পড়ি।'

'আমাদের একতলায় তো সালাম বলে কেউ থাকে না।'

'তাহলে এখন আমি কী করব?'

বলতে-বলতে সত্যি-সত্যি মেয়েটি কেঁদে ফেলল। অপালা নরম স্বরে বলল, 'আপনার রং নাশ্বার হয়েছে, আবার করুন, পেয়ে যাবেন। আমি রিসিভার উঠিয়ে

রাখছি, তাহলে আর এই নাশ্বারে চলে আসবে না।’

মেয়েটি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, ‘নাশ্বার ঠিক হলেও লাভ হবে না। ওরা ডেকে দেয় না।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। শুধু যুথী বলে একটা মেয়ে আছে, ও ডেকে দেয়। কে জানে, আজ হয়তো যুথী নেই।’

‘থাকতেও তো পারে, আপনি করে দেখুন।’

‘আমাকে আপনি-আপনি করে বলছেন কেন? আমি মাত্র ক্লাস টেনে উঠেছি। আমাকে তুমি করে বলবেন।’

মেয়েটির সঙ্গে তুমি-তুমি করে কথা বলার আর সুযোগ হয় নি। তার টেলিফোন নাশ্বার জানা নেই। মেয়েটিও অপালার নাশ্বার জানে না। রং নাশ্বারের একটি ব্যাপারে অল্প পরিচয়। কত দিন হয়ে গেল, এখনও সেই মিষ্টি গলার স্বর অপালার কানে লেগে আছে। টেলিফোন বেজে উঠলেই মনে হয়, ঐ মেয়েটি নয়তো?

না, ঐ মেয়ে না। সিঙ্গাপুর থেকে অপালার বাবা ফখরুদ্দিন টেলিফোন করেছেন।

‘কেমন আছ মা?’

‘খুব ভালো।’

‘তোমার মা’র কোনো চিঠি পেয়েছ?’

‘আজ সকালেই একটি পেয়েছি। মা এখন প্রায় সুস্থ।’

‘সেকেও অপারেশনের ডেট পড়েছে?’

‘সে-সব কিছু তো লেখেন নি।’

‘এই মহিলা প্রয়োজনীয় কথাগুলি কখনো লেখে না। তুমি সন্ধ্যা সাতটা-সড়ে সাতটার দিকে টেলিফোন করে জেনে নিও। এখানে সন্ধ্যা সাতটা মানে লগুনে ভোর ছয়টা।’

‘আচ্ছা, আমি করব।’

‘খুব একা-একা লাগছে নাকি?’

‘না, লাগছে না। তুমি আসছ কবে?’

‘আরো দু’দিন দেরি হবে। কোনো খবর আছে?’

‘না, কোনো খবর নেই।’

‘বসার ঘরটা নতুন করে সাজাতে বলে গিয়েছিলাম। কিছু হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ, হচ্ছে। ভীষণ রোগা আর লম্বা একটা ছেলে বোজ এসে কী-সব যেন করছে। তার সাথে মিস্ত্রি-টিস্ট্রিও আছে।’

‘কাজকর্ম কতদূর এগোচ্ছে?’

‘তা তো জানি না বাবা। আমি নিচে বিশেষ যাই না।’

‘একটু বলে দিও তো, যাতে আমি আসার আগে-আগে কমপ্লিট হয়ে থাকে।’

‘আমি এফুগি বলছি।’

‘আর শোন, তোমার মাকে কিছু জানিও না। সে এসে সারপ্রাইজ্ড হবে।’

‘আচ্ছা।’

‘ঐ ছেলেটার নাম কি?’

‘কোন ছেলেটার?’

‘কাজ করছে যো।’

‘নাম তো বাবা জানি না। জিজ্ঞেস করি নি। নাম দিয়ে তোমার কী দরকার?’

‘কোনো দরকার নেই। মতিন বলে একটা ছেলেকে দিতে বলেছিলাম। ওর কাজ ভালো। কিন্তু তুমি তো বলছ রোগা, লম্বা। ঐ ছেলে তো তেমন লম্বা নয়।’

‘আমি নাম জিজ্ঞেস করব। যদি দেখি ও মতিন নয়, তাহলে কী করব?’

‘কাজ বন্ধ রাখতে বলবে। আমি স্পেসিফিক্যালি বলেছি মতিনের কথা। তোমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে মা?’

‘ভালো হচ্ছে না।’

‘খুব বেশি খারাপ হচ্ছে?’

‘কেমন যেন মাঝামাঝি হচ্ছে। মাঝামাঝি কোনো কিছুই আমার ভালো লাগে না।’
ফখরুদ্দিন সাহেব উঁচু গলায় হাসতে লাগলেন। অপালার এই কথায় হঠাৎ করে তিনি খুব মজা পেলেন।

‘আচ্ছা মা, রাখলাম।’

‘তুমি ভালো আছ তো বাবা?’

‘অসম্ভব ভালো আছি। খোদা হাফেজ।’

অপালা নিচে নেমে এল। ঐ ভদ্রলোক বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন। তার সঙ্গে দু’ জন লোক করাত দিয়ে কাঠ টুকরো করছে। অপালা বসার ঘরে উকি দিল। সমস্ত ঘর লগুভগু হয়ে আছে। পেইনটিংগুলি নামিয়ে রাখা হয়েছে, শো-কেসটি নেই। কার্পেট ভাঁজ করে এক কোণায় রাখা। অপালা বলল, ‘আপনি কেমন আছেন?’

ফিরোজ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

‘আমাকে বলছেন?’

‘হ্যাঁ, আপনাকেই। আপনার নাম কি মতিন?’

‘আমার নাম মতিন হবে কী জন্যে? আমার নাম ফিরোজ।’

‘আপনার নাম ফিরোজ হলে বড়ো রকমের সমস্যা—কাজ বন্ধ।’

‘কাজ বন্ধ মানে?’

‘কাজ বন্ধ মানে হচ্ছে আপনি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে বাড়ি চলে যাবেন।’

ফিরোজের মুখ হাঁ হয়ে গেল। যেন এমন অদ্ভুত কথা এর আগে সে শোনে নি। অপালা হেসে ফেলল। সে অবশ্য হাসি মুহূর্তের মধ্যেই সম্মিলে ফেলল। শান্ত গলায় বলল, ‘বাবা টেলিফোনে বললেন, মতিন নামের একজনের নাকি কাজটা করার কথা।’

‘কিন্তু আমি তো ঠিক তার মতোই করছি।’

‘আপনি করলে হবে না।’

‘মতিন এখন ছুটিতে আছে। তার বড়ো বোনের অসুখ। বরিশাল গেছে।’

‘বরিশাল থেকে ফিরে এলে আবার না-হয় করবেন।’

ফিরোজ সিগারেট ধরাল। মেয়েটির কথা তার এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে ঠাট্টা করছে। যদি ঠাট্টা না হয়, তাহলে তার জন্যে বড়ো ধরনের ঝামেলা অপেক্ষা করছে। এই কাজটি সে জোর করে হাতে নিয়েছে। করিম সাহেবকে বলেছে, ‘কোনো

অসুবিধা নেই, মতিনের চেয়ে কাজ খারাপ হবে না।' করিম সাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'আরে না। ভদ্রলোক মতিনের কথা বলেছেন।'

'আমি নিজে তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলেছে, আমি করলেও চলবে। কাজ ভালো হলেই চলবে।'

'দেখেন, পরে আবার ঝামেলা না হয়। বড়লোকের কারবার। মুড়ের উপর চলে। মাঝখানে যদি বন্ধ করে দেয়.....'

'পাগল হয়েছেন। কাজ দেখে চোখ টারা হয়ে যাবে।'

এখন অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে ফিরোজেরই চোখ টারা হয়ে যাবার যোগাড়। বি- করিম লোকটি মহা তাঁদড়। হয়তো বলে বসবে, 'ফিরোজ সাহেব, এই ফার্মে আপনার কাজ ঠিক পোষাচ্ছে না। দু'দিন পর-পর ফার্মকে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলছেন। আপনি ভাই অন্য পথ দেখুন।'

করিম সাহেবের পক্ষে এটা বলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক। ব্যাটা অনেকদিন থেকেই সুযোগ খুঁজছে। মাঝে-মাঝে ইশারা-ইঙ্গিতও করছে। গত সপ্তাহে বেতনের দিন বলল, 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে গেছে। কাজের চেয়ে মানুষ বেশি। বার হাত কাঁকুড়ের আঠার হাত বিচি।'

ফিরোজ আধ-খাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে অপালার দিকে তাকাল। অপালা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ হাসি-হাসি। মনে হচ্ছে কায়দা করে এই মেয়েটিকে রাজি করিয়ে ফেলা যাবে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সী মেয়েদের মন তরল অবস্থায় থাকে। দুঃখ-কষ্টের কথা বললে সহজেই কাবু হয়ে যায়। মুশকিল হচ্ছে বলাটাই। এই বয়সী মেয়েদের সঙ্গে ভিখিরির গলার স্বরে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। তাতে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

'আমি বরং কাজটা শেষ করি। আমার ধারণা, আপনার বাবা যখন দেখবেন একটা চমৎকার কাজ হয়েছে... মানে চমৎকার যে হবে এই সম্পর্কে...'

অপালা হাসি মুখে বলল, 'না।'

ফিরোজ স্তম্ভিত। হাসিমুখে কাউকে না বলা যায়।

'এইভাবে আমি যদি চলে যাই তাহলে আমার নিজের খুব অসুবিধা হবে। চাকরিটা হয়তো থাকবে না। আপনি আপনার বাবাকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। আমার ধারণা, আপনার কথা উনি শুনবেন।'

'আপনার ধারণা ঠিক নয়।'

'এই বাজারে আমার চাকরি নিয়ে সমস্যা হলে কীভাবে অসুবিধায় পড়ব, আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না। আপনাদের বোঝার কথাও নয়। নিজ থেকে বলতে আমার খুবই লজ্জা লাগছে...'

অপালা মৃদু স্বরে বলল, 'যাবার আগে ঘরটা আগের মতো করে যাবেন। এ-রকম এলোমেলো ঘর দেখলে বাবা খুব রাগ করবেন।'

ফিরোজ দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। তার সঙ্গের লোক দু'টি চিত্তিত মুখে ফিরোজের দিকে তাকাচ্ছে। ফিরোজ নিচু গলায় বলল, 'যাও, ঘরটা শুছিয়ে ফেল।'

অপালা চলে যাচ্ছে। ফিরোজের গা জ্বালা করছে, মেয়েটি এক বার বলল না—সরি। মানবিক ব্যাপারগুলি কি উঠেই যাচ্ছে? গল্প-উপন্যাস হলে এই জায়গায়

মেয়েটির চোখে পানি এসে যেত। সে ধরা গলায় বলত—আমার কিছু করার নেই ফিরোজ ভাই। আমার বাবাকে তো আপনি চেনেন না—একটা অমানুষ!

ফিরোজ বলত, তুমি মন খারাপ করো না? তোমার মন খারাপ হলে আমারও মন খারাপ হয়। এই বলে সে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত।

কিন্তু জীবন গল্প-উপন্যাস নয়। জীবনে কুৎসিত সব ব্যাপারগুলি সহজভাবে ঘটে যায়। অপরূপ রূপবতী একটি মেয়ে হাসতে-হাসতে কঠিন-কঠিন কথা বলে।

‘চা নিল।’

ফিরোজ দেখল, কাজের মেয়েটি ট্রেতে করে এক কাপ চা নিয়ে এসেছে। ফিরোজ ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘চা কেন?’

‘আপা দিতে বললেন।’

তার এক বার ইচ্ছা হল বলে—চা খাব না। কিন্তু এ-রকম বলার কোনো মানে হয় না। শীতের সকালবেলা এক কাপ চা মন্দ লাগবে না। সে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। চা খাওয়া শেষ হলে আছাড় দিয়ে কাপটা ভেঙে ফেললেই হবে।

বি. করিম সাহেব বেশ কিছুক্ষণ মুখ ছুঁচালো করে রাখলেন।

চেষ্টামেচি হৈচৈ কিছুই করলেন না। করলে ভালো হত। স্টীম বের হয়ে যেত। স্টীম বের হল না—এর ফল মারাত্মক হতে পারে। ফিরোজ ফলাফলের অপেক্ষা করছে। তার মুখ দার্শনিকের মতো। যা হবার হবে এই রকম একটা ভাব।

‘ফিরোজ সাহেব।’

‘জ্বি।’

‘হাজার পাঁচেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেল, কি বলেন?’

‘ক্ষতি হবে কেন? মতিন এইগুলি দিয়েই কাজ করবে।’

‘পাগল, মতিন এই সব ছোঁবে? সে সবকিছু আবার নতুন করে করাবে।’

‘তা অবশ্যি ঠিক।’

‘বেকায়দা অবস্থা হয়ে গেল ফিরোজ সাহেব।’

‘তা খানিকটা হল।’

‘আপনাকে আগেই বলেছিলাম, যাবেন না। কথা শুনলেন না। রক্ত গরম, কারো কথা কানে নেন না।’

‘রক্ত এক সময় গরম ছিল, এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।’

‘আমার যা সবচেয়ে খারাপ লাগছে তা হচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনি বলেছিলেন, ফখরুদ্দিন সাহেবের মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনার কথার উপর ভরসা করে.....’

করিম সাহেব বাক্য শেষ করলেন না। পেনসিল চাঁহতে শুরু করলেন। এটি খুব অশুভ লক্ষণ। পেনসিল চাঁছা শেষ হওয়ামাত্র বুলেটের মতো কিছু কঠিন বাক্য বের হবে। তার ফল সদূরপ্রসারী হতে পারে।

‘ফিরোজ সাহেব।’

‘জ্বি।’

‘আপনি বরং সিনেমা লাইনে চলে যান।’

‘অভিনয় করার কথা বলছেন?’

‘আরে না! অভিনয়ের কথা বলব কেন? সেট-টেট তৈরি করবেন। আপনি ক্রিয়েটিভ লোক, অল্প সময়েই নাম করবেন। জাতীয় পুরস্কার এক বার পেয়ে গেলে দেখবেন কাঁচা পয়সা আসছে।’

ফিরোজ মনে-মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কাঁচা পয়সা জিনিসটা কী, কে জানে? পয়সার কাঁচা-পাকা নেই। পয়সা হচ্ছে পয়সা।’

‘ফিরোজ সাহেব।’

‘জ্বি।’

‘ঐ করুন।’

‘সিনেমা লাইনে চলে যেতে বলছেন?’

‘হ্যাঁ। আমরা বড়-বড় কাজটাজ পেলো আপনাকে ডাকব তো বটেই। আপনি হচ্ছেন খুবই ডিপেণ্ডেবল। এটা আমি সবসময় স্বীকার করি।’

‘শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। আগে জানতাম না।’

‘সিনেমা লাইনের লোকজন আপনাকে লুফে নেবো।’

‘কেন বলুন তো?’

‘সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, আপনার আর্ট কলেজের ডিগ্রি নেই। ডিগ্রিধারী কাউকে এরা নিতে চায় না। ওদের তেল বেশি থাকে। ডিরেক্টরের উপর মাতব্বরি করতে চায়। আপনি তা করবেন না।’

‘ডিগ্রি না-থাকার তো বিরাট সুবিধা দেখছি! এই ফার্মের চাকরি কি আমার শেষ?’

করিম সাহেব কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর পেনসিল চাঁছা শেষ হয়েছে। তিনি সেই পেনসিলে কী যেন লিখতে শুরু করেছেন। ফিরোজ হাই তুলে বলল, ‘আপনি কি আমাকে আরো কিছু বলবেন, না আমি উঠব?’

‘আমার পরিচিত একজন ডিরেক্টর আছে। তার কাছে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠি নিয়ে দেখা করুন, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।’

‘আপনি তো দেখছি রীতিমতো মহাপুরুষ ব্যক্তি। চিঠি পেনসিলে না লিখে দয়া করে কলম দিয়ে লিখুন।’

‘ইচ্ছা করেই পেনসিল দিয়ে লিখছি। পেনসিলের চিঠিতে একটা পারসোনাল টাচ থাকে, যে-জিনিসটা টাইপ-করা চিঠিতে বা কম্পিউটারের লেখায় থাকে না।’

‘গুড। এটা জানতাম না। এখন থেকে যাবতীয় প্রেমপত্র পেনসিলে লিখব।’

ডিরেক্টর সাহেবের বাসা কল্যাণপুর। সারা দুপুর খুঁজে সেই বাড়ি বার করতে হল। ডিরেক্টর সাহেবকে পাওয়া গেল না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বাড়িওয়ালার কাছে জানা গেল, ডিরেক্টর সাহেব ছ’ মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি ফেলে চলে গেছেন। শুধু তাই নয়, যাবার সময় বাথরুমের দু’টি কমোড হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙেছেন।’

ফিরোজ চোখ কপালে তুলে বলল, ‘বলেন কী!’

‘ফিল্ম লাইনের লোক। বাড়ি-তাড়া দেয়াই উচিত হয় নি। আপনি তার কে হন?’

‘আমি কেউ হই না। আমিও এক জন পাওনাদার।’

‘কত টাকা গেছে?’

‘প্রায় হাজার দশেক।’

‘ঐ টাকার আশা ছেড়ে দিন। ঐটা আর পাবেন? টাকা এবং স্ত্রী—এই দুই জিনিস হাতছাড়া হলে আর পাওয়া যায় না।’

ফিরোজ প্রায় বলেই বসছিল—আপনার স্ত্রীও কি তাঁর সাথে ভ্যানিশ হয়েছেন? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। এখন রসিকতা করতে ইচ্ছা করছে না। সে ক্লান্ত স্বরে বলল, ‘এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারেন?’

‘নিশ্চয়ই পারি। আসুন, ভেতরে এসে বসুন। এত মন-খারাপ করবেন না। কী করবেন বলুন, দেশ ভরে গেছে জোচ্ছোরে। আমার মতো পুরনো লোক মানুষ চিনতে পারে না, আর আপনি হচ্ছেন দুধের ছেলে।’

শুধু পানি নয়। পানির সঙ্গে সন্দেশ ও লুচি চলে এল। ভদ্রলোকের স্ত্রী পর্দার ও-পাশ থেকে উকি দিচ্ছেন। দেখছেন। দেখছেন কৌতূহলী চোখে।

ভদ্রলোক ফুটির স্বরে বললেন, ‘এই ছেলের কথাই তোমাকে বলছিলাম। একে ফতুর করে দিয়ে গেছে। কী-রকম অবস্থা একটু দেখ। হায়রে দুনিয়া!’

দশ মিনিটের ভেতর এই পরিবারটির সঙ্গে ফিরোজের চূড়ান্ত খাতির হয়ে গেল। ভদ্রলোক এক পর্যায়ে বললেন, ‘দুপুরবেলা ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। হাত-মুখ ধুয়ে তাত খেয়ে ফেল। বড়-বড় পাবদা মাছ আছে।’

ফিরোজের চোখ প্রায় ভিজে উঠল। এই জীবনে সে অনেকবারই অযাচিত ভালবাসা পেয়েছে। এই জাতীয় ভালবাসা মন খারাপ করিয়ে দেয়।

অপালার মা হেলেনা প্রথমে লণ্ডনের সেন্ট লিউক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর হাটের একটি ড্যামেজড ভাষা এখানেই রিপেয়ার করা হয়। রিপেয়ারের কাজটি তেমন ভালো হয় নি। ডাক্তাররা এক মাস পর আর একটি অপারেশন করতে চাইলেন। তবে এও বললেন যে, অপারেশন নাও লাগতে পারে। তবে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। এক মাস অবজারভেশনে রাখতেই হবে।

ফখরুদ্দিন সাহেব লণ্ডনের সারাবে লাল হাটের ছোটখাটো একটি নার্সিং হোম খুঁজে বের করলেন। এই হাসপাতালটি ঘরোয়া ধরনের। সবার প্রাণপণ চেষ্টা, যেন কিছুতেই হাসপাতাল মনে না হয়। কিছু অংশে তারা সফল। চট করে এটাকে হাসপাতাল মনে হয় না। তবে তার জন্যে রুগীদের প্রচুর টাকা দিতে হয়। এখানে বড় হাসপাতালের খরচের দেড়গুণ বেশি খরচ হয়। টাকাটাও আগেভাগেই দিয়ে দিতে হয়। ফখরুদ্দিন সাহেবের জন্যে সেটা কোনো সমস্যা হয় নি। টাকা খরচ করতে তাঁর ভালোই লাগে। ফখরুদ্দিন সাহেব নিজে যখন দরিদ্র ছিলেন, তখনো তাঁর এই স্বভাব

ছিল। পড়াশোনার খরচ দিতেন বড়মামা। তাঁর অবস্থা নড়বড়ে ছিল, তবু তিনি মাসের তিন তারিখে একটা মানিঅর্ডার পাঠাতেন। প্রায়ই এমন হয়েছে, মাসের ছ' তারিখেই সব শেষ। তখন ছোট্টাছুটি দৌড়াদৌড়ি। ফখরুদ্দিন সাহেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—প্রচুর টাকা রোজগার করা, যাতে দু'হাতে খরচ করেও শেষ করা না যায়। ফখরুদ্দিন সাহেবের মেধা ছিল। ভাগ্যও প্রসন্ন ছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ব্যবসা জমিয়ে ফেললেন। চারদিক থেকে টাকা আসতে শুরু করল। বিয়ে করলেন সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। বাসর রাতে স্ত্রীকে বললেন, 'টাকাপয়সা তোমার কাছে কেমন লাগে?'

হেলেনার বয়স তখন মাত্র সতের। আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে বড় ফুপার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে। সেখানেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে। বাসর রাতে টাকা প্রসঙ্গে স্বামীর এই অদ্ভুত প্রশ্নের সে কোনো আগামাথা পেল না। সে চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে—টু বিকাম রিচ। ভেরি রিচ। টাটা-বিড়লাদের মতো। তোমার কি ধারণা, আমি পারব?'

হেলেনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার কেন জানি মনে হতে লাগল, এই লোকটি ঠিক সুস্থ নয়। সুস্থ মানুষ বিয়ের প্রথম রাতে স্ত্রীকে নিশ্চয়ই এই জাতীয় কথা বলে না।

'বুঝলে হেলেনা, আমার মনে হয় আমি পারব। আমি খুব দ্রুত ভাবতে পারি। ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাই। এটা একটা মেজর এ্যাডভানটেজ। অন্যারা যা আজ চিন্তা করে, আমি সেটা দু'বছর আগেই চিন্তা করে রেখেছি।'

হেলেনার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসে। হট করে বিয়ে। আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, নিজের মা পর্যন্ত খবর জানেন না। টেলিগ্রাম করা হয়েছে, এখনো হয়তো পৌছে নি। ঘটনার আকস্মিকতা, বিয়ের উত্তেজনায় এমনিতেই হেলেনার মাথার ঠিক নেই, তার ওপর লোকটি ক্রমাগত কী-সব বলে যাচ্ছে।

'হেলেনা।'

'জ্বি।'

'আমি আজ কিঞ্চিৎ মদ্যপান করেছি, যেটা আমি কখনো করি না। আজ বাধ্য হয়ে নার্ভ স্টেডি রাখার জন্যে করতে হল। তুমি সম্ভবত গন্ধ পাচ্ছ।'

হেলেনা কোনো গন্ধটুকু পাচ্ছিল না। এখন পেতে শুরু করছে তার ইচ্ছে করল চোঁচিয়ে কেঁদে ওঠে।

'এই পৃথিবীতে আমি মোটামুটিভাবে একা। মানুষ কয়েকজন বড়মামা। তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে বিরাট একটা ঝগড়া হয়েছে। আজ তোমাকে বলব না, পরে বলব। আজ বরং আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি তোমাকে বলি।'

ঝুম-ঝুম করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। ফখরুদ্দিন সাহেব হাতে সিগারেট ধরিয়ে চক্রাকারে হাঁটছেন এবং কথা বলছেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় হেলেনার দম বন্ধ হবার যোগাড়। লোকটি একটির পর একটি সিগারেট ধরাচ্ছে। পুরোটা টানছেন না, কয়েকটি টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছে। হেলেনার ভয়-ভয় করতে লাগল। এ-কেমন ছেলে! কার সঙ্গে তার বিয়ে হল?

'এখনকার ট্রেণ্টা হচ্ছে কি, জান? চট করে ইণ্ডাস্ট্রি দিয়ে দেয়া। এতে সন্মাজে প্রেস্টিজ পাওয়া যায়। লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। কিন্তু এইসব

ইগুস্তি শেষ পর্যন্ত হাতিপোষার মতো হয়। হাতির খাবার যোগাতে গিয়ে প্রাণান্ত।
বুঝতে পারছ, কী বলছি?’

‘না।’

‘র মেটরিঅ্যাল নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। ইগুস্তির খাবার হচ্ছে র মেটরিঅ্যাল, যার প্রায় সবই আনতে হয় বাইরে থেকে। আমি তা করব না। আমি যখন কোনো ইগুস্তি দেব তার প্রতিটি র মেটরিঅ্যাল তৈরি করব আমি নিজে।’

হেলেনা হাই তুলল। ফখরুদ্দিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, ‘তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?’

‘না।’

‘শুধু ব্যবসা নিয়ে কথা বলছি বলে কি বিরক্তি লাগছে?’

‘না।’

‘টাকা খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, বুঝলে হেলেনা। যে-সোসাইটির দিকে আমরা যাচ্ছি, সেই সোসাইটির ঈশ্বর হচ্ছে টাকা। একটা সময় আসবে, যখন তুমি টাকা দিয়ে সব কিনতে পারবে। সুখ, শান্তি, ভালবাসা—সব।’

হেলেনা দ্বিতীয় বার হাই তুলল। ফখরুদ্দিন সেই হাই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, ‘খুব বেশি দূর তোমাকে যেতে হবে না। আজকের কথাই ধর। তোমার যদি প্রচুর টাকা থাকে, তাহলে তুমি সেই টাকায় বেহেশতে নিজের জন্যে একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে পার।’

‘কীভাবে?’

‘টাকা খরচ করে হাসপাতাল দেবে, স্কুল-কলেজ দেবে, এতিমখানা বানাবে, লঙ্গরখানা বসাবে। এতে পুণ্য হবে। সেই পুণ্যের বলে বেহেশত। কাজেই টাকা দিয়ে তুমি পরকালের জন্যে ব্যবস্থা করে ফেললে, যে-ব্যবস্থা এক জন ভিখিরি করতে পারবে না। ইহকালে সে ভিক্ষা করেছে, পরকালেও সে নরকে পচবে—কারণ তার টাকা নেই। হা হা হা।’

তাঁর হাসি আর থামেই না। মাঝে-মাঝে একটু কমে, তার পরই আবার উদ্দাম গতিতে শুরু হয়। হেলেনা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। বন্ধ দরজার পাশে ঘাড়ের মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের এক জন দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, ‘কী হয়েছে?’

ফখরুদ্দিন সাহেব হাসতে-হাসতেই বললেন, ‘নাথিং। এ্যাবসলুটলি নাথিং। পানি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্রিং মি সাম ওয়াটার।’

হেলেনা হাসপাতালের বেডে শুয়ে পুরনো কথা ভাবেন।

স্মৃতি রোমন্থনের জন্যে নয়, সময় কাটাওয়ার জন্যে। বইপত্র ম্যাগাজিন স্তুপ হয়ে আছে। বেশিক্ষণ এ-সব দেখতে ভালো লাগে না। টিভির অনুষ্ঠানও একনাগাড়ে দেখা যায় না। কথাবার্তা বোঝা যায় না। সবাই কেমন ধমক দেয়ার মতো করে ইংরেজি বলে। পুরোটাও বলে না। অর্ধেক গলার মধ্যে আটকে রাখে। যেন কথাগুলি নিয়ে গার্গল করছে।

‘হেলেনা।’

তিনি তাকালেন। সিস্টার মেরি এসে দাঁড়িয়েছে। এরা সবাই তাঁকে হেলেন ডাকে,

যদিও তিনি অনেক বার বলেছেন, তাঁর নাম হেলেনা—হেলেন নয়।

‘তোমার একটি টেলিফোন এসেছে। কানেকশন এ-ঘরে দেয়া যাচ্ছে না। টেলিফোন সেটটায় গুণগোল আছে। তুমি কি কষ্ট করে একটু আসবে?’

‘নিশ্চয়ই আসব।’

তিনি বিছানা থেকে নামলেন। এই হাসপাতালে সিস্টার মেরিই একমাত্র ব্যক্তি, যার প্রতিটি কথা তিনি বুঝতে পারেন। এই মহিলার গলার স্বরও সুন্দর। শুনতে ইচ্ছে করে। সে কথাও বলে একটু টেনে-টেনে।

টেলিফোন ঢাকা থেকে এসেছে। অপালার গলা।

‘মা, কেমন আছ?’

‘ভালো।’

‘আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করলে না তো?’

‘কেমন আছিস?’

‘ভালো। আমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে জিজ্ঞেস কর।’

‘পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?’

‘ভালো না। মাঝারি ধরনের।’

‘বলিস কি! তুই এমন সিরিয়াস ছাত্রী, তোর পরীক্ষা মাঝারি ধরনের হবে কেন?’

‘এখন হলে আমি কী করব?’

‘তুই কি আমার কথা ভেবে-ভেবে পরীক্ষা খারাপ করলি?’

‘হতে পারে। তবে কনশাসলি ভাবি না। অবচেতন মনে হয়তো ভাবি।’

‘সেটা বুঝলি কীভাবে?’

‘প্রায়ই স্বপ্নে দেখি, তোমার অপারেশন হচ্ছে। অপারেশনের মাঝখানে ডাক্তাররা গুণগোল করে ফেলল..... এইসব আর কি।’

‘সেকেন্ড অপারেশনটা আমার বোধহয় লাগবে না।’

‘তাই নাকি! এতবড় একটা খবর তুমি এতক্ষণে দিলে?’

‘এখনো সিওর না। ডাক্তাররা আরো কী-সব টেস্ট করবে।’

‘কবে নাগাদ সিওর হবে?’

‘এই সপ্তাহটা লাগবে। তোর বাবা কেমন আছে?’

‘জানি না। ভালোই আছে বোধহয়। একটা ভালো খবর দিতে পারি মা।’

‘দিতে পারলে দো।’

‘এখন থেকে ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। বাবা সিঙ্গাপুর থেকে ইংল্যান্ড যাচ্ছে।’

‘ভালো।’

‘তুমি মনে হচ্ছে তেমন খুশি হও নি।’

‘খুশি হয়েছে।’

‘গলার স্বর কিন্তু কেমন শুকনো-শুকনো লাগছে।’

‘এই বয়সে কি আর খুশিতে নেচে ওঠা ঠিক হবে?’

‘খুশি হবার কোনো বয়স নেই মা, যে-কোনো বয়সে খুশি হওয়া যায়।’

‘তা যায়।’

‘তুমি বাবার সঙ্গে চলে এসো।’

‘যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে চলে আসব।’

‘সব ঠিকঠাকই থাকবে।’

‘থাকলেই ভালো।’

‘মা, তোমার শরীর কি সত্যি-সত্যি সেরেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কিন্তু এমন করে কথা বলছ কেন? যেন কোনো উৎসাহ পাচ্ছ না। একটু হাস তো মা।’

তিনি হাসলেন। বেশ শব্দ করেই হাসলেন। আজ সারা দিনই তিনি খানিকটা বিষণ্ণ বোধ করছিলেন। সেই ভাবটা কেটে গেল। তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সুন্দর রোদ উঠেছে। আকাশ অসম্ভব পরিষ্কার। রোদে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে তাঁর ভালো লাগছে। বাতাস অবশ্যি খুব ঠাণ্ডা। সুচের মতো গায়ে বেঁধে। ভেতর থেকে ওভারকোটটি নিয়ে এলে ভালো হত। কিন্তু ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

চোখ মেলতেই প্রিয় দৃশ্যটি দেখা গেল।

জানালায় কাছে চায়ের কাপ। একটি চডুই পাখি কাপের কিনারায় বসে ঠোঁট ডুবিয়ে চা খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে ফিরোজের দিকে। এই ব্যাপারটি প্রথম ঘটে ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে। চায়ের দোকান থেকে যথারীতি জানালার পাশে গরম চা রেখে ডাক দিয়েছে—স্যার উঠেন। ফিরোজ ঘুম-ঘুম চোখে দেখেছে। হাত বাড়াতে-বাড়াতে আবার ঘুম। ঘুম ভাঙল এগারটার দিকে কিচিরমিচির শব্দে। চায়ের কাপ ঘিরে পাঁচ-ছ’টা চডুই পাখি। মহানন্দে কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে কিচিরমিচির করছে। সেই থেকে রোজ হচ্ছে। পাখিগুলি মনে হয় অপেক্ষা করে থাকে কখন চা আসবে। সেই চা ঠাণ্ডা হবে। রোজ তাদের সে-সুযোগ হয় না। বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফিরোজ কাপ টেনে নেয়। চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত। তিক্ত, কষা ও মধু—এই তিন স্বাদের সমাহার। তোরের প্রথম শারীরিক আনন্দ।

আজ ফিরোজের কোনোই কাজ নেই। কোথাও যেতে হবে না। দেনদরবার করতে হবে না। সাধারণত যে-দিন কোনো কাজ থাকে না সে-দিন সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভেঙে যায়। কাজের দিনে কিছুতেই ঘুম ভাঙতে চায় না। মনে হয় আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকি। আজ উন্টো ব্যাপার ঘটল। কোনো কাজকর্ম নেই, তবু বেশ খানিকক্ষণ ঘুমুনো গেল। চডুই পাখিটি কৃতজ্ঞ চোখে তাকাচ্ছে।

তার সঙ্গীরা আজ কেউ আসে নি। এলেও চা-পর্ব সমাধা করে চলে গিয়েছে। এই ব্যাটা যাচ্ছে না। হিন্দি ভাষায় ফিরোজ পাখিটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালান। পশু-পাখিরা বাংলা ভাষাটা তেমন বোঝে না।

‘কেয়া ভাই চিড়িয়া, হালত কেয়া?’

‘চিকির চিকির চিক।’

‘চিনি উনি সব ঠিক থা?’

‘চিকির চিকির।’

‘আউর এক দফা হোগা কেয়া নেহি?’

‘চিক চিকির চিকির।’

ফিরোজের ধারণা, পাখিরা মোস কোডে কথা বলে। চিকির এবং চিক এই দু’টি শব্দই নানান পারমুটেশন কম্বিনেশনে বেরিয়ে আসছে। এই বিষয়ে একটা গবেষণা হওয়া উচিত। সময় থাকলে দু’-একজন পক্ষীবিদদের সাথে কথা বলা যেত। পশু-পাখিদের ভাষাটা জানা থাকলে নিঃসঙ্গ মানুষদের বড় সুবিধে হত।

ফিরোজ টুথপেস্ট হাতে বারান্দায় এল। তার ঘর দোতলায়। একটি শোবার ঘর। জানালাবিহীন অন্য একটি কামরা এক শ’ ওয়াটের বাতি জ্বাললেও অন্ধকার হয়ে থাকে। সেই ঘরের উন্টো দিকে বাথরুম, যা অন্য এক জন ভাড়াটে রমিজ সাহেবের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যখন ফিরোজের বাথরুমে যাবার দরকার হয়, তখন রমিজ সাহেবকে বাথরুমের ভেতর পাওয়া যায়। ভদ্রলোকের ব্যাপার সব অদ্ভুত। বাথরুমে এক বার ঢুকলে আর বেরুবেন না। ফিরোজের ধারণা, বসে থাকতে-থাকতে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েন।

‘এই যে ব্রাদার, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।’

রমিজ সাহেব খুক-খুক করে দু’ বার কাশলেন।

‘আজ অফিসে যান নি? এগারটা বাজে, এখনো বাথরুমে বসে আছেন?’

আবার খুক-খুক কাশি। নাক ঝাড়ার শব্দ।

‘বেরিয়ে আসুন ভাই। খানিকক্ষণ পর না-হয় নতুন উদ্যমে আবার যাবেন। বাথরুম তো পালিয়ে যাচ্ছে না।’

রমিজ সাহেব ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে বের হয়ে এলেন। কড়া গলায় বললেন, ‘রোজ-রোজ এইসব কী বাজে কথা বলেন?’

‘বাজে কথা কি বললাম?’

‘এইসব আমি পছন্দ করি না। খুবই অ-পছন্দ করি। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন কেন? এইটা কী-ধরনের ভদ্রতা?’

‘আজ কিন্তু ধাক্কা দিই নি।’

‘অভদ্র ছোকরা।’

রমিজ সাহেব রাগে গর-গর করতে-করতে নিজের ঘরে গেলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত অসুস্থ। গলায় মোটা মাফলার। চোখমুখ ফোলা-ফোলা। অফিসেও যান নি। ফিরোজ কিঞ্চিৎ লজ্জিত বোধ করল। এক জন সুস্থ মানুষকে নিয়ে রসিকতা করা ঠিক হচ্ছে না। রসিকতার প্রচুর বিষয় আছে।

বেরুতে-বেরুতে সাড়ে বারটা বেজে গেল। একতলার বারান্দায় বাড়িওয়ালা বসে আছেন। আজ তাঁকে দেখে চট করে সরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দু’ মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি ছিল। গত সপ্তাহেই সেটা দিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাড়িওয়ালার ছোট মেয়েটির জন্যে সে এক জন পাত্রের খোঁজে আছে, এমনও বলেছে। এটা বলার দরকার ছিল। কারণ বাড়িওয়ালা হাজি আসমত আলি ওপরের দু’ জন ভাড়াটেকে উৎখাত করতে চাইছেন। সেখানে নাকি তাঁর বড় জামাই আসবেন। বড় জামাইয়ের

চাকরি নেই। বাড়ি-ভাড়া দিয়ে থাকতে পারছেন না। চাকরিবাকরির কোনো ব্যবস্থা না-
হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবেন।

ফিরোজ আঁতকে উঠে বলেছে, 'খাল কেটে লোকজন কুমির আনে, আপনি তো
হাঙর আনার ব্যবস্থা করছেন। জামাই এক বার ঢুকলে উপায় আছে?'

হাজি আসমত আলি বলেছেন, 'করব কী তাহলে, ফেলে দেব?'

'অফকোর্স ফেলে দেবেন। জামাই, শালা এবং ভাগ্নে—এই তিন জিনিসকে কাছে
ঘেষতে দেবেন না যদি বাঁচতে চান।'

'আপনি সবসময় বড় আজোবাজে কথা বলেন।'

'কোন কথাটা আজোবাজে বললাম?'

'এই নিয়ে আপনার সঙ্গে বক-বক করতে চাই না। আপনি তাই ডিসেম্বর মাসের
ত্রিশ তারিখে বাড়ি ছেড়ে দেবেন। এক মাসের নোটিশ দেবার কথা—দিলাম।'

'আচ্ছা, ছেড়ে দেব। উনত্রিশ তারিখেই ছেড়ে দেব। এক দিন আগে।'

মেয়ে বিয়ের প্রসঙ্গ এর পরপরই ফিরোজকে আনতে হয়েছে। কাল্পনিক এক পাত্র
দাঁড় করাতে হয়েছে। এই ব্যাপারে হাজি সাহেব যে-আগ্রহ দেখাবেন বলে আশা করা
গিয়েছিল, তার চেয়েও বেশি দেখালেন। ফিরোজ যথাযোগ্য গাভীরের সঙ্গে বলল,
'ছেলে এম এ পাশ করেছে গত বছর। ফাস্ট ক্লাস পাওয়ার কথা ছিল, পায় নি।
সেকেণ্ড ক্লাস ফোর্থ হয়েছে। একটা পেপার খুবই খারাপ করেছে। দেখতে রাজপুত্র নয়,
সেটা আগেই বলে দিচ্ছি। চেহারা মোটামুটি, তবে ভালো ফ্যামিলির ছেলে। ঢাকায়
নিজের বাড়ি। পুরনো ধরনের বাড়ি। তবে ময়মনসিংহ শহরে বিরাট বাড়ি। চার বোন
তিন ভাই। ছোট বোনের বিয়ে হয় নি। ভাইরা সবাই স্ট্যার্লিশড।

'ছেলে করে কী?'

'এখনো কিছু করে না। মাত্র তো পাস করল। তবে পারিবারিক অবস্থা যা, কিছু না-
করলেও হেসে-খেলে দু'-তিন পুরুষ কেটে যাবো।'

'ওদের সঙ্গে আপনার পরিচয় কীভাবে?'

'আমার আপন ফুপাতো ভাই। আপনি আপনার মেয়ের একটি ছবি দিয়ে দেবেন,
বাকি যা করার আমি করব। আরো ছেলে আছে আমার হাতে, নো প্রবলেম। ভালো
কথা, ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট এবং কালার—দু' ধরনের ছবিই দেবেন।'

'আচ্ছা দেব। ছবি দেব। যদি মেয়ে দেখতে চান, কোনো অসুবিধা নাই, যেখানে
বলবেন। কালার ছবি ঘরে নাই, স্টুডিওতে তুলতে হবে।'

'তুলে ফেলুন। কালারের যুগ এখন।'

বিয়ের ঐ আলাপ-আলোচনার পর বাড়ি ছাড়ার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। দু' মাসের
ভাড়াও হাজি সাহেব চাওয়া বন্ধ করলেন। অবশিষ্ট ভাড়া দিয়ে দেয়া হয়েছে, তবু মনে
সন্দেহ, আবার বাড়ি ছাড়ার প্রসঙ্গ ওঠে কি না।'

হাজি সাহেব ফিরোজকে বেরুতে দেখেও কিছু বললেন না। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বসে
রইলেন। ফিরোজ এগিয়ে এল, 'রোদ পোহাচ্ছেন?'

'জ্বি।'

'খুব ভালো, শরীরে ভিটামিন সি প্রডিউস হচ্ছে।'

'ঐ ছেলের ব্যাপারে তো আর কোনো খবর দিলেন না।'

‘ছবি? ছবি চাচ্ছে তো!’

‘ছবি তো তুলে রেখেছি। চান না, তাই.....’

‘কী মুশকিল, চাইব না কেন। যান, নিয়ে আসুন। আজ ছেলের বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে। দেখা যে হবেই তা বলছি না—একটা প্রবাবিলিটি।’

ছবি দেখে ফিরোজের মন উদাস হয়ে গেল। ভারি মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে। চোখ ছিল-ছিল করছে। হাজি সাহেবের মেয়েগুলি বোরকা পরে। ফিরোজ কখনো এদের মুখ দেখে নি। ভাগ্যিস দেখে নি। দেখলেই এই বোরকাওয়ালির প্রেমে পড়ে যেতে হত।

‘আপনার মেয়ে তো খুবই রূপবতী।’

হাজি সাহেব কিছুই বললেন না। ফিরোজ বলল, ‘এই রকম একটা মেয়ের বিয়ে নিয়ে কেউ চিন্তা করে? আশ্চর্য!’

হাজি সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘অন্য সমস্যা আছে।’

‘কী সমস্যা?’

‘ওর পায়ে একটু দোষ আছে।’

‘কী দোষ?’

‘পোলিও হয়েছিল।’

‘বলেন কী!’

‘হাঁটা-চলায় কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু।’

ফিরোজের অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গেল। তার প্রচণ্ড ইচ্ছে হতে লাগল বলে ফেলে-আমি এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। শেষ পর্যন্ত বলল না। তার আবেগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

‘আমি টাকাপয়সা যথেষ্ট খরচ করব। এই মেয়েটা আমার খুব আদরের। যদি একটা ভালো ছেলে দিতে পারেন।’

‘আপনি নিশ্চিত থাকুন।’

ফিরোজ লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। যদিও তার খুব খারাপ ছিল, রাস্তায় নেমে মন ভালো হয়ে গেল। কী সুন্দর ঝকঝকে রোদ! ধীন নীল আকাশ। বাতাস কত মধুর! বেঁচে থাকার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে?

ফিরোজ হাঁটছে ফুটির ভঙ্গিতে। কোনো কাজকর্ম নেই, চিন্তা করতেই ভালো লাগছে। যদিও উন্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। তার ফুটির মূল কারণ হচ্ছে পকেট একেবারে ফাঁকা নয়। আট শ’ ত্রিশ টাকা আছে। হাতগুলো টাকা পকেটে নিয়ে শুধু-শুধু দৃষ্টিভ্রম করার কোনো মানে হয় না। দৃষ্টিভ্রম মানেই পেপটিক আলসার, ক্ষুধামন্দ্য, অনিদ্রা। তারচেয়ে হাসিমুখে ঢাকার রাস্তায় হাঁটা অনেক ভালো।

ঢাকার রাস্তাগুলি এখন বেশ সুন্দর। হেঁটে বেড়ানোর জন্যে এবং শিক্ষা করবার জন্যে আদর্শ। ফুটপাথে ভিক্ষুকরা কী সুন্দর ঘর-সংসার সাজিয়ে শিক্ষা করছে।

ফিরোজ এই মুহূর্তে কৌতূহলী হয়ে একটি ভিক্ষুক-পরিবারকে দেখছে। এক বুড়ো তার দু’ পাশে দু’টি ছোট-ছোট বাচ্চাকে নিয়ে শিক্ষা করছে। তাদের একটু পিছনেই ইটের চুলায় রান্না হচ্ছে। ঘোমটা-দেয়া গৃহস্থ প্যাটার্নের একটি মেয়ে মাটির

হাঁড়িতে চাল দিচ্ছে। এই পরিবারটির চোখে-মুখে দুঃখ-বেদনার কোনো ছাপ নেই। বরং বুড়োর মুখে একটা প্রশান্তির ভাব আছে। বাচ্চা দু'টি একটু পর-পর দাঁত বের করে হাসছে। ফিরোজ কী মনে করে একটা চকচকে পাঁচ টাকার নোট বুড়োর থালায় ফেলে দিল। ভিথিরিরা এই জাতীয় ঘটনায় আবেগে উদ্বেলিত হয়। এই বুড়ো নিষ্পৃহ ভঙ্গিতে নোটটা নিজের বুক-পকেটে রেখে দিল। খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। থালায় একটা নোট থাকলে পয়সাকড়ি পড়বে না। ফিরোজের আফসোসের সীমা রইল না। টাকাটা জলে গেল। দাতা সাজবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অদূর ভবিষ্যতে তাকে যদি এ-রকম টিনের থালা নিয়ে বসতে হয় এবং কেউ যদি একটা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দেয়, তাহলে সে আনন্দের এমন প্রকাশ দেখাবে যে চারদিকে লোক জমে যাবে। দর্শকদের আনন্দের জন্যে সে বাঁদর-লাফ দিতেও রাজি আছে।

বাচ্চা দু'টির মধ্যে কী-কারণে যেন মারামারি লেগে গেছে। দু' জনই এলোপাতাড়ি কিল-ঘুঘি মারছে। এক জন মনে হচ্ছে খামচিবিশারদ। একেক বার খামচি দিয়ে ছাল-চামড়া নিয়ে আসছে। জমট দৃশ্য। কিন্তু বুড়োর এই দৃশ্যও কোনো ভাবান্তর হচ্ছে না। সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততা নিয়ে সে বসে আছে, রন্ধনরতা ঘোমটা-দেয়া মেয়েটিও কিছু বলছে না।

ফিরোজের ইচ্ছে করছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে এই পরিবারটিকে দেখে-দেখে দুপুরটা কাটিয়ে দেয়। সেটা করা ঠিক হবে না। লোকে অন্য অর্থ করবে। যে-মেয়েটি রাঁধছে তার বয়স অল্প। মুখে লাবণ্য এখনো খানিকটা আছে। এই মেয়ের আশেপাশে দীর্ঘ সময় থাকার একটি মানেই হয়। বুড়ো যে পাঁচটি টাকা পেয়েও বিরস মুখে বসে রইল তার মানেও এই। বুড়ো অন্য কিছু ভেবে বসেছে। ফিরোজ মগবাজারের দিকে লম্বা-লম্বা পা ফেলতে লাগল। এখন সে যাবে তাজিনদের বাসায়। তাজিন তার বড় বোন। মগবাজার ওয়ারলেস কলোনিতে থাকে। ফিরোজের যখন টাকাপয়সার টানাটানি হয় তখন দুপুরে এই বাড়িতে খেতে আসে।

‘কেমন আছিস রে আপা? তোর পুত্র-কন্যারা কোথায়? বাসা একেবারে খালি মনে হচ্ছে!’

তাজিন মুখ অন্ধকার করে রাখল।

‘হয়েছে কী? কথা বলছিস না কেন? কর্তার সঙ্গে আবার ফাইটিং?’

তাজিন থমথমে গলায় বলল, ‘তুই কি একটা মানুষ, না শুনি কিছু?’

‘কেন?’

‘রুমি এত করে বলে দিল তার জন্মদিনে আসার জন্যে, তুই আসতে পারলি না? মেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে অস্থির। বাচ্চাগুলি তোকে এত পছন্দ করে, আর তুই এ-রকম করিস? ভালবাসার দাম দিতে হয় না?’

‘খুব কৈঁদেছিল?’

‘জিনিসপত্র ফেলে-ছড়িয়ে একাকার করেছে, শেষে তোর দুলাতাইকে পাঠালাম তোর খোঁজে।’

‘আপা, হয়েছে কি জান..... আমাদের এক কলিগ.....’

‘চুপ কর, আর মিথ্যা কথা বলতে হবে না। ভাত খেতে এসেছিস, খেয়ে বিদায় হা!’

‘আজ তোদের রান্না কী?’

তাজিন জবাব না-দিয়ে টেবিলে ভাত বাড়তে লাগল।

‘তোদের টেলিফোন ঠিক আছে আপা?’

‘আছে।’

‘তুই রেডি কর সবকিছু, আমি টেলিফোন করে আসছি। দারুণ একটা খবর আছে। আগামী সপ্তাহে বিয়ে করছি।’

এই দারুণ খবরেও তাজিনকে বিচলিত মনে হল না।

‘বিশ্বাস হচ্ছে না? এই নে, মেয়ের ছবি দেখ। কি, এখন বিশ্বাস হচ্ছে?’

ফিরোজ টেলিফোন করতে গেল। বি. করিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করবে, মতিন কাজটা করেছে কি না। বি. করিম সাহেবকে পাওয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ‘কে, ফিরোজ সাহেব নাকি?’

‘আমার কি সৌভাগ্য। গলা চিনে ফেলেছেন!’

‘ঠাট্টা করছেন নাকি ভাই?’

‘পাগল হয়েছেন। আপনার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক?’

‘আমার চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিলেন?’

‘হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। বহু কষ্টে ব্যাটার ঠিকানা বের করতে হয়েছে।’

‘কী বলেছেন উনি?’

‘আপনার পারসোনাল টাচওয়ালা পেনসিলের চিঠিটা পড়ে মুখ বিকৃত করে বলল, বি. করিম—এই শালা আবার কে? আমার কাছে পেনসিলে চিঠি লেখে, আত্মপরাধী তো কম নয়!’

করিম সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে মেঘস্বরে বললেন, ‘ফিরোজ সাহেব, একটা কথা শুনুন।’

‘বলুন।’

‘কেন সবসময় এ-রকম উন্টোপান্টা কথা বলেন?’

‘সত্যি কথা বলছি। শুধু-শুধু মিথ্যা বলব কেন?’

‘ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আপনি তাঁর কাছে এখনো যান নি। তিনি ঠিকানা বদলেছেন, এখন থাকেন রামকৃষ্ণ মিশন খান্ডে।’

‘ও, আচ্ছা।’

‘আপনি গেলেই উনি আপনাকে কাজ দেবেন।’

‘মেনি থ্যাংকস।’

‘ফিরোজ সাহেব।’

‘জি।’

‘আচার-আচরণ সাধারণ মানুষের মতো করার চেষ্টা করুন। ইয়ারকি-ফাজলামি তো যথেষ্ট করলেন। বয়স কত আপনার?’

‘পঁয়ত্রিশ।’

‘বয়স তো মাশাআল্লাহ্ কম হয় নি। আরেকটা কথা।’

‘বলুন, শুনছি।’

‘ফখরুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে একবার যাবেন।’

‘কেন?’

‘ওনার মেয়ে টেলিফোনে আপনাকে চাচ্ছিল।’

‘বলেন কী! কী-রকম গলায় চাইল?’

‘কী-রকম গলায় মানে!’

‘প্রেম-প্রেম গলা, না রাগ-রাগ গলা?’

বি. করিম সাহেব তার উত্তর দিলেন না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। রাগে তাঁর গা জ্বলে যাচ্ছে। ফিরোজ হুটচিঙে খেতে বসল। প্রচুর আয়োজন। টেবিলের দিকে তাকাতেই মন ভরে যায়।

‘সিরিয়াস এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেছে, বুঝলে আপা। একেবারে লদকালদকি প্রেম।’

তাজিন কিছু বলল না। একটা বিশাল আকৃতির সরপুটি ভাজা ফিরোজের পাতে তুলে দিল।

‘ঐ মেয়ে আমার খোঁজে দিনে চার বার পাঁচ বার করে অফিসে টেলিফোন করছে। বি. করিম সাহেবের কান ঝালাপালা!’

‘সত্যি-সত্যি বলছিস?’

‘এই যে মাছ হাতে নিয়ে বলছি। বাঙালির ছেলে মাছ হাতে মিথ্যা কথা বলে না।’

‘মেয়েটার নাম কি?’

‘অপালা। বিয়ের পর অপা করে ডাকব। অপালা শব্দটার মানে কী, জানিস নাকি?’

‘জানি না। মেয়েটাকে ছবিতে যে-রকম দেখাচ্ছে আসলেও কি সে-রকম সুন্দর?’

ফিরোজ ভাত মাখতে-মাখতে বলল, ‘তুই একটা মিসটেক করে ফেললি রে আপা। ছবির মেয়ে আর ঐ মেয়ে দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। তুই গুলেট করে ফেলেছিস।’

তাজিন রাগ করতে গিয়েও করতে পারল না। তাদের পাঁচ বোনের পর এই এক ভাই। আদরে-আদরেই ওর মাথা নষ্ট হয়েছে। জীবনে কিছুই করল না। কোনো দিন যে করতে পারবে তাও মনে হচ্ছে না।

‘ফিরোজ।’

‘বল্।’

‘সবটাই কি তোর কাছে একটা খেলা?’

‘খেলা হবে কেন?’

তাজিন আর কিছু বলল না। ফিরোজের খাওয়া দেখতে লাগল। কেমন মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে থাকছে। গালভর্তি দাড়ি। হঠাৎ দাড়ি রাখার শখ হল কি জন্যে কে বলবে? জিজ্ঞেস করলে অদ্ভুত কিছু বলে হাসাতে চেষ্টা করবে। ইদানীং আর ফিরোজের কথায় তার হাসি আসে না, রাগ ধরে যায়। চড় মারতে ইচ্ছে করে।

‘দাড়িতে আমাকে কেমন লাগছে রে আপা?’

‘ভালো।’

‘রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ভাব চলে এসেছে না?’

তাজিন কিছু বলল না।

‘রবীন্দ্রনাথের মুখের গঠনের সাথে আমার মুখের গঠনের অদ্ভুত মিল আছে।’

চুলদাড়িগুলি আরেকটু লম্বা হোক, দেখবি।’

‘তখন কী করবি? একটা আলখাল্লা কিনবি?’

‘এটা মন্দ বলিস নি আপা। একটা আলখাল্লা কিনলে হয়। রেডিমেড বোধহয় পাওয়া যায় না। অর্ডার দিয়ে বানাতে হবে। তারপর সেই আলখাল্লা পরে বাংলা একাডেমীর কোনো একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে সবাইকে ভড়কে দেব। চারদিকে ফিসফাস শুরু হবে—গুরুদেব এসে গেছেন।’

‘চুপ কর দেখি।’

‘সরি, আমার আবার মনেই থাকে না তুই বাংলার ছাত্রী। দে, একটা পান দে। চমনবাহার থাকলে চমনবাহার দিয়ে দে।’

অপালা যে-বার ক্লাস এইটে বৃত্তি পেল, সে-বার তার বাবা তাকে চমৎকার একটা উপহার দিয়েছিলেন। লিসবন থেকে কেনা মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই-করা পাঁচ শ’ পাতার বিশাল একটা খাতা। মলাটে একটি স্প্যানিস নর্তকীর ছবি। চামড়ায় এত সুন্দর ছবি কী করে আঁকা হল কে জানে! দেখলে মনে হয় মেয়েটি চামড়া ফুঁড়ে বের হয়ে এসে নাচা শুরু করবে।

ভেতরের পাতাগুলির রঙ মাখনের মতো। কী মসৃণ। প্রতিটি পাতায় অপূর্ব সব জলছাপ। গাছপালা, নদী, আকাশের মেঘ।

ফখরুদ্দিন সাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, ‘উপহারটি মনে হয় খুব পছন্দ হয়েছে?’

আনন্দে অপালার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সে নিজেকে সামলে গাঢ় গলায় বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘এখন থেকে এই খাতায় গল্প, কবিতা, নাটক—এইসব লিখবে।’

‘এইসব তো আমি লিখতে পারি না বাবা।’

‘লিখতে-লিখতেই লেখা হয়। চেষ্টা করবে। ঐ সব না পছন্দ করলেও জীবনের বিশেষ-বিশেষ ঘটনা লিখে রাখবে। এই যে তুমি বৃত্তি পেলে, এটা তো বেশ একটা বড় ঘটনা। সুন্দর করে এটা লিখবে। তারপর তোমার যখন অনেক ক্লেশ হয়ে যাবে, চুল হবে সাদা, চোখে ছানি পড়বে—তখন ঐ খাতাটা বের করে পড়বে, দেখবে কত ভালো লাগে।’

‘আমি কোনোদিন বুড়ো হব না বাবা।’

‘তাই বুঝি?’

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘর কাঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন।

চমৎকার সেই খাতায় প্রথম এক বছর অপালা কিছুই লিখল না। তার অনেক বার লিখতে ইচ্ছে করল, কলম নিয়ে বসল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুন্দর পাতাগুলি নষ্ট করতে ইচ্ছে করল না। সে খাতা খুলে রেখে মনে-মনে পাতার পর পাতা লিখে যেতে লাগল। অনেক লেখা পছন্দ হল না, সেগুলি মনে-মনেই কেটে নতুন করে লিখল।

ক্লাস নাইনে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার শেষ দিনে সে প্রথম বারের মতো লিখল।
সাধু ভাষায় লেখা সেই অংশটিই এই—

“আজ আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমার মনে কোনো আনন্দ হইতেছে না।
পরীক্ষা বেশ ভালো হইয়াছে। তবে কেন আমার আনন্দ হইতেছে না? আমি সঠিক
জানি না। মাঝে-মাঝে খুব আনন্দের সময় আমার দুঃখ লাগে। আমি কাঁদিয়া ফেলি।
গত বছর আমরা নেপালের ‘পোখরা’ নামক একটি স্থানে গিয়াছিলাম। চারিদিকে
বিশাল পাহাড়। কত সুন্দর দৃশ্য। বাবা এবং মা’র মনে কত আনন্দ হইল। বাবা
ক্যামেরা দিয়া একের পর এক ছবি তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই
আমার মনে খুব দুঃখ হইল। গলা ভার-ভার হইল। চোখ দিয়া পানি আসিতে লাগিল।
ভাগ্যিস কেহ দেখিতে পায় নাই।”

অপালার খাতাটি ক্রমে ভরে উঠতে লাগল। ক্লাস টেনে উঠে প্রথম গল্প লিখল।
বয়সের সঙ্গে তার গল্পটি মিশ খায় না। গল্পের নাম রাজ-নর্তকী। গল্পের বিষয়বস্তু
পনের বছরের মেয়ের কলমে ঠিক আসার কথা নয়। শুরুটা এ-রকম :

রাজ-নর্তকী

মহিমগড়ের রাজপ্রাসাদে থাকে এক নর্তকী। রাজসভাতে গান করে, নাচে। তার নাচ যে-ই দেখে
সে-ই মুগ্ধ হয়। সেই রাজসভায় এক দিন এলেন ভিনদেশি এক কবি। তিনি নর্তকীর নাচ দেখে
মুগ্ধ হলেন। হাত জোড় করে বললেন, ‘দেবী, আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?’

নর্তকী হাসিমুখে বলল, ‘আমার নাম অপালা।’

‘দেবী, আমি কি নিভূতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?’

হ্যাঁ, পারেন। আসুন গোলাপ-বাগানে।’

তারা দু’জন গোলাপ-বাগানে গেল। ফুলে-ফুলে চারদিক আলো হয়ে আছে। রাজ-নর্তকী অপালা
বলল, ‘কী আপনার নিবেদন, কবি? আপনি আমার কাছে কী চান?’

‘যা চাই তাই কি আমি পাব? এত বড় সৌভাগ্য সত্যিই কি আমার আছে?’

তা তো বলতে পারছি না। আগে আমাকে বলতে হবে, আপনি কী চান?’

‘আমি আপনাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চাই।’

‘বেশ তো, লিখুন।’

‘আপনার অপূর্ব দেহ-সুখমা নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চাই।’

‘বেশ তো।’

‘কিন্তু দেবী, তার জন্যে আপনার দেহটিকে তো আমার দেখতে হবে।’

‘দেখতেই তো পাচ্ছেন। পাচ্ছেন না?’

‘না, পাচ্ছি না। আপনার অপূর্ব দেহটি আড়াল করে রেখেছে কিছু অপ্রয়োজীয় পোশাক। এইগুলি
খুলে ফেলুন। পোশাক আপনার জন্যে বাহ্যিক। এত সুন্দর একটি শরীরকে পোশাক ঢেকে রাখবে
এটা কিছুতেই আমি মেনে নিতে পারি না।’

সে খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর একে-একে খুলে ফেলল সব। শুধু গলায় রইল একটি চন্দ্রহার। সে
চন্দ্রহারও খুলে ফেলতে গেল। কিন্তু কবি চেঁচিয়ে উঠলেন, না না, চন্দ্রহার খোলার দরকার নেই।
চন্দ্রহার সরিয়ে ফেললে দেহের সমস্ত সৌন্দর্য একসঙ্গে আমার চোখে এসে পড়বে। আমি তা সহ্য
করতে পারব না।

গলায় শুধুমাত্র চন্দ্রহার পরে সে বাগানে হাঁটতে লাগল। আর রাজকবি একটি গাছের ছায়ায় তাঁর
কবিতার খাতা নিয়ে বসলেন। আকাশ ঘন নীল। সূর্য তার হলুদ ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে চারদিকে। বাতাসে
সেই হলুদ ফুলের নেশা-ধরানো গন্ধ। গাছে-গাছে পাখি ডাকছে।

গল্পের শেষ অংশ বেশ নাটকীয়। হঠাৎ বাগানে প্রবেশ করলেন রাজা। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রাজ-নর্তকী অপালার মৃত্যুদণ্ড হল। কবির চোখ অন্ধ করে দেয়া হল। অন্ধ কবি পথে-পথে ঘুরে বেড়ান এবং নর্তকীকে নিয়ে গীত রচনা করেন। অপূর্ব সব গীত। তিনি নিজেই তাতে সুর দেন। নিজেই গান। বনের পশু-পাখিরা পর্যন্ত সেই গান শুনে চোখের জল ফেলে।

পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে কবির লেখা গীত। গীতগুলি গদ্যের মতো সরল নয়। ছেলেমানুষি ছাড়া।

এই লেখার পর প্রায় দু' বছর আর কিছু লেখা হয় নি। দু' বছর পর হঠাৎ লেখা—আমার জীবন। গদ্য এখানে অনেক স্বচ্ছ, গতিময়। হাতের লেখাও বদলে গেছে। আগের গোটা-গোটা হরফ উধাও হয়েছে। এসেছে প্যাঁচানো ধরনের অক্ষর। আগের কোনো লেখায় কোনো রকম কাটাকুটি নেই। মনে হয় আগে অন্য কোথাও লিখে পরে খাতায় তোলা হত। আমার জীবন লেখাটিতে প্রচুর কাটাকুটি।

আমার জীবন

আমি কি খুব বুদ্ধিমতী? মনে হয় না। কেউ কোনো হাসির কথা বললে আমি বুঝতে পারি না। আজ বড় খালার বাসায় সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল। এটা যে ঠাট্টা, আমি বুঝতে পারি নি। কী নিয়ে কথা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। অবাক হয়ে সবার মুখের দিকে তাকাছি। বড় খালার মেয়ে বিনু হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। বড় খালা বললেন, কম বোঝাই তোমার জন্যে ভালো। বেশি বুঝলে বা বুঝতে চাইলে ঝামেলায় পড়বে। আমি এই কথাও মানে বুঝলাম না। মন-খারাপ করে বাসায় চলে এলাম। সারা দুপুর ভাবলাম। তখন একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হল—আমাকে বাবা এবং মা ছাড়া কেউ পছন্দ করেন না। যেমন বড় খালা, তিনি ছোট খালার ছেলেমেয়েকে তুই করে বলেন, মেজো খালার ছেলেমেয়েকে তুই করে বলেন; আমাকে বলেন তুমি করে।

সন্ধ্যাবেলা বাবাকে আমি এই কথাটা বললাম। বাবা চট করে খালাদের উপর রেগে গেলেন এবং বলতে লাগলেন—যাও কেন তাদের বাসায়? আর যাবে না। ওরাও এ-বাড়িতে আসবে না। দারোয়ানকে বলে দেব এলে যেন গেট খোলা না হয়।

বাবার রাগ যেমন চট করে ওঠে তেমনি চট করে নেমে যায়। এইবার তা হল না। কী লজ্জার কাণ্ড! পরদিন সকালবেলা বাবা বড় খালাকে টেলিফোন করে বললেন—আপনি সবাইকে তুই-তুই করে বলেন, আমার মেয়েটাকে তুমি বলেন কেন?

ভাগ্যিস বাবার এসব কাণ্ডকারখানা মা জানতে পারেন নি। জানলে খুব মন-খারাপ করতেন। মা'র হার্টের অসুখ খুব বেড়েছে। নড়াচড়াই করতে পারেন না। এই অবস্থায় মন-খারাপ করার মতো কোনো ঘটনা ঘটতে দেয়া উচিত নয়। কিন্তু বাবা এসব কিছু শুনবেন না। যা তাঁর মনে আসে, করবেন। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় মা'র এই অসুখের মূল কারণ হয়তো-বা বাবা। কী লিখছি আবোল-তাবোল, হার্টের অসুখের কারণ বাবা হতে যাবেন কেন? তাঁর মতো ভালো মানুষ ক'জন আছে?

আজ অনেক দিন পর অপালা তার খাতা নিয়ে বসেছে। কোনো কিছু লেখার উদ্দেশ্যে নয়। পুরনো লেখায় চোখ বোলানোর জন্যে। রাজ-নর্তকী গল্পটি সে পড়ছিল। এ-রকম একটা অদ্ভুত গল্প এত অল্প বয়সে সে কেন লিখেছিল ভাবতে-ভাবতে লজ্জায় গাল লাল হয়ে উঠল। এই গল্পটি ছিঁড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু খাতা থেকে পাতা ছিঁড়তে মায়া লাগে। এই গল্পটি এখন ভালো লাগছে না, আজ থেকে কুড়ি বছর পর

হয়তো-বা ভালো লাগবে।

‘আফা।’

অপালা চমকে তাকাল। রমিলা যে উঠে এসেছে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, সে লক্ষ্যই করে নি।

‘আফনেরে নিচে ডাকে।’

‘কে?’

‘ঐ যে দাড়িওয়ালা লোকটা, ঘর ঠিক করে যে।’

‘ও, আচ্ছা। বসতে বল, আমি আসছি।’

রমিলা গেল না, দাঁড়িয়ে রইল। অপালা শান্ত স্বরে বলল, ‘দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বলবে?’

‘আপনে দুপুরে কিছু খাইলেন না আফা।’

‘খিদে ছিল না।’

‘অখন এটু নাস্তাপানি আনি?’

‘আন। আর ঐ লোকটাকে আগামী কাল আসতে বল। আমার নিচে নামতে ইচ্ছা করছে না।’

‘জ্বি আচ্ছা।’

ফিরোজ ঘড়ি আনতে ভুলে গিয়েছে, কাজেই কতক্ষণ পার হয়েছে বলতে পারছে না। এই অতি আধুনিক বসার ঘরটিতে কোনো ঘড়ি নেই। সাধারণত থাকে। কোকিল-ঘড়ি বা এই জাতীয় কিছু। এক ঘন্টা পার হলেই খুট করে দরজা খুলে একটা কোকিল বের হয়। কু-কু করে মাথা ধরিয়ে দেয়। সময় পার হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপাটাই যন্ত্রণাদায়ক। এর মধ্যে কু-কু করে কেউ যদি সেটা মনে করিয়ে দেয়, তাহলে আরো খারাপ লাগার কথা। ঘড়ি চলবে নিঃশব্দে। কেউ জানতে চাইলে সময় দেখবে। যদি কেউ জানতে না-চায়, তাকে জোর করে জানানোর দরকার কী?

অ্যাসটেতে চারটি সিগারেট পড়ে আছে। এই থেকে বলা যেতে পারে, পঞ্চাশ মিনিটের মতো পার হয়েছে। পঞ্চাশ মিনিট অবশিষ্ট এক জন রাজকন্যার দর্শনলাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। রাজকন্যাদের জন্যে পঞ্চাশ ঘন্টা বসে থাকা যায়।

পর্দা সরিয়ে রমিলা ঢুকল, দাঁত কেলিয়ে বলল আফা আসতাকে। ফিরোজ মনে-মনে বলল, ধন্য হলাম। রাজকন্যার আগমনবাহিনী নকিব ঘোষণা করল। এখন সম্ভবত জাতীয় সঙ্গীত বাজবে—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

‘ফিরোজ সাহেব, আপনি কি ভালো আছেন?’

‘জ্বি, ভালো।’

‘আপনি ঐ দিন এসেছিলেন, আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, নিচে নামতে ইচ্ছা করছিল না। আপনি কিছু মনে করেন নি তো?’

‘না না, কিছু মনে করি নি। একা-একা বসে থাকতে আমার ভালোই লাগে।’

‘আপনার ঐ কাজের ব্যাপারটা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তিনি “ওকে” বলেছেন।’

‘প্রথমে তো আপনি “নো” বলে দিয়েছিলেন, আবার কেন.....’

‘আপনার চাকরি চলে যাবে বলছিলেন যে, তাই। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’

ফিরোজ বসল। বসতে গিয়ে মনে হল, এই মেয়েটি বসবে না। কথা বলবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। যে-কোনোভাবেই হোক, বুঝিয়ে দেবে, তুমি আর আমি একই আসনে পাশাপাশি বসতে পারি না। সেটা শোভন নয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মেয়েটি বসল। ফিরোজ বলল, ‘আমি অবশ্যি খুব ভয়ে-ভয়ে এসেছি। ভেবেছি আপনি গালাগালি করবার জন্যে আমাকে ডেকেছেন।’

‘কী আশ্চর্য। গালাগালি করব কেন?’

‘যেদিন আপনি আমার কাজ বন্ধ করে দিলেন, সেদিন রাগ করে আপনাদের একটা দামী কাপ ভেঙে ফেলেছিলাম।’

‘তাই নাকি। বাহ, বেশ তো!’

‘আপনি জানতেন না?’

অপালা অবাক হয়ে বলল, ‘সামান্য কাপ ভাঙার ব্যাপারে আমি জানব কেন?’

‘ও, আচ্ছা।’

‘আপনি যে-দিন ইচ্ছা কাজ শুরু করতে পারেন। যে-কোনো প্রয়োজনে আমাদের ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথা বললেই হবে। আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, নিচে সাধারণত নামি না।’

‘কিসের এত পড়াশোনা?’

‘অনার্স ফাইন্যাল।’

‘ও, আচ্ছা। আপনাকে অবশ্যি অনার্স ফাইন্যালের ছাত্রী মনে হয় না। মনে হয় কলেজ-টলেজে পড়েন।’

অপালা কিছু বলল না। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। ফিরোজ সেটা লক্ষ করল না। ফুটির ভঙ্গিতে বলতে লাগল, ‘পড়াশোনা করতে-করতে যদি ব্রেইন টায়ার্ড হয়ে যায়, তাহলে চলে আসবেন, আমি কাজ বন্ধ রেখে আপনার সঙ্গে গল্প-গুজব করব, ব্রেইন আবার ফ্রেশ হয়ে যাবে।’

‘তার মানে? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?’

ফিরোজ অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটির মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। ঠোঁট অল্প-অল্প কাঁপছে। এতটা রেগে যাবার মতো কিছু কি বলেছে?

‘আপনি হঠাৎ এমন রেগে গেলেন কেন? আমি অন্য কিছু ভেবে এটা বলি নি। আপনার চেয়ে অনেক-অনেক রূপবতী একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সেই মেয়েটিকে আগামী সপ্তাহে আমি বিয়ে করছি। দেখুন, তার ছবি দেখুন।’

ফিরোজ হাজি সাহেবের মেয়ের ছবিটি টেবিলে রাখল। তাগিয়াস ছবিটি সঙ্গে ছিল। মেয়েটি একদৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছি। ফিরোজ সহজ স্বরে বলল, ‘আপনাকে গল্প করতে এখানে আসতে বলার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আশা করি এটা আপনি বুঝতে পারছেন। আরেকটি কথা, যদি সে-রকম কোনো উদ্দেশ্য

আমার থাকে, তাহলে সেটা কি খুব দোষের কিছু? ভাগ্যগুণে বিরাট এক বড়লোকের ঘরে আপনার জন্ম হয়েছে, আমার ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না। তাই বলে আমার যদি আপনাকে ভালো লাগে, সেটা আমি বলতে পারব না? যদি বলি সেটা দোষের হয়ে যাবে?’

অপালা উঠে দাঁড়াল। ফিরোজ বলল, ‘কথার জবাব না-দিয়েই চলে যাচ্ছেন? আমি কাজ করব কি করব না, সেটা অন্তত বলে যান।’

‘কাজ করবেন না কেন? অবশ্যি আপনার ইচ্ছা না-করলে ভিন্ন কথা।’

ফিরোজ কাজে লেগে পড়ল। মতিনের ডিজাইন রাখল না। সম্পূর্ণ নিজের পরিকল্পনা। পছন্দ হলে হবে, না হলে হবে না। এক সপ্তাহ সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছ’টা পর্যন্ত কাজ। এর মধ্যে অপালাকে একটি বারের জন্যেও নিচে নামতে দেখা গেল না। এক বার কিছু সময়ের জন্যে বারান্দায় এসেছিল, ফিরোজের দিকে চোখ পড়তেই চট করে সরে গেল। অপমানিত হবার মতো ঘটনা, কিন্তু ফিরোজকে তা স্পর্শ করল না। এক বার কাজে ডুবে গেলে অন্য কিছু তার মনে থাকে না। দেয়ালের ডিসটেম্পার বদলাতে গিয়ে মনে-মনে ভাবল—এই অহঙ্কারী মেয়ে থাকুক তার অহঙ্কার নিয়ে, আমার কিছুই যায়-আসে না। ডিসটেম্পারের রঙ কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। তার প্রয়োজন আকাশি রঙ, কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। হয় বেশি গাঢ় হয়ে যাচ্ছে কিংবা বেশি হালকা। কড়া হলুদ এক বার দিয়ে দেখলে হয়। এতে রোদের এফেক্ট চলে আসতে পারে। হলুদ সবার অপছন্দের রঙ। ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে ম্যাজিকের মতো এফেক্ট সৃষ্টি হতে পারে। সে চতুর্থ বার ডিসটেম্পার বদলে আবার আগের নীল রঙে ফিরে গেল। গৃহসজ্জায় দেয়াল খুবই জরুরি। এই দেয়ালের রঙ ঘরকে বন্দি করে ফেলবে কিংবা মুক্তি দেবে।

কাজ শেষ হবার পরও অপালা দেখতে গেল না। রমিলাকে বলল, ‘চলে যেতে বল। আর ম্যানেজারবাবুকে বল টাকাপয়সা মিটিয়ে দিতে।’

‘দাড়িওয়ালা লোকটা আফনের পছন্দ হয়েছে কি না জানতে চায়।’

‘পছন্দ হয়েছে। বেশ পছন্দ হয়েছে।’

‘দেখলেন না তো আফা!’

‘দেখতে ইচ্ছা করছে না।’

অপালা তার দু’ দিন পর নিশানাথবাবুর সঙ্গে ঘর দেখতে গেল। তার বিশ্বয়ের সীমা রইল না। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! কি-রকম ফাঁকা-ফাঁকা শান্তি-শান্তি ভাব। মেঝেতে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কার্পেটের মতো শীতল পাটি। ছোট-ছোট বেতের চেয়ারে হালকা নীল রঙের গদি। চেয়ারগুলি একটি গোল সেন্ট্রাল টেবিলের চারপাশে এমনভাবে সাজানো, যেন পদ্মফুল ফুটে আছে। শীতল পাটিটিকে লাগছে দিঘির কালো জলের মতো। দেয়ালে একটিমাত্র জলরঙ ছবি। ঘন বন, মাঝখানে ছোট্ট একটি জলা। সেই জলার পানিতে আকাশের নীল রঙের ছায়া পড়েছে। একটি ছোট্ট মেয়ে সেই পানিতে ভাসছে। সমস্ত ঘরটায় একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব চলে এসেছে। অপালার বিশ্বয় কাটতে দীর্ঘ সময় লাগল।

‘ম্যানেজারবাবু, কেমন লাগছে আপনার কাছে?’

‘ভালোই তো!’

‘শুধু ভালোই তো! আরো কিছু বলুন।’

‘ছোকরা এলেমদার, তবে বিরাট ফকড়। যত টাকা নিয়েছে এই ঘর করতে, এর সিকি টাকাও লাগে না। ছোকরা বিরাট ফোরটোয়েন্টি।’

অপালা খিল-খিল করে হেসে উঠল। এ-রকম শব্দ করে সে কখনো হাসে না। নিশানাথবাবু এই মেয়েটির হঠাৎ এই উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে পারলেন না।

‘ম্যানেজারকাকু।’

‘বল মা।’

‘আপনি ফিরোজ সাবেহকে জানিয়ে দেবেন যে তাঁর সাজানো ঘর আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানানবেন।’

‘দরকার কী? কাজ করেছে পয়সা নিয়েছে।’

‘না, আপনি লিখবেন। আজই লিখবেন। কী লিখলেন, সেটা আমাকে দেখিয়ে নেবেন।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’

‘ম্যানেজারকাকু, ঐ ছবিটার দিকে দেখুন। একটা ছোট্ট মেয়ে পানিতে ভাসছে। আচ্ছা, মেয়েটা কি সাঁতার কাটছে, না পানিতে ডুবে মারা গেছে?’

‘হবে একটা কিছু।’

‘ছবিটার মধ্যে একটা গল্প আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, আপনার মধ্যে একটা কষ্টের ভাব হবে।’

নিশানাথবাবু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে বললেন, ‘কই, আমার তো কিছু হচ্ছে না।’

অপালা আবার খিল-খিল করে হেসে ফেলল।

ফখরুদ্দিন সাহেবের মেজাজ অল্পতেই খারাপ হয়। দেপার মাটিতে সেই মেজাজ প্রকাশের যথেষ্ট পথ থাকলেও বিদেশে সম্ভব হয় না। আজ একের পর এক যে-সব কাণ্ড ঘটেছে, তাতে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেলেও ঘোষের ছিল না। কিন্তু তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখেছেন। প্রেনে তাঁর পাশের সহযাত্রী অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে হড়-হড় করে বমি করল, তার খানিকটা এসে পড়ল তাঁর গায়ে। তিনি মুখ বিকৃত করে বললেন, ‘ইটস অলরাইট।’ এয়ার হোস্টেস সাবান-পানি দিয়ে তাঁর কোট কয়েকবার মুছে দিল। তবু বমির উৎকট গন্ধ গেল না। টয়লেটে গিয়ে কাপড় বদলানো যেত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটিমাত্র ব্রিফকেস। বড় স্যুটকেস দু’টি লাগেজ-কেবিনে।

প্রেন থেকে নামার সময়ও ছোট্ট দুর্ঘটনা-ঘটল। সিঁড়িতে বেকায়দায় পা পড়ে পা মচকে গেল।

ইমিগ্রেশন অফিসারের সঙ্গেও কিছু কথা-কাটাকাটি হল। অফিসারটি বলল, ‘তুমি লগুনে কী জন্যে যাচ্ছ।?’

তিনি বললেন, ‘তা দিয়ে তোমার কী দরকার? আমার পাসপোর্টে ভিসা দেয়া আছে। সেই ভিসায় আমি ঢুকব।’

‘তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কেন যাচ্ছ, বিজনেস টিপ, না প্রেজার টিপ?’

ফখরুদ্দিন সাহেব বিরস গলায় বললেন, ‘সর্দি ঝাড়ার জন্যে যাচ্ছি। তোমার এই দেশ নাকের সর্দি ফেলার জন্যে অতি উত্তম।’

‘তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করছ?’

‘হ্যাঁ, করছি।’

‘তোমার ব্রিফকেস খোল, হ্যাণ্ডব্যাগ খোল। চেকিং হবে।’

‘এক বার হয়েছে।’

‘আরো দশ বার হবে। তোমার সঙ্গে টাকাপয়সা কী পরিমাণ আছে?’

‘যথেষ্টই আছে।’

‘পরিমাণটা বল।’

‘পরিমাণ তোমাকে বলার প্রয়োজন দেখছি না। লিখিতভাবে আগেই এক বার বলা হয়েছে।’

‘সুবোধ বালকের মতো আরো এক বার বল।’

‘যদি বলতে না চাই?’

‘তুমি এস আমার সঙ্গে।’

‘কোথায়?’

‘তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’

‘অতি উত্তম প্রস্তাব। চল, যাওয়া যাক।’

ফখরুদ্দিন সাহেবকে তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হল। যখন ছাড়া পেলেন, তখন তাঁর শরীর অবসন্ন। একটু পর পর বমি আসছে। বমির বেগ সামলাতে হচ্ছে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা।

হোটেল পৌছেই বাংলাদেশে কল বুক করতে চাইলেন। বলা হল—স্যাটেলাইটে ডিসটারবেন্স আছে, ওভারসিজ কল ছ’ ঘণ্টার আগে করা যাবে না।

হেলেনার খোঁজে তাঁর নার্সিং হোমে টেলিফোন করলেন। এয়ারটেল ডেন্ট নার্স বলল, ‘পেসেন্ট ঘুমুচ্ছে।’

ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, ‘আমি ওর স্বামী।’

নার্স মধুর হেসে বলল, ‘তুমি পেসেন্টের স্বামীই হও বা প্রেমিকই হও, হাটের রুগীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা যাবে না। সকাল আটটায় টেলিফোন করো, কেমন? এখন শান্ত হয়ে ঘুমাও। রাত কত হয়েছে সেটা বোধহয় তুমি জান না। গুড নাইট।’

রুম-সার্ভিসকে কফি দিতে বলেছিলেন। সেই কফি এল এক ঘণ্টা পর। চুমুক দিয়ে তাঁর মনে হল, তিনি কুইনাইন-গোলা গরম পানি খাচ্ছেন।

সারা রাত তাঁর ঘুম হল না। ছটফট করতে লাগলেন। শেষরাতের দিকে প্রবল জ্বরে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল। তাঁর মনে হল এই হোটেল তাকে মরতে হবে। আত্মীয়-পরিজনহীন নির্জন একটি ঘরে। শেষ মুহূর্তে পানি-পানি করে চোঁচাবেন—কেউ শুনবে না। কোনো প্রিয় মানুষের মুখ দেখতে চাইবেন, দেখতে পারবেন না।

প্রিয় মুখ এই সংসারে তাঁর নেই। বাবার মুখ আবছাভাবে মনে পড়লেও মা’র মুখ

মনে পড়ে না। বাবার মুখও অস্পষ্ট, তাঁর মুখে বসন্তের দাগ ছিল। মাথায় চুলগুলি ছিল লালচে ধরনের কৌকড়ানো। স্মৃতি বলতে এই। অবশ্যি এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা কোনোকালেই ছিল না। যা চলে গিয়েছে, তা নিয়ে বুক চাপড়ানো এক ধরনের বিলাসিতা। এই বিলাসিতা কবি এবং শিল্পীর জন্যে ঠিক আছে। তাঁর জন্যে ঠিক নয়। তাঁর চোখ পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে।

তিনি রুম-সার্ভিসের বোতাম টিপলেন। লাল বাতি জ্বলে জ্বলে উঠছে। কেউ আসছে না। অসম্ভব ক্ষমতাবান লোকেরা প্রায় সময়ই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যায়।

দরজায় নক হচ্ছে। কেউ বোধহয় এসেছে। ফখরুদ্দিন সাহেব বহু কষ্টে বললেন, 'কাম ইন।'

লালচুলের বেঁটেখাটো এক জন মহিলা উঁকি দিল। ভয়-পাওয়া গলায় বলল, 'তোমার কী হয়েছে?'

ফখরুদ্দিন সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন।

মনে হচ্ছে ফিরোজের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে।

বি. করিম সহেবের বন্ধু তাঁকে সহকারী ডিজাইনার হিসেবে নিয়েছেন। তদ্রূপে ছোটখাটো। মাগুর মাছের মতো কালো রঙ। ফিটফাট বা বু সেজে থাকেন। তাঁর কাছে গেলেই আফটার শেভ লোশনের কড়া গন্ধে মাথা ধরে যায়। তাঁর নাম মস্তাজ মিয়া। ছবির লাইনে পনের বছর ধরে আছেন। এখন পর্যন্ত কোনো ছবি হিট করে নি। তাঁর ধারণা, এবারের ছবিটি করবে। ছবির নাম 'নয়া জিন্দেগি'—ইংরেজিতে ফ্রেশ লাইফ, নিউ লাইফ নয়।

এই ছবি হিট করবে, এ-রকম আশা করার সম্ভব কারণ আছে। ছবিতে তিন জন হিরোইন। দু' জন মারা যায়। শেষ পর্যন্ত এক জন টিকে থাকে। হিরোইন নয়া জিন্দেগি শুরু করে। ছ'টা গান আছে। প্রতিটি গানই কোলকাতার আর্টিস্টদের দিয়ে গাওয়ানো। ব্যালে ড্যান্স আছে, যা রেকর্ড করা হয়েছে কোলকাতার এক ক্যাবারেতে। প্রিন্সেস সুরাইয়া এমন এক ড্যান্স দিয়েছে, যা দেখে এই বড়ো বয়সেও মস্তাজ মিয়ার বুক ধরফড় করে। সেঙ্গার এই জিনিস কেটে দিলে সুখশীল হবে। ছবির অর্ধেক কাজ বিদেশে হয়েছে, বাকি অর্ধেক দেশে হবে। বেশির ভাগই আউটডোরে। ইনডোরে হিরোর বসার ঘর এবং বারান্দা। এমন সেট করতে হলে খাতে রিকশাওয়ালা শ্রেণীর দর্শকদের চোখ কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসে। ক্রমাগত সিটি বাজারে থাকে।

মস্তাজ মিয়ার সঙ্গে ফিরোজের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল :

'তুমি করে বললে আপত্তি আছে?'

'জ্বি-না।'

'শুড। সবাইকে আমি তুমি করে বলি। এ-দেশের যে টপ নায়িকা, যার সাইনিং মানি পাঁচশ হাজার টাকা, তাকেও তুমি করে বলি।'

ফিরোজ তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

‘তুমি কাজে লেগে পড়। কীভাবে কী করতে হয়, আগে শেখ। আমি যা চাই সেটা হচ্ছে গ্রামার। জি এল এ এম ও ইউ আর। বুঝলে?’

‘জ্বি, বুঝলাম।’

‘বোম্বের ছবিগুলি দেখ। দেখে কাজ শেখ।’

‘হ্যাঁ, তাই করব।’

‘বি করিম সাহেব বলেছেন, তুমি প্রতিভাবান লোক। সত্যি নাকি?’

‘জ্বি-না, সত্যি না।’

‘গুড। ভেরি গুড। জি ও ও ডি। প্রতিভাবান লোকদের দিয়ে কিছু হয় না। আমি চাই কাজ। ওয়ার্ক। ডাবলিউ ও আর কে। বুঝলে?’

‘জ্বি, বুঝলাম।’

‘মদ্যপানের অভ্যাস আছে?’

‘না।’

‘অল্পসল্প খেতে পার। এতে দোষ নেই। অল্প খেলে মেডিসিনের মতো কাজ করে। ব্রেইন শার্প হয়। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলি যে এতদূর এগিয়ে গেছে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে—এর পিছনে অ্যালকোহলের একটা ভূমিকা আছে বলে আমার ধারণা।’

‘আপনার ধারণা সত্যি হবারই সম্ভাবনা।’

‘নায়িকাদের সঙ্গে খাতির জমাবার চেষ্টা করবে না। দূর থেকে ম্যাডাম বলে স্নামালিকুম দেবে। তারপর ভ্যানিশ হয়ে যাবে। ফিল্ম লাইনে তোমার হবে বলে আমার ধারণা।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ। আমার ই এম পি ক্ষমতা আছে। আগেভাগে বলে ফেলতে পারি। মন্দিরা যখন প্রথম ফিল্ম লাইনে আসে, তাকে দেখেই আমি বললাম, তোমার হবে।’

‘হয়েছে?’

‘হয়েছে মানে। দু’ লক্ষ টাকার আর্টিস্ট এখন। শিডিউল নিতে হয় এক বছর আগে। আমাকে এখনো খুব মানে। সেদিন এক পত্রিকার ইন্টারভিউতে আমার নাম বলেছে।’

‘মন্দিরা কাজ করছে নাকি আপনার ছবিতে?’

‘তুমি এখন ফিল্ম লাইনের লোক। নায়িকাদের নাম ধরে কথা বলবে না। এখন থেকে প্র্যাকটিস কর। বল—মন্দিরা ম্যাডাম।’

ফিরোজ হেসে বলল, ‘মন্দিরা ম্যাডাম।’

‘হাসবে না। ফিল্ম লাইনে দাঁত বের করতে নেই। আচ্ছা, এখন যাও। কাল দু’ নম্বর স্টুডিওতে চলে আসবে।’

ফিরোজ সেট তৈরি করে দিল। মন্তাজ মিয়া চোখ-মুখ কুঁচকে দীর্ঘ সময় সেই সেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফিরোজ বলল, ‘মনে হচ্ছে আপনার মনমতো হয় নি?’

মন্তাজ মিয়া তারও জবাব দিলেন না।

‘পছন্দ না হলে অদলবদল করে দেব। হাতে তো সময় আছে।’

‘পছন্দ হয়েছে। ছোকরা, তোমার হবে।’

সেই সপ্তাহেই মধুমিতা মুভিজ-এর ব্যানারে নতুন যে-ছবিটি হবে, তার চীফ ডিজাইনার পদের অফার ফিরোজের কাছে চলে এল। ফিরোজ বলল, 'ভেবে দেখি।'

মধুমিতা মুভিজ-এর মালিক বললেন, 'ক'দিন লাগবে ভাবতে?'

'সপ্তাহখানেক লাগবে।'

'বেশ, ভাবুন। সপ্তাহখানেক পর আবার যোগাযোগ করুন। আপনার টেলিফোন আছে?'

'জি-না।'

'একটা টেলিফোন নিয়ে নিন। ছবির লাইনে টেলিফোনটা খুবই দরকারি।'

'নিয়ে নেব। শিগগিরই নিয়ে নেব। তারপর একটা গাড়ি কিনব। লাল রঙের। টু-ডোর। গাড়ি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে? মানে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ?'

পর-পর দু'দিন ফিরোজ ঘুমিয়ে কাটাল।

এ-রকম সে করে। তার ভাষায়, দুঃসময়ের জন্যে ঘুম ষ্টক করে রাখা। সেই ষ্টক-করা ঘুমের কারণে ভবিষ্যতে কোনো রকম আলস্য ছাড়াই না-ঘুমিয়ে থাকতে পারে। উট যেমন দুঃসময়ের জন্যে পানি জমা করে রাখে, অনেকটা সে-রকম। শুধু দুপুরে খাবার সময় পাশের 'ইরাবতী' হোটেলে খেতে গেছে। বাংলাদেশ হওয়ায় এই একটি লাভ ; সুন্দর-সুন্দর নামের ছড়াছড়ি। পানের দোকানের নাম 'ময়ূরাক্ষী'; জুতোর দোকানের নাম 'সোহাগ পাদুকা'।

ইরাবতী রেস্টুরেন্টের নাম হওয়া উচিত ছিল- 'নালাবতী'। পাশ দিয়ে কর্পোরেশনের নর্দমা গিয়েছে। নর্দমাগুলি বানানোর কায়দা এমন যে, পানি চলে যায়, কিন্তু ময়লা জমা হয়ে থাকে। সেই পৃথিবীকর্ময় নরকের পাশে খাবার ব্যবস্থা। তবে রান্না ভালো। পচা মাছও এমন করে রোধে দেয় যে দ্বিতীয় বার যেতে ইচ্ছে করে। ইরাবতী রেস্টুরেন্টে ফিরোজের তিন শ' টাকার মতো বাকি ছিল। সে বাকি মিটিয়ে আরো দু'শ' টাকা অ্যাডভান্স ধরে দিল। দিনকাল পান্টে গেছে। অ্যাডভান্স পেয়েও লোকজন খুশি হয় না। ম্যানেজার এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কিছুক্ষণ আগে একটি জ্যান্ত ইঁদুর গিলে ফেলেছে। সেই ইঁদুর হজম হয় নি, পেটে নড়াচড়া করছে।

ফিরোজ বলল, 'আছেন কেমন ভাইসাব?'

'ভালোই। আপনারা তো দেখি না।'

'সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত। সিনেমায় নেমে পড়েছি, বুঝেন?'

ম্যানেজার ফুস করে বলল, 'ভালোই।'

'আপাতত হিরোইনের বড় ভাইয়ের খেঁজ করছি। মোটামুটি একটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার। বই রিলিজ হলে দেখবেন। পাস দিয়ে দেব।'

'নাম কী বইয়ের?'

'নয়া জিন্দেগি। হিট বই হবে।'

ফিরোজ রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে মিষ্টি পান কিনল। রাতে আর খেতে আসবে না। ঘরেই যা হোক কিছু খেয়ে নেবে, কাজেই পাউরুটি, কলা এবং এক কৌটা মাখন কিনল। বাজারে নতুন বরই উঠেছে, খেতে ইচ্ছা করছে। ভাংতি টাকা সব শেষ। একটা

পাঁচ শ' টাকার নোট আছে, সেটা ভাঙতে ইচ্ছা করছে না। বরই না-কিনেই সে ফিরে এল। ছেলেমানুষি একটা আফসোস মনে জেগে রইল।

হাজি সাহেব বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে আছেন। ফিরোজ হাসিমুখে এগিয়ে গেল।

‘সলামলিকুম।’

‘ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ফিরোজ সাহেব?’

‘জ্বি, ভালো।’

‘ক’দিন ধরে দেখি না আপনাকে?’

‘দারুণ ব্যস্ত। আজ একটু ফাঁকা পেয়েছি, তাবলাম আপনাকে জরুরি কথাটা বলে যাই।’

‘কী জরুরি কথা?’

‘ঐ যে আপনার মেয়ের ছবি নিয়ে গেলাম যো।’

‘ও, আচ্ছা। বসেন, চা খাবেন?’

‘তা খাওয়া যায়।’

হাজি সাহেব ভেতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলেন। ফিরে এসে আগ্রহী চোখে তাকিয়ে রইলেন।

‘ঐ যে আপনার কাছ থেকে ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম, ছবি দেখে সবার এক কথা—মেয়ে কি ছবির মত সুন্দর? ফটোজেনিক ফেস ভালো থাকলে অনেক সময় এলেবেলে মেয়েকেও রাজকন্যার মতো লাগে।’

হাজি সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

‘মেয়ে যদি ছবির কাছাকাছিও হয়, তাহলেও ওদের কোনো আপত্তি নেই। যেদিন বলবেন, সেদিনই বিয়ে।’

আপনি কি মেয়ের অসুবিধার কথাটা বলেছেন?’

‘পাগল হয়েছেন। এখন আমি এইসব বলব? কথাবার্তা মোটামুটি পাকা হয়ে যাবার পর খুব কায়দা করে.....।’

‘না, যা বলবার এখনই বলবেন। মেয়েকে আমি একটা বাড়ি নিশ্চয় দেব, এটাও বলবেন। ৪৩ কঁঠাল বাগান। একতলা বাড়ি। ইচ্ছা করলে বাড়ি ঠিকঠাক আসতে পারেন।’

‘মেয়েই দেখলাম না, আর বাড়ি।’

‘বাড়িটাই লোকে আগে দেখে, মেয়ে দেখে পরে। তবে মেয়েকে আপনি দেখবেন। আসতে বলেছি। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।’

তারা বসার ঘরে পা দেয়ামাত্র হাজি সাহেবের মেয়েটি ঘরে ঢুকল। কী শান্ত, স্নিগ্ধ মুখ। গভীর কালো চোখে ডুবে আছে চাপা কষ্ট। সেই কষ্টের জন্যেই বুঝি এমন টলটলে চোখ।

ফিরোজ বলল, ‘দাঁড়িয়ে আছ কেন, বস।’

মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে বসল। তার আচার-আচরণে কিছুমাত্র জড়তা লক্ষ করা গেল না। সে সরাসরি তাকিয়ে আছে, চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না।

‘কি নাম তোমার?’

‘লতিফা।’

‘প্রায় চার বছর তোমাদের এদিকে আছি। নামটা পর্যন্ত জানি না। খুবই অন্যায়।
তুমি কি আমার নাম জান?’

‘জানি।’

হাজি সাহেব বললেন, ‘লতিফা, তুই এখন ভেতরে যা। চা দিতে বল।’

লতিফা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে চলে গেল। ফিরোজ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ফেলল।

তার ইচ্ছে করছে, বলে—পাত্র হিসেবে আমাকে আপনার কেমন লাগে?

বলা হল না। আধুনিক সমাজে বাস করার এই অসুবিধে। মনের কথা খোলাখুলি
কখনো বলা যায় না। একটি মেয়েকে ভালো লাগলেও তাকে সরাসরি সেই কথা বলা
যাবে না। অনেক ভণিতা করতে হবে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হবে।

হাজি সাহেব বললেন, ‘আমার মেয়েটা বড় আদরের।’

ফিরোজ কিছু বলল না। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে রাস্তায় বেরিয়ে
পড়তে ইচ্ছে করছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটার একটা আলাদা মজা আছে। যে-কোনো
দিকে যাওয়া যায়, যেখানে ইচ্ছে সেখানে থেমে যাওয়া যায়। এই সৌভাগ্য ক’জনার
হয়? সবাই ব্যস্ত। সবাই ছুটছে। এর মধ্যে দু’-এক জন অন্য রকম থাকুক না, যাদের
ছোট্ট ইচ্ছে নেই, প্রয়োজনও নেই।

এখন প্রায় বিকেল। হাঁটতে-হাঁটতে অপালাদের বাড়ির সামনে চলে যাওয়া যায়।
কেন জানি এই অহঙ্কারী মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তার কঠিন মুখ, চোখের
তীব্র দৃষ্টিও কেন জানি মধুর। এর ব্যাখ্যা কী? কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই রহস্যময়
পৃথিবীর অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি, দার্শনিক, শিল্পী—এঁরা ব্যাখ্যা
করার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা কত যুগ আগে শুরু হয়েছে, এখনও চলছে। ব্যাখ্যা
সম্পূর্ণ হয় নি।

‘ফিরোজ সাহেব, কী ভাবছেন?’

‘কিছু ভাবছি না। শরীরটা খারাপ লাগছে।’

‘সে কী!’

‘আজ আর চা-টা কিছু খাব না। ডাক্তারের কাছে যাব। বমি-বমি লাগছে।’

ফিরোজ বমির ভঙ্গি করে চোখ-মুখ উন্টে দিয়ে বলল, ‘কাল রাত্রেও চার বার
বমি হয়েছে। আমি উঠলাম।’

অপালাদের বাড়ির সামনে ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তাকে
দেখা না-যায়। মানুষের অদৃশ্য হবার ক্ষমতা থাকলে কি হয়। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে
দেখা যেত সে কী করছে। এই মুহূর্তে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। চেইনে বাঁধা ভয়াবহ
কুকুর দু’টি চেইন ছিঁড়ে ফেলবার একটা কসরত করছে। মালীকে নিড়ানি হাতে দেখা
যাচ্ছে। এ-ছাড়া সব ফাঁকা।

‘স্যার।’

ফিরোজ চমকে উঠল।

‘আপনাকে ডাকে স্যার।’

‘কে ডাকে?’

‘আপা আপনাকে যাইতে বলছে।’

‘কোন আপা?’

‘অপালা আপা।’

‘সে কী! কোথায় তিনি?’

অপালাদের দারোয়ান তার উত্তর দিল না। দারোয়ান-শ্রেণীর লোকেরা কথা কম বলে।



মেয়েটিকে সম্পূর্ণ অন্য রকম লাগছে। ফিরোজ ভেবে পেল না একই মেয়েকে একেক দিন একেক রকম লাগে কেন। এর পিছনের রহস্যটা কী? সাজগোজের একটা ব্যাপার থাকতে পারে। তার ভূমিকা কতই-বা আর হবে? চোখে কাজল দিয়ে চোখ দু’টিকে টানা-টানা করা যায়। চুল মাঝখানে সিঁথি না-করে বাঁ দিকে করে খানিকটা বদলানো যায়। পার্ম করে চুলে ঢেউ খেলানো নিয়ে আসা যায়, কিন্তু তার পরেও তো মানুষটি ঠিকই থাকবে।

‘বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’

ফিরোজ বসল। বসতে-বসতে মনে হল অপালায় গলার স্বরও এখন অন্য রকম লাগছে। একটু যেন ভারী। আগেকার তরল কণ্ঠস্বর নয়।

‘আপনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর আগেও একদিন এসে ছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যান। কেন বলুন তো?’

ফিরোজ কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু এই মুহূর্তেই বলা উচিত। মেয়েটি জবাব শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছে। জবাবের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। জবাব যদি তার পছন্দ হয়, তাহলে সে ফিরোজের সামনের চেয়ারটায় বসবে, পছন্দ না-হলে বসবে না। অহঙ্কারী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

অপালা বলল, ‘আপনার যদি আপত্তি থাকে তাহলে বলার দরকার নেই।’

‘না, কোনো আপত্তি নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হবে এই মুহূর্তেই দাঁড়িয়ে থাকি। দু’ দিন মাত্র নয়, তার আগেও কয়েক বার এসেছি।’

ফিরোজ লক্ষ করল, মেয়েটির চেহারা কঠিন হতে শুরু করেছে। কী প্রচণ্ড রাগ এই মেয়ের। গাল কেমন টকটকে লাল হয়ে গেল—ঠিক কীপছে। মেয়েটি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। সামলাতে পারছে না। মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই মেয়ের তেমন অভ্যাস নেই। অভ্যাস থাকলে খুব সহজেই নিজেকে সামলাতে পারত। ফিরোজ বলল, ‘আমার সব কথা না শুনেই আপনি রেগে যাচ্ছেন। সবটা আগে শোনা ভালো নয় কি?’

‘বলুন, শুনছি।’

‘আপনি বসুন, তারপর বলছি। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসে-বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলব, তা তো হয় না। আর আপনি যদি মনে করেন যে আমার স্তর আর আপনার স্তর আলাদা, তাহলে অবশ্যি ভিন্ন কথা।’

অপালা বসল। সে তাকিয়ে আছে ফিরোজের দিকে, এক বারও চোখ ফিরিয়ে

নিচ্ছে না। এটিও একটা মজার ব্যাপার! এই বয়সের অবিবাহিত মেয়েরা দীর্ঘ সময় পুরুষমানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। অসংখ্য বার তারা চোখ নামিয়ে নেয়।

‘কি বলবেন, বলুন।’

‘আমি নিজের মতো করে আপনাদের একটা ঘর সাজিয়ে দিয়েছি। সেটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে কি হয় নি আমাকে কিছু বলেন নি। আমার জানতে ইচ্ছা করে। জানবার জন্যেই আসি।’

‘আসেন তো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?’

‘আপনাদের দু’টি বিশাল কুকুর আছে। আমি কুকুর ভয় পাই। ছোটবেলায় আমাকে দু’বার পাগলা কুকুরে কামড়েছে।’

অপালার কঠিন মুখ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। গালের লাগ রঙ এখন অনেকটা কম, নিঃশ্বাস সহজ।

‘আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি ম্যানেজারকাকুকে বলেছিলাম, চিঠিতে আপনাকে জানানোর জন্যে। তিনি বোধহয় জানাতে ভুলে গেছেন।’

‘চিঠিতেই যখন জানানোর জন্যে বলেছেন, আপনি নিজেও তো জানাতে পারতেন। পারতেন না?’

‘হ্যাঁ, পারতাম।’

‘কাজ আপনার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। এখন তাহলে উঠি।’

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। মনে ক্ষীণ আশা, মেয়েটি বলবে, বসুন, চা খেয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা এইটুকু ভদ্রতা সে কি করবে না?’

অপালা বলল, ‘আপনি বসুন। আমার সঙ্গে চা খান।’

ফিরোজ সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়ল। একবার ভেবেছিল রাগ দেখিয়ে বলবে—চা লাগবে না। সেটা বিরাট বোকামি হত। এ যে—ধরনের মেয়ে, দ্বিতীয় বার অনুরোধ করবে না। দু’জন চুপচাপ বসে আছে। মেয়েটি চায়ের কথা বলার জন্যে ভেতরে যাচ্ছে না, কিংবা কাউকে ডেকেও কিছু বলছে না। এই পয়েন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হল, মেয়েটি তাকে ডাকতে পাঠাবার আগেই বলে দিয়েছে—আমরা খানিকক্ষণ গল্প করব, তখন আমাদের চা দেবে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ সে গল্প করবে।

অপালা বলল, ‘আসুন, আমরা বারান্দায় বসে চা খাই। আমার চা খাবার একটা আলাদা জায়গা আছে। বিকেলের চা বন্ধ ঘরের ভেতর বসে খেতে ইচ্ছা করে না।’

চা খাবার জায়গাটি অপূর্ব। যেন একটি পিকনিক স্পট। চারিদিকে ফুলের টব। বড়-বড় কসমস ফুটে রয়েছে। দিনের সামান্য আলোতেও তারা আনন্দে ঝলমল করছে। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সেই সরঞ্জাম দেখে ফিরোজ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপল। কারণ একটিমাত্র চায়ের কাপ। ওরা এক জনের চা-ই দিয়েছে।

অপালা টেবিলের পাশে দাঁড়ানো মেয়েটিকে বলল, ‘অরুণা ও বরুণাকে বেঁধে রাখতে বল। আরেকটি চায়ের কাপ দিয়ে যাও।’

কাজের মেয়েটি সন্দেহজনক দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে যাচ্ছে। কর্মচারীর মতো যে ঢুকেছে, সে মুনিবের মেয়ের সঙ্গে চা খাচ্ছে, দৃশ্যটিতে সন্দেহ করার মতো অনেক কিছুই আছে।

‘আমার চায়ের জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে?’

‘খুব ভালো লাগছে।’

‘আপনার বোধহয় একটু শীত-শীত লাগছে। এ-রকম একটা পাতলা জামা পরে কেউ শীতের দিনে বের হয়।’

আহ, কী সহজ-স্বাভাবিক সুরে মেয়েটি কথা বলছে! কী প্রচুর মমতা তার গলায়! ফিরোজের মন কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেল।

‘আপনার বিয়েটা এখনো হয় নি, তাই না?’

‘কোন বিয়ে?’

‘ঐ যে একটি মেয়ের ছবি দেখালেন। বলছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে হবে।’

‘ও, আচ্ছা। না, এখনো হয় নি। সামনের মাসে হবার সম্ভাবনা। মেয়ের এক চাচা আমেরিকাতে থাকেন। ছুটি পাচ্ছেন না বলে আসতে পারছেন না। মেয়ে আবার খুব আদরের। কেউ চায় না যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিয়ে হোক। বাঙালি হচ্ছে সেন্টিমেন্টাল জাত, বুঝতেই পারছেন।’

প্রচুর মিথ্যা বলতে হয় বলেই মিথ্যা বলার আর্ট ফিরোজের খুব ভালো জানা। মিথ্যা কখনো এক লাইনে বলা যায় না। মিথ্যা বলতে হয় আঁটঘাট বেঁধে। সত্যি কথার কোনো ডিটেল ওয়ার্কের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মিথ্যা মানেই প্রচুর ডিটেল কাজ।

অপালা বলল, ‘আপনি যে এখনো বিয়ে করেন নি, সেটা কীভাবে বুঝলাম বলুন তো?’

‘কীভাবে বুঝলেন?’

‘আপনার গায়ের পাতলা জামা দেখে। এই ঠাণ্ডায় আপনার স্ত্রী কিছুতেই এমন একটা জামা গায়ে বাইরে ছাড়তেন না।’

ফিরোজ লক্ষ করল, মেয়েটি ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে হাসছে, যেন এই বিরাট আবিষ্কারে সে উল্লসিত।

‘আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন?’

‘হ্যাঁ, খাব। এক কাপ খেলে খালে পড়ার সম্ভাবনা।’

‘আপনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব অহঙ্কারী মেয়ে ভেবে বসে আছেন, তাই না? আমি কিন্তু মোটেই অহঙ্কারী না।’

‘তাই তো দেখছি।’

‘একা-একা থাকতে-থাকতে স্বভাবটা আমার কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে।’

‘একা-একা থাকেন কেন?’

‘ইচ্ছা করে কি আর থাকি? বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। মা অসুস্থ। বাবা সারাফ্ফণই বাইরে-বাইরে ঘুরছেন।’

‘অন্য আত্মীয়স্বজনরা আসেন না?’

‘না।’

‘কেন?’

‘জানি না কেন। আমাকে বোধহয় পছন্দ করেন না।’

‘আপনাকে পছন্দ না-করার কী আছে? আমার তো মনে হয় আপনার মতো চমৎকার মেয়ে এই গ্রহে খুব বেশি নেই।’

ফিরোজ লক্ষ করল, মেয়েটি আবার রেগে যাচ্ছে। তার মুখে আগের কাঠিন্য ফিরে

আসছে। ফিরোজের আফসোসের সীমা রইল না। অপালা বলল, ‘আসুন, আপনাকে গेट পর্যন্ত আগিয়ে দিই।’

অর্থাৎ অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় বলা—বিদেয় হোন। ফিরোজের মন—খারাপ হয়ে গেল। আরেক বার আসার আর কোনো উপলক্ষ নেই। দিন সাতেক পর সে যদি এসে বলে—ঐদিন একটা খাম কি আপনার এখানে ফেলে গেছি—তাহলে তা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? মনে হয় না। এই মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী।’

সে গेट পর্যন্ত ফিরোজের সঙ্গে-সঙ্গে এল, কিন্তু একটি কথাও বলল না। ফিরোজ যখন বলল, ‘যাই তাহলে।’ সে তার জবাবেও চুপ করে রইল। শুধু দারোয়ানকে বলল, ‘অরুণা এবং বরুণাকে এখন ছেড়ে দাও।’

নিশানাথবাবু রাতের বেলা খবর নিতে এলেন। এই মানুষটি সাধারণত খুব হাসিখুশি। কিন্তু আজ কেমন যেন গম্ভীর লাগছে। মুখে খুব চিন্তিত একটা ভঙ্গি। অপালা বলল, ‘ম্যানেজারকাকু, আপনার কি শরীর খারাপ?’

‘না, শরীর ভালোই আছে।’

‘বাবার কোনো খবর পেয়েছেন?’

‘না। ইংল্যান্ডে পৌঁছেছেন, সেই খবর জানি। তারপর আর কিছু জানি না। স্যার মাঝে-মাঝে এ-রকম ডুব মারেন, তখন সব সমস্যা একসঙ্গে শুরু হয়।’

‘কোনো সমস্যা হচ্ছে কি?’

‘না, তেমন কিছু না।’

নিশানাথবাবু এড়িয়ে গেলেন। অপালার মনে হল, বড় কোনো সমস্যা হয়েছে। কারখানাসংক্রান্ত কোনো সমস্যা, যা এরা অপালাকে বলবে না। অপালারও এ-সব শুনতে ইচ্ছে করে না। সমস্যা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

‘ম্যানেজারকাকু!’

‘কি মা?’

‘ফিরোজ বলে যে—ছেলেটি আমাদের ঘর ঠিক করে দিল, তাকে একটি চিঠি দিতে বলেছিলাম, দেন নি কেন?’

নিশানাথবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘দিয়েছি তো!’

‘ও, তাহলে উনি বোধহয় পান নি। রেজিস্ট্রি করে দেয়া দরকার ছিল।’

‘রেজিস্ট্রি করেই তো দিয়েছি। চিঠির সঙ্গে একটা রেভিনিউ স্ট্যাম্প-বসানো রিসিট ছিল। উনি তো সেখানে সই করে ফেরত পাঠিয়েছেন। কাজেই আমার চিঠি না-পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আমি বরং কাল তাকে জিজ্ঞেস করব।’

‘না, জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।’

নিশানাথবাবু ইতস্তত করে বললেন, ‘ছেলেটি আজ এখানে এসেছিল, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

‘এদের বেশি প্রশয় দেয়া ঠিক না, মা। কাজ করেছে টাকা নিয়েছে, ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আবার এসে এত কিসের চা খাওয়াখাওয়া!’

অপালা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। নিশানাথবাবুর হঠাৎ এখানে আসার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হচ্ছে। তিনি এমনি-এমনি আসেন নি। নিশ্চয়ই তাঁকে খবর দেয়া হয়েছে।

টেলিফোনে জানানো হয়েছে।

‘মা অপালা।’

‘জ্বি।’

‘তুমি একা-একা থাক, তোমার বোধহয় খারাপ লাগে।’

‘না, আমার খারাপ লাগে না।’

‘খারাপ না-লাগলেও লোনলি তো নিশ্চয়ই লাগে। আমি তোমার কাকিমাকে বলেছি, সে এসে থাকবে।’

‘কোনো দরকার নেই।’

‘না, দরকার আছে।’

‘বেশ, দরকার থাকলে তাঁকে নিয়ে আসুন। তবে আপনি কিন্তু কাকু শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন। ঐ ছেলে আর এখানে আসবে না।’

নিশানাথবাবুকে কোনো কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে অপালা উঠে গেল। তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।



ফখরুদ্দিন সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ‘আমি একটা টেলিফোন করব। দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।’

যে-নার্স তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে, সে বলল, ‘আরো একটু ভালো হয়ে নাও, তারপর করবো।’

‘আমি ভালো আছি।’

‘তুমি মোটেও ভালো নও। খুবই অসুস্থ।’

‘কতটা অসুস্থ?’

‘অনেকটা। তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে—ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফিরে এসেছ।’

‘এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাকে একটি টেলিফোন করতে দাও।’

‘নিশ্চয়ই করবে। আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে চাও তো—ব্যবস্থা আমরা করেছি। তোমাদের এম্বাসিকে জানানো হয়েছে। তারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।’

‘আমাদের এম্বাসির কাজকর্ম সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। ওরা কিছুই করে নি। যে-নোট তোমরা পাঠিয়েছ, সেই নোট এখনো পড়ে নি। খাম খোলা হয় নি বলেই আমার ধারণা।’

নার্স কোনো কথা বলল না। ফখরুদ্দিন সাহেবের বাঁ হাতে একটি ইনজেকশন করল। ফখরুদ্দিন সাহেব আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল রাত ন’টায়। টেলিফোনে প্রথম কথা বললেন অপালার সঙ্গে।

‘বাবা, তুমি সবাই চিন্তায় অস্থির। তোমার কোনো খোঁজ নেই। মা’র সঙ্গে ঐ দিন কথা হল, মাও তোমার কোনো খোঁজখবর জানে না। তুমি আছ কেমন?’

‘খুব ভালো আছি।’

‘গলার স্বর এমন লাগছে কেন?’

‘সর্দি লেগেছে। কথাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন তো তাও কথা বলতে পারছি।’

‘তুমি কথা বলছ কোথেকে?’

‘লগুন থেকেই বলছি।’

‘এতদিন ডুব মেরে ছিলে কেন?’

‘দেখলাম ডুব মেরে থাকতে কেমন লাগে। এক দিন তো ডুব মারতেই হবে। হা হা হা। তোমার খবর কি?’

‘আমার কোনো খবর নেই। বসার ঘর ঠিক করা হয়েছে বাবা। এত সুন্দর করে সাজিয়েছে যে, দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।’

‘তোমার কথা বুঝতে পারছি না মা। কিসের ঘর?’

‘ও—মা, ভুলে গেছ। বসার ঘরের ডেকোরেশন বদলানো হল না?’

‘ও, আচ্ছা।’

‘তোমার তো এটা ভুলে যাবার কথা নয় বাবা। তুমি তো কিছুই ভোল না।’

‘এখন মনে হয় কিছু—কিছু ভুলে যাচ্ছি। বয়স হয়ে যাচ্ছে। গেটিং ওল্ড। বসার ঘরটা খুব সুন্দর হয়েছে বুঝি?’

‘খুব সুন্দর। এক বার বসার ঘরে ঢুকলে তোমার বেরুতে ইচ্ছা করবে না।’

‘তাহলে তো ডেকোরেশন ঠিক হয় নি। বসার ঘর এমন হবে, যেন কেউ বেশিক্ষণ না বসে। যেন খুব অস্বস্তি বোধ করে। চট করে চলে যায়। হা হা হা।’

‘বাবা।’

‘কি মা?’

‘তোমার হাসিটাও কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।’

‘কী—রকম লাগছে?’

‘মনে হচ্ছে হাসির তেমন জোর নেই।’

‘আচ্ছা, দেখ তো এখন কেমন মনে হয়—হা হা হা।’

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রেখে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ মুছলেন। তাঁর আরো কয়েকটি কল করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। মনে ইচ্ছে শরীর একেবারেই গেছে। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। দেশের মাটিতে মরতে হবে, এ—রকম কোনো সেন্টিমেন্টাল চিন্তা—ভাবনা তাঁর নেই। এ—রকম চিন্তা—ভাবনা থাকবে বড়—বড় কবি—সাহিত্যিকদের, দেশপ্রেমিক—রাজনীতিবিদদের। তিনি তাঁদের কেউ নন। নিতান্তই এলেবেলে ধরনের এক জন মানুষ। তাঁর কোনো রোমান্টিক চিন্তা—ভাবনা থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু রাতে ঘুমিয়ে—ঘুমিয়ে তিনি বৃষ্টির শব্দ শুনলেন। ঝম—ঝম বৃষ্টি। আষাঢ় মাসের প্রবল বর্ষণ। তিনি বেল টিপে নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নার্স?’

নার্স অবাক হয়ে বলল, ‘কই, না তো।’

‘হয়তো হচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছ না। দয়া করে একটু বারান্দায় দেখে আসবে? এ—রকম বৃষ্টি শুধু আমাদের দেশেই হয়। তুমি বোধহয় জান না, আমাদের দেশ হচ্ছে বৃষ্টির দেশ।’

‘আমি তো শুনেছিলাম তোমাদের দেশ হচ্ছে অভাবের দেশ।’

‘আমাকে দেখে কি খুব অভাবী লোক বলে মনে হচ্ছে?’

‘তোমাদের দেশের সবাই তোমার মতো?’

‘হ্যাঁ। এখন দয়া করে একটু দেখে এস বৃষ্টি হচ্ছে কি না।’

‘বললাম তো, হচ্ছে না।’

‘আমি শুনতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ না? দয়া করে একটু দেখে এস না। বারান্দায় যেতে তোমার খুব কি কষ্ট হবে?’

‘না, হবে না।’

নার্স বারান্দায় গেল না, এক জন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার রুগীর প্রেসার মাপলেন, গায়ের তাপ দেখলেন এবং কড়া সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

লোকাটকে এই বসার ঘরে ঠিক মানাচ্ছে না। রোগা ধরনের অভাবী টাইপের এক জন মানুষ। চোখে মোটা কাচের চশমা। স্যাণ্ডেল ঘরের বাইরে খুলে রেখে এসেছে। সেই স্যাণ্ডেলগুলিরও জরাজীর্ণ অবস্থা। অন্য কেউ হলে ফেলে দিত। এই লোক ফেলতে পারছে না।

এই ঘরে যে লোকটিকে মানাচ্ছে না, তা সে নিজেও বুঝতে পারছে। বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। হাত দু’টি অবসন্ন ভঙ্গিতে কোলের ওপর ফেলে রাখা। গায়ে হলুদ রঙের একটা চাদর। কড়া হলুদ। এই নীল-নীল বসার ঘরে হলুদ রঙ বড় চোখে লাগে। লোকটির বয়স পঞ্চাশের মতো হবে কিংবা তার চেয়ে কমও হতে পারে। অভাবী লোকদের অল্প বয়সেই চেহারা নষ্ট হয়ে যায়।

অপালা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি এক বার শুধু তাকিয়েছে। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। অথচ অপালা এমন একটি মেয়ে, যার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অপালা বলল, ‘আপনি কি বাবার কাছে এসেছেন?’

লোকটি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। কিন্তু অপালার দিকে তাকাল না। মাথা ঘুরিয়ে জলরঙা ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল।

‘বাবা তো দেশে নেই। সপ্তাহখানেক পরে ফিরবেন। আপনি বরং এক সপ্তাহ পরে আসুন।’

‘আচ্ছা।’

লোকটি কিন্তু উঠে দাঁড়াল না, বসেই রইল। এইবার সে তাকিয়ে আছে জানালার পর্দার দিকে। যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য ও সৌন্দর্য জানালার ঐ পর্দাটিতে। অপালা বলল, ‘আপনি কি কিছু বলবেন?’

‘তোমার মা আছেন?’

অদ্ভুত ব্যাপার তো, এই লোক তাকে তুমি করে বলছে। অপালাকে তুমি করে বলার মতো বাচ্চা এখনো নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে না। তার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটি মেয়েকে শাড়ি পরলে অনেকখানি বড় দেখায়। কিংবা কে জানে, লোকটি

হয়তো ভালো করে তাকে লক্ষ্যই করে নি।

‘আমার মাও দেশের বাইরে। চিকিৎসার জন্যে গিয়েছেন।’

লোকটি ঠিক আগের মতো ভঙ্গিতে পর্দার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

‘আপনার যদি জরুরি কিছু বলার থাকে, আমাকে বলতে পারেন।’

লোকটি হলুদ চাদরের ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করল। বিড়বিড় করে বলল, ‘আমার বড় মেয়ের বিয়ে ১৭ই পৌষ।’

অপালা হাত বাড়িয়ে কার্ডটি নিল।

‘বাবা এলেই আমি তাঁকে দিয়ে দেব। তিনি কি আপনাকে চেনেন?’

‘হ্যাঁ। আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।’

অপালা হাসিমুখে বলল, ‘বাবার মন ভালো থাকলে তিনি সাহায্য-টাহায্য করেন। তাঁর কাছে যেতে হয় মুড বুঝে।’

লোকটি উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরোবার সময় হঠাৎ বলে বসল, ‘ছেলেটা ভালো পেয়েছি। ব্যাঙ্কে কাজ করে। অগ্রণী ব্যাঙ্ক।’

‘বাহ, খুব ভালো।’

‘অফিসার্স গ্রেড। কোয়ার্টার পেয়েছে।’

অপালার বড় মায়া লাগল। সে নিতান্তই অপরিচিত একটি মেয়ে। অথচ এই লোকটি কত আগ্রহ করে তার সৌভাগ্যের কথা বলছে। নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু সাহায্যের জন্যে এসেছিল। লোকটি নিচু গলায় বলল, ‘যাই।’

অপালা তার পিছনে-পিছনে বারান্দা পর্যন্ত এল। গেটের বাইরে বার-তের বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে। লোকটি গেট খুলে বেরোতেই এসে তার হাত ধরল। এই মেয়েটি নিশ্চয়ই লোকটির সঙ্গে এসেছে। ভেতরে ঢোকে নি। অপালা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েটি এলেই পারত। বিশাল বাড়ি দেখে হয়তো ভরসা পায় নি। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করেছে বাইরে। তারি মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। লোকটি কেমন—মেয়েটিকে গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

‘অপা, এই অপা।’

অপালা বিরক্ত মুখে তাকাল। দোতলার গেট থেকে নিশানাথকাকুর স্ত্রী তাকে ডাকছেন। অপালা জবাব দিল না। এই মহিলা গত তিন দিন ধরে এ বাড়িতে আছেন। প্রথম দিন থেকেই অপালাকে আদর করে অপা ডাকছেন। এই আদর তার সহ্য হচ্ছে না। এক বার ভেবেছির বলবে—আপনি আমাকে অপা ডাকবেন না। বলতে পারে নি। বয়স্ক এক জন মহিলাকে মুখের ওপর এমন কঠিন কথা বলা যায় না। তা ছাড়া ভদ্রমহিলা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন অপালাকে খুশি রাখতে। প্রথম রাতে অপালার ঘরে ঘুমুতে এলেন। অপালা বলল, ‘এই ঘরে আপনার ঘুমানোর দরকার নেই।’

‘কেন, দু’টা খাট তো আছে।’

‘থাকুক। আমার একা-একা থাকতে ভালো লাগে।’

‘ও-মা, কেমন কথা। ঘুমুবার আগে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করলে তোমার ভালোই লাগবে মা। আমি খুব মজার-মজার গল্প জানি মা।’

‘মজার-মজার গল্প আমার শুনতে ভালো লাগে না।’

‘না-শুনেই কী করে বলছ, শুনতে ভালো লাগে না।’ আচ্ছা, এইটা শোন, তারপর

দেখি না—হেসে থাকতে পার কি না। একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হল কোনটা বেশি দরকারি—চেহারা না ব্রেইন। মেয়েটি বলল, চেহারা। কারণ চেহারা দেখা যায়, ব্রেইন দেখা যায় না। কী, গল্পটা মজার না?’

‘হ্যাঁ, মজার।’

‘এ-রকম গল্প আমি লক্ষ-লক্ষ জানি।’

অপালা অস্থির হয়ে পড়ল। উঠতে-বসতে একটা হাসির গল্প। কখনো বীরবলের, কখনো গোপাল ভাঁড়ের, কখনো-বা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার।

এই যে ভদ্রমহিলা দোতলার বারান্দা থেকে অপালা-অপালা ডাকছেন, এক্ষুণি তিনি নেমে এসে একটা হাসির গল্প বলবেন, যা শুনে মোটেও হাসি আসবে না। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ম্যানেজারকাকুর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন।

‘এই যে অপা।’

‘বলুন।’

‘কখন থেকে ডাকছি, কথা বলছ না কেন?’

‘আমি কথা কম বলি, কাকিম।’

‘এটা ভালো কথা না, মা। কথা বেশি বলবে। হাসবে, খেলবে, গান গাইবে। তুমি দিনরাত এমন গম্ভীর থাক, আমারই ভয় লাগে। ঐ লোকটা কে?’

‘কোন লোকটা?’

‘ঐ যে, তুমি এগিয়ে দিলে?’

‘আমি চিনি না। অচেনা একজন মানুষ।’

‘কী সর্বনাশ! তুমি অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলছ কেন?’

‘কথা বলা কি নিষেধ? এইসব আপনি কী বলছেন! হাসির গল্প বলতে চান বলুন, এ-রকম অদ্ভুত কথা বলবেন না। আপনিও তো এক জন অচেনা মানুষ। আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলছি না?’

‘তুমি শুধু-শুধু আমার উপর রাগ করছ মা। সব জান না, তাই রাগ করছ। কারখানায় বিরাট গওগোল। দু’ জন শ্রমিক মারা গেছে। সবার ধারণা, মালিকপক্ষ মারিয়েছে। এখন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওরা কিছু করেও বসতে পারছে না।’

অপালা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সে এ-সবের কিছুই জানে না।

‘আমি যে মা এখানে আছি, এ-জন্যেই তো আছি।’

‘আমাকে তো কেউ কিছু বলে নি!’

‘তোমাকে শুধু-শুধু বলবে কেন? আমিও বলতে পারি না। তুমি রাগ করছ দেখে বললাম।’

‘বাবা এ-সব জানেন।’

‘জানেন। বড়সাহেবের সঙ্গে গতকাল কথা হয়েছে। বড়সাহেবের শরীর খারাপ, তাই আসতে পারছেন না। শরীর ভালো থাকলে এসে পড়তেন।’

‘শরীর খারাপ? কই, আমি তো এই খবরও জানি না!’

‘তুমি তো মা কোনো খবরই জান না। কোন দুনিয়ায় তুমি বাস কর বল তো? উদাসীর মতো শুধু ঘুরে বেড়ালে তো হয় না, পৃথিবীর খোঁজখবর রাখতে হয়।’

অপালা একটি কথাও বলল না—তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা ঠাণ্ডা গলায় বললেন,

‘তোমাকে আরেকটা কথা বলি মা, মন দিয়ে শোন—আমি তোমার মায়ের বয়সী, তোমার মতো মেয়ে আমার ঘরে আছে। আর তুমি এ-রকম কর, যেন আমি রাস্তার একটা মেয়ে।’

ভদ্রমহিলার চোঁচামেচিতে বাসার অন্য সবাই বের হয়ে এল। কী লজ্জার কথা! অপালা কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে যেতে। পৃথিবীতে বাস করার এত যন্ত্রণা! আজ সারা দিনে এক পাতাও পড়া হবে না। কী যে হবে পরীক্ষায়, কে জানে।

অপালা তার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দুপুরে ভাত খাবার সময় কাজের মেয়েটি ডাকতে এল। অপালা বলল, ‘বিরক্ত করবে না। আমি কিছু খাব না।’ বিকেলে চা খাওয়ার জন্যেও নামল না। সন্ধ্যাবেলা নিশানাথবাবু এসে দরজায় টোকা দিলেন। সে খুব স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলল। সহজ স্বরে বলল, ‘কেমন আছেন ম্যানেজারকাকু।’

‘ভালো আছি মা।’

‘কারখানায় কী-সব নাকি ঝামেলা?’

‘ঝামেলা তো আছেই মা। বিষয়-সম্পত্তি মানেই হচ্ছে ঝামেলা। একমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীরাই ঝামেলামুক্ত।’

‘দু’ জন নাকি মারা গেছে?’

‘হঁ। নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে মরেছে, দোষ পড়েছে মালিকপক্ষের। তুমি এই নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না। আসগর সাহেব চলে এসেছেন, উনি দেখছেন। খুবই কাজের লোক।’

‘আসগর সাহেব কে?’

‘আমাদের চিটাগাং ব্রাঞ্চের জি. এম., উনি একতলায় বসে আছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।’

‘আমার সঙ্গে কিসের কথা?’

‘স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বড় রকমের ডিসিশনের ব্যাপার। তুমি একটু নিচে এস মা।’

আসগর সাহেব মানুষটি সুপুরুষ। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। গোলগাল ভালমানুষের মতো মুখ। কথা থেমে-থেমে বলেন। মনে হয় প্রতিটি শব্দ বলার আগে খানিকক্ষণ ভাবেন। অপালা ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন এবং অপালা না-বসা পর্যন্ত নিজে বসলেন না।

‘খুবই দুঃখিত যে আপনাকে ডিসটার্ব করতে হচ্ছে। মাই অ্যাপোলজি। এদিকে স্যার অসুস্থ, স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।’

‘কী বলবেন, বলুন।’

‘দু’ লাখ টাকার মতো খরচ করলে ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এক লাখ দিতে হবে ইউনিয়নকে। ওদের ঠাণ্ডা করতে হবে। পুলিশকে দিতে হবে বড় এ্যামাউন্ট। তা ছাড়া.....’

ভদ্রলোকের কথার মাঝখানেই অপালা বলল, ‘এতে কি মালিকপক্ষের দোষই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে না? সবাই কি তাহলে ভাববে না, এটা আমরাই করিয়েছি?’

আসগর সাহেব গভীর মুখে বললেন, ‘আমরা যে ধোয়া তুলসীপাতা, তাও কিন্তু না মিস অপালা। ছোট হলেও আমাদের একটা ভূমিকা আছে।’

‘অ-আচ্ছা, আছে তাহলে।’

‘আপনার সেফটির ব্যাপারটাও দেখতে হয়। আপনার নিরাপত্তা হচ্ছে আমাদের টপ প্রায়োরিটি।’

‘আমার নিরাপত্তার ব্যাপারটা আসছে কেন?’

‘প্রতিশোধের ব্যাপার আর কি। ধরুন, একটা হাতবোমা এসে ফেলে দিল, অ্যাসিড ছুঁড়ে মারল.....’

অপালা চুপ করে রইল। আসগর সাহেব বললেন, ‘আগেও এ-রকম ঝামেলা হয়েছে। টাকাপয়সা দিয়ে মিটমাট করা হয়েছে। অবশ্যি এত বড় স্কেলে ঝামেলা হয় নি। দিস টা.....’

‘আপানারা যা ভালো মনে করছেন, তা করাই ভালো।’

‘আপনাকে একটা অনুরোধ, এক-একা বাইরে যাবেন না। সবচেয়ে ভালো হয়, প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে না-বেরুলে।’

‘আমি এমনিতেই ঘর থেকে বের হই না।’

‘ডি.সি. সাউথকে আমি অবশ্যি রিকোয়েস্ট করেছি কয়েক দিনের জন্যে বাড়ির সামনে একটা ফিক্সড সেন্টির ব্যবস্থা করতে। কথায় আছে না, প্রিভেনশন ইজ বেস্টার দ্যান কিওর? আজ তাহলে উঠি। আপনাকে কষ্ট দিলাম।’

রাতে অপালা অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। যেন বিকেল হয়েছে। সূর্য ডুবে যাবার আগের মায়াবী আলো চারদিকে। সে একা-একা বাগানে হাঁটছে। হঠাৎ কে যেন ডাকল— এই..... এই। অপালা চমকে তাকাল—কেউ তো কোথাও নেই। কে ডাকল। অপালা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, ‘কে ডাকছে আমাকে?’

‘আমি। আমি ডাকছি আপনাকে।’

অপালা দেখল, গেটের বাইরে সেই এগার-বার বছরের মেয়েটি দাঁড়িয়ে, যে তার বাবার সঙ্গে ঘরে ঢোকে নি। একা-একা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

‘নাম কি তোমার?’

মেয়েটি নাম বলল না। খুব হাসতে লাগল।

‘ঐ দিন তুমি ঘরে ঢোক নি কেন? কেন তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?’

এই প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না মেয়েটি। অপালায় বুক কাঁপতে লাগল, কারণ এই মেয়েটিকে তার চেনা-চেনা লাগছে। খুব চেনা—অসম্ভব চেনা। কিন্তু তবুও অচেনা।

এ কেমন স্বপ্ন! ঘুম ভাঙার পরও অপালার হাত-পা কাঁপছে। পানির পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। তার খুব ইচ্ছে করছে চোঁচিয়ে কাঁদে।

ঐ মেয়েটিকে সে কেন স্বপ্নে দেখল? মানুষের অবচেতন মনে কত রহস্যই-না খেলা করে। কোনো দিন মানুষ তা জানতে পারে না। অপালার বড় জানতে ইচ্ছে করে।

হেলেনা ভিজিটার্স রুমে ঢুকে একটু অবাক হলেন।

ফখরুদ্দিন সাহেব বসে আছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত চুরুট। হেলেনা অবশ্য তাঁর বিষয় গোপন করলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'কেমন আছ?'

'খুব ভালো।'

'চুরুট টানছ? শ্যোকিং এখানে নিষিদ্ধ। দেয়ালে লেখা চোখে পড়ে নি?'

'পড়েছে। দেয়ালে লেখা "ধূমপান না করার জন্যে অনুরোধ করছি"। আমি অনুরোধটা রাখলাম না। হা হা হা।'

'তোমার কি শরীর খারাপ?'

'না, শরীর ভালোই আছে।'

'কোথায় ডুব দিয়েছিলে?'

'আশেপাশে ছিলাম। তোমরা অবস্থা কি?'

'ভালো।'

'কী-রকম ভালো?'

'বেশ ভালো। অপারেশনটা লাগবে না। ইচ্ছা করলে দেশে ফিরে যেতে পারি।'

'ইচ্ছা করছে?'

হেলেনা জবাব দিলেন না। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'এই মুহূর্তে দেশে ফিরতে পারছি না। এখানে আমার কিছু কাজ আছে। কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'ক'দিন লাগবে কাজ শেষ হতে?'

'দিন দশেক লাগবে।'

'কি কাজ?'

ফখরুদ্দিন সাহেব এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ডাক্তাররা তাঁর শরীরটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে চায়। দিন দশেক সময় এই কারণেই তারা চাচ্ছে। হেলেনাকে তা বলার তিনি কোনো প্রয়োজন বোধ করছেন না। আজ যে হাসপাতাল থেকে বের হয়েছেন, সেও বহু কষ্টে। বলে এসেছেন দু' ঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন। তাও সম্ভব হবে কি না কে জানে? দু' ঘণ্টার এক ঘণ্টা তো এখনই শেষ।

'হেলেনা।'

'বল।'

'চল, একটু হেঁটে আসি।'

'কোথায় হাঁটবে?'

'এই বাগানেই হাঁটব। বেশি দূর যাব না। তোমার হাঁটহাঁটিতে কোনো বাধা নেই তো?'

'না, নেই।'

'গুড। গায়ে ওভারকোট জাতীয় কিছু-একটা চাপিয়ে এস।'

ছবির মতো সুন্দর বাগান। এত সুন্দর যে কৃত্রিম মনে হয়। বড় বেশি সাজানো।

ফখরুদ্দিন সাহেব মাঝে-মাঝে কাশছেন, কিন্তু কোনো কথা বলছেন না। হেলেনা হঠাৎ বললেন, 'তুমি যে খুব অসুস্থ, একটা হাসপাতালে আছ, এই খবর কিন্তু আমি জানি।'

'জানলে তো ভালোই।'

'অন্যের কাছ থেকে জানতে হল।'

ফখরুদ্দিন সাহেবের চুরুট নিভে গিয়েছিল; অনেক কায়দা করে সেটা ধরাতে হল। তিনি কিছু বললেন না।

'আমাকে খবরটা না-জানানোর পিছনে তোমার যুক্তিগুলি কি, একটু বল তো শুনি।'

'কোনো যুক্তি নেই। এস, কোথাও একটু বসা যাক। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।'

তারা বসলেন। হেলেনা মৃদু স্বরে বললেন, 'এখনো কি তুমি বিশ্বাস কর, টাকা দিয়ে সব পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, করি।'

'মানুষ হিসেবে তুমি কি সুখী?'

'হ্যাঁ, সুখী। তোমার মতো বানানো দুঃখ-কষ্ট আমার নেই। আমার বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের। আমার মতো মানুষের কোনো কাল্পনিক দুঃখ-কষ্ট থাকে না। ঐ সব থাকে খুব উচ্চমার্গের লোকদের।'

'আমার কিন্তু ধারণা, তুমি খুব দুঃখী মানুষ।'

'তাই নাকি? ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

'তুমি যে খুব দুঃখী, এটা তুমি নিজেও জান।'

ফখরুদ্দিন সাহেব চুরুটটা ছুঁড়ে ফেললেন। ঢালু জায়গা পেয়ে চুরুটটা গড়াতে-গড়াতে নিচে নামছে। সেই দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের মতো তাঁর মাথায় এল, মানুষের জীবনও কি এ-রকম গড়িয়ে যাওয়া নয়? কেউ কিছু দূর গিয়েই আটকে যায়, আবার কেউ যেতেই থাকে। এমন কিছু উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা নয়, তবু ফখরুদ্দিন সাহেবের বেশ ভালো লাগছে। তিনি পকেট থেকে আরেকটি চুরুট বের করে গড়িয়ে দিলেন। হেলেনা বললেন, 'কি করছ?'

'এক ধরনের খেলা, তুমি বুঝবে না।'

'না-বোঝারই কথা। তোমার বেশির ভাগ কাজকর্মই আমি বুঝি না।'

'তুমি কি করে বুঝবে বল, আমি নিজেই বুঝি না।'

বলতে-বলতে ফখরুদ্দিন সাহেব খুব হাসলেন। হাসতে-হাসতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। হেলেনা বললেন, 'তোমার অসুখটা কী?'

'জানি না, কি। ডাক্তাররা জানার চেষ্টা করছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, ডাক্তাররা খুঁজে-খুঁজে একটা খারাপ অসুখই বের করবে। রাজকীয় কোনো অসুখ। ডায়রিয়া বা আমাশয় মতো অসুখে আমাকে মানাবে না; এইসব হচ্ছে ভিথিরিদের অসুখ। আমি কি ভিথিরি? হা হা হা।'

লগনের আকাশ আজ ঘন নীল। বাতাস মধুর। রোদের রঙ কাঁচা সোনার মতো। অদ্ভুত সুন্দর একটি দিন। ফখরুদ্দিন সাহেব এমন চমৎকার একটি দিনেও খানিকটা

বিষগ্র হলেন। সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হেলেনা বললেন,
'আজ তুমি অপালার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলো।'

'কেন বল তো?'

'ওর বোধহয় খুব মন-খারাপ। কী-একটা দুঃস্বপ্ন দেখে খুব কেঁদেছে। আমাকে
বলতে-বলতেও কঁদল।'

'কী দুঃস্বপ্ন?'

'একটা ছোট্ট মেয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, এইসব কি হাবিজাবি।'

'দুঃস্বপ্নটা কী, তা তো বুঝলাম না। রাক্ষস-খোকস স্বপ্নে দেখলেও না-হয় কথা
ছিল। ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো কী হয়েছে?'

হেলেনা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মাঝে-মাঝে সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন দেখেও মানুষ ভয়
পায়। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে।'

'আমি এক্ষুণি টেলিফোন করছি।'

'ফখরুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ফিরোজের দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস নেই।

তার ধারণা গৃহী টাইপের মহিলা এবং ডায়াবেটিক প্রৌঢ়রাই নিয়ম করে দুপুরে
ঘুমায়। এক জন ইয়াংম্যান, যার রক্তে উত্তেজনা টলমল করছে, তার দুপুরে ঘুমানোর
প্রশ্নই ওঠে না। ফিরোজের ধারণা, সে নিজে এক জন ইয়াংম্যান এবং তার রক্তে
উত্তেজনা টলমল করছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এইসব ধারণা থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক
দিন ধরে তাকে নিয়মিত ঘুমুতে দেখা যাচ্ছে। মশারি খাটিয়ে বেশ একটা আয়োজনের
ঘুম।

মশারি খাটানোর কারণ হচ্ছে, এ-বাড়ির মশারা দিন এবং রাত্রির পূর্ণাঙ্গ বোঝে
না। এরা দিনে বেশি কামড়ায়।

দুপুরে ঘুমানোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, ঘুম ভাঙলেই বিচিত্র কারণে মন
সাঁতসেঁতে হয়ে থাকে। কোনো কিছুই ভালো লাগে না। মন খারাপ ভাব কিছুতেই
কাটতে চায় না। ফিরোজের ধারণা, বেশির ভাগ যুবক স্নানহীন করে দুপুরে ঘুমের
পর। একটি উদাহরণ তার কাছে আছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সমু, এক দুপুরে লম্বা ঘুম
দিয়ে উঠল। চায়ের দোকানে চা খেয়ে এসে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখল। সেই চিঠিতে
কোনো সম্বোধন নেই, কাজেই বোঝা গেল না কাকে লেখা। চিঠি শেষ করে তাদের
তিনতলার ছাদ থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল।

দুপুরবেলায় ঘুমুলে ফিরোজেরও এ-রকম নাটকীয় কিছু করতে ইচ্ছে করে। এই
মুহূর্তেই করছে। সে বারান্দায় কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটল, তারপর ঠিক করল
অপালা মেয়েটির সঙ্গে এক কাপ চা খাবে। সে-বাড়িতে যাবার জন্যে একটা অজুহাত
ভেবে-চিন্তে বের করতে হবে। সেটা যে এখনই বের করতে হবে, এমন কোনো কথা
নেই। পথে যেতে-যেতে ভাবলেই হবে।

এই মেয়েটি তাকে এত ভোগাচ্ছে কেন? রোজ খানিকক্ষণের জন্যে হলেও এর কথা মনে পড়ে। এটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। আসল কথা হল, কেন বার-বার মনে পড়ছে?

মেয়েটি রূপবতী। এটা এমন কোনো ব্যাপার নয়। এ-শহরে প্রচুর রূপবতী মেয়ে আছে। এদের কারো-কারো সঙ্গে তার পরিচয়ও আছে। কই, ওদের কথা তো মনে পড়ে না।

মেয়েটির মধ্যে রহস্য আছে। সে তো সব মেয়ের মধ্যেই আছে। মেয়ে মানেই তো রহস্য। আনসলভ্‌ মিস্ত্রি।

মেয়েটি অন্য কোনো মেয়ের মতো নয়। এটা কোনো কথা হল না। কোনো মেয়েই অন্য কোনো মেয়ের মতো নয়। প্রতিটি মেয়েই আলাদা।

ফ্রয়েডীয় তাত্ত্বিকদের মতো চিন্তা করা যাক। এই মেয়েটির চেহারা বা আচার-আচরণে কোথাও ফিরোজের মা'র সঙ্গে মিল আছে। মায়ের সঙ্গে মিল আছে এই জাতীয় মেয়ের প্রতি পুরুষেরা প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করে। বোগাস কথা! ফিরোজের মা ফিরোজের জন্মের সময় মারা যান। সেই মহিলার কোনো স্মৃতি ফিরোজের মনে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

মেয়েটির প্রচুর টাকাপয়সা—এটা কি একটা কারণ হতে পারে? না, হতে পারে না। টাকার লোভ ফিরোজের আছে, তবে তা নিশ্চয়ই খুব প্রবল নয়। প্রবল হলে সিনেমার কাজ ছেড়ে দিত না। মোটামুটি ভালো টাকাপয়সার একটা সম্ভাবনা ঐ লাইনে ছিল।

অপালাদের বাড়ির সামনে এক জন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। এর মানে কী? মেয়েটির বাবা কি মন্ত্রী-ফন্ত্রী হয়ে গেলেন নাকি? পয়সাওয়ালা লোকজন হঠাৎ করে মন্ত্রী হয়ে যান। ইনিও হয়তো হয়েছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী কিংবা পাটমন্ত্রী। আচ্ছা, দেশে পাটমন্ত্রী আছে, চা-মন্ত্রী নেই কেন?

রপ্তানিযোগ্য প্রতিটি আইটেমের ওপর এক জন করে মন্ত্রী থাকলে ভালো হত। চামড়া-মন্ত্রী, রেডিমেড গার্মেন্ট-মন্ত্রী, চিংড়ি-মন্ত্রী। সবচেয়ে ভালো হয় এক জন ব্যাঙ-মন্ত্রী থাকলে। ব্যাঙও তো আজকাল রপ্তানি হচ্ছে। তবে এই দপ্তর হয়তো কেউ নিতে চাইবেন না। কে আর শখ করে ব্যাঙ-মন্ত্রী হবে?

অপালাদের গেটে বিশাল এক তাল, এ-ও রহস্যজনক। দিনে-দুপুরে গেটে তাল থাকবে কেন? দারোয়ান ব্যাটা টুলে বসে আছে। ফিরোজকে দেখেও সে বসে রইল। এটাই স্বাভাবিক। সে যদি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বসত, তাহলেই অস্বাভাবিক হত।

‘এই যে দারোয়ান, গেটটা খোল।’

দারোয়ান তাকে ভালোই চেনে। ফিরোজ বেশ কিছুদিন এ-বাড়িতে কাজ করেছে, তাকে না-চেনার কোনোই কারণ নেই। দেখা হয়েছে দু’ বেলা। তবু এই ব্যাটা এমন করে তাকাচ্ছে, যেন ফিরোজ খুনের পলাতক আসামী—এই বাড়িতে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে।

‘আফনে কার কাছে যাইবেন?’

‘তোমাদের আপার কাছে। উনিই আসতে বলেছেন।’

‘দাঁড়ান, খবর দেই।’

দারোয়ান গেট খুলল না। খবর দেবার জন্যে রওনা হল। গদাইলস্করি চাল বোধহয় একেই বলে। দশ মিনিট পর-পর একেকটা পা ফেলছে। এভাবে হাঁটলে বারান্দা পর্যন্ত পৌছতে-পৌছতে রাত এগারটা বাজবে।

ফিরোজ অতি দ্রুত এ-বাড়িতে উপস্থিত হবার অজুহাত মনে-মনে সাজিয়ে ফেলতে চেষ্টা করল। সেই সঙ্গে কী কথাবার্তা হবে, তা নিয়ে একটা স্টেজ রিহার্সল। “মেয়েটি এসেছে। মুখ হাসি-হাসি। ফিরোজ বলছে—হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম। মেয়েটি বলল—না না, বিরক্ত কিসের, এসেছেন খুশিই হয়েছে। আসুন, একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে। খুব লোনলি ফিল করছিলাম। আজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন।

‘আমার বিয়েটা ভেঙে গেল, ঐ খবরটা দিতে এসেছিলাম’

‘বিয়ে ভেঙে গেল নাকি?’

‘হ্যাঁ। মেয়ের আমেরিকা প্রবাসী চাচা আমাকে পছন্দ করলেন না।’

‘মেয়ের চাচার পছন্দে কী যায়-আসে? মেয়ে তো আপনাকে পছন্দ করেছে।’

‘আমিও তাই ভেবেছিলাম। এখন দেখছি সেটা ঠিক না। ভীষণ মন-খারাপ হয়ে গেছে। সারা দুপুর শুয়ে-শুয়ে সুইসাইড করার কথা ভাবলাম। এখন যে ভাবছি না, তা নয়। এখনো ভাবছি।’

‘ছিঃ, এ-সব ভাবনা মনেও আনবেন না। আমার এখানে এসেছেন ভালো করেছেন, গল্প করে মন হালকা করুন।.....”

চিন্তা এই পর্যন্ত এসে কেটে গেল। দারোয়ান গদাইলস্করি চালে ফেরত আসছে। ব্যাটার মুখ অন্ধকার। নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে দাবড়ানি খেয়েছে।

‘আপা কী বলল?’

‘আফনেরে চইল্যা যাইতে কইছে।’

‘চলে যেতে বলেছে?’

‘জ্বি।’

‘আমার কথা বলেছিলে ঠিকমতো?’

‘জ্বি, বলছি।’

‘কী বলেছ?’

‘বলছি, ঐ যে ভদ্রলোক ঘর সাজাইয়া দিচ্ছে সেই আসছে’

‘আর তোমার আপা কী বলল?’

‘এক কথা কয়বার কয়, কন। চইল্যা যাইতে কইছে।’

ফিরোজ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। হাত কেঁপে যাচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো পুলিশটি সহানুভূতির চোখে তাকাচ্ছে। খাকি পোশাক-পরা কেউ সহানুভূতি দেখাতে পারে, এটা ফিরোজের কল্পনায় ছিল না। সে কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। ছুটে পালিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হত। তা করা যাচ্ছে না। তাকে হেঁটে-হেঁটে সদর রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে, এবং যতক্ষণ তাকে

দেখা যাবে ততক্ষণ পুলিশ এবং দারোয়ান তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের চোখে থাকবে সহানুভূতি ও করুণা।

ফিরোজ মাথা নিচু করে পা বাড়াল। হাতের সিগারেটটি নিভে গেছে। আবার ধরাতে ইচ্ছে করছে না। কোথায় এখন যাওয়া যায়? যাবার তেমন কোনো জায়গা নেই। তাজিন আপার কাছে যাওয়া যেতে পারে। অনেক দিন যাওয়া হয় না। মনসুরের বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ ওকে বিরক্ত করা যেতে পারে। নতুন বিয়ে করেছে। সন্ধ্যার পর কেউ বেড়াতে গেলে অসম্ভব বিরক্ত হয়। মুখ হাঁড়ির মতো করে রাখে, একটু পর-পর ঘড়ির দিকে তাকায়, রাত আটটা বাজতেই লোক-দেখানো হাই তুলতে শুরু করে।

মনসুরের ওখানেও যেতে ইচ্ছে করছে না। আজ সারারাত পথে-পথে হাঁটলে কেমন হয়? এই পাগলামির বয়স কি তার আছে?

ফিরোজের ঠাণ্ডা লাগছে। ইচ্ছে করেই আজও পাতলা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছিল। যদি অপালা পাতলা শার্ট নিয়ে ঐ দিনের মতো কিছু বলে।

ফিরোজ অনেক রাত পর্যন্ত পাতলা জামা গায়ে দিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াল। এক সময় তার মাথা ভারি হয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশপাতাল জ্বর আসবে। আসুক। পেতেছি সমুদ্রে শয্যা শিশিরে কি ভয়?



রান্নাঘরে নিশানাথবাবুর স্ত্রী। চারদিকে বাসনপত্র ছড়িয়ে কী-সব যেন করছেন। বাবুটি গোমেজ, চোখমুখ কুঁচকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। গোমেজ এই মহিলাটিকে পছন্দ করছে না। এই মহিলা সরাসরি তার সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করছে। যখন-তখন রান্নাঘরে ঢুকে জিনিসপত্র এলোমেলো করে দিচ্ছে। এখন আর কোনো কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। গতকাল লবণের কৌটা খুঁজতে তার দশ মিনিট লেগেছে। অথচ লবণের কৌটা থাকে দ্বিতীয় তাকের সবচেয়ে প্রথমে। আগে চোখ বন্ধ করে বের করতে পারত।

‘গোমেজ।’

‘জ্বি।’

‘দেখছ কী তুমি? ব্যাটাছেলের রান্নাঘরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা বড় খারাপ লাগে।’

‘আমার কাজই তো রান্নাঘরে।’

‘ও, আচ্ছা। তাই তো, মনে থাকে না। তুমি রান্না শিখেছ কার কাছে?’

গোমেজ জবাব দিল না। ভদ্রমহিলা ছেলের গুঁড়োয় পানি ছিটাতে-ছিটাতে বললেন, ‘বাঙালি রান্না কিছু জান, না শুধু সাহেবি রান্না?’

এই প্রশ্নেরও সে জবাব দিল না। কঠিন মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই মহিলাটি বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে।

‘গোমেজ, তুমি যাও তো, অপালাকে ডেকে নিয়ে এস। বল, ভাপা পিঠা বানাচ্ছি, সে যেন দেখে যায়। তাকে শিখিয়ে দেব।’

‘আমি রান্না ছাড়া অন্য কাজ করি না।’

‘এটা কেমন কথা! তুমি ডেকেও আনতে পারবে না?’

‘জি-না। তা ছাড়া আমাদের দোতলায় যাওয়া নিষেধ আছে। শুধু রমিলা দোতলায় যেতে পারে।’

‘এইসব নিয়ম-কানুন কে করেছে?’

‘বড়সাহেব।’

‘বড়সাহেব তো এখন নেই, তুমি যাও ডেকে নিয়ে এস। এ-রকম হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।’

গোমেজ বের হয়ে এল, কিন্তু দোতলায় উঠল না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল। গোমেজের ঘর মূল বাড়ির দক্ষিণে আলাদা দু’টি কামরা। একটিতে শোবার ব্যবস্থা, অন্যটিতে রান্নার। এ-বাড়ির মোট আট জন কাজের লোকের জন্যে আলাদা রান্না হয়। সেই রান্নাও গোমেজ করে। গোমেজ ঠিক করল আজ সে কোনো রান্নাবান্না করবে না। তার এ-রকম অভ্যেস আছে। মাঝে-মাঝে মেজাজ বিগড়ে গেলে এ-রকম করে। রান্না তো শুধু হাঁড়িতে কিছু জিনিস ফেলে নাড়াচাড়া করা নয়। এটা খুব কঠিন ব্যাপার। মন বসাতে হয়। তা সবসময় সম্ভব হয় না। আজ যেমন হবে না। আজ সে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। গোপনে কিছুকিছু মদ্যপান করবে। এই অভ্যেসও তার পুরনো।

নিশানাথবাবুর স্ত্রী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই অপালার খোঁজে গেলেন। মেয়েটি তাঁকে পছন্দ করে না, কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড মায়া পড়ে গেছে। পাগলা-পাগলা ধরনের মেয়ে। একা-একা থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে।

‘অপা, কি করছ তুমি?’

‘পড়ছি কাকিমা, আজ আমার ফিফ্‌থ পেপার পরীক্ষা।’

‘ও-মা। কই, আমি তো জানি না।’

‘আপনি জানবেন কেন? আপনার তো জানার কথা নয়।’

‘পরীক্ষা কখন?’

‘বিকেলে দু’টার সময় আরম্ভ হবে, শেষ হবে পাঁচটায়।’

‘তাহলে তো তোমার দুপুরের খাবার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হবে।’

‘আপনি ব্যস্ত হবেন না কাকিমা, পরীক্ষার আগে আমার খুব টেনশান থাকে, আমি কিছু খেতে পারি না।’

‘সে কী কথা! কিছুই খাবে না?’

‘একটু চা খাব, একটা স্যাণ্ডউইচ খাব। ঐ নিয়ে আপনি ভাববেন না।’

‘দৈ আছে কি না ঘরে, কে জানে। দৈ খেলে খিটটা ঠাণ্ডা থাকবে। দাঁড়াও, আমি দৈয়ের ব্যবস্থা করছি। ঘরে-পাতা দৈ। তোমার ম্যানেজারকাকু ঘরে-পাতা দৈ ছাড়া খেতে পারে না।’

‘আপনাকে কোনো ঝামেলা করতে হবে না।’

‘ঝামেলা কিছু না। যাব আর নিয়ে আসব। গাড়ি তো আছেই।’

অপালা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘আপনি যখন বেরুচ্ছেন, তখন একটা কাজ করতে পারবেন?’

‘পারব না মানে! কী কাজ?’

‘দামি একটা শাড়ি কিনে আনতে পারবেন? যেন খুব ভালো হয়।’

‘তোমার জন্যে।’

‘না, আমার জন্যে না। আমি একজনকে উপহার দেব?’

‘কাকে?’

অপালা মনে-মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই মহিলাকে কিছু বলাই বোকামি। এক লক্ষ প্রশ্ন করবে। বিরক্ত করে মারবে।

‘কাকে দেবে শাড়ি?’

‘এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। খুব আগ্রহ করে দাওয়াত দিয়েছেন। খুব মায়া লেগেছে। তা ছাড়া বাবা এখানে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু-একটা দিতেন।’

‘উনি যখন নেই, তখন তোমার এত মাথাব্যথা কেন?’

‘আপনি না-পারলে ম্যানেজারকাকুকে বলুন।’

‘পারব না কেন? কত টাকার মধ্যে কিনব?’

‘আগেই তো বলেছি, দামি একটা শাড়ি।’

‘একেক জনের দামি তো একেক রকম মা। আমার কাছে তো তিন শ’ টাকা দামের শাড়িই মনে হয় অনেক দামি।’

‘আপনি পছন্দ করে কিনুন। আর কাকিমা, এখন যান। আমি পড়ছি, একটা চ্যাপ্টার এখনো বাকি।’

‘মেয়েটা কেমন, ফর্সা না কালো? শাড়ি তো সেইভাবেই কিনতে হবে।’

‘আমি মেয়েটাকে দেখি নি। বাঙালি মেয়ে যে-রকম হয়, সে-রকম হবে। খুব বেশি ফর্সা নয়, কালোও নয়। কাকিমা, আপনি এখন যান।’

‘ভাপা পিঠা খাবে? ভাপা পিঠা বানাচ্ছি।’

‘আমি এখন কিছু খাব না।’

আজ অপালার ফিফ্‌থ পেপার। এই পেপারেই তার প্রিপারেশন সবচেয়ে কম। পরীক্ষা খুব খারাপ হবে। একটা চ্যাপ্টার এখনো পুরো বাকি। পরীক্ষার ঠিক আগে-আগে পড়বে ভেবেছিল, যাতে মনে থাকে, এলোমেলো না-হয়ে যায়। কিন্তু সকাল থেকেই একটার পর একটা কামেলা। বই নিয়ে বসার সঙ্গে-সঙ্গে একটা মেয়ে ফোন করল। অপালা ‘হ্যালো’ বলামাত্র একনাগাড়ে কথা বলতে লাগল-নমিতা, আজ কী হয়েছে শোন। ভাই, আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। এত অপমানিত হয়েছে! আমি আমার জীবনে এত অপমানিত হই নি—বিশ্বাস কর! এক ঘণ্টা কেঁদেছি। রিকশায় কাঁদতে-কাঁদতে এসেছি। রাস্তার সমস্ত লোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। রিকশাওয়ালা পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখেছে.....

অপালা বলবার সুযোগই পেল না যে এটা রং নাশ্বার, আর তার নাম নমিতা নয়। মেয়েটা নিজের কথা বলতে-বলতে ফৌপাতে শুরু করল। কী অস্বস্তিকর অবস্থা। অপালা বলল, ‘শুনুন, আমার নাম নমিতা নয়। আপনার রং নাশ্বার হয়েছে।’

ফোনের ও-পাশে মেয়েটি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘আপনি কে?’

‘আমার নাম অপালা।’

‘ও, আচ্ছা। আপনি আমার এইসব কথা কাউকে বলবেন না, প্রীজা।’

কী অদ্ভুত কথা! অপালা কাকে এ-সব কথা বলবে? আর বললেই-বা কী? কে চিনবে এই মেয়েকে?

ফোন রেখে বই নিয়ে বসেও মেয়েটির কথা মনে হতে লাগল। বইয়ে মন বসছে না। পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু পড়াটা মনে ধরছে না। তখন টঙ্গির কারখানা থেকে টেলিফোন। মিজান বলে কে এক লোক। সুপারভাইজার। তাকে অপালা কোনো দিন চোখেও দেখে নি। লোকটি তাকে ম্যাডাম ডাকছে। অপালা কঠিন স্বরে বলল, ‘আমাকে ফোন করেছেন কেন? আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার?’

‘ম্যাডাম, একটা খুব বড় ঝামেলা হয়েছে।’

‘কি ঝামেলা?’

‘অফিসার লেভেলের সবাইকে শ্রমিকরা একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিয়েছে। ঘেরাও।’

‘আমাকে এটা জানাচ্ছেন কেন? আমি কী করব?’

‘না, মানে, আপনার কিছু করার নেই। আমরা পুলিশে খবর দিয়েছি। শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।’

‘আমাকে জানিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই। প্রীজ, আমাকে শুধু-শুধু বিরক্ত করবেন না।’

‘ম্যাডাম, ভেরি সরি।’

অপালা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। এত ঝামেলা নিয়ে কিছু করা যায়? বারটা পর্যন্ত একনাগাড়ে পড়বে ভেবেছিল সে। এগারটা বাজতেই উঠে পড়ল। বাগানে রোদে খানিকক্ষণ হাঁটল। মালী বলল, ‘ফুল দেব আপা?’ বলেই সে অপেক্ষা করল না, বিরাট বড় একটা গোলাপ ছিঁড়ে দিল। এত সুন্দর একটা গোলাপ হাতে নিলে কেমন মন-খারাপ হয়ে যায়।

‘আরো দেব আপা?’

‘না, আর লাগবে না।’

অপালা গোলাপ হাতে নিয়ে বাগানে হাঁটছে। অরুণা এবং বরুণা জলসে পায়ে তার পিছনে-পিছনে হাঁটছে। শীতের দিনের ঝকঝকে সোনালি রোদে এদের তিন জনকে চমৎকার লাগছে। মালী কাজ ভুলে এদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ফিরোজের জ্বর তৃতীয় দিনে নেমে গেল। তার ধারণা হয়েছিল ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া এইসব কিছু-একটা হয়েছে। তা নয়, ঠাণ্ডা লেগেছিল। তা তাকে তেমন কাবু করতে পারল না। এই তো আজ বেশ উঠে বসতে পারছে। সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। সিগারেটের তৃষ্ণা হবার মানে—রোগ সেরে গেছে। সে সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে নিচে নেমে গেল।

হাজি সাহেব নিড়ানি হাতে বাগানে। ফুলের বাগান নয়, টমেটো গাছ লাগিয়েছিলেন। বাজারভর্তি পাকা টমেটো, কিন্তু হাজি সাহেবের গাছে সব ফুল ফুটছে।

ফিরোজের ধারণা, অতিরিক্ত যত্নের কারণে এই অবস্থা।

‘হাজি সাহেব, কেমন আছেন?’

‘ভালো। আপনার জ্বর সেরে গেছে নাকি?’

‘পুরোপুরি সারে নি। সারব-সারব করছে। আপনার গাছে ফুল ফুটেছে দেখছি। মিরাকল করে ফেলেছেন।’

‘ফুল পর্যন্তই, ফল হয় না। ফুল ফোটে, দু’দিন পর ঝরে যায়। আপনি যাচ্ছেন কোথায়?’

‘কোথাও না, রাস্তায়।’

‘চা খাবেন?’

‘না।’

‘ঐ ব্যাপারটা কিছু করেছেন?’

‘আপনার মেয়ের কথা বলছেন?’

‘জ্বি।’

‘জ্বরে আটকা পড়ে সব জট পাকিয়ে গেছে। দেখি, কাল-পরশুর মধ্যে বেরুবা।’

হাজি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, ‘আরেকটা সম্বন্ধ এসেছে।’

‘বলেন কী। ছেলে কী করে?’

‘করে না কিছু। ক্যাশ টাকা পেলে বিজনেস করবে বলছে।’

‘ক্যাশ টাকা কে দেবে, আপনি?’

‘আমি ছাড়া আর কে?’

‘একেবারেই পাত্তা দেবেন না। নেক্‌স্ট টাইম যখন আসবে, এক চড় দিয়ে বিদায় করে দেবেন। আমি তো ব্যবস্থা করছিই। আমি কি বসে আছি নাকি? ভাবেন কী আমাকে? কথা দিয়েছি না? কথার একটা দাম আছে না?’

হাজি সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি খুব-একটা ভরসা পাচ্ছেন না।

‘ঐ লোক এলে হাঁকিয়ে দেবেন, বুঝলেন? ব্যাটা আছে টাকার তালে। এদের ধরে-ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া দরকার, তাহলে বিয়ের শখ ঘুচে যাবে।’

রাস্তায় নেমে ফিরোজের মনে হল জ্বর আবার চেপে আসছে। রোদ ঝলঝল লাগছে। মাথা হালকা মনে হচ্ছে। সিগারেটে টান দিয়ে মনে হল এক্ষুণি বসি করে সব ভাসাবে। পেটের ভেতর ক্রমাগত পাক দিচ্ছে। কী ভয়াবহ অবস্থা। দু’টাকা দিয়ে কেনা বেনসন এ্যাও হেজেস। শুধুমাত্র মহাপুরুষরাই একটান দিয়ে দু’টাকা দামের সিগারেট ফেলে দিতে পারেন। ফিরোজ মহাপুরুষ নয়, মহাপুরুষ হবার কোনো আগ্রহও তার নেই। সে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে এলোমেলো পা ফেলতে লাগল।

‘আপনি এখানে কী করছেন?’

ফিরোজ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে জ্বরের ঘোরে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। কারণ সে যে-দৃশ্যটি দেখছে, তা তার এই অবস্থায় দেখতে পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বাংলা সিনেমাতেও এই ঘটনাটাকে নাটকীয় মনে হবে।

‘আপনি কি আমকে চিনতে পারছেন না?’

‘চিনতে পারব না কেন? আপনি, এক জন অসম্ভব রাগী হৃদয়হীন অহঙ্কারী তরুণী। এখানে কী করছেন?’

অপালা হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতেই বলল, ‘বেশ কিছুক্ষণ থেকে আপনাকে লক্ষ্য করছি। এ-রকম পাগলের মতো পা ফেলছেন কেন? আপনি কি অসুস্থ?’

‘হ্যাঁ। তার আগে বলুন, এমন সহজ ভঙ্গিতে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন কেন? ঐ দিন এমন অপমান করলেন। নেহায়েত সাহসের অভাবে সুইসাইড করি নি।’

‘আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কিসের অপমান?’

‘ঐ যে ঐ দিন দেখা করতে গেলাম, আপনি বলে পাঠালেন দেখা হবে না।’

‘ঐ দিন মন ভালো ছিল না। কথা বলতে ভালো লাগছিল না। এতে অপমান বোধ করার কী আছে?’

‘আজ কি আপনার মন ভালো?’

‘হ্যাঁ, ভালো। গতকাল আমার একটা পরীক্ষা ছিল। খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছি।’

‘এখানে কী করছেন?’

‘এক জনকে খুঁজছি।’

‘আমাকে না তো?’

‘না, আপনাকে কেন খুঁজব? এ-রকম করে কথা বলছেন কেন?’

‘শরীর খারাপ তো, কাজেই উন্টোপান্টা কথা বলছি। ঐ-সব ধরবেন না। আপনি এক-একা হাঁটছেন, আপনার বডিগার্ডরা কোথায়? গাড়ি কোথায়?’

অপালা হাসতে-হাসতে বলল, ‘কাউকে না-বলে একা-একা বেরিয়েছি। এক জনকে একটা গিফ্ট দেব। ঠিকানা লেখা আছে, খুঁজে বের করতে পারছি না।’

‘দিন ঠিকানা, এক্ষুণি বের করে দিচ্ছি।’

‘এইভাবে লুপ্তি পরে যাবেন? আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, আপনি চট করে কাপড় বদলে আসুন।’

‘রাস্তায় দাঁড়িয়ে না-থেকে আপনিও বরং আমার সঙ্গে আসুন। কোথায় কীভাবে থাকি দেখে যান, কাজে লাগবে।’

‘কী কাজে লাগবে?’

‘বাংলাদেশে কিছু দরিদ্র মানুষও থাকে, এটা জানবেন।’

‘আপনার ধারণা, আমি জানি না?’

‘আমার সে-রকমই ধারণা।’

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, শাড়ির প্যাকেট হাতে অপালা ফিরোজের পিছনে-পিছনে আসছে। অপালার ভালোই লাগছে। কেন ভালো লাগছে তাও ঠিক বুঝতে পারছে না। এই মানুষটি তাকে দেখে অসম্ভব খুশি হয়েছে। তা ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে, কথা বলার ভঙ্গিতে। তার সিগারেটে আগুন নেই। সেই নেভানো সিগারেটই সে টানছে এবং ধোঁয়া ছাড়বার মতো ভঙ্গি করছে। লোকটি জানে না যে তার সিগারেট নেভানো। অপালার মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ খেলা করছে। এই সন্দেহটিকে প্রশয় দেয়া বোধহয় ঠিক হবে না।

ফিরোজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বিম্বিত গলায় বলল, ‘আপনি সত্যি-সত্যি আমার সঙ্গে আসছেন!’

‘আপনি তো আসতে বললেন।’

‘ও হ্যাঁ, তাই তো। কথার কথা হিসেবে বলেছিলাম, সত্যি-সত্যি চলে আসবেন ভাবি নি। আপনি কি রোমান হলিডে নামের কোনো ছবি দেখেছেন?’

‘না। কেন?’

‘যে-ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটছে, তার সঙ্গে ঐ ছবিটার অদ্ভুত মিল আছে। ঐ ছবিতে একজন রানী এক দিন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, সারাটা দিন কাটান এক জন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলা আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।’

‘আপনি এমনভাবে কথা বলছেন কেন?’

‘আগেই তো বলেছি, আমি অসুস্থ, আমার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। যা মনে আসছে বলে ফেলছি। আপনি চলে যাবার আগে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইব। সাবধানে উঠবেন, সিঁড়িটা পিছল।’

ফিরোজ অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটা কী সুন্দর গুট-গুট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। তার মনে হল, মেয়েটির মাথাও খানিকটা এলোমেলো। কিংবা লোকজনের সঙ্গে মিশে তার অভ্যাস নেই। সাধারণ একটি মেয়ে কখনো কোনো অবস্থাতেই এমন পরিচয়ে তার ঘরে আসবে না। ব্যাপারটির অস্বাভাবিকতা মেয়েটির চোখেই পড়ছে না, কিংবা কে জানে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, এটা স্বপ্নদৃশ্য নয় তো? সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো স্বপ্নে ঘটে যাচ্ছে। না, তা নয়। ফিরোজ সেন্টের গন্ধ পাচ্ছে। ঘন নীল রঙের আকাশ দেখতে পাচ্ছে। স্বপ্ন হয় গন্ধ ও বর্ণহীন।

অপালা কৌতূহলী হয়ে দেখছে। দেখার মতো কিছু নেই। অপরিস্ফুট নোংরা একটি ঘর। অন্য দিন এর চেয়ে পরিষ্কার থাকে। অসুস্থ থাকার কারণে কোনো কিছুতেই হাত দেয়া হয় নি। এখনো মশারি খাটানো। মেঝেতে সিগারেটের টুকরো। ময়লা কাপড়। দু’টি শেষ না-হওয়া পেইন্টিং। রঙের টিউব, ব্রাশ। পিরিচে রঙ, চেয়ারের রঙ, মেঝেতে রঙ। জানালার পাশে আধা-খাওয়া চায়ের কাপের দিকে সারি বেঁধে লাল পিঁপড়ার দল যাচ্ছে। অপালা বলল, ‘আপনি মনে হচ্ছে খুব গোছানো মানুষ।’

ফিরোজ জবাব দিল না।

‘আপনি ড্রেস চেঞ্জ করুন, আমি বারান্দায় দাঁড়াচ্ছি।’

অপালা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সুখী-সুখী চোখে তাকিয়ে রইল রাস্তার মানুষজনদের দিকে। কত ব্যস্ত হয়েই-না এরা ছুটছে, দেখে মনে হয় এদের কারোর বিন্দুমাত্র অবসর নেই। সবার ভীষণ তাড়া।

ফিরোজ বেরিয়ে এসে বলল, ‘আপনাকে এনে লজ্জাই লাগছে।’

অপালা বলল, ‘আমি ভেবেছিলাম আপনার কীকি এ-বাড়িতে দেখব। এখনো বিয়ে হয় নি?’

‘না।’

‘হবে তো শেষ পর্যন্ত?’

‘হ্যাঁ, হবে।’

‘আপনি বানিয়ে-বানিয়ে এ-সব বলছেন না তো?’

‘বানিয়ে বলব কেন? আমার কী স্বার্থ?’

‘তাও তো ঠিক। আচ্ছা শুনুন, একটা মজার জিনিস দেখলাম আপনার এখানে।’

দুটো চড়ুই পাখি চা খাচ্ছে।’

‘ওরা আমার পোষা চড়ুই। চা খাইয়ে-খাইয়ে পোষ মানিয়েছি।’

‘আপনি কেন বানিয়ে-বানিয়ে এত মিথ্যা কথা বলেন?’

‘চড়ুইগুলো যদি কথা বলতে পারত, তাহলে এরা বলত যে এটা সত্যি।
দূর্ভাগ্যক্রমে এদের কথা আমরা বুঝি না।’

বাসা খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগল। গলির পর গলি, তস্য গলি। টিনের একটা
ঘর। এর আবার নামও আছে-আনন্দকুটির।

ফিরোজ বলল, ‘আমিও কি আসব আপনার সঙ্গে?’

‘না, আপনি কেন আসবেন?’

‘অপেক্ষা করব এখানে?’

‘না, আমি নিজেই চলে যাব।’

‘আমি না-হয় থাকি, আপনাকে রিকশায় তুলে তারপর যাব।’

‘না। কেউ অপেক্ষা করে থাকলে আমার অস্বস্তি লাগে।’

ফিরোজ নিজেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। প্রচণ্ড জ্বরের আগমন সে টের
পাচ্ছে। চোখ মেলে রাখতে পারছে না, বমি-বমি ভাব হচ্ছে। ফিরোজের ধারণা, অপালা
এটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সে একটি কথাও বলছে না। সহজ ভদ্রতার দু’টি কথা কি
বলা যায় না? সে যদি জিজ্ঞেস করে-আপনার কি খুব খারাপ লাগছে নাকি? তাতে
তো জগৎ-সংসারের কোনো ক্ষতি হবে না। ফিরোজ বলল, ‘হয়তো ওরা বাসায় নেই,
কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গিয়েছে। আমি দাঁড়াছি, আপনি খোঁজ নিয়ে আসুন।’

অপালা হেসে ফেলল। ফিরোজ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, ‘আপনি হাসছেন? এখন
বাস্তাদের পরীক্ষা-টরীক্ষা হয়ে গেছে, এই সময়ই সবাই নানার বাড়িতে বেড়াতে
যায়।’

‘যে-বাড়িতে যাচ্ছি, তাদের বড় মেয়েটির বিয়ে, কাজেই ওরা কোথাও যাবে
না।’

‘হয়তো দল বেঁধে কেনাকাটা করতে গিয়েছে। বড় মেয়ের বিয়েতে দল বেঁধে
কেনাকাটা হয়। আমার বড় বোনের বিয়ের সময় দেখেছি। কাজেই মেয়েটিকে পর্যন্ত
আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। ঘর তালাবন্ধ করে গেলাম, ফিরে এসে দেখি চোর সব
সাফা করে দিয়েছে।’

‘ফিরোজ সাহেব।’

‘জ্বি।’

‘এখন চলে যান। প্লীজ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে ভালো লাগছে
না।’

ফিরোজ গেল না। একটু শুধু সরে গেল। তার কেন জানি মনে হচ্ছে অপালা
এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে। তখন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ হাঁটা যাবে। পাশাপাশি সাত পা
হাঁটলে সাত পাকে বাঁধা পড়ে। অনেক বেশি পা হাঁটা হয়েছে। আরো হোক। সে লক্ষ পা
হাঁটবে।

আশেপাশে কোনো চায়ের দোকান নেই যে বসা যায়। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

সামান্য জ্বরে শরীর বড় বেশি কাবু হয়েছে। অসুখ-অসুখ একটা গন্ধ বেরুচ্ছে গা থেকে। পেটে আবার পাক খেতে শুরু করেছে। এবার নির্ঘাত বমি হবে। অপালা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখবে সে রাস্তায় উবু হয়ে বসে বমি করছে। সে বড় কুৎসিত দৃশ্য। এই দৃশ্য অপালাকে কিছুতেই দেখানো যায় না। ফিরোজ একটা রিকশায় উঠে পড়ল।



অপালা অনেকক্ষণ হল কড়া নেড়েছে। ভেতর থেকে মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে বলল, 'কে?'

অপালা কী বলবে ভেবে পেল না। সে যদি বলে—'আমি অপালা'। তাহলে কেউ কিছু বুঝবে না। শুধু 'আমি' বলারও কোনো মানে নেই। সে আবার কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে সেই মেয়েটি আবার বলল, 'কে?' যেন জবাব না—পেলে দরজা খুলবে না।

অপালা বলল, 'দরজাটা কি খোলা যাবে?'

খুঁট করে দরজা খুলল, তাও পুরোপুরি নয়। অল্প একটু ফাঁক করে বার-তের বছরের মেয়েটি মুখ বের করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটিকেই অপালা তাদের গেটের বাইরে দেখেছে। মেয়েটি কী-যে অবাক হয়েছে। চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে আছে। নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না। অপালাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না—দিয়ে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তার পরপরই অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বাড়ির সবাই যেন একসঙ্গে ছুটে আসছে। অপালার লজ্জা করতে লাগল।

এ-বাড়িতে বোধহয় কোনো ছেলে নেই। পাঁচটি বিভিন্ন বয়সের মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। এদের সবার মুখের দিকে খানিকক্ষণ করে তাকাল। একটি শীতল স্রোত বয়ে গেল অপালার গা দিয়ে। এই মেয়েগুলো দেখতে তার মতো, বিশেষ করে বড় মেয়েটি। অপালা কাঁপা গলায় বলল, 'তোমরা কেমন আছ?' কেউ কোনো জবাব দিল না। বাড়ির ভেতর থেকে এক জন মহিলা বললেন, 'ওকে ভেতরে নিয়ে আয়, ওকে ভেতরে নিয়ে আয়।' বড় মেয়েটি চাপা গলায় বলল, 'আস, ভেতরে আস।' বলেই সে অপালার হাত ধরল। যেন সে এদের অনেক দিনের পরিচিত কেউ। অপালা বলল, 'তোমরা কি আমাকে চেন?' তারা কেউ সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। ভেতর থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওকে নিয়ে আয়, ওকে ভেতরে নিয়ে আয়।'

চাদর গায়ে এক জন মহিলা বিছানায় শুয়ে আছেন। অপালা ঘরের ভেতর পা দেয়ামাত্র তিনি কান্দতে শুরু করলেন। কান্নার দমকে তার ছোট শরীর থর-থর করে কাঁপছে। বড় মেয়েটি ছুটে গিয়ে তার মাকে ধরল। ফিস-ফিস করে বলল, 'কিছু হয় নাই মা, কিছু হয় নাই, তুমি চুপ করা।' ভদ্রমহিলা চুপ করতে পারছেন না।

অপালা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

ভদ্রমহিলা না-সূচক মাথা নাড়লেন।

'আপনি তাহলে এ-রকম করছেন কেন?'

বড় মেয়েটি একটি হাতপাখা নিয়ে তার মাকে দ্রুত হাওয়া করছে। মেজো মেয়েটি অপালার হাত ধরে বলল, 'তুমি বস। চেয়ারটায় বস।'

অপালা বসল। হাতের শাড়ির প্যাকেটটি নামিয়ে রেখে ক্লান্ত গলায় বলল, 'এ-বাড়ির যে মেয়েটির বিয়ে, তার জন্যে এই শাড়িটা এনেছি। বিয়ের দিন তো আসতে পারব না, তাই। বেশি লোকজন আমার ভালো লাগে না।'

অপালা কী বলছে নিজেও বুঝতে পারছে না। সে যেন ঘোরের মধ্যে কথা বলছে। পাঁচটি মেয়ের কেউই তার কথা শুনছে বলে মনে হল না। সবাই চোখ বড়-বড় করে অপালার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু বড় মেয়েটি তার মাকে নিয়ে ব্যস্ত। ভদ্রমহিলা এখন আর কোনো সাড়াশব্দ করছেন না। তাঁর চোখ বন্ধ। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। বড় মেয়েটি তার মা'র গলা পর্যন্ত চাদর টেনে মৃদু স্বরে বলল, 'এস, আমরা পাশের ঘরে যাই।'

'উনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। মা'র শরীর খুব খারাপ। মাঝে-মাঝে তাঁর এ-রকম হয়।'

'উনি আমাকে দেখে এ-রকম করলেন কেন?'

বড় মেয়েটি তার জবাব না-দিয়ে বলল, 'চল, পাশের ঘরে যাই।'

অপালা বলল, 'না, আমি পাশের ঘরে যাব না। আমি এখন চলে যাব। আমার ভালো লাগছে না। আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

সে উঠে দাঁড়াল। আবার বলল, 'তোমরা কি আমাকে চেন?'

বড় মেয়েটি বলল, 'না, চিনি না।'

'সত্যি চেন না?'

'তোমার বাবা আমার বাবাকে অনেক সাহায্য করেছেন, সেইভাবে চিনি। আমার বাবার কোনো টাকাপয়সা ছিল না। প্রায় না-খেয়ে ছিলেন। বাবা-মা আর তাদের তিন মেয়ে। তখন তোমার বাবা আমাদের সাহায্য করেন। টাকাপয়সা দেন। বাবাকে একটা দোকান দিয়ে দেন। সেইভাবে তোমাকে চিনি।'

'সেই রকম চেনায় কেউ কি আমাকে তুমি বলবে?'

'তুমি বলায় কি রাগ করেছ?'

অপালা জবাব না-দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সে ঠিকভাবে পা ফেলতে পারছে না। তার যেন প্রচণ্ড জ্বর আসছে। নিঃশ্বাসও ঠিকমতো ফেলতে পারছে না। অপালার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা পাঁচ জনও বেরিয়ে এসেছে। মেজো মেয়েটি অপালার হাত ধরে কী বলতে চাইল। অপালা সেই হাত কাঁপা ভঙ্গিতে সরিয়ে প্রায় ছুট গেল রাস্তার দিকে। তার মনে হচ্ছে, সে রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারবে না, তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে। তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

পাঁচ বোন দরজা ধরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, যেন তারা কোনো কারণে খুব ভয় পেয়েছে।

রাত দশটা।

নিশানাথবাবু দোতলায় উঠে এসে অপালার দরজায় ধাক্কা দিলেন।

‘মা, একটু দরজা খুলবে?’

অপালা দরজা খুলল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি এলোমেলো। নিশানাথবাবু মৃদু স্বরে বললেন, ‘কি হয়েছে?’

‘কই, কিছু হয় নি তো! কী হবে?’

‘আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?’

‘ম্যানেজারকাকু, আজ আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। আপনি এখন যান। আপনার পায়ে পড়ি।’

নিশানাথবাবু আবার নিচে নেমে গেলেন। সেই রাতে তিনি আর বাড়ি ফিরলেন না। একতলার গেস্টরুমে রাত কাটালেন।

ফখরুদ্দিন সাহেব গভীর রাতে টেলিফোন করলেন। গভীর রাতের টেলিফোনে গলা অন্যরকম শোনা যায়। চেনা মানুষকেও অচেনা মনে হয়। অপালা বলল, ‘আপনি কে?’

ফখরুদ্দিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না, মা?’

‘ও, বাবা তুমি?’

‘হ্যাঁ, আমি। তোমার কী হয়েছে?’

‘কই, কিছু হয় নি তো!’

‘মা, সত্যি করে বল তো।’

‘সত্যি বলছি, আমার কিছু হয় নি, শুধু.....’

‘শুধু কি?’

‘আমার খুব একা-একা লাগছে বাবা।’

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোনেই কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর অসম্ভব মন-খারাপ হয়ে গেল।

‘মা, তুমি কি কাঁদছ?’

‘হ্যাঁ, কাঁদছি। আর কাঁদব না।’

‘কিছু-একটা তোমার হয়েছে। সেটা কী?’

অপালা চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, ‘আমাকে বলতে কি তোমার কোনো বাধা আছে?’

‘বলার মতো কিছু হয় নি বাবা।’

‘কোনো ছেলের সঙ্গে কি তোমার ভাব হয়েছে?’ নিশানাথ বলছিল আর্টিস্ট একটা ছেলে নাকি আসে প্রায়ই। তুমি কি আজ তার কাছে গিয়েছিলে?’

‘হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।’

‘সে কি এমন কিছু বলেছে, যাতে তোমার মন-খারাপ হয়েছে?’

‘না।’

‘এই ছেলেটিকে তোমার কি পছন্দ হয়? যদি হয় আমাকে বল। তুমি যা চাইবে তাই হবে। যা হওয়ার নয়, তাও আমি হওয়াব। আমার প্রচুর ক্ষমতা।’

ফখরুদ্দিন সাহেবের মনে হল, অপালা আবার কাঁদতে শুরু করেছে। তিনি বললেন, ‘ঐ ছেলে যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, আমি টেনে তার জিত ছিঁড়ে

ফেলব।’

‘ঐ-সব কিছু না বাবা, এমনিতেই আমার মন-খারাপ। তুমি তো জান, মাঝে-মাঝে আমার মন-খারাপ হয়।

‘এটা তো ভালো কথা না। এটা একটা অসুখ, এর নাম মেলাংকলি। আমি ঢাকায় এসেই বড়-বড় ডাক্তার দেখাব।’

‘কবে আসবে ঢাকায়?’

‘তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ হলেই আমি টাভেল এজেন্টকে ফোন করব। এখানে আমার অনেক ঝামেলা, তবুও আমি ফাস্ট এ্যাক্টিভইলবল ফ্লাইটে চলে আসব। তোমার মা’কেও নিয়ে আসব।’

‘আচ্ছা।’

‘তুমি কি আর কিছু বলবে?’

‘না।’

‘তুমি কি জেগে ছিলে নাকি মা?’

‘হ্যাঁ।’

‘এত রাত পর্যন্ত জেগে-জেগে কী করছিলে?’

‘ছবি দেখছিলাম।’

‘কী ছবি দেখছিলে?’

‘আমার ছবি। কত ছবি যে তোমরা আমার তুলেছ।’

‘দ্যাটস রাইট। ফটোগ্রাফির হবিটা একসময় বেশ জোরালই ছিল। এখন নেই। ভাবছি, আবার শুরু করব। একটা ডার্ক রুম বানিয়ে নিজেই ছবি ডেভেলপ করব। কেমন হবে?’

‘ভালোই হবে। বাবা।’

‘বল মা।’

‘আমার এত ছবি, কিন্তু খুব ছোটবেলার ছবি নেই কেন?’

‘তোমার কথা বুঝতে পারছি না।’

‘জন্মের পর-পর তোলা ছবি। এক বছর-দু’ বছর বয়সের ছবি।’

ফখরুদ্দিন সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর মিস্টার্স ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। অপালা যখন দ্বিতীয় বার প্রশ্নটি করতে যাবে তখন তিনি বললেন, ‘তোমার ছোটবেলার ছবিও আছে। না-থাকায় তো কোনো কারণ নেই। আমি এসে তোমাকে খুঁজে দেব।’

‘আচ্ছা।’

‘তোমার ছোটবেলায় আমি একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম। ব্যবসা-সংক্রান্ত ঝামেলা। মন-মেজাজ ভালো ছিল না। প্রচুর ছোট্ট ছুটি করতে হত, ছবি তোলার তেমন মুড ছিল না। ছবি তোলা, কবিতা এবং গল্প লেখার মতোই একটা মুডের ব্যাপার।’

‘তা ঠিক।’

‘একেবারেই যে তুলি নি তা নয়। কিছু-কিছু নিশ্চয়ই তোলা হয়েছে। তবে আরো বেশি তোলার প্রয়োজন ছিল। আমি ফিরে আসি, তারপর দেখবে প্রতিদিন এক রোল করে স্ল্যাপ নেব।’

‘বাবা।’

‘বল মা।’

‘আগামী কাল আমার একটা পরীক্ষা আছে।’

‘ও, আই অ্যাম সরি। এতক্ষণ তোমাকে ডিস্টার্ব করা খুবই অনুচিত হয়েছে।’

অপালা ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘কাল যদি পরীক্ষাটা না দিই, তাহলে কি তুমি রাগ করবে?’

‘মা, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।’

‘কাল আমার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করছে না। যদি পরীক্ষার হলে যাই, তাতেও লাভ হবে না। একটা লাইনও লিখতে পারব না।’

‘কেন?’

‘আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।’

‘শরীর খারাপ লাগলে তো পরীক্ষা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মা, তুমি শুয়ে থাক। আমি আসছি, এসেই সব ঠিক করে দেব।’

অপালা টেলিফোন রেখে খাবার ঘরে গেল। এত রাত হয়েছে, তবু কেউ ঘুমায় নি। সবাই জেগে আছে। সে আজ সারা দিন কিছু খায় নি, রাতেও খায় নি—এই জন্যেই জেগে আছে হয়তো।’

‘রমিলা।’

‘জি আফা।’

‘আমি এক কাপ কফি খাব। খুব কড়া করে এক কাপ কফি দাও।’

‘সাথে আর কিছু দিব আফা?’

‘এক টুকরো পনির কেটে দিও। আমার ঘরে নিয়ে এসো। আর শোন, তোমরা সবাই জেগে আছ কেন? শুয়ে পড়।’

অনেক দিন পর অপালা তার খাতা নিয়ে বসেছে। ঘুম-ঘুম একটা ভাব ছিল, কফি খাওয়ায় সেই ভাব কেটে গেছে। খুব ক্লান্তি লাগছে, আবার ইচ্ছেও করছে কিছু—একটা লিখতে। অপালা লিখতে শুরু করল।

আমার বাবা

যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন বাংলার স্যার একটা রচনা লিখতে দিলেন—তোমার প্রিয় মানুষ। কেউ লিখল রবীন্দ্রনাথ, কেউ শরৎচন্দ্র। কিছু-কিছু ছোট্ট মেয়েরা বিদেশের নামকরা লোকদের প্রিয় মানুষ বানিয়ে রচনা লিখল, লেনিন, আইনস্টাইন, মার্কস তেরেসা। আমি লিখলাম, আমার প্রিয় মানুষ আমার বাবা। কেন তিনি আমার প্রিয় মানুষ তাও লিখলাম। ছোট-ছোট কিছু ঘটনার কথা লিখলাম—যেমন, আমার এক বার টনসিল উপারেশন হল। সলিড কিছু খেতে পারি না। বাবার তা দেখে খুব কষ্ট হল। তিনি বললেন, আমার মা যত দিন সুস্থ না হয়েছে, তত দিন আমিও সলিড কিছু খাব না। সত্যি-সত্যি তিন দিন তাই করলেন। দুধ, মুরগির সুপ এইসব খেয়ে কাটালেন। আরেক বার আমার প্রচণ্ড দীতে ব্যথা। মাটির হাড়ে কী যেন হয়েছে। কত ওষুধ কত ডাক্তার, ব্যথা কমে না। আমার কষ্ট দেখে বাবা যেন কী—রকম হয়ে গেলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট বাক্সদের মতো শব্দ করে কঁদতে লাগলেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার! বাবার কান্না শুনে আমার ব্যথা কমে গেল। আমি বললাম, বাবা তুমি কঁদবে না, আমার ব্যথা কমে গেছে। বাবা মনে করলেন আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলছি। তিনি আরো শব্দ করে কঁদতে লাগলেন। এই

মানুষটি যদি আমার প্রিয় না-হয়, তাহলে কে হবে? রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, মাদার তেরেসা—এরা মহাপুরুষ পর্যায়ে মানুষ, পৃথিবীর সবার প্রিয়। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ, আমার প্রিয় মানুষটিও সামান্য।

এই রচনা নিয়ে কত কাণ্ড। আমাদের বাংলার স্যার কবিরউদ্দিন খুব খুশি। ক্লাসে সবাইকে পড়ে শোনালেন। শুধু তাই না, লেখাটা কপি করে তিনি দৈনিক বাংলার শিশুদের পাতায় ছাপতে দিলেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, লেখাটা সেখানে ছাপাও হল। এটাই আমার প্রথম ছাপা লেখা এবং এটাই শেষ।

বাবা এই লেখা পড়লেন না। কারণ তিনি জানেনই না যে তাঁর মেয়ের একটা লেখা ছাপা হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছা করছিল বাবাকে লেখাটা পড়াই, আবার লজ্জাও লাগছিল। নিজের গোপন ভালবাসার কথা জানাতে লজ্জা করে.....।

আমার মনে হয় লজ্জা একটু বেশি। মা এত অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আমার এত খারাপ লাগে, কিন্তু নিজের খারাপ লাগার কথা মা'কে কখনো জানাই না। জানাতে ইচ্ছা করে না। সবসময় মনে হয় নিজের মনের কথা থাকুক না মনে! কী হবে সবাইকে জানিয়ে?

তোরবেলা খুব সহজভাবে অপালা নিচে নেমে এল। নাশতার টেবিলে বসল। নিশানাথবাবুর স্ত্রী প্রায় ছুটে এলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে অপালা বলল, 'একটা হাসির গল্প বলুন তো কাকিমা।'

তিনি খুবই অবাক হলেন। এত অবাক হলেন যে হাসির গল্প মনে এল না। তিনি হাসির গল্পের জন্যে আকাশপাতাল হাতড়াতে লাগলেন। অপালা নাশতা শেষ করে অরুণা-বরুণার খোঁজে গেল। অরুণা তাকে বিশেষ পছন্দ করে না, তবে বরুণা তার জন্যে পাগল। আজ দু' জনই ছুটে এল। লাফালাফি করতে লাগল। বরুণার স্বভাব হচ্ছে আদর দেখানোর জন্যে পা কামড়ে ধরার ভঙ্গি করা। অপালা যখন বলে—এই, এ—সব কী! তখন তার ফুটির সীমা থাকে না। অনেকটা দূরে ছুটে যায়, আবার দৌড়ে এসে কামড়ের ভঙ্গি করে। আজ দু' জনই এক খেলা খেলছে। দু'জনের মনেই আনন্দ।

গোমেজ এসে বলল, 'আপা, আপনার টেলিফোন।'

গোমেজের হাতে এক কাপ কফি।

'আপা, কফিটা নিন। অন্য রকম করে বানিয়েছি।'

'অন্য রকম মানে? লবণ দিয়েছ নাকি গোমেজ ভাই?'

'খেয়ে দেখেন আপা।'

অপালা কফির কাপ হাতে টেলিফোন ধরতে গেল। টেলিফোন করেছেন মা। তাঁর গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। যেন খুব সূক্ষ্মভাবে কাঁপছে।

'মা, তুই কেমন আছিস?'

'আমি ভালো আছি। আমি খারাপ থাকব কেন? আমার তো আর হাটের অসুখ হয় নি।'

'আজ তোর পরীক্ষা না?'

'হ্যাঁ, বিকেলে।'

'তোর বাবা বলছিল, তুই নাকি পরীক্ষা দিবি না?'

'পরীক্ষা দেব না কেন? এত পড়াশোনা শুধু-শুধু করলাম? তবে পরীক্ষাটা খুব খারাপ হবে।'

'তুই কাল তোর বাবাকে কী বলেছিলি? সে সারা রাত ঘুমুতে পারে নি।'

‘ও-মা, সে কী কথা! আমি তো কিছু বলি নি। কই, বাবাকে দাও তো, তোমার কাছে আছেন না?’

‘না। টিকিটের জন্যে ছোট্টাছুটি করছে। টিকিট পাচ্ছে না। এখন গেছে অ্যারোফ্লটের অফিসে—মস্কো হয়ে ঢাকায় যাবে।’

‘তোমাদের এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমার কিছু হয় নি। আমি খুব ভালো আছি।’

‘সত্যি ভালো আছিস?’

‘হ্যাঁ, সত্যি ভালো। মিথ্যা ভালো আবার কেউ থাকে নাকি?’

অপালা হেসে ফেলল।

প্রশ্ন হাতে নিয়ে অপালার জ্বর এসে গেল। সব অচেনা। মনে হচ্ছে অন্য কোনো সাবজেটের প্রশ্ন ভুল করে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, লিখতে গিয়ে দেখল সে লিখতে পারছে। উত্তরগুলো বেশ ভালোই হল। রিগ্রেশন মডেলের একটা জটিল অঙ্কও শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে ফেলল। কে জানে, হয়তো এই শেষ পরীক্ষাটাই তার সবচেয়ে ভালো হয়েছে।

অনার্সের কঠিন কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। বেশ লাগছে তার। ইচ্ছে করছে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে। গাড়িতে করে নয়, হেঁটে-হেঁটে। ফিরোজ নামের ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়? তাকে গিয়ে সে যদি বলে, আপনি আপনার বান্ধবীর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন, ঐ মেয়েটিকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

হাজি সহেব অবাক হয়ে একটি দৃশ্য দেখলেন। বিশাল একটা নীল রঙের গাড়ি তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। লম্বা, ফর্সা একটা মেয়ে নামছে গাড়ি থেকে। বেশ সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। যেন অনেক বার সে এসেছে। সবকিছু তার খুব ভালো চেনা। দোতলায় এই মেয়েটি কার কাছে যাচ্ছে? মেয়েটির বয়স এমন যে চট করে তুমি বলা যায় না। আবার তাঁর মতো একজন ব্যক্তি লোকের পক্ষে আপনি করে বলাও মুশকিল। তাঁর বড় মেয়ের বয়স নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি। হাজি সাহেব ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

অপালা সিঁড়ির মাঝামাঝি থেমে গেল। দু’ পাশে এসে বলল, ‘ফিরোজ বলে এক জন ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর কাছে।’

‘উনি তো হাসপাতালে।’

‘সে কী, কেন?’

‘আকাশপাতাল জ্বর। আমিই হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি।’

‘কোন হাসপাতাল, কত নম্বর বেড, এইসব বলতে পারবেন?’

‘মুখস্থ বলতে পারব না। আমার কিছু মনে থাকে না। তবে লেখা আছে। আমার সঙ্গে এস, দিচ্ছি।’

অপালা নেমে এল। হাজি সাহেব বললেন, 'ফিরোজ তোমার কে হয়?'

'কিছু হয় না। আমার খুব পরিচিত।'

হাজি সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হল। বেফাঁস কিছু বলে ফেলছিলেন, বহু কষ্টে নিজেকে সামলালেন। মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে হাসপাতালের নাম-ঠিকানা দেবার কোনো আগ্রহ এখন আর অনুভব করছেন না। তবু মুখের ওপর বলা যায় না।—তুমি চলে যাও, তোমাকে কিছু দেব না।

অপালা হাজি সাহেবের পিছনে-পিছনে বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে তার জন্যে বড় রকমের একটা বিছানায় অপেক্ষা করছিল। হাজি সাহেবের ছোট মেয়ে বিছানার ওপর বসে আছে। তার ছবিই সে ফিরোজের কাছে দেখেছে। মেয়েটি ছবির চেয়েও অনেক সুন্দর। তবে সে বোধহয় নিজের পরিবারের বাইরে কারো সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নয়। খুব হকচকিয়ে গেছে। একটি কথাও না-বলে চলে যাচ্ছে ভেতরের দিকে। কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে। এমনভাবে হাঁটছে কেন?

অপালা বলল, 'এই মেয়েটির সঙ্গেই কি ফিরোজ সাহেবের বিয়ের কথা হচ্ছে?'

হাজি সাহেব এবং তাঁর মেয়ে দু' জনই চমকে উঠল। মেয়েটি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাজি সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর হাতে একটা নোটবই। নোটবইটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিয়ের কথা তুমি কী বললে?'

'আমি বোধহয় কোনো ভুল করেছি। কিছু মনে করবেন না।'

'ভুল না, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি গোড়া থেকে সে-রকমই সন্দেহ করছিলাম। ওর মা'কে বলেছিও কয়েক বার।'

দরজা ধরে দাঁড়ানো মেয়েটি চট করে সরে গেল। হাজি সাহেব বললেন, 'মুখ ফুটে নিজের কথা বললেই হয়, কিংবা আত্মীয়স্বজনদের দিয়ে বলাতে পারে, তা না।'

বিস্মিত অপালা বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে তাহলে উনি আপনাদের কিছু বলেন নি?'

'আরে না। একেক সময় একেক কথা বলে। এক বার বলল—বিয়ের সব দায়িত্ব আমার। তখনই সন্দেহ হল। চালাক ছেলে। তুমি বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন? দাঁড়াও, চায়ের কথা বলে আসি। আর এই হল ঠিকানা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ওয়ার্ড নাম্বার পাঁচ। বেড নাম্বার তেতাল্লিশ। ওয়ার্ডে ঢুকেই প্রথম বিছানাটি।'

অপালাকে ঘন্টাখানেক বসতে হল। হাজি সাহেবের স্বীকৃতি এই এক ঘন্টা ক্রমাগত কথা বললেন। মোটামোট ধরনের মহিলা, কথা বলার সময় খুব হাত নাড়ান। গুরুত্ব করলেন 'মা' ডাক দিয়ে।

'মা, তোমার নাম কি?'

'অপালা।'

'ও-মা, কী অদ্ভুত নাম! তুমি আমার কথায় কিছু মনে করলে না তো?'

'জ্বি-না।'

'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি। একটা ঝামেলা মিটে গেল। ছেলের মনে কী ছিল তা তো আর আমরা জানি না। জানলে এত দিনে শুভ কাজ সমাধা হয়ে যেত ইনশাআল্লাহ।'

হাজি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এসেই কী বকবক শুরু করলে? চুপ কর

তো।’

‘চুপ করব কেন? আমরা মেয়েতে-মেয়েতে কথা বলছি, তুমি এর মধ্যে থাকবে না। বারান্দায় গিয়ে বস।’

মেয়েটি চায়ের টে নিয়ে ঢুকেছে। একটা প্লেটে পঁপর ভাজা, অন্য একটা প্লেটে সুজির হালুয়া। সে খুব সাবধানে টে নামিয়ে রাখল। এক বারও চোখ তুলে তাকাল না। ভয়ে-সঙ্কোচে সে এতটুকু হয়ে গেছে। এখন ভালো লাগছে মেয়েটিকে দেখতে।

হাজি সাহেবের বাড়ি থেকে বেরতে-বেরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা কারো বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে না। সন্ধ্যাবেলা শুধু পশু এবং পাখিরাই ঘরে ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়। মানুষ হয় না। উষা এবং গোধূলি ইচ্ছে গৃহত্যাগের লগ্ন।

ড্রাইভার বলল, ‘বাসায় যাব আপা?’

‘না, এমনি একটু রাস্তায় চালান।’

‘মীরপুর রোড ধরে যাব?’

‘যান।’

শ্যামলীতে বড় খালার বাড়ি। তাঁর সঙ্গে এক বার দেখা করে এলে কেমন হয়? কত দিন ও-বাড়িতে যাওয়া হয় না। খালাও আসেন না। মা মাঝে-মাঝে এ-বাড়িতে আসেন, কিন্তু অপালাকে সঙ্গে আনেন না। কেন আনেন না এ নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায় নি। আজ তার মাথায় ঝম-ঝম করে বাজতে লাগল—মা আমাকে এ-বাড়িতে আনেন না, মা আমাকে এ-বাড়িতে আনেন না। যেন রেকর্ডে পিন আটকে গেছে, তুলে না-দেয়া পর্যন্ত বাজতেই থাকবে।

‘ড্রাইভার সাহেব।’

‘জি আপা।’

‘শ্যামলী চলুন। বড় খালার বাসায়। বড় খালার বাসা চেনেন না?’

‘জি, চিনি। চিনব না কেন?’

বড় খালা অপ্রসন্ন মুখে বললেন, ‘তারপর রাজকন্যা, কেমন আছ?’

অপালা হেসে ফেলল।

‘আমি ভালো আছি বড় খালা।’

‘সন্ধ্যাবেলা কী মনে করে? আমাদের বাড়িঘর তো তোমার জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা। ফরবিডেন জোন।’

‘ফরবিডেন জোন হবে কেন?’

‘আমি তো জানি না, আছে নিশ্চয়ই কোম্পোজারগ। রাজকন্যারা কি সব জায়গায় যেতে পারে, না যেতে পারা উচিত? বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

‘বসব না খালা। আমি এখন যাব।’

‘এখন যাবে মানে। তাহলে এসেছ কেন?’

অপালা বসল। বড় খালা গম্ভীর মুখে বললেন, ‘এমনিতে তো তোমাদের খবর পাওয়ার উপায় নেই। পত্রিকায় অবশ্যি ইদানীং পাচ্ছি।’

অপালা বিস্মিত হয়ে বলল, ‘পত্রিকায় খবর মানে! পত্রিকায় আবার কী খবর?’

‘সে কী! তুমি পত্রিকা পড় না?’

‘জ্বি-না।’

‘দেশি পত্রিকা তোমার বাবা পড়তে দেন না বোধহয়।’

‘তা নয় খালা, ইচ্ছা করে না। কী খবর বেরিয়েছে?’

‘দু’টা খুন হয়েছে তোমাদের টঙ্গির কারখানায়। খুনী ধরা পড়েছে। তার ছবিটি বি দিয়ে নিউজ হয়েছে। সে বলছে, তোমার বাবার নির্দেশেই এই কাণ্ড সে করেছে। সব পত্রিকাতেই তো আছে, তুমি কিছুই জান না?’

‘জ্বি-না।’

‘না- জানাই ভালো।’

‘খুব চিন্তা লাগছে খালা।’

‘চিন্তা লাগার কী আছে? টাকাওয়ালা মানুষদের এইসব সামান্য জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। তোমার বাবা আসুক। দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। ঐ খুনীই তখন উক্টো কথা বলবে। বস তুমি, আমি দেখি, চা-টার ব্যবস্থা করি। তোমার ঠিকমতো যত্ন হয় নি—এই খবর তোমার বাবার কানে উঠলে উনি রেগে যাবেন। জগৎ শেঠদের রাগাতে নেই।’

অপালা একা-একা বসে রইল। এক বার বড় খালার মেয়ে বিনু এসে বলল, ‘ছবি দেখবে আপা? “বালিকা বধূ” আছে। খুব ভালো প্রিন্ট।’

‘তুমি দেখ। আমার ইচ্ছা করছে না।’

‘আমি চার বার দেখেছি আপা। তুমি দেখলে তোমার সঙ্গে আবার দেখবা।’

‘আমার আজ একটুও ইচ্ছা করছে না। ভীষণ মাথা ধরেছে।’

মাথা ধরার ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। আসলেই প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে যেতে। তা সম্ভব নয়। বড় খালা তার সামনে প্রচুর খাবারদাবার সাজিয়ে রাখছেন। তাঁর মুখে কী অদ্ভুত এক ধরনের কাঠিন্য।

‘বড় খালা।’

‘বল।’

‘আমার জন্ম কি হাসপাতালে হয়েছিল?’

‘তা দিয়ে তোমার কী দরকার?’

‘এমনি জিজ্ঞেস করছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, জানেন না?’

‘জানব না কেন? নাও, চা খাও। তুমি কি এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে এসেছিলে?’

‘জ্বি-না। হঠাৎ মনে হল।’

‘তোমার বাবা-মা ফিরবেন কবে?’

‘টিকিট নিয়ে কী-সব ঝামেলা হচ্ছে, ঝামেলা মিটলেই ফিরবেন।’

‘একা-একা থাক—আমাদের খোঁজখবর নেয়া উচিত, কিন্তু নিতে পারি না। কেন জান?’

‘জ্বি-না।’

‘তোমাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা মানেই আগ বাড়িয়ে গালে চড় খাওয়া। পত্রিকায় খবর দেখার পর তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম। কী বলল, জান?’

‘কী বলল?’

‘বলল, তুমি পড়াশোনা করছ, তোমাকে ডাকা যাবে না।’

‘ওদের দোষ নেই খালা আমিই বলে দিয়েছিলাম।’

‘ভালো, খুব ভালো।’

প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে অপালা বাসায় ফিরল। বাসায় অনেক মানুষ। ড্রয়িং রুমে আলো জ্বলছে। কিছু লোকজন বসে আছে সেখানে। বারান্দায় চিত্তিত মুখে ম্যানেজারবাবু এবং চিটাগাং ব্রাঞ্চের জি এম হাঁটাহাঁটি করছেন। নিশানাথবাবু ছুটে এলেন, ‘কোথায় ছিলে এতক্ষণ?’

অপালা তার জবাব দিল না। নিশানাথবাবু বললেন, ‘তুমি একটু বসার ঘরে এস। পুলিশের কয়েকজন অফিসার এসেছেন।’

‘আমার সঙ্গে তো তাঁদের কোনো দরকার নেই।’

‘আমরা বলেছি। তবু তাঁরা কথা বলতে চান। অনেকক্ষণ বসে আছেন।’

‘আমি তাঁদের সঙ্গে কোনো কথা বলব না।’

‘মা, তুমি বুঝতে পারছ না।’

‘আমার কিছু বোঝার দরকার নেই। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি এখন ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব।’

‘দু’—এক মিনিটের ব্যাপার।’

‘ম্যানেজারকাকু, আপনি আমাকে বিরক্ত করবেন না।’

অপালা দোতলায় উঠে গেল। এক বারও ফিরে তাকাল না। নিশানাথবাবুর চিত্তিত মুখ আরো ঝুলে পড়ল।

নার্সদের মুখশ্রী ভালো থাকা উচিত।

ফিরোজের তাই ধারণা। যেন মুখের দিকে তাকিয়েই মন প্রশান্ত হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মোমবাতি হাতে হেঁটে যাচ্ছেন—এই দৃশ্য দেখে রুগীরা নতুন আশায় বুক বেঁধেছে। কারণ ঐ মহিলা ছিলেন অসম্ভব রূপবতী। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যদি তাড়কা রাক্ষসীর মতো হতেন, তাহলে রুগীরা নিশ্চয়ই রাতেই বেলা এই দৃশ্য দেখ ভিরমি খেত।

এই হাসপাতালে যে-ক’টি নার্স ফিরোজ দেখেছে সবাই হয় তাড়কা রাক্ষসী, নয়তো তাড়কা রাক্ষসী হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ডাক্তার এবং নার্সদের প্রেম নিয়ে অনেক সুন্দর-সুন্দর গল্প-উপন্যাস আছে। সে-সব নিশ্চয়ই বানানো। এই ওয়ার্ডে যে গত দু’দিন ধরে আসছে তার চেহারা মন্দ নয়, তবে কথাবার্তা অসহ্য।

ধমক না-দিয়ে কোনো কথা বলে না। আজ সকালেই ফিরোজের সঙ্গে বড় রকমের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। মেয়েটি ওয়ার্ডে ঢুকেই কড়া গলায় বলল, ‘এই যে লোক, বসে আছেন কেন?’

‘এই যে লোক’ বলে কেউ সম্বোধন করতে পারে, এটাই ফিরোজের ধারণা ছিল না। সে বহু কষ্টে রাগ সামলে বলল, ‘বসে থাকা নিষেধ আছে নাকি?’

‘হ্যাঁ, আছে। শুয়ে-শুয়ে রেস্ট নিন। ডন-বৈঠকের জন্যে হাসপাতাল না।’

ফিরোজ শুয়ে পড়ল। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাত-দুপুরে আজীবাজে কোনো ওষুধ খাইয়ে দিতে পারে। একটা থ্রিলারে এ-রকম একটা ঘটনা ছিল। নার্স রাত-দুপুরে ঘুমের ওষুধ বলে আফিমের ঢেলা গিলিয়ে দিত। অবশ্যি সেই নার্স ছিল রূপবতী এবং সে বেছে-বেছে এই কাণ্ডগুলো করত রূপবান তরুণ রুগীদের সঙ্গে।

ফিরোজ গলা পর্যন্ত চাদর টেনে কৌতূহলী চোখে নার্সটাকে দেখছে। এই মহিলা এক-একটা বেডের কাছে যাচ্ছে এবং বিনা কারণে রুগীদের ধমকাচ্ছে। গরিব রুগীদের তুমি-তুমি করে বলছে। সে ঘুরে-ঘুরে আবার ফিরোজের কাছে ফিরে এল।

‘আপনার জ্বর রেমিশন হয়েছে।’

ফিরোজ জবাব দিল না। নার্স তার এ্যাপ্রনের পকেটে হাত দিয়ে বলল, ‘আপনার একটা চিঠি এসেছে। গত কাল দিতে ভুলে গেছি। এই নিন।’

‘ফিরোজ থমথমে গলায় বলল, ‘আপনি চিঠি পড়েছেন কেন? খামের মুখ খোলা।’

‘আপনার চিঠি পড়ার আমার দরকারটা কী? মুখখোলা অবস্থাতেই এসেছে। চিঠি পড়ুন, বালিশের নিচে রেখে দিচ্ছেন কেন?’

‘আপনি এখান থেকে যান, তারপর পড়ুন।’

নার্স চলে যাবার পরও সে চিঠি পড়ল না। হাসপাতালে বসে চিঠি পাওয়ার বিন্দুটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যাক। নার্স যে চিঠিটা পড়েছে, তাতে তাকে ঠিক দোষ দেয়া যায় না। হাসপাতালের রুগীদের কেউ চিঠি লেখে না, দেখতে আসে। গত দশ বছরে এটাই হয়তো প্রথম চিঠি এবং ফিরোজের ধারণা, হাসপাতালের জমাদারনী, মালী, ওয়ার্ডবয়—সবাই এই চিঠি পড়েছে।

কে লিখতে পারে এই চিঠি? তাজিন? হতে পারে। পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র সে-ই তাকে দেখতে আসে নি। দুলাভাই বলেছেন—রাগ করে আসে নি। ফিরোজ অবাক হয়ে বলেছে, ‘রাগ কী জন্যে?’

‘নিজের দিকে তুমি তাকাবে না। অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে খবর পাঠাবে, সে রাগ করবে না? শোন ফিরোজ, তুমি কথা দাও, রিলিজ হলে আমার খস্মায় গিয়ে উঠবে।’

‘কথা দিলাম।’

‘আমরা যে-মেয়ে ঠিক করব, চোখ বন্ধ করে তাকে ধিয়ে করবে।’

‘কথা দিলাম।’

‘তোমাকে কেবিনে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করছি। সব ধরাধরির ব্যাপার। এক জন মেজর জেনারেলকে আজ ধরব। আমার ভাবির সুপাত ভাই।’

‘কাউকে ধরতে হবে না দুলাভাই। ওয়ার্ডে আমি ভালোই আছি। আশেপাশের রুগীদের সঙ্গে খাতির হয়েছে। গল্পগুজব করে সময় কেটে যাচ্ছে।’

‘কার সঙ্গে খাতির হল?’

‘বাঁ পাশের বেডের রুগীর সঙ্গে। খাতিরটা আরো জমত, বেচারী হঠাৎ মরে যাওয়ায় খাতিরটা জমতে পারল না।’

‘সবসময় এমন ঠাট্টা-তামাশা করো না। মৃত্যু নিয়ে রসিকতা করবে না।’

‘আর করব না। আপনি দুলাতাই, বড় আপাকে পাঠিয়ে দেবেন। আপাকে দেখতে ইচ্ছা করছে।’

‘বাজে কথা বলবে না। তোমার কাউকেই দেখতে ইচ্ছা করে না।’

তাজিনই নিশ্চয় এই পত্রলেখক। চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস তার আছে। জন্মদিন, নববর্ষ—এইসব বিশেষ দিনগুলোতে তার একটা সুন্দর কার্ড আসবেই।

এটাও বোধহয় একটা কার্ড। ‘গেট ওয়েল’ কার্ড। বড় আপার কাছে নানান ধরনের কার্ডের বিরাট সংগ্রহ।

ফিরোজ ভেবেছিল গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে চিঠি পড়বে। এতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, চিঠির রচয়িতা হয়তো—বা অপালা। এ—রকম মনে হবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে।

খাম খুলে ফিরোজের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অপালাই লিখেছে। আহ, এত গভীর আনন্দের ব্যাপারও ঘটতে পারে। চিঠিটি পড়তে ইচ্ছা করছে না। পড়া মানেই তো ফুরিয়ে যাওয়া। বরং গুটি-গুটি লেখার তিনটি পৃষ্ঠা নিয়ে সে সারা রাত জেগে বসে থাকবে। মাঝে-মাঝে ঘ্রাণ নেবে। এই কাগজ কোনো ফুলের গুচ্ছ নয়। তবু নেশা—ধরানো সৌরভ নিশ্চয়ই লুকানো আছে। সবাই সে সৌরভ পাবে না। যার পাবার শুধু সে—ই পাবে।

ফিরোজ সাহেব।

আপনার হাসপাতালের ঠিকানা কোথায় পেয়েছি বলুন তো? না, এখন বলব না, আপনি ভাবতে থাকুন। এটা একটা ধাঁধা। দেখি আপনি কেমন বুদ্ধিমান। ধাঁধার জবাব দিতে পারেন কি না। আমি হাসপাতালে আপনাকে দেখতে আসি নি, যদিও খুব আসার ইচ্ছা ছিল। কেন আসি নি জানেন? ছোটবেলায় আমাদের এক জন কাজের মেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসে। তাকে দেখবার জন্যে এক দিন হাসপাতালে এসে কী দেখি, জানেন? দেখি দু’-তিন মাস বয়সী একটা বাচ্চাকে বড় একটা গামলায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চাটা মরা। বাচ্চার নাভি ও নাকে লাল-লাল পিপড়া। এই কুৎসিত দৃশ্যটি দুঃস্বপ্ন হয়ে বার-বার আমার কাছে ফিরে আসে। হাসপাতালে যেতে আমার এই কারণেই ইচ্ছা করে না।

এখন বলি আপনার ঠিকানা কোথায় পেলাম। আপনার বান্ধবীর বাবার কাছে থেকে। আপনার বান্ধবীর সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। খুব লাজুক মেয়ে, তবু কিছু কথা শ্রবণ করছি। তবে আমার ধারণা, আপনার সঙ্গে সে খুব বক-বক করবে।

আচ্ছা, আপনি আমাকে কিছু একটা ভাল কথা বলেছেন। আপনার সন্তানের বিয়ের ব্যাপারে। ভাল আমি ভেঙে দিয়েছি। আপনার বান্ধবী, তার বাবা এবং মা সবাই খুশি। তারা মনে-মনে সুপাত্র হিসেবে আপনাকে কামনা করছিলেন। মনের কথাটা পর্যন্ত বললেন না! আপনার সঙ্গে এই দিকে আমার কিছু মিল আছে। আমিও নিজের মনের কথাটা কিছুতেই বলতে পারি না। আমার একটা ডাইরি আছে, মাঝে-মাঝে তাতে লিখি। এই মুহূর্তে আপনাকে আমার একটা মনের কথা বলি। আমার মনে হচ্ছে, এখন বললে সেটা খুব দোষের হবে না। কথাটা হচ্ছে, আমি যখন জানলাম—আপনার এক জন ভালবাসার মানুষ আছে, তখন আমার কেন জানি মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মন-খারাপ ভাবটা এখনো পুরোপুরি কাটে নি। কাটতেই যে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। না—কাটাই ভালো। কী বলেন আপনি? আমি ঠিক বলি নি? কিছু—কিছু কষ্ট আছে সুখের মতো। আবার কিছু—কিছু কষ্ট খুব কঠিন।

এখন আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনি সুস্থ হয়ে উঠলেই আপনাকে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। যেখানে যাব, সেখানে চমৎকার একটা রহস্য আছে। দেখি, আপনি রহস্য ভেদ

করতে পারেন কি না। আমার মনে হয় আপনি পারবেন। কারণ, আপনার খুব বুদ্ধি—অন্তত আমার তাই ধারণা।

এই চিঠি আপনি পাবেন কি না বুঝতে পারছি না। কে জানে হয়তো চিঠি পৌঁছবার আগেই সূঁহ হয়ে ফিরে যাবেন। আগ্রহ নিয়ে এই চিঠি লিখছি, আপনি তা না পেলে খুব কষ্টের ব্যাপার হবে।

বিনীতা

অপালা

সারা রাত ফিরোজ ঘুমুতে পারল না।

কত বার যে চিঠিটা পড়ল! প্রতিবারই মনে হল এটা তো আগে পড়া হয় নি। এ্যাটেনডিং ফিজিশিয়ান এক সময় বললেন, ‘আপনি এমন ছটফট করছেন কেন? কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি?’

‘জ্বি হচ্ছে। অস্থির-অস্থির লাগছে।’

‘অস্থির-অস্থির লাগার তো কোনো কারণ দেখছি না। অসুখ সেরে গেছে, কাল-পরশুর মধ্যে রিলিজ অর্ডার হবে। আসুন, আপনাকে একটা ট্রাংকুলাইজার দিয়ে দিই।’

‘একটায় কাজ হবে না, বেশি করে দিন।’

‘আপনার কী হয়েছে বলুন তো?’

‘খুব আনন্দ হচ্ছে ডাক্তারসাহেব।’

ফিরোজ ঘুমুতে গেল শেষরাতের দিকে। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। নাশতা নিয়ে এসেছে। দরিদ্র দেশের হাসপাতালের তুলনায় বেশ ভালো নাশতা। দু’ পিস রুটি, একটা সেদ্ধ ডিম, একটা কলা, এক গ্লাস দুধ। নাশতা যে দিতে আসে, সে টে নামিয়ে দিয়েই চলে যায় না। অপেক্ষা করে। কোনো রুগী যখন বলে—‘ভালো লাগছে না, কিছু খাব না’, তখন যে বড় খুশি হয়। টে উঠিয়ে নিয়ে যায়। আজ তাকে খুশি করা গেল না। ফিরোজের খুব খিদে পেয়েছে। জানালা গলে শীতের রোদ এসেছে। খুবই ভালো লাগছে সেই রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে। বেড নাম্বার চব্বিশের বড়ো রুগীটি খুব কষ্ট পাচ্ছে। গোঙানির মতো শব্দ করছে। গভীর বেদনায় ফিরোজের মন ভরে গেল। তার ইচ্ছে করতে লাগল, রুগীর মাথার কাছে গিয়ে বসে। মাঝে-মাঝে গভীর সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ফিরোজ সত্যি-সত্যি বেড নাম্বার চব্বিশের দিকে এগিয়ে গেল। নরম গলায় বলল, ‘আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?’

দরজা খুলল বড় মেয়েটি।

অপালা এর নাম জানে না। শুধু এর কেন, কারোরই নাম জানে না। আজও হয়তো জানা হবে না। অপালা ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘ভেতরে আসব?’ বড় মেয়েটি হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। শুধু দরজা ছেড়ে একটু সরে গেল। অপালা বলল, ‘তোমার নাম কি?’

‘আমার নাম সোমা।’

‘তোমারই কি বিয়ে হচ্ছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘বিয়েটা যেন কবে? আমার তারিখটা মনে নেই। কার্ড হারিয়ে ফেলেছি।’

‘এগার তারিখ।’

‘আমি আবার আসায় তুমি কি রাগ করেছ?’

‘রাগ করব কেন?’

সোমা অপালার কাঁধে হাত রাখল। অপালা বলল, ‘তুমি কি আমার বড়, না ছোট?’

সোমা সে-কথার জবাব দিল না। হালকা গলায় বলল, ‘এস, ভেতরে এসে বস।’

‘বাসায় কেউ নেই? কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।’

‘ওরা বাজারে গিয়েছে।’

‘বিয়ের বাজার?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোমার মা? উনি যান নি?’

‘মা অসুস্থ, এখন ঘুমুচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে এস।’

তারা ভেতরের দিকে একটা ছোট্ট ঘরে এসে দাঁড়াল। দু’ দিকে দু’টি চৌকি পাতা। একটা পড়ার টেবিল। সুন্দর করে গোছানো।

‘এটা তোমার ঘর?’

‘হ্যাঁ।’

‘কে কে শোয় এখানে?’

‘আমরা চার বোন। দু’ জন দু’ জন করে। তুমি বস।’

অপালা বসল। বসতে-বসতে বলল, ‘শাড়িটা কি তোমার পছন্দ হয়েছে?’

সোমা এবারও হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। সে বসেছে অপালার মুখোমুখি। কিন্তু এক বারও অপালার দিকে তাকাচ্ছে না। মাথা নিচু করে আছে।

‘যে-ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে তাকে কি তুমি দেখেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ছেলেটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে?’

‘না।’

‘পছন্দ হয় নি কেন?’

‘সোমা উত্তর দিল না। তার মুখ ঈষৎ কঠিন হয়ে গেল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। অপালা বলল, ‘আচ্ছা, আমরা দু’ জন কি যমজ বোন? দু’ জন দেখতে ঋকিল এক রকম, তাই না?’

সোমা এবারও চুপ করে রইল।

‘আমার মনে হচ্ছে, আমরা যমজ বোন। ছোটবেলায় আমাদের বোধহয় একই একম জামা-জুতো পরানো হত। হত না?’

অপালা লক্ষ করল, সোমা কাঁদছে। নিঃশব্দ কান্না। মাঝে-মাঝে তার শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। গালে সূক্ষ্ম জলের রেখা।

‘সোমা।’

‘বল।’

‘আমার কী নাম ছিল তখন? আমার কী ধারণা, জ্ঞান? আমার ধারণা, সোমার সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম ছিল রুমা।’

সোমা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। সে বোধহয় চোখে কাজল দিয়েছিল, সারা মুখে কাজল লেপ্টে গেল।

‘তোমার চোখ তো এমনিতেই সুন্দর, কাজল দিতে হবে কেন? আমাদের দু’ জনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর? তোমাদের ঘরে বড় আয়না আছে? এস না, দু’ জন পাশাপাশি দাঁড়াই।’

সোমা যেভাবে বসেছিল, সেভাবেই বসে রইল। অপালা অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘আমি যদি ফিরে আসি, তাহলে কার সঙ্গে ঘুমুবো? তোমার সঙ্গে?’

ভেতর থেকে সোমার মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ‘কে কথা বলে? কে ওখানে?’

সোমা বলল, ‘কেউ না মা, কেউ না।’

‘আমি স্পষ্ট শুনলাম।’

ভদ্রমহিলা নিজে-নিজেই বিছানা থেকে উঠলেন। পা টেনে-টেনে সোমাদের ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অপালা বলল, ‘আপনি ভালো আছেন?’

এই বলেই সে অস্পষ্টভাবে হাসল। ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। টলে পড়ে যাচ্ছেন। সোমা ছুটে গিয়ে তার মা’কে ধরল। একা সে সামলাতে পারছে না। সে তাকাল অপালার দিকে। অপালা নড়ল না, যেভাবে বসে ছিল, সেভাবেই বসে রইল। সোমা বলল, ‘তুমি একটু পানি এনে দেবে? মুখে পানির ছিটা দেব।’

অপালা উঠে দাঁড়াল। হালকা পায়ে বারান্দায় চলে এল। ঐ তো পানির কল। মগে করে পানি নিয়ে আসা যায়। সে পানির কলের দিকে গেল না। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে এল। তার খুব কৌদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কান্না আসছে না।

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘন্টাখানেক আগে এসে পৌঁছেছেন। হেলেনার টিকিট ছিল। তিনি আসতে পারেন নি। ডাক্তাররা শেষ মুহূর্তে ঠিক করেছেন হাটে বাই পাস সার্জারির প্রয়োজন, এবং তা অল্পদিনের মধ্যেই করতে হবে। ফখরুদ্দিন সাহেব সব ব্যবস্থা করে এসেছেন। দিন সাতেকের মধ্যে তিনি অপালাকে নিয়ে ফিরে যাবেন।

বাড়িতে পা দিয়েই তিনি মেয়ের খোঁজ করলেন। মেয়ে বাড়িতে নেই। কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারে নি। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রায়ই গাড়ি ছাড়া বের হয়। ফখরুদ্দিন সাহেব কিছুই বললেন না। সারপ্রাইজ দেবার জন্যে খবর না-দিয়ে এসেছেন। সেই সারপ্রাইজটি দেয়া গেল না।

তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলেন। পর-পর তিন কাপ বিশ্বাদ কালো কফি খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিচে নেমে এলেন। নিশানাথবাবুর সঙ্গে আগেই তাঁর দেখা হয়েছে। তিনি কোনো কথা বলেন নি, এখন বললেন।

‘কেমন আছেন?’

‘জি স্যার, ভালো।’

‘বসার ঘরটির এই অবস্থা করেছে?’

‘অপালা মা খুব পছন্দ করেছে।’

‘তার জন্যে এ-রকম ঘর একটা সাজিয়ে দেয়া যাবে। আপনি এক্ষুণি আগের ডেকোরেশনে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করুন।’

‘স্যার, করছি।’

‘আর্টিস্ট লোকটি কি প্রায়ই এ-বাড়িতে আসে?’

‘কার কথা বলছেন স্যার?’

‘যে এই অদ্ভুত ডেকোরেশন করেছে, তার কথাই বলছি।’

‘জি-না স্যার।’

‘আপনি না-জেনে বলছেন। দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে আসুন।’

নিশানাথবাবু ছুটে গেলেন। দারোয়ানের কাছে একটা বড় খাতা থাকার কথা। সেখানে সে লিখে রাখবে কে আসছে কে যাচ্ছে। কখন আসছে কখন যাচ্ছে। দারোয়ান খাতা নিয়ে এল। ফখরুদ্দিন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ‘যাও, আমার ঘরে রেখে এস। নিশানাথবাবু।’

‘জি স্যার।’

‘আপনার স্ত্রী এখানে কেন?’

‘অপালা মা একা-একা থাকে.....।’

‘সে কি বলেছিল তাঁকে আনবার কথা?’

‘জি-না স্যার।’

‘তাহলে.....?’

নিশানাথবাবু ঘামতে লাগলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, ‘খবরের কাগজে এত কেচ্ছা-কাহিনী ছাপা হল, আপনারা ছিলেন কোথায়? পি-আর-ও-সাহেবকে আসতে বলুন। যে-সব পুলিশ অফিসার এই ঘটনার তদন্ত করছেন, তাঁদেরকে খবর দিন যে আমি এসেছি। তাঁরা ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।’

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক এক ঘন্টার মধ্যেই চলে এলেন। পুলিশ অফিসার বলে মনে হয় না, অধ্যাপক-অধ্যাপক চেহারা। পায়জামা-পায়জামির ওপর একটা শাল চাপানো। শাল গায়ে দিয়ে কেউ অপরাধের তদন্ত করতে আসে! ফখরুদ্দিন সাহেব বিরক্তি চেপে রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

‘কি জানতে চান আমার কাছ থেকে, বলুন?’

‘একটা তারিখ আপনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই। আসামী বলছে, সে আপনার নির্দেশে এই কাজ করেছে। কোন তারিখে সে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, তাও সে বলেছে। আমরা দেখতে চাই, ঐ তারিখে আপনি দেশে ছিলেন কি না।’

‘আমার কাছ থেকেই জানতে চান?’

‘জি স্যার।’

‘এটা একটা কাঁচা কাজ হচ্ছে না কি? এয়ারপোর্টে কাগজপত্র দেখলেই তো তা জানতে পারেন। আমার মুখের কথার চেয়ে ঐ-সব প্রমাণ নিশ্চয়ই অনেক মূল্যবান।’

‘তাও স্যার করা হবে। আপনার একটা স্টেটমেন্ট নেব।’

‘ভালো কথা, নেবেন। আপনার নাম কি?’

‘রশিদ। আব্দুর রশিদ।’

‘শুনুন রশিদ সাহেব, এই ধরনের কোনো কিছু আমার বলার ইচ্ছা যদি থাকে, তাহলে আমি কি তা সরাসরি বলব? অন্যদের দিয়ে বলাব। এমন একটা কাঁচা কাজ কি আমি করতে পারি?’

‘মাঝে-মাঝে খুব পাকা লোকও স্যার কাঁচা কাজ করে ফেলে।’

‘হ্যাঁ, তা করে। কথাটা আপনি ভালোই বলেছেন। ওয়েল সেইড।’

পুলিশ অফিসার আধ ঘন্টা সময় নিয়ে স্টেটমেন্ট নিলেন। তাঁকে চা-বিসকিট কিছু দেয়া হল না। ভদ্রলোক চলে যাবার পরপরই পি.আর.ও. আবসার সাহেবকে ফখরুদ্দিন সাহেব ডেকে পাঠালেন।

‘আবসার সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘পুলিশ অফিসার আব্দুর রশিদ সম্পর্কে খোঁজখবর নিন। লোকটির টাকা নেয়ার অভ্যাস আছে কি না দেখুন। পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার ত্যাঁদড় ধরনের থাকে। টাকাপয়সা নেয় না। তবে আমার ধারণা, এ নেয়। এর গায়ের শালটি বেশ দামি। বেতনের টাকায় এ-রকম শাল কেনার কথা নয়।’

‘আমি স্যার খোঁজ নেব।’

‘আজ সন্ধ্যার মধ্যে নেবেন। ইনভেসটিগেশন টীমে আর কে-কে আছে দেখুন। ডি.আই.জি. রহমতউল্লাহ সাহেব এখন কোথায় আছেন, কোন সেকশনে, তাও দেখবেন।’

‘জি স্যার।’

‘আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমি এই সমস্যার পুরো সমাধান চাই।’

‘জি স্যার।’

‘আপনি এখন যান।’

‘অফিসে আসবেন স্যার?’

‘হ্যাঁ। তিনটার দিকে যাব।’

‘জি আচ্ছা স্যার।’

দুপুরে ফখরুদ্দিন সাহেব একা-একা ভাত খেলেন। অপালা এখনো ফেরেনি। ভাত খেতে-খেতে দারোয়ানের দিয়ে যাওয়া খাতাটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। ফাঁকে-ফাঁকে গোমেজের সঙ্গে রান্নাবান্না নিয়ে গল্প করলেন। খুঁটি তীর পুরনো অভ্যাস।

‘গোমেজ।’

‘জি স্যার।’

‘পৃথিবীর সব দেশে রান্নায় পনির ব্যবহার করে, বাংলাদেশে কেন করে না?’

‘আমি তো স্যার বলতে পারব না।’

‘এমন তো নয় যে এ-দেশে পনির তৈরি হত না। হাজার-হাজার বছর ধরে পনির তৈরি হচ্ছে। হচ্ছে না?’

‘জি স্যার।’

‘আমাদের দেশি রান্নায় খানিকটা পনির দিয়ে দিলে কেমন হবে বলে তোমার ধারণা?’

‘আমি তো স্যার বলতে পারছি না।’

‘এক বার দিয়ে দেখবে।’

‘জি আচ্ছা স্যার।’

তিনি বিশেষ কিছু খেতে পারলেন না। কিছুদিন ধরেই তাঁর খিদের সমস্যা দেখা দিডিয়েছে।

‘গোমেজ।’

‘জি স্যার।’

‘লাঞ্ছের পর কাউকে তুমি মাটিনি খেতে দেখেছ?’

‘জি স্যার, দেখেছি। মেক্সিকান এক সাহেবকে দেখেছি।’

‘একটা মাটিনি তৈরি কর তো।’

মাটিনি খেয়ে তাঁর শরীর আরো খারাপ লাগতে লাগল, তবু তিনি ঠিক তিনটায় অফিসে গেলেন। ডেকে পাঠালেন ঢাকা ব্রাঞ্ছের এ. জি. এম. মোস্তফা সাহেবকে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ‘মোস্তফা, আমার ধারণা যাবতীয় ঝামেলার পিছনে আপনি আছেন।’

‘এইসব আপনি কী বলছেন স্যার।’

‘আমি ঠিকই বলছি। ভুল বললে এত দূর আসতে পারতাম না, অনেক আগেই মুখ খুবড়ে পড়ে যেতাম। আপনি আপনার চার্জ বুঝিয়ে দিন।’

‘স্যার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’

‘আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন।’

ফখরুদ্দিন সাহেব কোটের পকেট থেকে বরখাস্তের চিঠি বের করলেন। এই চিঠি তিনি ইংল্যাণ্ড থেকেই টাইপ করে নিয়ে এসেছেন।

চিঠি হাতে মোস্তফা দাঁড়িয়ে, তিনি তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পি.এ.-কে বললেন, ‘বাসায় টেলিফোন করে দেখ তো আমার মেয়ে ফিরেছে কি না।’

পি.এ. জানাল এখনো ফেরে নি। ফখরুদ্দিন সাহেবের কপালে সূক্ষ্ম একটা ভাঁজ পড়ল। সেই ভাঁজ স্থায়ী হল না। তিনি পি.এ.-কে বললেন, ‘গাড়ি বের করতে বল, আমি কারখানা দেখতে যাব। ইউনিয়নের নেতাদেরও খবর দিতে বল—আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।’

‘আপনার ওখানে এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না স্যার।’

‘আমাকে উপদেশ দেয়া তোমার কাজের কোনো অঙ্গ নয় বলেই আমি জানি। তোমাকে যা করতে বলেছি, কর।’

‘স্যার, এফুগি ব্যবস্থা করছি।’

‘গুড। ভেরি গুড।’

হাজি সাহেবের স্ত্রী ভিজিটার্স আওয়ারে ফিরোজকে দেখতে এসেছেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ভদ্রমহিলার গায়ে বোরকা নেই। ফিরোজ তাঁকে আগে দেখে নি। সে অবাক হয়ে বলল, ‘কিছু মনে করবেন না, আপনাকে চিনতে পারছি না।’

ভদ্রমহিলা একগাদা ফলমূল নিয়ে এসেছেন। এর সঙ্গে আছে একটা হরলিকস, একটা ওভালটিন। তিনি বেশ সহজ ভঙ্গিতে বললেন, ‘আমি হাজি সাহেবের স্ত্রী।’

‘ও আচ্ছা। বসুন বসুন।’

‘বেশিক্ষণ বসতে পারব না। হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডে আমাদের এক জন রুগী আছে, তাকে দেখতে যাব। তোমাকেও চট করে দেখে গেলাম।’

‘এইসব খাবারদাবার আমার জন্যে এনেছেন, না ওনার জন্যে?’

ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন। ভদ্রমহিলার এই হাসি ফিরোজের পছন্দ হল। রসবোধ আছে। মেয়েদের এই জিনিসটা একটু কম। সাধারণ রসিকতাতেও এরা রেগে যায়।

‘আপনি আমাকে দেখতে আসবেন, এটা তো স্বপ্নেও ভাবি নি।’

‘কেন দেখতে আসব না? শুধু আমি একা না, আমার মেয়েও এসেছে।’

‘সে- কী।’

‘ভেতরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে—বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক দাঁড়িয়ে, আমি আমার রুগী দেখে আসি।’

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। তাঁর ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা। ফিরোজ বাইরে এসে দেখল সমস্ত বারান্দা আলো করে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এত সুন্দর হয় মানুষ।

‘এই মেয়ে, তুমি একা-একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, ভেতরে এস।’

সে সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হল। তার গায়ে হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি। মাথায় ঘোমটা দেয়ার জন্যে কেমন বউ-বউ লাগছে।

‘বোরকা কোথায় তোমার?’

মেয়েটিও তার মায়ের মতো ভঙ্গিতে হাসল।

‘এস, বস।’

বেডের সামনে একটা খালি চেয়ার। সে সেখানে বসল না। বিছানায় মাথা নিচু করে বসে রইল।

‘তুমি কি আমাকে দেখতে এসেছ, না আরেক জন যে রুগী আছে, তাকে দেখতে এসেছ?’

মেয়েটি বিস্মিত গলায় বলল, ‘আর তো কোনো রুগী নেই।’

ফিরোজ কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু-একটা বলতে ইচ্ছে করছে। বড় মায়া লাগছে মেয়েটির জন্যে।

‘তুমি চা খাবে?’

‘জ্বি-না।’

‘খাও-না এক কাপ। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। এখানে একটা বয় আছে, ওকে বললেই নিচ থেকে চা এনে দেয়।’

‘বলুন।’

ফিরোজ চায়ের কথা বলে এল। মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে রুগীদের দিকে দেখছে।

‘হাসপাতাল নিশ্চয়ই তোমার খুব খারাপ লাগে, তাই না?’

‘জ্বি-না। অনেক দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম, হাসপাতাল আমার ভালোই লাগে। আপনার অসুখ এখন সেরে গেছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

চা এসে গেল। মেয়েটি ছোট-ছোট চুমুকে চা খাচ্ছে। বার-বার তাকাচ্ছে ফিরোজের দিকে। এখন আর সেই দৃষ্টিতে কোনো লজ্জা আর সঙ্কোচ নেই। ফিরোজ আন্তরিকভাবেই বলল, ‘তুমি এসেছ, আমার খুব ভালো লাগছে।’

মেয়েটি অত্যন্ত মৃদু স্বরে প্রায় ফিস-ফিস করে বলল, ‘অপালা বলে যে-মেয়েটি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, ওকে আপনি কীভাবে চেনেন?’

‘ইঠাৎ করে পরিচয়। ও আমাকে সুন্দর একটা চিঠি লিখেছে, তুমি কি ঐ চিঠিটা পড়বে?’

‘জ্বি-না।’

‘তুমি পড়, তুমি পড়লে আমার ভালো লাগবে।’

ফিরোজ চিঠি বের করল। মেয়েটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী সুন্দর স্বচ্ছ চোখ। শুধু চোখের দিকে তাকালেই যেন এই মেয়েটির অনেকখানিই দেখে ফেলা যায়।

বিকেল হয়ে আসছে। দিনের আলো কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। চেনা পৃথিবীও এই আলোতে অচেনা হয়ে যায়।

ফখরুদ্দিন সাহেব বাগানে চেয়ার পেতে বসে আছেন। তাঁকে চা দেয়া হয়েছে। তিনি চা খাচ্ছেন না। তাঁর পায়ের কাছে অরুণা ও বরুণা। তিনি বরুণার পিঠ মাঝে-মাঝে চুলকে দিচ্ছেন। তাঁর কাছেই গোমেজ দাঁড়িয়ে। তাকে তিনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এখন কিছু বলছেন না। গোমেজ যেতে পারছে না, অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

‘গোমেজ।’

‘জ্বি স্যার।’

‘ক’টা বাজে বল তো?’

‘সাড়ে চারটা বাজে স্যার।’

‘মাত্র সাড়ে চার, কিন্তু চারদিক এমন অন্ধকার হয়ে আসছে কেন? সূর্য ক’টার সময় ডোবে?’

‘ঠিক বলতে পারছি না স্যার।’

‘খবরের কাগজে দেখ তো ওখানে দেয়া আছে কি না। সানসেট এবং সানরাইজ যদি দেয়া না থাকে, তাহলে আবহাওয়া অফিসে টেলিফোন করবে।’

‘জ্বি আচ্ছা স্যার।’

‘ঘট-ঘট শব্দ হচ্ছে কিসের?’

‘বসার ঘরটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে স্যার।’

‘ওদের নিষেধ করতে বল। আমার মেয়ে পছন্দ করে সাজিয়েছে ওটা, যেমন আছে তেমন থাকুক।’

‘জি আচ্ছা স্যার।’

গোমেজ চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে বলল, ‘আপাকে কি খুঁজতে বের হব?’

‘না।’

ফখরুদ্দিন সাহেব অরুণার পিঠ চুলকে দিতে লাগলেন। বাগান এখন প্রায় অন্ধকার। তাঁর শীত লাগছে, তবু তিনি বসেই আছেন। আকাশে একটি-দু’টি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। গোলাপ-ঝাড় থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি সৌরভ।

অপালা বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা মেলানোর পর। সে ভেবেছিল, গেটের পাশে সবাই ভিড় করে থাকবে। তা নয়, গেট ফাঁকা। অন্য সময় তালা দেয়া থাকে, আজ তাও নেই। দারোয়ান টুলের ওপর বসে-বসে ঝিমুচ্ছে। অপালাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কিছু বলল না।

অপালা বারান্দায় উঠে এসে প্রথম লক্ষ করল বাগানে বেতের চেয়ারে কে যেন বসে আছে। বাগানের আলো জ্বলছে না। জায়গাটা অন্ধকার। সিগারেটের আগুন ওঠানামা করছে। অপালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল, ‘বাবা!’

ফখরুদ্দিন সাহেব উত্তর দিলেন না। সিগারেট ছুঁড়ে ফেললেন। অপালা ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বালিকার মতো শব্দ করে কঁদতে শুরু করল। ফখরুদ্দিন সাহেবের একটা হাত মেয়ের পিঠে। তিনি গাঢ় স্বরে বার-বার বলছেন, ‘মাই চাইন্ড। মাই চাইন্ড।’

অপালা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, ‘কখন এসেছ?’

‘এই তো সকালে। তুমি সারা দিন কোথায় ছিলে?’

‘নানান জায়গায় ছিলাম। তুমি কেমন আছ বাবা?’

‘ভালো। আমি খুব ভালো আছি।’

‘ঠাণ্ডার মধ্যে এখানে বসে আছ কেন?’

‘তোমার জন্যে বসে আছি।’

‘মা আসে নি, তাই না?’

‘কী করে বুঝলে?’

‘মা এলে সেও তোমার সঙ্গে বসে থাকত। তুমি এসেছ, বাবা, আমার খুব ভালো লাগছে।’

অপালা আবার ফোঁপাতে শুরু করল।

‘মা এল না কেন?’

‘ডাক্তাররা এখন বলছে, বাই পাস সার্জারি লাগবে।’

‘একেক সময় এরা একেক কথা বলে কেন?’

‘কি জানি, কেন!’

‘বাবা এস, তোমাকে আমাদের বসার ঘরটা দেখাই, কী সুন্দর যে করেছে।’

ফখরুদ্দিন সাহেব এই ঘর আগেই দেখেছেন, তবু মেয়ের সঙ্গে ঢুকলেন।

‘কেমন লাগছে বাবা?’

‘ভালো।’

‘শুধু ভালো? এর বেশি কিছু না?’

‘না মা, এর বেশি কিছু না। তবে তোমার ভালো লাগছে, এটাই বড় কথা। আমার পুরনো চোখ। পুরনো চোখ সহজে মুগ্ধ হয় না।’

‘বাবা, তুমি চা খেয়েছ?’

‘হ্যাঁ। তবে আরেক বার খেতে পারি।’

‘তুমি বাগানে গিয়ে বস, আমি তোমার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।’

‘তোমার বানাতে হবে না, তুমি আমার সঙ্গে এসে বস।’

‘না, আমিই বানাব। আর শোন, একটা চাদর গায়ে দিয়ে যাও। নাও, আমারটা নাও।’

অপালা তার গায়ের নীল চাদর তার বাবার গায়ে জড়িয়ে দিল।

‘তুমি রাতে কী খাবে, বাবা?’

‘কেন?’

‘আমি রান্না করব।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’

ফখরুদ্দিন সাহেব আবার বাগানে গিয়ে বসলেন। অরুণা এবং বরুণা দু’ জন দু’ পাশ থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর আনন্দে ফখরুদ্দিন সাহেবের চোখ ভিজে উঠছে। চোখের জল মানেই দুর্বলতা। তাঁর মধ্যে কোনোরকম দুর্বলতা থাকা উচিত নয়। এই অশ্রুবিन्दু এক্ষুণি মুছে ফেলা উচিত। কিন্তু তিনি মুছলেন না। চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকারে তাঁর দুর্বলতা কেউ দেখে ফেলবে না।

অপালা আসছে চা নিয়ে। বারান্দার আলো তার মুখে পড়েছে। কী সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে।

এখন দুপুর।

গরমের দুপুরে চারদিক ঝিম ধরে থাকে। ভূতে মাকড়সিটিল। কিন্তু শীতের দুপুরগুলো অন্য রকম। সকাল-সকাল একটা ভাব লেগে থাকে। রোদে পিঠ মেলে খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে চমৎকার লাগে।

ফিরোজ বেশিক্ষণ রোগে বসে থাকতে পারল না। ছায়া এসে পড়ল। তার ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদায়ক আলস্য। ফিরোজ লেপের ভেতর ঢুকে পড়ল। জানালার রোদ পড়ে লেপ ওম হয়ে আছে। কুসুম-কুসুম গরমে কী চমৎকারই না লাগছে! হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেয়েছে গত পরশু। শরীর এখনো পুরোপুরি সারে নি। আরামদায়ক একটা ক্লান্তি সারাক্ষণ তাকে ছুঁয়ে থাকে। সে ঘুমিয়ে পড়ল। সুন্দর একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল।

যেন অপালা তার ঘরে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নাড়ছে। কিন্তু তার ঘুম ভাঙছে না। অপালা বার-বার বলছে—প্লীজ উঠুন, প্লীজ উঠুন। এমন অসময়ে কেউ ঘুমায়? সে সব শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙছে না।

একসময় সত্যি-সত্যি সে জেগে উঠল। অবাক হয়ে দেখল ঘরের ভেতর শাড়িপরা এক জন কে যেন হাঁটছে। না, অপালা নয়, বড় আপা। ফিরোজের মনে হল, যা দেখছে তাও সত্যি নয়। স্বপ্নেরই কোনো অংশ। একমাত্র স্বপ্নের মধ্যেই এক জন মানুষ চট করে অন্য এক জন হয়ে যায়। সেই পরিবর্তনটাকেও মনে হয় খুব স্বাভাবিক।

তাজিন বলল, 'এই ওঠ। আর কত ঘুমুবি? সন্ধ্যা বানিয়ে ফেললি তো।'

ফিরোজ ধড়মড় করে উঠল। এটা মোটেই স্বপ্ন নয়। ঐ তো বড় আপা।

'কখন এসেছিস?'

'অনেকক্ষণ। কত রকম শব্দটন্দ করছি। তোর ঘুম আর ভাঙেই না। এক বার চোখ মেলে খানিকক্ষণ দেখিস, তারপর আবার ঘুম। তোর শরীর এত খারাপ?'

'কিছুটা তো খারাপই।'

'তোকে নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার বাসায়। একা আসি নি। দলবল নিয়ে এসেছি।'

'দলবল তো দেখছি না।'

'দেখবি কী করে, ওরা হাজি হাসেবের বাড়িতে মচ্ছবে লেগে গেছে।'

'মচ্ছবে লেগে গেছে মানে?'

'তোর বিয়ে নিয়ে ফাইন্যাল কথাবার্তা হচ্ছে।'

ফিরোজ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। কী বলবে ভেবে পেল না। তাজিন বলল, 'শোকে পাথর হয়ে গেলি মনে হচ্ছে। এ-রকম করে তাকাচ্ছিস কেন?'

'কথাবার্তা বলছে কে—দুলাভাই?'

'দুলাভাই কথাবার্তা বলার লোক? বড় মামা এসেছেন, ফুপা এসেছেন।'

'কী সর্বনাশ।'

'কাপড় পর। চল্ নিচে যাই।'

'আমি নিচে যাব কেন?'

'আমি বলছি, এই জন্যে নিচে যাবি। সারা জীবন তুই চুল্লি নিজের মতো। কারো কথা শুনলি না। বয়স তো তোর কম হল না। এখনো যদি লাইফের একটা পারপাস না পাওয়া যায়.....!'

'বক্তৃতার দরকার নেই।'

'নে, তোর জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি, একটা গায়ে দে।'

'পাঞ্জাবি গায়ে দেব কেন?'

'কী-রকম বোকার মতো কথা। তুই কি পাঞ্জাবি কখনো গায়ে দিস না? সারা জীবন তো গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবিই দেখলাম।'

ফিরোজ পাঞ্জাবি গায়ে দিতে-দিতে বলল, 'এখানে আসার ব্যাপারটা কি আগে থেকেই এ্যারেঞ্জ করা ছিল, না হঠাৎ ঠিক হয়েছে?'

'খবর দেয়া ছিল। তোকে কোনো খবর দেয়া হয় নি। কারণ, আমাদের সবার ভয়,

বিয়ের কথায় তুই পালিয়ে যেতে পারিস। আমি কোনো রিঙ্ক নিতে চাই নি। তোর উপর নজর রাখার জন্যে লোক ছিল।’

তাজিন তরল গলায় হাসল।

‘মন্টু সকাল থেকে তোর সঙ্গে ছিল না?’

‘হ্যাঁ, ছিল।’

‘তার দায়িত্ব ছিল তোকে আটকে রাখা। নে, পায়জামাটা পর। ভালো করে চুল আঁচড়া।’

‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না।’

‘নিচে নামলেই বুঝতে পারবি। এজিন কাবিন হবে। রুসমত সামনের মাসের সতের তারিখ।’

ফিরোজ চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল।

‘এ-রকম করে তাকাচ্ছিস কেন? তুই নিজে আমাকে বলেছিস, মেয়েটিকে তোর খুব পছন্দ। আমাদের উপর রাগটাগ যা করবার, পরে করবি। এখন নিচে নেমে আয়। সবাই অপেক্ষা করছে।’

ফিরোজ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ছ’-সাতটা গাড়ি হাজি সাহেবের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা মাঠে সুন্দর-সুন্দর পোশাক-পরা একগাদা ছেলেপুলে ছোট্ট ছুটি করে খেলছে। ফিরোজকে দেখতে পেয়েই তাজিনের সবগুলো মেয়ে একসঙ্গে চোঁচিয়ে উঠল—‘মামার বিয়ে, মামার বিয়ে।’

সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে। চারদিকে তার অপরূপ সোনালি আলোর শেষ ছটা। এই আলোয় এমনিতেই সবার মন কেমন করে। ফিরোজের হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হল-যদিও এই মেয়েটিকে সে সত্যি-সত্যি কামনা করে। সে নিশ্চিত, এই মেয়েটি তার জীবনে কল্যাণময়ীর ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাকে সারা জীবন ডুবিয়ে রাখবে গভীর ভালবাসায়।

ফখরুদ্দিন সাহেব অফিসে এলেন ঠিক দশটায়।

তিনি অফিসে পা দেয়ামাত্র বড় দেয়াল-ঘড়িতে ঘন্টা বাজতে শুরু করল। তিনি নিজের ঘরে না-টুকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব ক’টা ঘন্টা শুনলেন। এই অভ্যেস তাঁর দীর্ঘকালের। এর পিছনে তাঁর উদ্দেশ্যও খুব পরিষ্কার। অফিসের সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চান যে, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি চলেন, এবং আশা করেন অন্যরাও তাই করবে।

এখন তিনি যেখানে আছেন, সেটা একটা বড় হলঘরের মতো। সাত জন কর্মচারী পাশাপাশি টেবিলে কাজ করেন। সবাই এসে গেছে, শুধু ওয়ার্ড প্রসেসরের মেয়েটি আসে নি। এই মেয়েটিকে চার মাস আগে চাকরি দেয়া হয়েছে। তাকে প্রায়-সময়ই তিনি দেখেন না। এই মেয়েটির বয়স অল্প, একে ধমক দিতে তাঁর মায়া লাগে। আজ তাকে কিছু বলবেন।

‘মুনিম সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘ঐ মেয়েটি আসে নি?’

‘এসে পড়বে স্যার।’

‘এসে পড়বে, সেটা কী করে বললেন? না-ও তো আসতে পারে। আজ হয়তো সে কোনো কারণে বাড়িতে ছুটি কাটাবে।’

মুনিম সাহেব চুপ করে রইলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, ‘বসুন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’

মুনিম সাহেব তবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, ‘মেয়েটির নাম মনে পড়ছে না। ওর কি নাম?’

‘রেখা।’

‘রেখা নিশ্চয়ই ডাকনাম। ভালো নাম কী?’

‘সুলতানা। সুলতানা বেগম।’

‘সুলতানা বেগমকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।’

‘জি আচ্ছা স্যার।’

তিনি নিজের ঘরে ঢুকলেন। তাঁর খাস বেয়ারা তৎক্ষণাৎ গরম এক কাপ চা তাঁর টেবিলে এনে রাখল।

‘ইদ্রিস, কী খবর তোমার?’

‘জি স্যার, ভালো।’

‘নিশানাথবাবুকে খবর দাও।’

ফখরুদ্দিন সাহেব চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্যাড টেনে নিলেন। আজ দুপুর একটা পর্যন্ত কী-কী কাজ করবেন, সেগুলো লিখে ফেলবেন। একেকটা কাজ শেষ হবে, তিনি লাল কালিতে সেটা কাটবেন। একটা বাজার আগেই সব কাটা হয়ে যাবে। আলাদা একটি ফাইলে সেই কাগজ তুলে রাখবেন। এই ফাইলটি ব্যক্তিগত। সবসময় নিজের কাছে রাখেন। আজ তিনি যা-যা লিখলেন তা হচ্ছে :

১. পুলিশ তদন্ত : কতদূর কি হল?

২. চিটাগাং ব্রাঞ্চ অফিস : কেন পেপার মিল বন্ধ?

৩. ইউনিয়ন কর্মকর্তা জলিল : শায়েস্তা করতে হবে।

৪. মোস্তাক মিয়া : সে কী চায়?

৫. সুলতানা বেগম : কেন সে রোজ দেরি করে আসে?

৬. টেলিফোন : হেলেনা কেমন আছে?

ফখরুদ্দিন সাহেব লেখা অক্ষরগুলোর দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। পাঁচ নম্বর পয়েন্টটি কেটে দিলেন। অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

‘স্যার, আসব?’

‘আসুন নিশানাথবাবু। কেমন আছেন?’

‘জি স্যার, ভালো। কি জন্যে ডেকেছেন?’

‘আপনি আমার আশেপাশেই থাকবেন। দরকার হলেই যেন পাই।’

‘তা তো স্যার থাকি।’

‘পুলিশ ইনকোয়ারি কোন পর্যায়ে আছে এটা আপ-টু-ডেট জানতে চাই।’

‘জি আচ্ছা স্যার।’

‘মোস্তাক মিয়া নামে এক লোককে আজ আমি সাড়ে এগারটায় আসতে বলেছি। সে এলে তাকে দক্ষিণের ঘরটায় বসাবেন।’

‘সে স্যার এসে গেছে।’

‘বেশ, ঐ ঘরে নিয়ে বসান। চা দিন। তার সঙ্গে কোনো গল্পগুজব করার প্রয়োজন নেই।’

‘জি-না স্যার। গল্পগুজব কেন করব?’

‘ঠিক আছে, যান। পি.এ.-কে বলুন লন্ডনের সেন্ট লিউক হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমি হেলেনার ব্যাপারে খোঁজ নেব। পি.এ.-র কাছে টেলিফোন নাম্বার আছে।’

নিশানাথবাবু ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ামাত্র তিনি চার নাম্বার পয়েন্টটি কেটে দিলেন। ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে এগারটা বাজতে এখনো অনেক দেরি। তিনি মোস্তাককে সাড়ে এগারটায় আসতে বলেছেন ; তিনি ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন।

দক্ষিণের যে-ঘরটিতে মোস্তাক মিয়া বসে ছিল, সেটা একটা মিনি কনফারেন্স রুম। অল্প কিছু লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কোনো গোপনীয় আলাপের প্রয়োজন হলে ঘরটি ব্যবহার করা হয়। একটিমাত্র দরজা—এটা বন্ধ করামাত্র বাইরে লাল আলো জ্বলে।

ফখরুদ্দিন সাহেব ঠিক সাড়ে এগারটায় সেই ঘরে ঢুকলেন। নিজেই হাত দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করলেন।

‘দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।’

তিনি সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে নিজে ধরালেন, একটি বাড়িয়ে দিলেন।

‘নাও, সিগারেট নাও। নাও, নাও।’

তিনি নিজেই মোস্তাকের সিগারেট ধরিয়ে দিলেন।

‘তুমি ভাল আছ?’

‘জি স্যার।’

তিনি লক্ষ করলেন, লোকটির সামনে চায়ের কাপ। চাটা গা হয়ে হালকা সর পড়েছে। সে চায়ে মুখ দেয় নি। ফখরুদ্দিন সাহেব ঠিক তার সামনের চেয়ারটিতে বসলেন। সহজ স্বরে বললেন, ‘তুমি আমার কাছে কী চাও?’

‘স্যার, আমি তো কিছু চাই না।’

‘না-চাইলে কেন তুমি আমার বাসায় এসেছিলে? কেন আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ?’

‘আমি বড় মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছি, দাওয়াতের কার্ড নিয়ে.....’

‘দাওয়াত দিতে গিয়েছিলে?’

‘আমার মেয়েগুলো খুব ধরল। বড় মেয়েটা কান্নাকাটি করছিল।’

‘শোন মোস্তাক মিয়া, তুমি এক সময় না-খেয়ে মরতে বসেছিলে। আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম, যে-কারণে আজ তুমি ফর্সা জামাকাপড় গায়ে দিচ্ছ, মেয়ের বিয়ে

উপলক্ষে কার্ড ছাপানোর পয়সাও তোমার হয়েছে।’

‘আপনি আমাকে সাহায্য করেন নি স্যার।’

‘তার মানে? পনের হাজার টাকা নগদ তোমার হাতে দিয়েছি। তোমাকে একটা দোকান করে দিয়েছি।’

‘তার বদলে আমি আমার মেয়েটাকে দিয়েছি.....’

‘কথা বলতেও শিখেছ মনে হচ্ছে।’

ফখরুদ্দিন সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তিনি তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

‘আমার মেয়ে গিয়েছে তোমার ওখানে?’

‘জি।’

‘দু’ বার গিয়েছে, তাই না?’

‘আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।’

‘তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমার মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কারণে সে নিদারুণ মানসিক কষ্টে আছে। মেয়েটাকে কেন কষ্ট দিলে?’

‘ইচ্ছা করে দিই নি স্যার।’

‘আমার মেয়েকে দেখে তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যারা কি খুশি হয়েছে? আমাকে বল, কেমন আনন্দ-উল্লাস হল।’

মোস্তাক মিয়া চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, ‘চুপ করে আছ কেন, বল? তোমার স্ত্রী কেমন খুশি?’

‘ওর বোধশক্তি নেই স্যার—মাথায় গুগুগোল হয়েছে। কিছু বুঝতে পারে না। মেয়েটা যাওয়ার পর থেকে এই অবস্থা স্যার।’

‘তুমি তো সুস্থই আছ। আছ না? তোমার মাথায় আশা করি কোনো গুগুগোল হয় নি। নাকি হয়েছে?’

মোস্তাক জবাব দিল না।

‘মোস্তাক।’

‘জি স্যার।’

‘আগামী কাল সকাল দশটার মধ্যে তুমি ঐ বাড়ি ছেড়ে দেবে। অন্য কোথাও চলে যাবে। মেয়ের বিয়ে দেয়া পর্যন্ত সময় তোমাকে আমি দিচ্ছি, বিয়ের পর-পর ঢাকা শহর ছেড়ে যাবে। তোমাকে যেন আমি ঢাকা শহরের কিসীমানায় না দেখতে পাই।’

‘কেন?’

‘আমি চাচ্ছি, এই জন্যে। আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমাকে আমি দিচ্ছি, নাকি আরো বেশি চাই?’

‘টাকা লাগবে না, আমি চলে যাব।’

‘টাকা লাগবে না কেন? খুবই লাগবে। নাও, টাকাটা রাখ। আরেকটা সিগারেট নাও। নাও না, নাও। মোস্তাক মিয়া।’

‘জি স্যার।’

‘আমি মানুষ খুব খারাপ, তুমি বোধহয় জান না। এই বার তোমাকে ক্ষমা

করলাম। দ্বিতীয় বার করব না। এখন তুমি যেতে পার। তুমি টাকা নিলে না?’

‘টাকার স্যার আমার দরকার নেই।’

ফখরুদ্দিন সাহেব নিজের কামরায় ফিরে এলেন। মাথার যন্ত্রণা তাঁর ক্রমেই বাড়ছে। এমন শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে কোনো কিছুতেই মন বসানো যায় না। এক কাপ কালো কফির কথা বললেন। এক চুমুক দিয়ে তাও বিশ্বাস লাগল। তিনি বেল টিপলেন।

‘লগনের লাইন এখনো পাওয়া যায়নি?’

‘পাওয়া গিয়েছিল স্যার। আপনি তখন কনফারেন্স রুমে ছিলেন।’

‘আবার চেষ্টা কর।’

নিশানাথবাবু ঢুকলেন।

‘স্যার, পুলিশের ইনকোয়ারির ব্যাপারটা খোঁজ নিয়েছি। ফাইনাল রিপোর্ট এখনো হয় নি। রমনা থানার অফিসার ইন-চার্জ.....’

‘এখন থাক। পরে শুনব।’

‘আপনার কি শরীর খারাপ স্যার?’

তিনি জবাব দিলেন না। নিশানাথবাবু বললেন, ‘আপনি স্যার বাসায় গিয়ে রেস্ট নিন।’

‘আপনি আপনার কাজ করুন। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার বিচলিত হবার কোনো কারণ দেখছি না।’

‘আদাব স্যার।’

ফখরুদ্দিন সাহেব ড্রয়ার খুলে দু’টি প্যারাসিটামল বের করলেন। ট্যাবলেট শুধু-শুধু গেলার কোনো উপায় নেই। পানির জন্যে বেল টিপতে তাঁর ইচ্ছে করছে না। আবার মাথার যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছেন না।

‘স্যার, আসব?’

‘এস।’

‘লাইন পাওয়া গেছে স্যার, কথা বলুন।’

পি. এ. দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। এই ঘরটি সাউণ্ডপ্রুফ। দরজা বন্ধ করে দিলে পৃথিবী থেকে এই ঘরটি আলাদা হয়ে যায়।

‘হ্যালো, কে কথা বলছেন?’

‘আমি ডক্টর মেজান।’

‘আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। হেলেনা।’

‘আমি হেলেনার ফিজিসিয়ান বলছি।’

‘হেলেনা কি অসুস্থ?’

‘হ্যাঁ। গুরুতর অসুস্থ—তাঁর হার্ট ফাংশান কাজ করছে না। লাইফ সেভিং ডিভাইস ব্যবহার করতে হচ্ছে।’

‘ব্যাপারটা কখন ঘটল?’

‘খুব বেশি আগে নয়। ন’-দশ ঘণ্টা হবে। আপনি কি এগজ্যাক্ট সময় জানতে চান?’

‘না, চাই না। রুগীর অবস্থা কেমন?’

‘অবস্থা ভালো নয়।’

‘ভালো নয় বলতে আপনি কী মিন করছেন?’

‘আমি সবচেয়ে খারাপটাই আশঙ্কা করছি। হার্ট এ্যাণ্ড লাং মেশিনে রুগীকে আপনি দীর্ঘ সময় রাখতে পারবেন না। আমাদের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই।’

‘আই সি।’

‘তার উপর রুগীর ঠাণ্ডা লেগেছে। নিউমোনিয়ার দৃষ্টিতে। ব্যাপারটা খুব ওমিনাস।’

‘বুঝতে পারছি। আপনি একটি টেলিফোন নাম্বার লিখুন, খারাপ কিছু হলে জানাবেন।’

ফখরুদ্দিন সাহেব তাঁর শোবার ঘরের নাম্বার দিলেন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত নাম্বার। কাউকেই দেন নি। ডাইরেক্টরিতেও নেই। এখান থেকে তিনি টেলিফোন করেন। কখনো রিসিভ করেন না।’

ডক্টর মেজান বললেন, ‘আপনি কি আর কিছু জানতে চান?’

‘রুগিণীর কি জ্ঞান আছে?’

‘না, নেই। উনি কমায় চলে গিয়েছেন।’

‘জ্ঞান ফিরবে, এ-রকম কি আশা করা যায়?’

‘না, যায় না। আমি খুবই দুঃখিত।’

‘আপনার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই।’

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন, লগুনে এই মুহূর্তে কাকে বলা যায়? তাঁর লগুনে কোনো অফিস নেই। করার কথা মনে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে নি। একটা অফিস থাকলে এখন কাজে দিত। এখন সাহায্যের জন্যে অন্যদের কাছে যেতে হবে—যাদের লগুনে নিজস্ব অফিস আছে, লোকজন আছে। ওদেরকে বলতে হবে, একটা ডেডবডি দেশে আসবে, দয়া করে সব ব্যবস্থা করুন। সেটা কোনো সমস্যা নয়।

তিনি পি. আর. ও.-কে ডেকে পাঠালেন।

‘লগুনে কাদের অফিস আছে, বলতে পারেন? দেশি কোম্পানির অফিস।’

‘ব্যাংক-এর কথা বলছেন?’

‘না, ব্যাংক নয়, বিজনেস অফিস।’

‘মেফতা ইনজিনিয়ারিং-এর আছে। বাকিগুলো তো স্মার অফিসগুলো বলতে পারব না। একটা ওষুধ কোম্পানিরও আছে, নামটা মনে পড়ছে না।’

‘বের করুন।’

‘করছি স্যার। ব্যাপারটা কী, যদি জানতে পারেন.....’

‘ব্যাপারটা আপনার জানার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এখন যান।’

পি. আর. ও. নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা এসে বসে আছে। স্যারের সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুবই নাকি জরুরি। অথচ পি. আর. ও. সাহেব এটা বলতে ভুলে গেলেন। দ্বিতীয় বার ঢুকে এটা বলতে তাঁর সাহসে কুলাল না। ইউনিয়নের নেতাদের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। এরা আজ দেখা করবেই।

ফখরুদ্দিন সাহেব তাঁর সামনের নোটটির দিকে আরেক বার চোখ বোলালেন। একটা প্রায় বাজতে চলল। আজ কিছুই করেন নি। চার নাম্বার পয়েন্টটা শুধু দেখা

হয়েছে। মোস্তাক মিয়া। লোকটির কিছু পয়সা হয়েছে মনে হয়। ঘাড় শক্ত হয়েছে। কত বড় সাহস, বলে কিনা—আপনি আমাকে সাহায্য করেন নি।’

‘স্যার, আসব?’

তিনি চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলেন। লালপাড় সিঁটের শাড়ি পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোমটা টানা। মেয়েটি কে? পরিচিত মনে হচ্ছে।

‘স্যার, আসব?’

‘প্লীজ কাম ইন। কি ব্যাপার?’

‘আপনি স্যার আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন।’

‘আমি? কেন?’

‘তাহলে বোধহয় স্যার আমার ভুল হয়েছে। আই অ্যাম সরি স্যার।’

‘আপনি কে?’

মেয়েটি অত্যন্ত অবাক হয়ে বলল, ‘স্যার, আমার নাম রেখা। সুলতানা বেগম।’

‘ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি কনফিউজ করে ফেলেছি। বস, তুমি বস। চেয়ারটায় বস।’

মেয়েটি আড়ষ্ট হয়ে বসল। ফখরুদ্দিন সাহেবের অস্বস্তির সীমা রইল না। তিনি অফিসের কোনো মহিলা কর্মচারীকে তুমি বলেন না। একে কেন বললেন? মেয়েটি বসে আছে চুপচাপ। তাকাচ্ছে ভয়ে-ভয়ে। এই মেয়েটি অফিসে রোজ দেরি করে আসছে। তাকে কিছু শক্ত কথা বলা দরকার, কিন্তু তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, কোনো শক্ত কথা তাঁর মনে আসছে না। কী কারণ থাকতে পারে?

‘সুলতানা বেগম।’

‘জি স্যার।’

‘আমি ভুলে আপনাকে তুমি বলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না।’

‘ছি-ছি স্যার, এটা আপনি কী বলছেন! আমি আপনার মেয়ের বয়সী।’

‘মেয়ের বয়সী কথাটা উঠছে কেন? আমার কোনো মেয়ে নেই।’

বলেই ফখরুদ্দিন সাহেব চমকে উঠলেন। এটা তিনি কী বললেন। অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে গেল।

‘সুলতানা বেগম, আপনি এখন যান।’

‘আপনার কি স্যার শরীর খারাপ?’

‘আমার শরীর ভালোই আছে।’

‘যাব স্যার?’

ফখরুদ্দিন সাহেব উত্তর দিলেন না।

‘স্নামালিকুম স্যার।’

মেয়েটি চলে যাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন, কী কারণে একে তিনি কোনো কড়া কথা বলতে পারেন নি। এই মেয়েটি তাঁকে হেলেনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। হেলেনার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, কিন্তু মনে হল। সম্ভবত ঘোমটার কারণে। হেলেনার ঘোমটা দেয়ার বাতিক ছিল। তিনি কত বার বলেছেন, ‘সবসময় ঘোমটা কেন?’ হেলেনা হেসে বলেছে, ‘ভালো লাগে, বউ-বউ মনে হয়।’

বউ সাজার এই শখ বিয়ের ত্রিশ বছরেও কাটল না।

অফিসের সবাই লক্ষ করল, তিনটা বেজে গেছে, তবু বড়সাহেব ঘর থেকে বের

হচ্ছেন না। সাড়ে তিনটার সময় ফখরুদ্দিন সাহেবের বেয়ারা ইদ্রিস এসে বলল, 'সুলতানা আপাকে স্যার আরেক বার একটু ডেকেছেন।'

সুলতানা ছিল না। তার আজ এক জায়গায় জন্মদিনের দাওয়াত—সে তার স্বভাবমতো কাউকে কিছু না-বলে আগে-আগেই চলে গেছে।

অপালা হাতে ক্যাডবেরি চকলেটের দু'টি চৌকো টিন।

সে বেশ কিছু সময় হল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কড়া নাড়তে কেন জানি তয় লাগছে। ইচ্ছে করছে ফিরে চলে যেতে। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ অপালা কান্না পেয়ে গেল। সে বহু কষ্টে কান্না থামিয়ে কড়া নাড়ল। মিষ্টি গলায় ভেতর থেকে বলল, 'কে?'

অপালা জবাব দিল না। তার খুব ইচ্ছে করতে লাগল বলে, আমি তোমাদের এক জন বোন। তোমরা আমাকে বাইরে ফেলে দিয়েছ।

'কে, কে?'

অপালা ধরা-গলায় বলল, 'আমি।'

দরজা খুলে গেল। আজ বাড়িতে মেয়েরাই শুধু আছে, অন্য কেউ নেই। পাঁচটি পরীর মতো মেয়ে আগের মতোই অবাক বিশ্বয়ে তাকে দেখছে। অপালা চকলেটের বাস্ক দু'টি এগিয়ে ধরল। কেউ হাত বাড়াল না।

সোমা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসে নিল। অপালা বলল, 'এদের নাম কি?'

সোমা নিচু গলায় বলছে, কিন্তু কিছু অপালা মাথায় ঢুকছে না। তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। এর আগের দু' দিন এমন কষ্ট হয় নি। আজ কেন হচ্ছে?

সোমা বলল, 'তুমি বসবে না?'

'না, বসব না। আমি চলে যাব।'

'একটু বস। বাবা মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে, আসতে অনেক দেরি। একটু বস।'

অপালা বলল, 'ছোটরা জানে, আমি কে?'

'হ্যাঁ, জানে। কেন জানবে না? কত কথা আমরা বসি তোমাকে নিয়ে।'

মেজো মেয়ে, যার নাম বিনু, সে হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি যখন হলি ক্রস স্কুলে পড়তেন, তখন কত দিন আমরা আপনাকে দেখার জন্যে ফার্মগেটে দাঁড়িয়ে থেকেছি।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি। এক দিন আপনি গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে একটা রিকশার নিচে পড়ে গেলেন। আপনার সেটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ আছে, মনে আছে। খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। সেদিন স্কুলে যাই নি।'

'হ্যাঁ, আপনি চলে গিয়েছিলেন। তখন কী হয়েছিল জানেন? আব্বার ঐ রিকশাওয়ালার উপর খুব রাগ হয়ে গেল। তখন আব্বা হঠাৎ ছুটে গিয়ে রিকশাওয়ালাকে একটা চড় মারলেন। তখন সব রিকশাওয়ালা আব্বাকে মারতে লাগল।

কী যে অবস্থা! আমরা কাঁদতে-কাঁদতে বাসায় এসেছি।’

‘তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন?’

বিনু মাথা নিচু করে অল্প হাসল। সোমা বলল, ‘বিনু ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছে।’

‘তাই নাকি?’

‘ও আবার কবি। কবিতা লেখে। বিনু, তোর কবিতার খাতাটা আন না।’

বিনু সঙ্গে-সঙ্গে খাতা নিয়ে এল। অপালার হাতে খাতা দিতেই অপালার চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল।

সোমা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। একটা হাত রেখেছে অপালার কাঁধে। অন্য বোনরা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে অপালাকে। শুধু বিনু ফ্রকের আঁচলে চোখ চাপা দিয়েছে। সোমা বলল, ‘তোমরা সবাই যাও তো, অপালার জন্যে চা বানাও।’

মুহূর্তে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। সোমা বলল, ‘আমাদের উপর তোমার খুব রাগ, তাই না?’

‘না। রাগ করব কেন?’

‘জান অপালা, তোমার ঘটনাটা জানার পর থেকে আমি বাবার সঙ্গে কথা বলি না। আজ চোদ্দ বছর। আমি একটি কথাও বলি না। তোমার বিশ্বাস হয়? বাবা এই জন্যে ঘরেও বিশেষ থাকে না।’

‘তাঁর হয়তো উপায় ছিল না। যা করেছেন, বাধ্য হয়ে করেছেন।’

অপালা খুব কাঁদছে। কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না। সোমা তার পাশেই বসে আছে মূর্তির মতো। তার চোখ শুকনো। ছোটবেলা থেকেই সে কাঁদতে পারে না। কত দুঃখ-কষ্ট বয়ে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে, অথচ তার চোখে জল আসে নি। আজ তার খুব কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কান্না আসছে না।

রান্নাঘরে চার বোন মহা উৎসাহে রান্না চাপিয়েছে। এক জন আবার ময়দা বের করল। ছোট-ছোট হাতে বিনু ময়দা মাখছে। ময়দা দিয়ে সে কিছু-একটা বানাবে। কী বানাবে, তা এখনো জানে না। তাদের খুব আনন্দ হচ্ছে।

অপালা শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে।

সোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়েছে অনেক আগে। কিন্তু এখনো তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কত-কত জায়গায় সে গেল। একটি গলি ছাড়িয়ে অন্য একটি গলি, তারপর একটা বড় রাস্তা। আবার একটা গলি। একসময় সে একটা ফাঁকা মাঠের কাছে এসে পড়ল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। একদল ছেলেমেয়ে মাঠে খেলছে। কী সুন্দর লাগছে তাদের।

বিচিত্র ধরনের খেলা। একটা ছেলে ছুটতে থাকে—সবাই তার পিছনে ছোটো। একসময় ছেলেটা বসে পড়ে ছড়ার মতো কী-একটা বলে, অমনি দলের সবাই উন্টো দিকে ছুটতে থাকে। অপালা গভীর আগ্রহে ওদের খেলা দেখতে লাগল।

ফিরোজ বলল, ‘তোমার নামটা গ্রাম্য ধরনের। এই যুগে লতিফা কারোর নাম হয়? নামটা আমি বদলে দেব।’

‘কী নাম দেবেন?’

‘আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে এখন থেকে তোমার নাম ফিরোজ। কি, পছন্দ হয়েছে?’

‘উন্টোটা করলে কেমন হয়? আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে আপনার নাম হোক লতিফ।’

বলেই লতিফা খিল-খিল করে হেসে ফেলল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ফিরোজ। মেয়েরাও যে রসিকতা করতে পারে, বিশেষ করে এই মেয়ে, যার জীবন এ-পর্যন্ত বোরকার আড়ালে কেটেছে—তা ফিরোজ কল্পনাও করে নি।

‘আপনি রাগ করলেন না তো?’

‘না, রাগ করি নি। আপনি-আপনি করছ, এই জন্যে রাগ লাগছে।’

‘এক দিনে কাউকে তুমি বলা যায়?’

‘ইচ্ছা করলেই যায়। তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?’

‘হচ্ছে।’

‘দাঁড়াও, একটা রিকশা নিয়ে নিই।’

ফিরোজ রিকশার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। রিকশাওয়ালা পছন্দেরও একটা ব্যাপার আছে। এমন এক জনকে নিতে হবে, যে তাদের দু’ জনের কথা কান পেতে শুনবে না। বুড়ো কোনো রিকশাওয়ালা। তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

অনেক ঝামেলা করে সে লতিফাকে বের করে এনেছে। হাজি সাহেব বাসায় থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হত না। হাজি সাহেবকে অনেক কায়দা করে খিলগাঁয়ে পাঠানো হয়েছে। এই কাজটা করেছেন ফিরোজের শাশুড়ি। যদিও তিনি বার-বার বলেছেন—বিয়ে তো এখনো পুরোপুরি হয় নি। এখন দু’ জনে একসঙ্গে বের হওয়া ঠিক না। কিন্তু এটা তাঁর মুখের কথা, কারণ হাজি সাহেবকে খিলগাঁয়ে পাঠানোর বুদ্ধিটা তাঁরই।

লতিফা বলল, ‘আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

ফিরোজ হেসে বলল, ‘আছে একটা জায়গা, এখন বলব না।’

‘আমি জানি আপনি কোথায় যেতে চান।’

‘তাই নাকি! বল তো কোথায়?’

‘অপালা বলে আপনার যে চেনা এক জন আছে, তাঁর বাসায়।’

বলতে-বলতেই লতিফা মুখ নিচু করে হাসল। ফিরোজ গম্ভীর হয়ে বলল, ‘তুমি হাসছ কেন?’

‘এমনি হাসছি। মাঝে-মাঝে আমার খুব হাসি পায়।’

‘কই, আমার তো পায় না!’

‘সব মানুষ তো আর এক রকম হয় না। সবাই যদি এক রকম হত, তাহলে এখন আর আপনি ঐ বাড়িতে যেতে চাইতেন না। আমাকে সঙ্গে নিয়েই বেড়াতেন।’

‘এটা আবার কী ধরনের কথা?’

‘আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন?’

ফিরোজ সিগারেট ধরাল। সে সত্যি-সত্যি রেগে গিয়েছে। রাগ কমানোর চেষ্টা করছে। ফিরোজের ধারণা ছিল, এই শান্ত স্নিগ্ধ চেহারার মেয়েটি সাত চড়েও কথা বলবে না। এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়। মেয়েটা কথা বলতে পারে। কথা বলে খুব গুছিয়ে।

‘লতিফা, তোমার একটা ভুল আমি ভেঙে দিতে চাই। অপালাদের বাসায় যাবার জন্যে আমি তোমাকে নিয়ে বের হই নি। তোমাকে নিয়ে বের হয়েছি একটু হাঁটব, কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসব। চট করে একটা ধারণা করা ঠিক না।’

লতিফা চুপ করে রইল। ফিরোজের মনে হল মেয়েটি কান্না চাপার চেষ্টা করছে। এ-রকম কড়া গলায় কথা বলা উচিত হয় নি। এই মেয়ে খুব আদরে মানুষ হয়েছে, যে-কারণে সে এত অভিমানী। কোঁদে ফেললেও অবাক হবার কিছু নেই, শুধু অবস্থাটা খুব অস্বস্তিকর হবে। রূপবতী একটা মেয়ে কাঁদছে, সে ভ্যাবলার মতো পাশে দাঁড়িয়ে—সন্দেহজনক চোখে সবাই তাকাবে।

‘লতিফা।’

‘জ্বি।’

‘কোঁদে ফেলার চেষ্টা করছ নাকি?’

‘যাতে কোঁদে না ফেলি, সেই চেষ্টা করছি।’

ফিরোজ আশ্চর্য হয়ে বলল, ‘তুমি কি সবসময় এ-রকম কথার পিঠে কথা বল, না আমার সঙ্গেই বলছ?’

‘আপনার সঙ্গেই বলছি। আমি কথা খুব কম বলি।’

‘তুমি তো মনে হচ্ছে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।’

‘না, তুলব না। একসময় আমার কথা শুনে আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে।’

তারা একটা রিকশায় উঠল। ফিরোজ রিকশাওয়ালাকে অপালাদের বাড়ির দিকেই যেতে বলল। লতিফার গায়ে একটা চাদর। তার হাত চাদরের নিচে। ফিরোজ ভয়ে-ভয়ে লতিফার হাতে তার হাত রাখল। লতিফা ভীষণভাবে চমকে উঠেও সামান্য হাসল।

‘লতিফা।’

‘জ্বি।’

‘অপালাদের বাসায় আমরা কেন যাচ্ছি, বল হে?’

‘ওনাকে আপনার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, তাই যাচ্ছি। তা ছাড়া হঠাৎ বিয়ে করে নিজেকে আপনার খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।’

‘চুপ কর তো, কী বক-বক শুরু করলে? অপরাধী মনে করার কী আছে। আমি চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি? এই মেয়ের সঙ্গে যেদিন আমার পরিচয়, সেদিনই আমি তাকে বলেছি যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিকঠাক। যদি আমার কথা বিশ্বাস না-হয়, তাকেই জিজ্ঞেস করো।’

আজ দারোয়ান তাকে গেটে আটকাল না। রূপবতী একটি মেয়ে পাশে থাকার অনেক

রকম সুবিধা আছে। কাজের মেয়েটি যত্ন করে বসার ঘরে নিয়ে বসাল। তার কাছে জানা গেল, অপালা সারা দিন বাসায় ছিল না। এই কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে।

লতিফার চোখে বিশ্বাস। এত বিশাল বাড়ি সে কল্পনাও করে নি। যা দেখছে তাতে মুগ্ধ হচ্ছে। এক সময় চাপা গলায় বলল, ‘এদের বসার ঘরটা কত সুন্দর, দেখেছেন?’

‘সুন্দর লাগছে তোমার কাছে?’

‘খুবই সুন্দর! ইস, আমাদের যদি এ-রকম একটা বসার ঘর থাকত, তাহলে আমি আর কিছু চাইতাম না।’

‘এই বসার ঘরটা আমার তৈরি করে দেয়া। ডিজাইন, ডেকোরেশন—সব আমরা।’

‘সত্যি।’

‘হ্যাঁ, সত্যি। তুমি চাইলে এর চেয়ে সুন্দর একটা ঘর আমি তোমার জন্যে বানিয়ে দেব।’

‘আমি চাই। আমি এক শ’ বার চাই। ঐ ছবিটাও তোমার আঁকা?’

এই প্রথম লতিফা তুমি বলল। সে নিজেও তা বুঝতে পারল না। তার মুগ্ধ দৃষ্টি ছবিটির দিকে।

‘ছবিটা ভালো লাগছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন ভালো লাগছে?’

‘তা তো জানি না।’

ফিরোজ মৃদু স্বরে বলল, ‘আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এইটা। অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু ভালো লাগে, কিন্তু কেন ভালো লাগে তা আমরা বুঝতে পারি না। বুঝতে চেষ্টাও করি না।’

‘সবকিছু বুঝে ফেলাও ভালো না।’

ফিরোজ মনে-মনে হাসল। এই মেয়েটি দার্শনিক টাইপ নাকি? কত সহজে কঠিন-কঠিন কথা বলছে।

কাজের মেয়েটি ট্রেতে করে চা এবং নানান ধরনের খাবারদাবার নিয়ে এসেছে। সে চায়ের কাপ টেবিলে রাখতে-রাখতে মৃদু স্বরে বলল, ‘আপার শরীফ ভালো না। আপা আজকে একতলায় নামবে না। আপনারা আরেক দিন আসেন। ফিরোজের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। লতিফা বলল, ‘আমি উপরে গিয়ে ওনাকে দেখে আসি?’

কাজের মেয়েটি বলল, ‘জি-না। বাইরের মানুষের উপরে উঠা নিষেধ আছে।’ লতিফা চায়ের কাপে চিনি ঢেলে হালকা গলায় বলল, ‘মিষ্টি হয়েছে কি না দেখা।’ ফিরোজ কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে, যেন এই মুহূর্তে রেগেমেগে একটা কাণ্ড করবে। লতিফা মৃদু স্বরে বলল, ‘চা না খেয়ে যাওয়াটা আরো খারাপ হবে। চা খাও, কিছুক্ষণ বস। কাপগুলো কি সুন্দর, দেখেছ? তুমি আমাকে এ-রকম এক সেট কাপ কিনে দিও।’

ফিরোজ চুপ করে আছে। লতিফা শাড়ির আঁচলে গা ভালো মতো জড়াতে-জড়াতে বলল, ‘আজ বেশ শীত পড়েছে। তোমার শীত লাগছে না?’

এ-প্রশ্নেরও কোনো জবাব পাওয়া গেল না। ফিরোজ রিকশায় বসে আছে পাথরের মতো, তাকিয়ে আছে শূন্যদৃষ্টিতে। তার কিছুই ভালো লাগছে না। লতিফা চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি? তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখছ। নিশ্চয়ই ওনার কোনো সমস্যা হয়েছে। কেউ কি আর ইচ্ছা করে কাউকে অপমান করে?'

'চুপ করে থাক। তুমি বেশি বক-বক কর।'

'সবার সঙ্গে করি না। কোনোদিন করবও না। শুধু তোমরা সঙ্গে করব, রাগ কর আর যাই কর।'

লতিফা তার হাত রাখল ফিরোজের হাতে। সেই হাত কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ফিরোজ বিস্থিত হয়ে বলল, 'কি হয়েছে লতিফা?'

'কিছু হয় নি।'

কৌদছ নাকি?'

'হ্যাঁ, কৌদছি। তুমি এত লজ্জা পেয়েছ, তাই দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ফিরোজের বিশ্বয়ের সীমা রইল না। এ তো বড় অদ্ভুত মেয়ে! সত্যি-সত্যি কৌদছে। ফিরোজ বিব্রত স্বরে বলল, 'কী শুরু করলে তুমি, কান্না থামাও তো।'

লতিফা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'চেপ্টা করছি, পারছি না।'

ওরা চলে যাবার পরপরই খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অপালা নিচে নেমে এল। তাকে দেখে মনে হল, সে দীর্ঘ সময় নিয়ে সাজগোছ করেছে। গায়ে হালকা লাল রঙের শাড়ি। গলায় গাঢ় লাল রঙের রুবি-বসানো হার। কানের দুপের পাথর অবশ্যি রুবি নয়—স্বচ্ছ টোপাজ। লাল শাড়ির প্রতিফলনে সেগুলোও লালচে দেখাচ্ছে। অপালাকে দেখে মনে হচ্ছে এফুগি কোথাও বেরুবে।

বারান্দায় গোমেজ দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অপালা লাজুক গলায় বলল, 'আমাকে কেমন লাগছে?'

'খুব সুন্দর লাগছে আপা।'

'বাবা কোথায়?'

'বাগানে বসে আছেন।'

'আমাদের দু' কাপ চা দাও।'

অপালা হালকা পায়ে বাগানে নেমে গেল। বাগান অন্ধকার। বারান্দার বাতি নেভানো বলে সবকিছুই কেমন অস্পষ্ট লাগছে। ফখরুদ্দিন সাহেব অরুণা এবং বরুণাকে দু' পাশে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত চুরুট। অন্ধকারে চুরুটের আগুন ওঠানামা করেছে। অপালা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

'অন্ধকারে বাগানে বসে আছ কেন বাবা?'

'এমনি বসে আছি, কিছু করার নেই।'

'তোমার শীত লাগছে না?'

'কিছুটা লাগছে।'

'এস, ঘরে এস। এই ঠাণ্ডায় তোমার পাশে বসতে পারব না।'

অপালার গলা সতেজ। কথায় ফুটির একটা ভঙ্গি, যা তার স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই মিশছে না। সে বড় একটা সাদা চন্দ্রমল্লিকা ছিঁড়ে খোঁপায় পরল।

‘বসে রইলে কেন বাবা, এস।’

অপালা ফখরুদ্দিন সাহেবের হাত ধরল। তিনি বিম্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

‘তোকে খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছে।’

‘সবাই মুখ গোমড়া করে রাখলে চলবে? তোমার কারখানার ঝামেলা মিটেছে?’

‘প্রায় মিটেছে। কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। আরো টাকা খরচ হবে, এই আর কি।’

‘ধনী হবার কত সুবিধা, তাই না বাবা? সব সমস্যা চট করে মিটিয়ে ফেলা যায়।’

‘গরিব হবারও সুবিধা আছে। গরিবদের এ-ধরনের কোনো সমস্যা থাকে না।’

অপালা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে হালকা গলায় বলল, ‘তা ঠিক, গরিবদের একমাত্র সমস্যা কীভাবে বেঁচে থাকবে। এই বেঁচে থাকার জন্যে কত কাণ্ড এরা করে। নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়।’

ফখরুদ্দিন সাহেব হাতের চুরুট ছুঁড়ে ফেললেন। তাকালেন মেয়ের দিকে। অন্ধকারে অপালার মুখের ভাব দেখতে পেলেন না। শুধু মনে হল, মেয়েটির গলার স্বর হঠাৎ করে যেন খানিকটা বিষন্ন হয়ে গেছে, এবং মেয়েটি নিজেও তা বুঝতে পেরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বিষন্নতা ঝেড়ে ফেলতে।

তারা বসল বারান্দায়। গোমেজ চায়ের ট্রে নামিয়ে দিয়ে বাতি জ্বলে দিল। অপালা চায়ে চিনি মেশাতে-মেশাতে বলল, ‘আমাকে কেমন লাগছে বাবা?’

‘সুন্দর লাগছে। তবে লাল চন্দ্রমল্লিকা হলে বোধহয় আরো ভালো লাগত।’

‘না, তা লাগত না। কালো চুলের সঙ্গে সাদা ফুলের সুন্দর কন্ট্রাস্ট হয়। কালোর সঙ্গে লাল মিশ খায় না। তোমার চায়ে চিনি হয়েছে?’

‘হ্যাঁ, হয়েছে। হঠাৎ আজ এত সাজের ঘটা?’

‘ইচ্ছা করল, তাই। কারণ নেই কোনো।’

‘চল, বাইরে কোথাও গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে আসি। যাবে?’

‘কেন যাব না?’

‘মন ভালো না লাগলে থাকা।’

‘মন ভালো লাগবে না কেন? আমার খুব ভালো লাগছে।’

রেস্তোরাঁতে অপালা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। কথা বললেন ফখরুদ্দিন সাহেব। সবই ব্যাবসায়িক কথা। মোট সম্পদের একটা আবছা ধারণা দিতে লাগলেন। অপালা বিম্বিত হয়ে বলল, ‘আমাকে এ-সব কেন বলছ বাবা?’

‘তোমাকে ছাড়া কাকে বলব? আমার শরীর ভালো না। যে-কোনো সময় কিছু-একটা হবে। তখন হাল ধরবে কে?’

অপালা ক্ষীণ স্বরে বলল, ‘মা’র কথা তুমি আমাকে অনেক দিন ধরেই কিছু বলছ না। তাঁর শরীর কি খুব খারাপ?’

‘না তো। শরীর মোটামুটি ভালোই আছে।’

‘না বাবা, ভালো নেই। আমি আজ খুব ভোরে হাসপাতালে টেলিফোন করেছিলাম। ডাক্তাররা বললেন, অবস্থা খুবই খারাপ। বাবা।’

‘বল।’

‘তুমি এখনো কেন এখানে বসে আছ? তুমি যাচ্ছ না কেন?’

অপালা খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, ‘মা’র এখন জ্ঞান নেই, কিন্তু যদি জ্ঞান ফেরে, তখন মা এক জন প্রিয় মানুষের মুখ দেখতে চাইবে। মা তখন কাকে দেখবে?’

‘রাইট। রাইট আসলেই তাই। মৃত্যুর সময় প্রিয়জনদের দেখতে ইচ্ছা করে। আমি এটা খুব ভালো জানি। আমার মাও তাই চেয়েছিল। আমি, আমি.....’

ফখরুদ্দিন সাহেব কথা শেষ করলেন না। অপালা বলল, ‘চল উঠে পড়ি, আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না।’

রাত প্রায় একটার মতো বাজে। অপালা এখনো তার খোঁপা থেকে চন্দ্রমল্লিকা তুলে ফেলে নি। তার গায়ে এখনো লাল শাড়ি। গলার হার আগুনের মতো জ্বলছে। তাকে দেখাচ্ছে তার ডাইরিতে আঁকা নর্তকীর মতো। সেই রকম চোখ, সেই রকম মুখ। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা আগে অপালা লক্ষ করে নি। সে অনেকক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখল। ফিস-ফিস করে বলল, ‘আয়নার এই মেয়েটি তো ভারি সুন্দর।’ বলেই সে তাকাল তার ডাইরির ছবিটির দিকে। ‘এত মিল আমাদের মধ্যে, কিন্তু আগে কেন এটা চোখে পড়ল না?’ এই বলেই সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাইরি খুলে ছোট-ছোট অক্ষরে লিখল—

“বাবা, তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই।”

তার কাছে মনে হল, এই লেখা পড়ে সবাই ভাববে, মেয়েটি কোন বাবার কথা বলছে? কেউ তা বুঝতে পারবে না। বোঝার কথাও নয়। বেশ চমৎকার একটা ধাঁধা। যে ধাঁধার উত্তর শুধু এক জনই জানে। সে সেই উত্তর কাউকে দিয়ে যাবে না। থাকুক—না খানিকটা রহস্য।

ঘরের বাতি নিভিয়ে অপালা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলে দিল। তার ডাইরির শেষ লেখাটি অতি দ্রুত লিখতে লাগল।

ফিরোজ সাহেব,

আপনাদের দু’ জনকে আমি জানালা দিয়ে আসতে দেখলাম। বিকেলবেলার আলোয় সবকিছুই ভালো দেখায়, কিন্তু আপনাদের দু’ জনকে যে কী সুন্দর লাগছিল! আমি দেখলাম, আপনার বান্ধবী (নাকি স্ত্রী?) একটা হৌচট খেলেন, আপনি সঙ্গে-সঙ্গে হাত দিয়ে তাঁকে ধরে ধৌলে কী যেন বললেন, তারপর দু’ জন অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। কী যে অপূর্ব একটি দৃশ্য! সিন্দে আমার চোখ ভিজে গেল। কত আনন্দ আমাদের চারদিকে, তাই না?

আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসি নি। কারণটি জানতেই আপনারা দু’ জনই সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণটা হচ্ছে, কেন জানি পেরুর থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, আপনার এই বান্ধবীর ব্যাপারটা সব স্নানানো। মিথ্যা অভ্যাসে আপনি বার-বার আমার কাছেই আসেন। কিন্তু তা তো নয়। এটা আমি কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারছিলাম না। আপনি আমাকে সত্যি কথা বলেছিলেন। আমিও সত্যি কথাই বললুম। আমি আপনাকে নিয়ে একটা বাড়িতে যেতে চেয়েছিলাম। সেটা আর সম্ভব হল না। তবে আপনাকে একটা মজার কথা বলি—যদি ইঠাৎ কোনোদিন অবিকল আমার মতো কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, আপনি কিন্তু চমকে উঠবেন না। তার কাছে গিয়ে বলবেন—অপালা নামের খুব চমৎকার একটি মেয়ে ছিল। তাকে আমি চিনতাম। সেই মেয়েটি খুব দুঃখী ছিল, কিন্তু তার দুঃখের কথা সে কাউকেই কোনোদিন বলে নি। এবং কারো উপর তার কোনো রাগ নেই।

মেয়েটির ঠিকানা আমি আপনাকে দেব না। কারণ আমি জানি, একদিন-না-একদিন তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে। আপনি ভীষণ চমকে উঠবেন। কল্পনায় আপনার সেই চমকে ওঠার দৃশ্য আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমার খুব মজা লাগছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘুমুতে যাবার আগে দু'টি ঘুমের ট্যাবলেট খান। সোনারিলের বড় একটা কৌটা তাঁর বিছানার পাশের সাইড-টেবিলে থাকে। আজ কৌটাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। হয়তো হাত লেগে নিচে পড়ে গেছে। খুঁজতে ইচ্ছে করছে না। তিনি বিছানায় উঠে বাতি নিভিয়ে দিলেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই রাতে তাঁর খুব ভালো ঘুম হল। চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখলেন। নদী, বন, ফুল, পাখি নিয়ে স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যেই তিনি বুঝলেন, এটা স্বপ্ন—এর কোনো অর্থ নেই, তবু তাঁর মন গভীর প্রশান্তিতে ভরে গেল। অনেক দিন স্বপ্ন দেখা হয় না।।

একজন মায়াবতী



একজন মায়াবতী



দরজার কড়া নড়ছে।

মনজুর লেপের ভেতর থেকে মাথা বের করে শব্দ শুনল, আবার লেপের ভতর ঢুকে পড়ল। এর মধ্যেই মাথার পাশে রাখা ঘড়ি দেখে নিয়েছে— সাতটা দশ। কোনো বুদ্ধিমান লোক পৌষ মাসে ভোর সাতটা দশে লেপের ভেতর থেকে বেরুতে পারে না। মনজুর নিজেকে একজন বুদ্ধিমান লোক মনে করে।

যে কড়া নাড়ছে সে যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে আরও কয়েক বার কড়া নেড়ে চলে যাবে। পাঁঠা শ্রেণীর হলে যাবে না। বিপুল উৎসাহে কড়া নাড়তেই থাকবে। নাড়ুক, ইচ্ছে হলে দরজা ভেঙে ফেলুক। হু কেয়ারস? এখন লেপের ভেতর থেকে বের হওয়া যাবে না।

মনজুর গত রাতে তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিল। ঘুমাতে গেছে তিনটা কুড়িতে। ঘুম ভালো হয় নি। কারণ ঘুমাতে গেছে খিদে নিয়ে। রাত জাগলে খিদে পায়। শরীরের জন্য বাড়তি কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন হয়। সেই ব্যবস্থা ঘরে থাকে— দু’তিন রকমের জেলি এবং পাউরুটি। কাল রাতে জেলি ছিল— পাউরুটি ছিল না। বিস্কিটের টিনে কিছু বিস্কিটের গুঁড়া পাওয়া গেল। এক চামচ মুখে দিয়ে মনে হলো সাবানের গুঁড়া খাচ্ছে। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার যোগাড়। কতদিনকার বাসি কে জানে। পানি এবং চিনির কৌটার শেষ দু’চামচ চিনি খেয়ে পেট ভরিয়ে ঘুমাতে গেছে, চোখ প্রায় ধরে এসেছে— এমন সময় বাথরুম পেয়ে গেল। ভরপেট পানি খেয়ে ঘুমাতে যাবার এই হলো সমস্যা। বাথরুম পাচ্ছে তবে সেই তাগিদ জোরালো নয়, উঠে যেতে ইচ্ছা করে না। শীতের রাতে লেপের ভেতর একবার ঢুকে পড়লে বেরুতে ইচ্ছা করে না।

এখনও খটখট শব্দ হচ্ছে।

গাধা নাকি? গাধা তো বটেই— অতি নিম্নমানের গাধা। গাধা সমাজের কলঙ্ক। মনজুর লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে উঁচু গলায় বলল, ‘ইউ স্টুপিড অ্যাস। ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।’ এটি মনজুরের প্রতি প্রিয় গালি। সে শিখেছে বিন্দুবাসিনী স্কুলের হেড স্যারের কাছে। ক্লাস চলার সময় মনজুর কী কারণে জানি হেড স্যারের ঘরে ঢুকেছিল। তাকে দেখে স্যার হুঙ্কার দিলেন, ‘ইউ স্টুপিড অ্যাস, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার।’ ইংরেজি গালি বাচ্চা-ছেলে বুঝতে পারবে কিনা তাঁর হয়তো সন্দেহ হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ বাংলা তরজমাও করে দিলেন, ‘ওহে বোকা গাধা, এখানে তোমার কোনো কর্ম নাই।’

মনজুর হেড স্যারের ইংরেজি গালি সাধারণত মনে-মনে দেয়। তবে এখন উঁচু গলায় দেয়া যেতে পারে। শোবার ঘর থেকে যা-ই বলা হোক, বাইরে থেকে কিছুই শোনা

যায় না। সে হয়তো তার স্যারের মতো গালির বাংলা তরজমাও করত। কিন্তু সে বুঝতে পরছে তাকে বিছানা ছাড়তেই হবে, তলপেটে চাপ পড়ছে, বাথরুমে না গেলেই নয়। কাল রাতে বাথরুম পেয়েছিল, সে বাথরুমে না গিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। যে দু'গ্লাস পানি ঘুমাবার আগে খেয়েছিল তার পুরোটাই এখন একটি কিডনিতে জমা হয়েছে। সাধারণ নিয়মে দুটি কিডনিতে জমা হবার কথা। সে সাধারণ নিয়মের বাইরে— তাঁর একটিমাত্র কিডনি। ডানদিকের কিডনি সাত বছর আগে কেটে বাদ দেয়া হয়েছে। বাঁ দিকেরটাও সম্ভবত যাই-যাই করছে। মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা হয়। চোখে অন্ধকার দেখার মতো ব্যথা। মিলিটারি ডাক্তার ব্রিগেডিয়ার এস. মালেক গত মাসে হাসি হাসি মুখে বললেন, Outlook not so good. মিলিটারি ডাক্তাররা বোধহয় সাধারণ ডাক্তারদের চেয়ে বোকা হয়। বোকা না হলে এই জাতীয় কথা হাসিমুখে বলে কী করে?

একজন হাসিমুখে কিছু বললে অন্যজনকেও হাসিমুখে জবাব দিতে হয়। মনজুর হাসিমুখে বলল, Outlook not so good বলতে কী মিন করছেন?

ডাক্তার সাহেবের হাসি আরও বিস্তৃত হলো। তিনি বললেন, কিডনি যেটা আছে মনে হচ্ছে সেটাও ফেলে দিতে হবে। সিমটম্‌স ভালো না।

মনজুরের বুক শুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। তবু মুখে হাসি ধরে রাখল। হাসাহাসি দিয়ে যে বাক্যবিন্যাস শুরু হয়েছে তাকে বন্ধ করার কোনো মানে হয় না।

যেটা আছে সেটাও ফেলে দিতে হবে? বলেন কি! হা-হা-হা।

মিলিটারি ডাক্তার এই পর্যায়ে হকচকিয়ে গেলেন। সরু গলায় বললেন, হাসছেন কেন? আপনার শরীর থেকে একটা প্রত্যঙ্গ ফেলে দিতে হচ্ছে এর মধ্যে হাসির কী পেলেন? What is so funny about it?

মনজুরের গা জুলে গেল। ব্যাটা বলে কি! আমি হাসছি তোঁর সঙ্গে তাল দিয়ে আর তুই বলছিস What is so funny about it?

এখনও কড়া নড়ছে।

খুব কম হলেও ঝাড়া কুড়ি মিনিট ধরে ধাক্কাধাক্কি চলছে। দুটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে— এক. ভিথিরি, যে ঠিক করেছে ভিক্ষার বউনি এই বাড়ি থেকে শুরু করবে। কিছু না নিয়ে যাবেই না। দুই. তাঁর শ্বশুরবাড়ির কেউ। মীরা হয়তো তাঁর কোনো খালাতো, চাচাতো কিংবা মামাতো ভাইকে পাঠিয়েছে। বলে দিয়েছে 'দেখা না করে আসবি না।' কাজ হচ্ছে সেইভাবেই। গাধাটা খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। মনজুর বিছানা থেকে নামতে নামতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল— এটা কিমেন করে সম্ভব যে আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি লোক গাধা ধরনের? শুধু যে মনজুরের গাধা তাই না, চেহারাতেও গাধা। জহির নামে মীরার এক খালাতো ভাই আছে যার কান দুটি অস্বাভাবিক লম্বা। মুখও লম্বাটে। ঐ ব্যাটাই এসেছে বাসি?

কে?

জি আমি।

আমিটা কে?

স্যার, আমি কুদ্দুস।

কুদ্দুস মনজুরের অফিসের পিয়ন। সাত সকালে সে এখানে কেন? মনজুর কি তাকে আসতে বলেছিল? মনে পড়ল না। আজকাল কিছুই মনে থাকে না। কিডনির সঙ্গে কি স্মৃতিশক্তির কোনো সম্পর্ক আছে? মনজুর দরজা খুলল।

ব্যাপার কী কুদ্দুস?

স্যার, আমার ছোট বোনটা গত রাত্রে মারা গেছে।

মনজুর তাকিয়ে রইল।

ভোরবেলা কেউ মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এলে তাকে কী বলতে হয়? সান্ত্বনার কথাগুলো কী? বলার নিয়মটাই বা কী? মনজুর খুবই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

কুদ্দুস ভিতরে আসো। ভেরি স্যাড নিউজ। ইয়ে কী যেন বলে... ক'টার সময় মারা গেছে?

রাত আড়াইটার সময় স্যার।

মনজুরের নিজের ওপরই রাগ লাগছে। ক'টার সময় মারা গেছে সেই খবরে তার দরকার কী? আড়াইটার সময় সে কী করছিল? বিস্কিটের গুঁড়া খাচ্ছিল বলে মনে হয়।

কুদ্দুস মাথা নিচু করে বলল, কিছু টাকা দরকার ছিল স্যার। হাত একেবারে খালি।

মনজুর স্বস্তিবোধ করল। সান্ত্বনা দেবার চেয়ে টাকা দেয়া অনেক সহজ। সান্ত্বনা দেয়ার অসংখ্য পথ আছে, টাকা দেয়ার একটাই পথ। মানিব্যাগ বের করে হাতে দিয়ে দেয়া।

কত টাকা দরকার?

স্যার আমি তো জানি না। লাশের খরচপাতি আছে। দেশে নিয়া গোর দেয়ার ইচ্ছা ছিল; সেটা পারব না। সবই স্যার কপাল।

হাজার খানিক দিলে হয়?

দেন স্যার।

আসো, ভিতরে এসে বসো। নাম কী ছিল তোমার বোনের?

সাবিহা।

ও আচ্ছা, সাবিহা।

মনজুর আবার নিজের ওপর বিরক্ত হলো। 'নাম কী' প্রশ্নটা সে শুধু শুধু কেন করল? নাম দিয়ে তার দরকার কী? মূল কথা হচ্ছে বেচারি মারা গেছে। তার নাম সাবিহা হলেও যা ময়ূরাক্ষি হলেও তা। অবশ্যি ময়ূরাক্ষি নাম হলে এক শিল্পকের জন্য হলেও মনে হতো— 'আহা, এত সুন্দর নামের একটা মেয়ে মারা গেছে'।

তুমি এই চেয়ারটায় বসো কুদ্দুস। জীবন-মৃত্যু হচ্ছে তোমার কী যেন বলে... উইল অব গড, মানে ইয়ে...দেখি টাকটা নিয়ে আসি।

মানিব্যাগে আছে মাত্র এক শ' আশি টাকা। টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারে আছে নব্বুই টাকা— এ তো দেখি বিরাট বেকায়দা হয়ে গেল। বাড়িওয়ালার কাছে চাইলে কি পাওয়া যাবে? সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাকে এই মাসের ভাড়াই দেয়া হয় নি। মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া দেয়ার কথা আজ বারো তারিখ।

কুদ্দুস।

জি স্যার।

মানে একটা সমস্যা হয়ে গেল। ঘরে এত টাকা নেই। এখানে অল্প কিছু আছে। সরি, আমি ভেবেছিলাম...কুদ্দুস, তুমি চা-টা কিছু খেয়েছ?

জি-না স্যার।

বসো, চা খেয়ে যাও। শুধু চা— একা থাকি। ঘরে নাশতার কোনো ব্যবস্থা নেই। রেস্টুরেন্টে নাশতা খাই। বরং তুমি এক কাজ করো— চলো আমার সঙ্গে চা-নাশতা খাও।

লাগবে না স্যার। আমি যাই।

মনটাকে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করো। জীবন-মৃত্যুর ওপর আমাদের কোনো ইয়ে নেই। মানে গডস উইল।

আমি স্যার যাই। দেরি হয়ে গেছে।

আচ্ছা যাও।

কুদুস চলে যাবার পর মনজুর চায়ের পানি চড়াল। পানি না চড়ালেও হতো। চিনি শেষ হয়ে গেছে, চিনির কৌটায় যা অবশিষ্ট ছিল তা কাল রাতে সে খেয়ে নিয়েছে। আর কোনো কৌটায় চিনি আছে কি? সেদিন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা কৌটা বের হলো, যার গায়ে লেখা 'ইমার্জেন্সি চা পাতা'। মীরার কাণ্ড— চায়ের কৌটার বাইরেও একটা ইমার্জেন্সি কৌটা রেখেছে। এই কৌটায় সে নিশ্চয় কখনও হাত দেয় না। সে-রকম ইমার্জেন্সি চিনি লেখা কোনো কৌটা কি আছে? চিনির কৌটা পাওয়া গেল না, তবে একটা কৌটা পাওয়া গেল যার গায়ে লেখা— 'সমুদ্র'। কৌটার গায়ে 'সমুদ্র' লেখার মানে কী?

মনজুর রাতে খিদে নিয়ে ঘুমিয়েছিল। সেই খিদে জানান দিচ্ছে। আরেক চামচ বিস্কিটের গুঁড়া কি খেয়ে নেবে? কুদুসকে টাকা দিতে না পারার অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছে না। কিছু সান্ত্বনার কথা তো তাকে অবশ্যই বলা উচিত ছিল। এসব পরিস্থিতিতে কী বলতে হয় বা বলতে হয় না তার ওপর বই-টাই থাকা উচিত ছিল। বিদেশে নিশ্চয়ই আছে— 'মৃত্যুশোকে কাতর মানুষকে সান্ত্বনা দেবার এক শ'টি উপায়'।

আধুনিক মানুষদের জন্য এ জাতীয় বই খুবই প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় বইয়ে বাজার ভর্তি, প্রয়োজনীয় বই খুঁজলে পাওয়া যায় না। কথা বলার আর্টের ওপরও একটা বই থাকা দরকার। কেউ-কেউ এত সুন্দর করে কথা বলে, কেউ কথাই বলতে পারে না। যখন মজার কোনো গল্প বলে তখন ইচ্ছা করে একটা চড় বসিয়ে দিতে।

বর্তমানে সময়টা হলো কথা-নির্ভর। অথচ সেই কথাই লোকজন গুছিয়ে বলতে পারছে না। কথা বলার ওপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটা কোর্স থাকলে ভালো হতো। ইনস্ট্রাকটরদের কোনো ডিগ্রি থাকতে হবে না, তবে কথা বলার ব্যাপারে তাদের হতে হবে এক একজন এক্সপার্ট। যেমন মীরা। মনজুরের ধারণা, মীরার মতো গুছিয়ে এবং সুন্দর করে কোনো মেয়ে কথা বলতে পারে না। প্রথম দিনে খানিকক্ষণ কথা বলার পর মীরা বলল, আপনার নামের প্রথম অক্ষর এবং শেষ অক্ষর দিয়ে আমার নাম— এটা কি আপনি লক্ষ করেছেন? মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, এখন লক্ষ করলাম। আগে করি নি।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, নামের এই মিল কী প্রকাশ করে— বলতে পারেন? জি-না।

চিন্তা করে দেখুন তো, বের করতে পারেন কিনা। যদি বের করতে পারেন তা হলে টেলিফোন করে জানাবেন। যদি বের করতে না পারেন তা হলে টেলিফোন করবেন না।

মনজুর তৃতীয় দিনে টেলিফোন করল। সে কে, তার কী নাম কিছুই বলতে হলো না। 'হ্যালো' বলতেই মীরা বলল, ও আপনি? রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছেন? আনতাম আপনি পারবেন।

মনজুর কাঁচুমাচু গলায় বলল, জি-না, পারি নি।

পারেন নি। তাহলে টেলিফোন করলেন যে?

আপনার কাছ থেকে জানার জন্য।

আচ্ছা, আপনাকে আরও সাতদিন সময় দিচ্ছি। সাতদিন পরেও যদি না পারেন তা হলে বলে দেব। রাখি, কেমন?

মনজুর অনেক কিছু ভাবল— নামের মিল কী বুঝাচ্ছে? চার অক্ষরের দুটি মিলে যাচ্ছে। প্রথমটি এবং শেষটি। তাতে কী হয়? আদৌ কি কিছু হয়?

সাতদিন পর মীরার সঙ্গে আবার কথা হলো। সে হাসতে হাসতে বলল, এখনও পারেন নি? এত সহজ আর আপনি পারছেন না।

আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিম্ন পর্যায়ে। আমার মেজ মামার ধারণা আমি গাধা-মানব।

তাই তো দেখছি।

মিলটা কী, দয়া করে যদি বলেন...

মীরা হাসতে হাসতে বলল, ঠিক করে বলুন তো আপনার আগ্রহ কি মিল জানার জন্য, না আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য?

মনজুর গুছিয়ে কথা বলতে পারলেও তৎক্ষণাৎ তার মাথায় হঠাৎ করে কোনো জবাব এলো না। মীরা বলল, হ্যালো, কথা বলছেন না কেন? আপনি অ্যামবারাসড্ বোধ করছেন?

জি-না।

মনে হচ্ছে আপনি অ্যামবারাসড্। সরি, আমি কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাই না। রাখি, কেমন? পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

মনজুর দুধ-চিনিবিহীন চা নিয়ে বিছানায় বসল। আশ্চর্য, টেলিফোনে কুঁ-কুঁ-পিঁড়িং জাতীয় শব্দ হচ্ছে। ব্যাপারটা কী? নজরুল অবাক হয়ে তাকাল। গত দুই মাস ধরে টেলিফোন ডেড। বিলের টাকা জমা না দেয়ায় লাইন সম্ভবত কেটে দিয়েছে। টেলিফোন অফিসে একবার যাওয়া দরকার। যেতে ইচ্ছা করছে না। টেলিফোন ছাড়া তার খুব যে অসুবিধা হচ্ছে তাও না। বরং এক রকম আরামই অনুভব করছে।

টেলিফোনে আবার কুঁ-কুঁ শব্দ। আপনা আপনি ঠিক হয়ে গেল নাকি। এ দেশে সবই সম্ভব। যে নিয়মিত বিল দিয়ে যায় তার লাইন কাটা যায় আর তার মতো ডিফল্টারদের কাটা লাইন আপনা আপনি মেরামত হয়ে যায়।

মনজুর রিসিভার তুলে কোমল গলায় বলল, হ্যালো। হ্যালো।

ওপাশ থেকে আট নয় বছর বয়সী বালকের গলা শোনা গেল।

হ্যালো বড় চাচু?

আমি বড় চাচু না খোকা— তুমি কেমন আছ?

আমি ভালো, আপনি কে?

আমার নাম মনজুর।

মনজুর চাচু ?

তাও বলতে পারো। তুমি স্কুলে যাও নি?

উঁহঁ।

কেন বলো তো?

আমার জ্বর।

বলো কি! একটু আগে তো বললে— তুমি ভালো।

ছেলেটা হকচকিয়ে গেল। ভুল ধরিয়ে দিলে ছোটরা অসম্ভব লজ্জা পায়।

নাম কী তোমার খোকা?

ইমরুল।

ইমরুল? সর্বনাশ, তুমি যখন একটু বড় হবে সবাই তোমাকে কি বলে স্ক্যাপাবে জানো? সবাই বলবে— ভিমরুল।

ভিমরুল কী?

ভিমরুল কী বলার আগেই টেলিফোন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একেবারেই ঠাণ্ডা। শৌ-শৌ-পি-পি কোনো আওয়াজ নেই। টেলিফোনটা ঠিক থাকলে মীরাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা যেত— কৌটার গায়ে ‘সমুদ্র’ লেখা কেন? উত্তরে মীরা তার স্বভাবমতো বলত— তুমি আন্দাজ করো তো কেন?

আমি পারছি না।

তবু চেষ্টা করো। তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম।

আধুনিক জগতের সাত আশ্চর্যের মধ্যে আছে— রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন...। অষ্টম আশ্চর্য (মনজুরের মতে) তার সঙ্গে মীরার বিয়ে। যাকে বলে হলস্থূল বিবাহ। মীরার বাবা, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মনসুর উদ্দিন এক হাজার লোককে দাওয়াত করেছিলেন। দাওয়াতি লোকজনের মধ্যে তিনজন ছিলেন মন্ত্রী। ফ্যাগ দেয়া গাড়ি করে এসেছিলেন। তাঁরা কিছুই খেলেন না। তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন মনজুরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, হ্যালো ইয়াং ম্যান। বেস্ট অব ইণ্ডর লাক।

বাসর হলো মীরার বড় ভাইয়ের বাসায়। বিছানার ওপর বেলি ফুলের যে চাদর বিছানো তার দামই নাকি দু’হাজার টাকা।

মীরা বাসর রাতে প্রথম যে কথাটি বলল, তা হচ্ছে— এই বিছানার বিশেষত্ব কী বলো তো?

মনজুর কিছু বলতে পারল না।

কী, বলতে পারলে না? এটা হচ্ছে ওয়াটার বেড। বাঙালি জল-তোশক বলতে পারো। এখানে ঘুমালে মনে হবে পানির মধ্যে ঘুমিয়ে আছ।

বলো কী!

ভাইয়া আমেরিকা থেকে আনিচ্ছে। সে খুবই শৌখিন। বেচারার নিজে অবশ্যি এই বিছানায় ঘুমাতে পারে না। ওর পিঠে বগা জাকার নরম বিছানায় শোয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বেচারার ঘুমায় মেঝেতে পাটি পেতে। বাধ্য হয়ে ভাবিকেও তাই করতে হয়। একে বলে পোয়েটিক জাসটিস। আচ্ছা, তুমি এমন মুখ ভোঁতা করে বসে আছ কেন? কথা বলো।

কী কথা বলবে?

কী কথা বলবে সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে? ইন্টারেস্টিং কোনো কথা বলো। বাসর রাতের কথা বাকি জীবনে অসংখ্যবার মনে করা হবে— কাজেই কথাগুলো খুব সুন্দর হওয়া উচিত।

মনজুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের বাথরুমটা কোন দিকে?

মীরা হেসে ফেলে বলল, তোমার প্রথম কথা আমার কাছে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কথাটা কী?

ফুলের গন্ধে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ফুলগুলোকে অন্য কোথাও রাখা যায় না?

না। আর কিছু বলবে?

ইন্টারেস্টিং আর কিছু তো মনে আসছে না। তুমি বলো, আমি শুনি। বলতে বলতে মনজুর হাই তুলল।

মীরা বলল, তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ। গত দুই রাত এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। আমার ছোট বাসা আত্মীয়স্বজনে গিজগিজ করছে— শোব কী, দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই।

খুব বেশি ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ো। বাসর রাতে যে বকবক করতেই হবে এমন কথা নেই।

মশারি ফেলবে না?

দরজা-জানালায় নেট লাগানো— মশা আসবে না। তা ছাড়া ঘরে ফুল থাকলে মশা আসে না। ফুলের গন্ধ মশারা সহ্য করতে পারে না।

তাই নাকি? জানতাম না তো!

ঘুম পেলে শুয়ে পড়ো।

মনজুর শুয়ে পড়ল। এক ঘুমে রাত কাবার। মনজুরের ধারণা, সবচেয়ে আরামের ঘুম সে ঘুমিয়েছে বাসর রাতে।

কাফে লবঙ্গতে চা খেতে খেতে মনজুর আজ সারা দিনে কী কী করবে ঠিক করে ফেলল। তার ভিজিটিং কার্ডের উল্টো পিঠে এক দুই করে লিখল—

১. অফিস, সকাল দশটা।
২. বড়মামার সঙ্গে কথাবার্তা এবং তার অফিসে দুপুরের খাওয়া।
৩. কালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোস্ট করা।
৪. ইদরিসের সঙ্গে ঝগড়া। [সন্ধ্যায়, তাকে তার বাসায় ধরতে হবে।]
৫. মীরার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা। [রাত দশটার পর।]

এই জাতীয় একটা লিস্ট মনজুর প্রতিদিন ভোরেই করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে— লিস্ট অনুযায়ী কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত করা হয় না। তবু লিস্টটা করলে মনে এক ধরনের শান্তি পাওয়া যায়।

লিস্টের পাঁচ নম্বরে মীরার সঙ্গে কথা বলা। রাত দশটার পরে তাকে সব সময় পাওয়া যায় না। এগারোটার পর হলে মোটামুটি নিশ্চিত যে, পাওয়া যাবে। শীতের রাতে এগারোটার পর টেলিফোন যোগাড় করাই এক সমস্যা। সব দোকানপাট বন্ধ। বাড়িওয়ালার বাসা থেকে করা যায় তবে তার জন্য বাড়ির ভাড়া ক্রিয়ার করা

দরকার। আজ রাতে বাড়িভাড়া নিয়ে যদি যাওয়া যায় তাহলে উঠে আসার সময় হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলা যেতে পারে, ভাই সাহেব, টেলিফোনটা ঠিক আছে?

উনার টেলিফোন অবশ্যি বেশিরভাগ সময়ই খারাপ থাকে। নিজেই খারাপ করে রাখে কিনা কে জানে!

তারচেয়ে এখন চলে গেলে কেমন হয়? মীরাকে ভোরবেলার দিকে সব সময় পাওয়া যায়। মনজুর ভিজিটিং কার্ড বের করে পাঁচ নম্বর আইটেমে টিক চিহ্ন দিল।

মীরা সহজ স্বরে বলল, তুমি এত ভোরে!

মনজুর বলল, ভোর কোথায়। আটটা চল্লিশ বাজে।

কোনো কাজে এসেছ?

ভাবলাম সেপারেশনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করি।

মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস্ মানে? ঠাট্টা করছ নাকি? তোমার কাছে আমি কি কিছু চাচ্ছি? তোমার এমন কোনো রাজত্ব নেই— অর্ধেক আমাকে দিয়ে দেবে।

তা ঠিক, তবু আইনের কিছু ব্যাপারসাপার আছে।

তার জন্য তো গত মাসের সাতাশ তারিখে ভাইয়া সুপ্রিম কোর্টের লইয়ার এম জামানকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলেন। তোমার আসার কথা ছিল, তুমি আস নি।

সেটা আমি এক্সপ্লেইন করেছি। হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে গেল।

কী তোমার অফিস আর কী তার জরুরি কাজ! একটা কথা পরিষ্কার করে বলো তো— সেপারেশনে তোমার কি ইচ্ছা নেই?

আরে কী বলো! ইচ্ছা থাকবে না কেন? দু'জন মিলেই তো ঠিক করলাম। চা খাওয়াতে পারো?

মীরা চা আনতে উঠে গেল। তাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। বিয়ের সময় এতটা সুন্দর ছিল না। আলাদা হবার পর থেকে সুন্দর হতে শুরু করেছে। খানিকটা রোগাও হয়েছে। রোগার জন্যই লম্বা লম্বা লাগছে নাকি? চেহারায় চাপা অগ্নির আভা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মীরা এখন সুখে আছে। সমস্ত চেহারায় স্মার্টবতী মায়াবতী ভাব। নীল শাড়ির জন্যও হতে পারে। ধবধবে সাদা ব্লাউজের সঙ্গে নীল শাড়ি পরলে মেয়েদের মধ্যে একটা আকাশ আকাশ ভাব চলে আসে। শাড়িটা আকাশ, ব্লাউজ হলো পূর্ণিমার চাঁদ। উপমা নিখুঁত হলো না। রাতের আকাশ নীল হয় না। হয় ঘন কৃষ্ণবর্ণ।

নাও, চা নাও। চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেবো?

না।

নাশতা খেয়ে এসেছে?

হঁ।

কোথায় খেলে? তোমার সেই কাফে লবঙ্গ?

হঁ।

এক অক্ষরে জবাব দিচ্ছ কেন? আমরা আলাদা থাকছি বলে কথা বলা যাবে

না— তা তো না। কী কথা ছিল? সেপারেশনের পরে আমাদের যদি পথেঘাটে দেখা হয় তাহলে আমরা সিভিলাইজড মানুষের মতো বিহেভ করব।

তা অবশ্যই করব।

এক ধরনের সাধারণ বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে থাকবে। তুমি চা খাচ্ছ না কেন? চিনি বেশি হয়েছে?

না। চিনি ঠিক আছে।

তোমাকে অসুস্থ অসুস্থ লাগছে। তোমার শরীরে অসুখ অসুখ গন্ধ।

মনজুর কিছু না বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করল। সিগারেটের কড়া ধোঁয়ায় অসুখ অসুখ গন্ধটা যদি তাড়ানো যায়। মীরার দ্রাণশক্তি কুকুরের চেয়েও প্রবল। যখন অসুখ অসুখ গন্ধ বলছে তখন বুঝতে হবে ঠিকই বলছে।

কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? অসুখ নাকি?

আরে না। বিনা পেস্টে দাঁত মেজেছি— গন্ধ যা পাচ্ছ আমার মনে হয় মুখ থেকে পাচ্ছ।

মুখের গন্ধ আমি চিনি। তোমার গা থেকে জ্বর জ্বর গন্ধ আসছে। সিগারেটও মনে হয় প্রচুর খাচ্ছ।

হেভি টেনশনে থাকি। সিগারেটের ধোঁয়ার ওপর দিয়ে টেনশনটা পার করার চেষ্টা করি।

কীসের এত টেনশন?

আছে অনেক। আচ্ছা, তোমাকে একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস করি। ধরো একজন লোকের খুব নিকট কোনো আত্মীয় মারা গেছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। কী বলে সান্ত্বনা দেবে?

কে মারা গেছে?

কে মারা গেছে সেটা জরুরি না। কী কথা বললে সে সান্ত্বনা পাবে সেটা বলো।

কোনো কথাতেই সে সান্ত্বনা পাবে না। তুমি যদি তার গায়ে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকো তাহলে খানিকটা সান্ত্বনা পেতে পারে।

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠল না। বসে রইল। মনজুর বলল, আজ উঠি।

মীরা বলল, তুমি না টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস্ নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলে? এখন চলে যাচ্ছ যে?

আরেকদিন আলাপ করব। অফিসের সময় হয়ে যাবে।

এ মাসের কুড়ি তারিখে কি তুমি আসতে পারবে? কুড়ি তারিখ বুধবার। সন্ধ্যা সাতটার পর। পারবে আসতে?

পারব।

তাহলে ঐ দিন জামান সাহেবকে আসতে বলব।

জামান সাহেবটা কে?

এর মধ্যে ভুলে গেলে? লইয়ার।

ও আচ্ছা আচ্ছা, অবশ্যই আসব। অফিসে গিয়েই ডায়েরিতে লিখে রাখব। এবার আর ভুল হবে না। তবে সেইফ গাইড থাকার জন্য তুমি বুধবার সকালেই একটা টেলিফোন করে দিও। পারবে না? টেলিফোন নাম্বার আছে না?

আছে।

মনজুর বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজার চৌকাঠে একটা ধাক্কা খেল। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার— এ বাড়ির বসার ঘর থেকে বেরুবার সময় প্রতিবার চৌকাঠে ধাক্কা খায়। এর কারণটা কী কে জানে? এই ঘর তাকে পছন্দ করে না, নাকি দরজা তাকে পছন্দ করে না?

এই জগতে জড়বস্তুর কি পছন্দ-অপছন্দ আছে?

রাস্তায় নেমে মনজুরের মনে হলো, আসল জিনিসটাই মীরাকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। কৌটার গায়ে ‘সমুদ্র’ লেখা কেন? আবার কি ফিরে যাবে? না— থাক।

দিলকুশা এলাকায় মনজুরের অফিস। এগারো তলার ছ’টি কামরা। ফ্লোর স্পেস আট হাজার স্কয়ার ফিট। অফিসের নাম থ্রী-পি কনস্ট্রাকশনস্। কোম্পানির মালিক নুরুল আফসার মনজুরের স্কুলজীবনের বন্ধু। স্কুলে নুরুল আফসারের নাম ছিল— মিডা কাঁচামরিচ। ছেলেবেলাতেই লক্ষ করা গেছে নুরুল আফসার চট করে রেগে যায়, তবে রেগে গেলেও অতি মিষ্টি ব্যবহার করে। মিডা কাঁচামরিচ নামকরণের এই হলো রহস্য।

ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর মনজুর ভর্তি হলো জগন্নাথ কলেজে। নুরুল আফসার চলে গেল আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ক্রিয়েটিভ লিটারেচার পড়তে। সায়েন্স পড়তে তার নাকি আর ভালো লাগছে না। ক্রিয়েটিভ লিটারেচারের ক্লাসগুলো তার খুবই পছন্দ হলো। প্রথম সেমিস্টারে খুব খেটেখুটে সে একটা অ্যাসাইনমেন্টও জমা দিল। অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে তিন হাজার শব্দে সেন্ট জোসেফ সেমিটিয়ারির একটি বর্ণনা দিতে হবে।

অ্যাসাইনমেন্ট দেয়ার দিন পাঁচেক পর কোর্স কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ক্লার্ক ব্রেইস তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার রচনা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। It is interesting.

তোমার পছন্দ হয়েছে?

ইন এ ওয়ে হয়েছে। তুমি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছ। মোট ক’টি কবির আছে লিখেছ। কে কবে মারা গেছে তার ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করেছ। কবরখানা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কত তা দিয়েছ— যাকে বলা যায় পারফেক্ট ফটোগ্রাফিক ডেসক্রিপশন।

থ্যাং ইউ।

কিন্তু সমস্যা কি জানো— এই রচনা প্রমাণ করেছে তোমার কোনো ক্রিয়েটিভিটি নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দেব তুমি কিছু পড়তে। যেমন ধর ইঞ্জিনিয়ারিং।

তোমার ধারণা ইঞ্জিনিয়ারদের ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন নেই?

অবশ্যই আছে। তাদের যতটুকু ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন তোমার তা আছে।

নুরুল আফসার ছ’বছর আমেরিকায় কাটিয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি, আমেরিকান স্ত্রী পলিন এবং দুই যমজ কন্যা পেত্রিসিয়া ও পেরিনিয়াকে নিয়ে দেশে ফিরল। চাকরির চেষ্টা করল বেশ কিছুদিন— লাভ হলো না। শেষ চেষ্টা হিসেবে খুলল কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। স্ত্রী এবং দুই কন্যার আদ্যক্ষর নিয়ে কোম্পানির নাম হলো Three P.

মনজুর জনালগ্ন থেকেই এই কোম্পানির সঙ্গে আছে। নুরুল আফসার শুরুতে পেটের দিতে পারবে না— পেটেভাতে থাকবি, রাজি থাকলে আয়। যদি কোম্পানি দাঁড়িয়ে যায় তুই তোর শেয়ার পাবি। আমি তোকে ঠকাব না। বিশ্বাস কর, ঠকাব না।

কোম্পানি বড় হয়েছে। ফুলে-ফেঁপে একাকার। গত বছর দু'কোটি টাকার ব্যবসা করেছে, এ-বছর আরও করবে। অফিস শুরু হয়েছিল তিনজনকে নিয়ে, আজ সেখানে এক শ' এগারোজন কর্মচারী। মনজুরের হাতে নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব নেই। চিঠিপত্রের যোগাযোগের ব্যাপারটা সে দেখে। পি.আর.ও. বলা যেতে পারে। প্রতিমাসে তার এ্যাকাউন্টে আট হাজার টাকা জমা হয়। তার চাকরির শর্ত কী, দায়িত্ব কী— এই নিয়ে নুরুল আফসারের সঙ্গে তার কখনও কথা হয় না।

অফিসঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে মনজুরের ঘর। কামরাটা ছোট তবে মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দেয়ালে পালতোলা নৌকার একটি পেইন্টিং আছে। ঘরের এক প্রান্তে ডিভানের মতো আছে। ডিভানের পাশেই বুক শেলফে বেশ কিছু বাংলা বই, যার বেশিরভাগই কবিতা। তার কোনো কাব্যপ্রীতি নেই। কবিতার বইগুলো মীরা কিনে দিয়েছে। ডিভানে শুয়ে শুয়ে আজকাল সে মাঝে মাঝে বইগুলোর পাতা উল্টায় এবং জুঁকাকে ভাবে— লোকজন কি সত্যি আগ্রহ করে কবিতা পড়ে? যদি পড়ে তাহলে কেন পড়ে?

মনজুরের ঘরে গত পনেরো দিন ধরে বসছে জাহানারা। জাহানারা টাইপিস্ট হিসেবে তিনমাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে। বসার কোনো জায়গা নেই। একেক সময় একেক জায়গায় বসছে। বড় সাহেব নুরুল আফসারের পাশেই হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দিয়ে নতুন ঘর তার জন্য তৈরি হবার কথা। যতদিন হচ্ছে না, ততদিন জাহানারা মনজুরের ঘরে বসবে এই ঠিক হয়েছে। ব্যবস্থাটা মনজুরের পছন্দ হয় নি। একটি অল্পবয়স্ক কুমারী মেয়ে ঘরে থাকলে এক ধরনের অস্বস্তি লেগেই থাকে। সহজ হওয়া যায় না। ডিভানে গা এলিয়ে কবিতার বইয়ের পাতা উল্টানোও সম্ভব না। তার চেয়েও বড় কথা মেয়েটা সিগারেটের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। মুখে কিছুই বলে না, তবে মনজুর লক্ষ করেছে সিগারেট ধরালেই জাহানারা অস্বস্তিবোধ করতে থাকে।

মনজুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কী খবর জাহানারা?

জি স্যার, খবর ভালো।

মুখ এত গম্ভীর কেন?

জাহানারা হাসল। সে এখনও দাঁড়িয়ে। বসতে না বসতে পর্যন্ত সে বসবে না।

বসো, দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার ঘর আজ তৈরি হয়ে যাবার কথা না?

ঘর তৈরি হয়েছে স্যার।

তাহলে আর এখানে কেন, নতুন ঘরে যাও। গৃহপ্রবেশ হয়ে যাক।

আপনাকে বলে তারপর যাব, এজন্য বসে আছি।

ভেরি গুড। বড় সাহেব কি এসেছেন নাকি?

জি-না স্যার। উনি আজ আসবেন না। চিটাগাং যাবেন।

জাহানারা হ্যান্ডব্যাগ খুলে মুখবন্ধ খাম বের করল। নিচু গলায় বলল, স্যার, আপনার টাকাটা। বলতে বলতে জাহানারার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। মনজুর

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল— মেয়েটা অতিরিক্ত রকমের লাজুক। এই ধরনের মেয়েদের কপালে দুঃখ আছে। এরা নিজেরা সমস্যা তৈরি করে এবং অন্যের তৈরি সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে।

টাকা ফেরত দেয়ার ব্যাপারটি এত দ্রুত করার দরকার ছিল না। নিশ্চয়ই নানান ঝামেলা করে তাকে টাকা যোগাড় করতে হয়েছে। মনজুর বলল, তোমার এত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই, তুমি আরও পরে দিও। আর পুরো টাকাটা একসঙ্গে দেবারও দরকার নেই। তুমি মাসে মাসে কিছু-কিছু করে দিও।

জি আচ্ছা স্যার।

আর শোনো, মাঝে মাঝে আমাদের সবাইকেই টাকাপয়সা ধার করতে হয়। এত লজ্জা পাওয়ার তো এর মধ্যে কিছু নেই। আমাদের যে বড় সাহেব, তিনিও ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ধার নিয়েছেন।

জাহানারা হেসে ফেলল।

মনজুর বলল, তুমি একটা কাজ করতে পারবে?

অবশ্যই পারব। কী কাজ স্যার?

আমি এই মাসের বেতন তুলি নি। একটা চেক দিচ্ছি, ক্যাশিয়ার সাহেবকে বলো ভাঙিয়ে দিতে।

জি আচ্ছা স্যার।

আর বরুণ বাবুকে বলো, আমাদের অফিসের একজন পিয়ন আছে— আব্দুল কুদ্দুস নাম, জেনারেল ফাইল দেখে তার ঠিকানা বের করতে। ও আজ সকালে কিছু টাকার জন্য এসেছিল। দিতে পারি নি। ওর একটা বোন মারা গেছে।

জাহানারা চলে গেল।

মনজুরের টেবিলে কোনো ফাইল নেই। অর্থাৎ করার কিছুই নেই। মনজুর দু'মাস ধরেই লক্ষ করছে, তার টেবিলে কোনো ফাইল আসছে না। বড় সাহেব কি তার টেবিলে ফাইল না পাঠানোর কোনো নির্দেশ দিয়েছেন? এমন না যে অফিসে কোনো কাজকর্ম নেই। বরং উল্টো। কাজকর্মের চাপ অনেক বেশি। শুধু তার টেবিলেই কিছু নেই। এটা নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার, কিন্তু নিজ থেকে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। শরীরে এক ধরনের আলস্য এসে গেছে। আগ বাড়িয়ে কিছু করতে ইচ্ছা করে না। যা হবার হবে— এ-রকম একটা ভাব চলে এসেছে এবং তা এসেছে খুব সম্ভব মীরার কারণে। মীরা চলে গেলে হয়তোবা এ ধরনের আলস্য আসত না।

মনজুর মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ডটা বের করল। আজ দিনে করণীয় কাজের পাঁচটির মধ্যে দুটি করা হয়ে গেছে। অবশিষ্ট এর মধ্যে আরেকটি যুক্ত হয়েছে— কুদ্দুসকে টাকা দেয়া। কাউকে দিয়ে টাকটা পাঠাতে হবে; নাকি নিজেই চলে যাবে? কুদ্দুসের গায়ে হাত রেখে কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসবে? সন্ধ্যার পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আপাতত তিন নম্বর আইটেমটির ব্যবস্থা করা যাক। তিন নম্বর আইটেম হচ্ছে— খালাকে চিঠি লেখা এবং নিজ হাতে পোস্ট করা (যেহেতু আগের দুটি চিঠি পান নি)। মনজুর কাগজ-কলম নিয়ে বসল। একটা দীর্ঘ চিঠি লেখার পরিকল্পনা নিয়ে বস। হবে অবশ্য উল্টোটা— ছোট চিঠি লেখা হবে। কয়েক লাইন লেখার পরই মনে হবে— আর কিছু লেখার নেই।

শ্রদ্ধেয়া খালা

আমার সালাম জানবেন। আমি নিয়মিত আপনার চিঠি পাচ্ছি।
মনে হয় আপনি আমার চিঠি পাচ্ছেন না।

আমি ভালোই আছি বলা চলে। তবে যে কিডনিটি এখনও
অবশিষ্ট আছে তাতে বোধহয় কিছু সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার
মনগড়াও হতে পারে। যেহেতু একটিমাত্র কিডনি অবশিষ্ট সেহেতু
কিছু হলেই মনে হয় কিডনি বুঝি গেল। আপনি শুধু শুধু চিন্তা
করবেন না। আপনার আবার অকারণ চিন্তা করার অভ্যাস।
খালুজানকে আমার সালাম দিবেন।

ইতি

আপনার মনজু

চিঠি ছোট হবে আগেই বোঝা গিয়েছিল, এতটা ছোট হবে তা বোঝা যায় নি।
পুরো পাতাটা খালি খালি লাগছে। পুনশ্চ দিয়ে আরও কয়েকটা লাইন না ঢুকালেই
না। কী লেখা যায় সেটাই সমস্যা।

পুনশ্চ : ঢাকায় এবার অসম্ভব শীত পড়েছে। আপনাদের
এদিকে শীত কেমন? নীতু কেমন আছে? তার পরীক্ষা কেমন
হচ্ছে?

নীতুকে একটা আলাদা চিঠি দেয়া উচিত ছিল। বেচারী প্রতিসপ্তাহে একটা চিঠি
দেয়— কখনও সেসব চিঠির জবাব দেয়া হয় না। তাতে নীতুর উৎসাহে ভাটা পড়ে
না। শিশুদের মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে। তারা প্রতিদান আশা করে কিছু করে
না। কখনও না। বড়রাই সব সময় প্রতিদান চায়।

মনজুরের ঘরে টেলিফোন বাজছে। এই টেলিফোন সেটে কোনো গণ্ডগোল
আছে। তীক্ষ্ণ শব্দ হয়। মাথা ধরে যায়।

হ্যালো।

মনজুর কেমন আছিস তুই?

মনজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বড় সাহেবের গলা। একই সঙ্গে তার ছেলেবেলার
বন্ধু এবং বস। টেলিফোনে নুরুল আফসারের গলা— ইমরুল নামের ঐ ছেলেটির
গলার মতোই লাগছে। কেমন যেন অভিমান মেশা।

কী-রে কথা বলছিস না কেন? কেমন আছিস?

ভালো।

তোর বাসার টেলিফোন নষ্ট নাকি? কয়েক বার টেলিফোন করেছিলাম, ভোঁ-ভোঁ
শব্দ হয়।

টেলিফোনটা ডেড হয়ে আছে।

ঠিক করা। চারপাশে মৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে বাস করার কোনো মানে হয়? মানুষ
মরে গেলে কিছু করা যায় না— যন্ত্রপাতি মরে গেলে তাদের বাঁচানো যায়।

এই কথা বলার জন্যই টেলিফোন করেছিস, না আরও কিছু বলবি?

হ্যাঁ বলব। মীরা নাকি তোকে ছেড়ে চলে গেছে?

হুঁ।

ব্যাপারটা ঘটল কবে?
এই ধর দিন বিশেক।
আমি তো কিছুই জানতাম না। আজ জালাল সাহেব আমাকে বললেন। মীরার
বড় ভাই। চিনতে পারছিস?

হ্যাঁ পারছি।

তাকে খুব খুশি দেখলাম। তাঁর সঙ্গে তোর কোনো গুণগোল ছিল নাকি?

না।

এত চমৎকার একটা মেয়ে ধরে রাখতে পারলি না? তুই তো বিরাট গাধা।

মীরাও আমাকে ধরে রাখতে পারল না। তাকেও কি মহিলা গাধা বলা যায় না?

তোর সঙ্গে পরে কথা বলব। গাড়ি হর্ন দিচ্ছে।

নুরুল আফসার লাইন কেটে দিলেন।

মীরার সঙ্গে মনজুরের পরিচয় নুরুল আফসারের মাধ্যমে। মীরার বাবা
মনসুরউদ্দিন, নুরুল আফসারের আপন ফুপা। সেই মনসুর উদ্দিনের কাছে মনজুর
একটা চিঠি নিয়ে গিয়েছিল।

ক্ষমতাবান মানুষরা সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাতপ্রার্থীকে সাক্ষাত দেন না। তিনি বলে
পাঠালেন— অপেক্ষা করতে। সে ঘণ্টাখানেক বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে বসে
রইল। তারপর বিরক্ত হয়ে বাড়ির সামনের বাগানে হাঁটতে লাগল। মনসুরউদ্দিন
সাহেব এই সময় বের হয়ে এলেন এবং কঠিন গলায় বললেন— এই যে ছেলে, তুমি
কী মনে করে আমার ফ্লাওয়ার বেডের উপর হাঁটছ? ক’টা গাছ তুমি নষ্ট করেছ
জানো? ফ্লাওয়ার বেড কাকে বলে সেটা জানো? তুমি কোথাকার মূর্খ?

মনজুর পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল। এ কী সমস্যা!

কথা বলছ না কেন? তুমি কোথাকার মূর্খ সেটা জানতে চাই। Speak out loud.

মীরা হইচই শুনে ঘর থেকে বের হয়ে হাসিমুখে মনজুরকে বলল, আপনি
কাইডলি আমার সঙ্গে আসুন তো। প্লিজ আসুন। প্লিজ।

মীরা তাকে বারান্দার এক কোনায় নিয়ে নিচু গলায় বলল, বাবার ব্যবহারে আমি
খুবই দুঃখিত, খুবই লজ্জিত। বাবার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। বাবাকে প্রথম দেখছেন
বলে এ-রকম মনে হচ্ছে। আপনাকে বাবা যেভাবে ধমক দিচ্ছেন ফুলের
গাছগুলোকেও তিনি ঠিক সেইভাবে ধমক দেন। মাঝে মাঝে কিছু-কিছু গাছকে
মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আশা করি বাবার মানসিকতা কিছুটা বুঝতে পারছেন। আপনি
এখানে চুপ করে বসুন। আমি চা নিয়ে আসি। বাবা যদি কিছু বলেন— কোনো
উত্তর দেবেন না। তবে আমার মনে হয় না তিনি কিছু বলবেন। একবার রেগে যাবার
পর ঘণ্টা দুয়েক তিনি খুব ভালো থাকেন।

মীরার কথা দেখা গেল সত্যি। কিছুক্ষণ পরে মনসুর উদ্দিন বারান্দায় উঠে
এলেন এবং কোমল গলায় মনজুরকে বললেন— আপনাকে তো চিনতে পারলাম না!
আপনার পরিচয়? আপনাকে কি চা-নাশতা কিছু দেয়া হয়েছে?

কুদ্দুসের বাসা যাত্রাবাড়িতে।

হাফ বিল্ডিং। পাকা মেঝে, উপরে টিন। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার
আড়াল থেকে কলাগাছের নধর পাতা উঁকি দিচ্ছে।

মনজুর খানিকটা বিস্ময় নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। এটা কুদ্দুসের বাড়ি তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশ শ্রীমন্ত চেহারা। বাড়ির ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না। সর্ব্ব কেমন ঝিম মেরে আছে। তাই অবশিষ্ট থাকার কথা। মৃত্যুর প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে সবাই বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য চুপ করে যায়। আবার কান্নাকাটি শুরু হয় দিন দু'এক পর।

মনজুর কড়া নাড়তেই বুড়ো মতো এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। এই প্রচণ্ড শীতেও তাঁর গায়ে পাতলা জামা। তবে গলায় মাফলার আছে। পায়ে মোজা। চোখে চশমা। শিক্ষক শিক্ষক চেহারা।

এটা কুদ্দুসের বাসা?

জি।

কুদ্দুস আছে বাসায়?

না।

আমি কুদ্দুসের জন্য কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম।

আমার কাছে দিতে পারেন। আমি তার পিতা। কত টাকা?

আট শ' টাকা। কবর দিতে মোট কত খরচ হয়েছে?

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে বললেন, কীসের কবর?

মনজুর হকচকিয়ে গেল।

সাবিহা নামের একটা মেয়ে মারা গেছে না এই বাড়িতে?

সাবিহা আমার ছোট মেয়ের নাম। সে মারা গেছে দশ বছর আগে। আপনি কে?

আমি তেমন কেউ না। নাম বললে চিনবেন না।

টাকাটা আমার কাছে দিয়ে যান। আমি দিয়ে দিব।

কুদ্দুসকেই দিতে চাই। আমি অন্য একসময় আসব।

আমার কাছে দিতে না চাইলে অপেক্ষা করেন। কুদ্দুস দশটার মধ্যে আসে। চা খান। চায়ের অভ্যাস আছে?

আরেক দিন এসে চা খেয়ে যাব।

মনজুর রাস্তায় নেমে এলো। তাড়াতাড়ি কোনো একটা রিকশায় উঠে ছুট তুলে দিতে হবে। এখন কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। জাঁকিটে শীত পড়েছে। অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগছে। বুকে ঠাণ্ডা বসে না গেলে হয়।



ঘুমাবার আগে আয়নায় নিজেকে দেখার যে বাসনা সব তরুণীর মনেই থাকে সে বাসনা মীরার ভেতর অনুপস্থিত। ওই কাজটি সে কখনও করে না। চুল বাঁধে হাঁটতে হাঁটতে। সেই সময় সে গুনগুন করে গানও গায়। সে কখনও গান শেখে নি, তবে দু'একটা সহজ সুর ভালোই তুলতে পারে।

আজ সে আয়নার সামনে বসে আছে।

বিশাল আয়না। এক ইঞ্চি পুরো বেলজিয়াম গ্লাস। সামনে দাঁড়ালে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। মনসুরউদ্দিন, মেয়ের ষোলো নম্বর জন্মদিনে এই আয়না তাকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন— রোজ একবার আয়নার সামনে দাঁড়াবি এবং নিজের সঙ্গে কথা বলবি।

মীরা বিস্মিত হয়ে বলেছিল— কী কথা বলব?

নিজেকে প্রশ্ন করবি।

নিজেকে প্রশ্ন করার জন্য আয়না লাগবে কেন?

তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— তোর সঙ্গে কথা বলাই এক যন্ত্রণা। তুই আমার সামনে থেকে যা।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, জন্মদিনে তুমি আমাকে ধমক দিয়ে কথা বলছ। এটা কি বাবা ঠিক হচ্ছে? এখনও সময় আছে। ধমক ফিরিয়ে নাও।

ধমক ফিরিয়ে নেব কীভাবে?

মুখে বলো ধমক ফিরিয়ে নিলাম— তাহলেই হলো।

তাকে তাই করতে হলো।

মীরা তার জন্মদিনের উপহার এই বিশাল আয়নার সামনে অনেকবার দাঁড়িয়েছে কিন্তু কখনও নিজেকে প্রশ্ন করে নি। আয়নার ছবিকে প্রশ্ন করার পুরো ব্যাপারটা তার কাছে সব সময়ই হাস্যকর মনে হয়েছে। আজ অবশ্য সে একটা প্রশ্ন করল। নিজের ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মীরা দেবী, আপনি কেমন আছেন?

আয়নার মীরা দেবী সেই প্রশ্নের উত্তরে হেসে ফেলে বলল, ভালোই।

ভালোর পর 'ই' কার লাগাচ্ছেন কেন? তার মানে কি এই যে, আপনি বিশেষ ভালো নেই।

আচ্ছা 'ই' তুলে দিলাম। আমি ভালো আছি।

খুব ভালো?

হ্যাঁ খুব ভালো।

খুব ভালো থাকলে গান গাচ্ছেন না কেন? আপনার মন খুব ভালো থাকলে আপনি উল্টাপাল্টা সুরে গান গেয়ে থাকেন। দেখি এখন একটা গান গেয়ে।

মীরা গুনগুন করে গাইল—

চরণ ধরিতে দিয়ে গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরিয়ে

জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়িয়ে

গান দু'লাইনের বেশি এগুলো না। কাজের মধ্যে এসে বলল, বড় সাব আপনেনে যাইতে বলছে। মীরা গান বন্ধ করে ছোট্ট শিথাস ফেলল। কয়েক দিন থেকেই এই ভয় সে করছিল। না জানি কখন বাবা তাকে ডেকে পাঠান। সে চব্বিশ দিন ধরে এই বাড়িতে আছে। এই চব্বিশ দিনে বাবার সঙ্গে তেমন কোনো কথা হয় নি। মনে হচ্ছে আজ হবে। বাবার মাথা এখন ঠিক আছে। লজিক পরিষ্কার। তবে শুধু একদিকের লজিক। এক-চক্ষু হরিণের মতো। সমস্যাটা এইখানে।

বাবা, ডেকেছ?

মনসুরউদ্দিন সাহেবের ঘরের বাতি নেভানো। জিরো পাওয়ারের নীল একটা বাল্ব জ্বলছে। সে আলোয় তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তিনি মশারির ভিতর কম্বল

গায়ে দিয়েবসে আছেন। তিনি খাটের পাশে রাখা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, মীরা বোস।

মীরা বসতে বসতে বলল, রাত এগারোটা বাজে। তোমার তো দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, এখনও জেগে আছ যে! ডাক্তার শুনলে খুব রাগ করবে।

শুয়ে ছিলাম। ঘুম আসছিল না।

ঘুমের ওষুধ খেয়েছ?

হঁ।

এখন কতটুকু করে খাও? ফ্রিজিয়াম ফাইভ মিলিগ্রাম না দশ মিলিগ্রাম?

দশ।

মীরা আর কী বলবে ভেবে পেল না। সে নিজের ভেতর চাপা উদ্বেগ অনুভব করছে। মনসুরউদ্দিন বললেন— মীরা, তুই কি আমাকে কিছু বলতে চাস?

না।

বলতে চাইলে আমি শুনতে রাজি আছি। ভালো না লাগলেও শুনব।

আমার কিছু বলার নেই বাবা। তুমি ঘুমাও।

বাইরের কিছু কথাবার্তা আমার কানে আসছে— শুনলাম মনজুরকে ছেড়ে তুই চলে এসেছিস। সত্যি না মিথ্যা?

সত্যি।

কারণ কী?

ওকে আমার আর পছন্দ হচ্ছিল না।

পছন্দ না হবারই কথা— গোড়াতেই তো বোঝা উচিত ছিল।

তখন বুঝতে পারি নি।

অপছন্দটা হচ্ছে কেন?

অনেক কারণেই হচ্ছে। স্পেসিফিকেসি বন্ডার মতো কিছু না। ছোটখাটো ব্যাপার।

ছোটখাটো ব্যাপারগুলোই আমি শুনতে চাই...।

মীরা চুপ করে রইল। সব কথা কি বাবার কাছে বলা যায়? বাবা কেন এই সাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না?

তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, কথা বলছিস না কেন? কী করে সে— হাঁ করে ঘুমায়? নাক ডাকে? শব্দ করে চা খায়? সবার সামনে ফোঁৎ করে শাক ঝাড়ে?

মীরা হেসে ফেলল।

মনসুরউদ্দিন কড়া গলায় বললেন, হাসির কোনো ব্যাপার না। তুই পছন্দ করে আগ্রহ করে সবার মতামত অগ্রাহ্য করে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছিস, এখন তাকে ছেড়ে চলে এসেছিস— কী কারণে চলে এসেছিস তাও বলতে পারছিস না। অপছন্দ? কেন অপছন্দ?

মনের মিল হচ্ছে না বাবা।

মনের মিলের সময় কি শেষ হয়ে গেছে? একটা মানুষকে বুঝতে সময় লাগে না? সেই সময় তুই দিয়েছিস?

হ্যাঁ দিয়েছি। তিন বছর অনেক সময়। বাবা শোনো, সবকিছু তো আমি তোমার

সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। এটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, আমার দিক থেকে চেষ্টার ক্রটি করি নি। তার সঙ্গে থাকতে হলে আমাকে প্রচণ্ড মানসিক কষ্টে থাকতে হবে। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। সে ভালোবাসতে জানে না। সে খানিকটা রোবটের মতো।

আর তুই ভালোবাসার সমুদ্র নিয়ে বসে আছিস?

এমন করে কথা বলছ কেন বাবা?

কী অদ্ভুত কথা— ভালোবাসতে জানে না! দিনের মধ্যে সে যদি এক শ'বার বলে, 'ভালোবাসি' 'ভালোবাসি' তাহলে ভালোবাসা হয়ে গেল? আমি তোর মার সঙ্গে বাইশ বছর কাটিয়েছি। এই বাইশ বছরে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' জাতীয় ন্যাকামি কথা বলেছি বলে তো মনে হয় না।

মুখে না বললেও মনে-মনে বলেছ। লক্ষ্যবার বলেছ। মনজুরের মুখে এই কথা নেই, মনেও নেই।

তুই মনের কথাও বুঝে ফেললি? তুই এখন তাহলে মন বিশারদ?

মনের কথা খুব সহজেই বোঝা যায় বাবা। যে মানুষটা আমাকে ভালোবাসে না, ভালোবাসার ক্ষমতাই যার নেই তার সঙ্গে দিনের পর দিন আমি কাটাতে কী করে?

ভালোবাসার ক্ষমতাই তার নেই?

না। এই যে আমি তাকে ছেড়ে চলে এসেছি— তাতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না বা মন খারাপ হচ্ছে না। সে বেশ খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, অফিস করছে। আমি যদি এখন ফিরেও যাই— তার জীবনযাপন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হবে না। সে খুশিও হবে না, অখুশিও হবে না।

মনসুরউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন; তুই ফিরে যাবি না— এ-রকম কোনো মতলব করেছিস নাকি?

হ্যাঁ করছি।

তুই আমার সামনে থেকে যা। ভোরবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। তোকে দেখলেই আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাবে। সেটা হতে দেয়া উচিত হবে না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি এখন চলে যাস। ড্রাইভার তোকে জালালের বাসায় দিয়ে আসুক। ভাইয়ের সঙ্গে থাক— আমার সঙ্গে না। যাদের দেখলে আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায় তাদের আমি আমার আশপাশে দেখতে চাই না।

তুমি অকারণে এতটা রাগছ।

মনসুরউদ্দিন ঘর কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিলেন, গেট আউট গেট আউট।

মীরা বের হয়ে এলো। রাতে কোথাও গেল না। ভোরবেলা জালালউদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হলো। এই বাড়িতে একটি ঘর সমস্ত সময় তার জন্য আছে। ঘরের নাম 'মীরা মহল'।

মীরা তার ভাই এবং ভাবির খুব ভক্ত। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। মীরা অনেকটাই তাঁদের সন্তানের মতো।

সুটকেস হাতে গাড়ি থেকে নেমেই ভাবির সঙ্গে দেখা হলো। মীরা বলল, কেমন আছ ভাবি? আমি মীরা মহলে কিছুদিন থাকতে এসেছি। মীরা মহলের চাবি তোমার কাছে, না ভাইয়ার কাছে?



খবরের কাগজে লিখেছে ‘শৈত্যপ্রবাহ’।

‘শৈত্যপ্রবাহ’ মানে যে ঠাণ্ডা কে জানত?

মীরা ফুলহাতা স্যুয়েটার পরেছে। স্যুয়েটারের উপর গরম শাল— তবু শীত যাচ্ছে না। আজ বারান্দায় রোদও আসে নি। আকাশ শ্রাবণ মাসের মেঘলা আকাশের মতো। সবকিছু যেন ঝিম ধরে আছে।

মীরার বড় ভাই জালালউদ্দিন বারান্দায় মোড়ার উপর বসে আছেন। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ। এই বয়সেই চুলটুল পাকিয়ে বুড়ো হয়ে গেছেন। বুড়োদের মতো অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে বাতে কষ্ট পান। এসব দিনে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা করতে থাকে। আজ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা কোনোটাই না, তবু তাঁর পিঠে ব্যথা উঠেছে। ব্যথার কারণে বাইরে বের হন নি। ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়েছে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ার কথা। পঁচিশ মিনিট পার হয়েছে— ডাক্তার এখনও আসে নি।

জালালউদ্দিনের পায়ের কাছে কম্বল ভাঁজ করে বিছানো। তিনি প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর কম্বলে এসে চিৎ হয়ে শুচ্ছেন। তাতে ব্যথার কোনো হেরফের হচ্ছে না। তাঁর মেজাজ অসম্ভব খারাপ। যাকেই দেখছেন তাকেই ধমক দিচ্ছেন। মীরা এর মধ্যে দু’বার ধমক খেয়েছে। তৃতীয়বার ধমক খাওয়ার জন্যও প্রস্তুত হয়ে আছে। ভাইয়ার কাছে বকা খেতে তার তেমন খারাপ লাগে না।

মীরা শোন তো— হট ওয়াটার ব্যাগে পানি ভরে দিতে বলেছি চল্লিশ মিনিট আগে। পানি গরম করতে চল্লিশ মিনিট লাগে?

মীরা সহজ গলায় বলল, পানি গরম হয়ে গেছে। হট ওয়াটার ব্যাগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ড্রাইভার গেছে আরেকটা কিনে আনতে।

এখন একটা কিনতে গেছে? আগেরটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? এই বাড়ির সব ক’টা মানুষ ইডিয়ট নাকি?

শুধু শুধু চিল্লাচিল্লি করছ কেন?

দরকারের সময় একটা জিনিস খুঁজে পাওয়া যায় না— তাহলে বাড়িতে এতগুলো মানুষ থাকার প্রয়োজন কী?

চুপ করে শুয়ে থাকো তো ভাইয়া। আমি বলছি পিঠে হাত বুলিয়ে দিই।

খবরদার— পিঠে হাত দিবি না। অসহ্য ব্যথা।

কাত হয়ে শুয়ে দেখ তো আরাম হয় কিনা।

তোর উপদেশ দেবার দরকার নেই। তুই ডাক্তার না।

মীরাকে এই কথা বললেও তিনি কাত হয়ে শুলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা কমে গেল।

ভাইয়া ব্যথা কমেছে?

একটু কম লাগছে।

তাহলে এইভাবে শুয়ে থাক।

কাত হয়ে কতক্ষণ শুয়ে থাকব? তুই এমন পাগলের মতো কথা বলিস কেন?

ব্যথা তো কমেছে, তবু এমন চোঁচামেচি করছ কেন? চা খাবে, চা দিতে বলব?

কাত হয়ে চা খাব?

মীরা হেসে ফেলল। মীরার হাসি দেখে জালালউদ্দিন নিজেও হেসে ফেললেন।
যদিও খুব ভালো করে জানেন এখন হাসাটা ঠিক হচ্ছে না। রাগ ভাবটা ধরে রাখা
উচিত।

মীরাকে কিছু কঠিন কথা বলা প্রয়োজন। সমস্যা হলো পিঠের ব্যথা কমার সঙ্গে
সঙ্গে রাগটাও দ্রুত কমে যাচ্ছে।

মীরা।

বলো কী বলবে।

তোর ভাবি বলছিল তুই নাকি আলাদা বাসা ভাড়া করার কথা চিন্তা করছিস?

ঠিকই বলেছে। ভাবির স্মৃতিশক্তি খুবই ভালো। সে পুরো কনভারসেশন, দাঁড়ি-
কমাসহ রিপ্ৰডিউস করতে পারে। তুমি যা শুনেছ ঠিকই শুনেছ।

এখানে অসুবিধাটা কী?

কোনো অসুবিধা নেই। তোমার এখানে আমি মহা সুখে আছি। এক হাজার করে
টাকা হাতখরচও পাচ্ছি।

এই এক হাজার টাকা দিয়ে তুই বাসা ভাড়া করে থাকবি?

আমার নিজের কাছে কিছু টাকা আছে। চার/পাঁচ মাস ঐ টাকায় চালাব,
এরমধ্যে চাকরি-বাকরি কিছু-একটা যোগাড় করে নেব।

চাকরি নিয়ে সবাই তোর জন্য বসে আছে?

ভাইয়া শোনো, ইংরেজি সহিতো এম.এ. ডিগ্রি আমার আছে। অনেকের সঙ্গে
চেনা-জানা আছে। আমার পক্ষে একটা চাকরি যোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না।
তুমি নিজেও এটা ভালো জানো। তা ছাড়া একজন রূপবতী ডিভোর্সিকে সাহায্য
করার জন্য সবাই খুব উৎসাহ বোধ করে।

জালালউদ্দিন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মেয়েটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?
নিজের বড় ভাইয়ের সঙ্গে এটা কী ধরনের কথাবার্তা? পিঠের ব্যথা চলেই
গিয়েছিল— উল্টাপাল্টা কথার কারণেই বোধহয় ফিরে আসছে।

তুই নিজেকে বেশি চালাক মনে করিস?

মীরা সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ করি। এতে কোনো দোষ নেই। বোকারা
নিজেদের চালাক মনে করলে দোষ। বুদ্ধিমানরা মনে করলে দোষ নেই।

বুদ্ধির দোকান খুলে বসেছিস মনে হয়।

রেগে যাচ্ছ কেন? আবার ব্যথা শুরু হয়েছে? এখন চিং হয়ে শুয়ে দেখো। এখন
চিং হয়ে ঘুমালে হয়তো ব্যথা করবে না।

জালালউদ্দিন নিজের অজান্তেই চিং হয়ে গেলেন। না, ব্যথা লাগছে না। তাঁর
গলার স্বর থেকে রাগ ভাবটা এই কারণেই অনেকখানি কমে গেল। তবু কঠিন গলায়
কথা বলার চেষ্টা করলেন, তোর কি ধারণা, ফড়ফড় করে কথা বলা বুদ্ধিমানের
লক্ষণ?

।, এটা বোকার লক্ষণ। বোকারাই ফড়ফড় করে কথা বলে। বুদ্ধিমান
দর লক্ষ করলে দেখবে এরা কিছুক্ষণ কথা বলার পর চুপ করে অপেক্ষা করে।
কথা বলে। তারপর আবার অপেক্ষা। এই অপেক্ষার সময়টায় তারা চিন্তা
করে। অতি দ্রুত চিন্তা করে।

আমার সম্পর্কে তোর কী ধারণা? আমি বোকা, না বুদ্ধিমান?

তুমি বোকাও না, বুদ্ধিমানও না— মাঝামাঝি।

তোর নিজের ক্ষুরধার বুদ্ধি?

হঁ।

এই বুদ্ধির জন্য তোর জীবনটা কোথায় এসে থেমেছে এটা দেখেছিস? হাতের
কাছে এতগুলো ছেলে থাকতে বিয়ে করলি একটা অগা-বগাকে।

তা করেছি। তবে সে অগা-বগা কিন্তু না। তাকে আমার পছন্দ হয় নি।
অবিষ্মতেও যে হবে না এটা বুঝতে পেরেছি এবং খুব সম্মানজনকভাবে আলাদা
হবার ব্যবস্থা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না।

তুই আমার সামনে থেকে যা।

যাচ্ছি।

যাবার আগে একটা টেলিফোন করে দেখ— ডাক্তারের কী হয়েছে?

ভাইয়া, আমার মনে হয় তুমি যদি একটা হট শাওয়ার নাও তাহলে আরাম
হবে।

হট শাওয়ারের চিকিৎসা ডাক্তারের কাছে শুনে তারপর করতে চাই। তোর
ডাক্তারি তুই তোর নিজের জন্য রেখে দে।

ডাক্তারকে টেলিফোন করার দরকার পড়ল না। গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

মীরা মনজুরের অফিসে টেলিফোন করল। আজ মঙ্গলবার। বুধবারের কথা মনে
করিয়ে দেয়া দরকার।

‘হ্যালো’ বলতেই মনজুরের গলা শোনা গেল। মনজুর ভারি গলায় বলল, কে
বলছেন?

আমি, আমি মীরা।

ও আচ্ছা মীরা। কেমন আছ?

ভালো আছি। আমি হ্যালো বললাম তারপরেও আমাকে চিনতে পারলে না।

চিনব না কেন, চিনেছি।

চিনেছ তা হলে বললে কেন— কে বলছেন?

অভ্যাস। হ্যালো বলতেই— ‘কে বলছেন?’ বলি তো।

থাক এত এক্সপ্লানেশনের দরকার নেই। তোমাকে খুব জরুরি কারণে টেলিফোন
করেছি।

মনজুর উদ্বিগ্ন গলায় বলল, জরুরি কারণটা কী?

তুমি আন্দাজ করো তো।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আজ মঙ্গলবার। তোমাকে বুধবারে আসতে বলেছিলাম।

ও আচ্ছা, মনে আছে। আমি এপয়েন্টমেন্ট বইয়ে লিখে রেখেছি।

তোমার আবার এপয়েন্টমেন্ট বুক আছে নাকি ?

ঠিক এপয়েন্টমেন্ট বুক না— ডেস্ক ক্যালেন্ডার। কাল সকালে পাতা উল্টাও।
সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে।

দয়া করে এখনি উল্টাও। ডেস্ক ক্যালেন্ডারের পাতা তুমি কখনও উল্টাও না।
আচ্ছা উল্টালাম।

কী লেখা পড়ে শোনাও তো। যা লেখা হবহ তাই তুমি পড়বে।

বেশি কিছু না— শুধু ‘মীরা’ লিখে রেখেছি। নাম দেখলেই মনে পড়বে।

আমি টেলিফোন করার আগে কী করছিলে?

ডিভানে শুয়ে ছিলাম।

শুয়ে ছিলে কেন? শরীর খারাপ নাকি?

একটু খারাপ। কিডনি বিষয়ক জটিলতা।

পরিষ্কার করে বলো। কিডনি বিষয়ক জটিলতা মানে?

সবেধন নীলমণি যেটা আছে সেটা নন-কোঅপারেশন করছে।

এটা কি তোমার নিজের ধারণা না ডাক্তারদের ধারণা?

ডাক্তারদের।

ভালোমতো চিকিৎসা করাও।

করাচ্ছি।

আচ্ছা। তাহলে বুধবারে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

আচ্ছা, তুমি ভালো তো?

ভালো।

মীরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। মনজুরের সঙ্গে কথা বলার পর তার কিছুক্ষণের জন্য খারাপ লাগে। লজ্জা এবং অপরাধবোধের মিশ্র অনুভূতি হয়। নিজের ওপর তার খানিকটা রাগও লাগে। শেষের দিকে মনজুরের সঙ্গে সে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছে। এতটা খারাপ ব্যবহার মনজুরের প্রাপ্য ছিল না। তার চরিত্রে কিছু ইন্টারেস্টিং দিক অবশ্যই আছে : যেমন— সে ভালোমানুষ। অসাধারণ কিছু না, সাধারণ ভালো মানুষদের একজন। শতকরা পঁয়তাল্লিশজন মানুষ এই পর্যায়ে।

আজ বুধবার।

জামান সাহেব এসে পড়েছেন। জালালউদ্দিনের সঙ্গে চা খেতে খেতে মাথা দুলিয়ে গল্প করছেন। বিলেতের গল্প। বিলেতে ক্রিসমাসের সময় এক তরুণীকে রাস্তা পার করাতে গিয়ে কী যে বিপদে পড়েছিলেন তার গল্প।

বুঝলেন জালাল সাহেব, পকেট থেকে সিক্সটি পাউন্ড খসে গেল। আজ থেকে পনেরো বছর আগের ঘটনা। পনেরো বছর আগের সিক্সটি পাউন্ড মানে সিক্সটি ইনটু ফিফটিন অর্থাৎ, প্রায় নয় শ’ পাউন্ড।

জালালউদ্দিন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছেন। মীরার হাসি পাচ্ছে না। হাসি পাওয়ার মতো কোনো গল্প না। মাঝে মাঝে লোকজনের অকারণেই হাসতে ইচ্ছা করে; তখন একটা উপলক্ষ ধরে হাসে। এখানেও তাই হচ্ছে।

জামান সাহেব মীরার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের ক্লায়েন্ট তো এখনও আসছে না। মীরা বলল, এসে পড়বে।

আমার অবশ্য কোনো তাড়া নেই। আরেক প্রস্থ চা হোক।

জালালউদ্দিন বললেন, অন্য কোনো পানীয় খাবেন? ভালো স্কচ আছে।

ঝামেলা চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে। স্কচের কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। আটলান্টিক সিটিতে একবার কী হয়েছিল শুনুন। একটা নাইট ক্লাবে গিয়েছি— এলাদিনস ক্যাসেল। ওখানকার খাবারটা সস্তা এবং ভালো। ভাবলাম খেতে খেতে একটা শো দেখে ফেলি। একটা ড্রিন্স নিয়ে বসেছি— অমনি পাটটিউট ধরনের এক তরুণী বলল, বাইরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, তুমি কি আমাকে একটা ড্রিন্স অফার করবে? আমি বললাম, অবশ্যই। তুমি ওয়েটাকে বলো কী খেতে চাও।

মেয়েটা নিচু গলায় ওয়েটাকে কী যেন বলল, সে তৎক্ষণাৎ একটা গ্লাস এবং বোতল এনে টেবিলে রাখল। মেয়েটা অতি দ্রুত বোতল শেষ করে আমাকে থ্যাঙ্কস দিয়ে চলে গেল। বিল দিতে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। দু’শ’ চল্লিশ ডলার! মেয়েটা নাকি দু’শ’ ডলার দামের ফরাসি শ্যাম্পেন চেয়েছিল। তাকে তাই দেয়া হয়েছে। হা-হা-হা।

জালালউদ্দিন ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মীরা ভেবে পেল না, এর মধ্যে হাসির কী আছে। সব মানুষ এত বোকা কেন? পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা এত অল্প!

কলিং বেলের শব্দ হচ্ছে।

মীরা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। চাদর গায়ে মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে কালো একটা ব্যাগ। তার চাদর ভেজা-ভেজা। মীরা বলল, বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?

হঁ। এইবারের শীতকালটা অদ্ভুত— দু’দিন পরপর বৃষ্টি। আমি কি দেরি করে ফেললাম?

হ্যাঁ দেরি করেছে।

জামান সাহেব এসেছেন?

দু’ ঘণ্টা আগে এসেছেন।

সরি, ডাক্তারের কাছে গিয়ে এই যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম। স্লিপে লেখা এগারো। নিশ্চিত হয়ে বসে আছি, আসলে লেখা উনিশ।

ডাক্তার কী বলল?

বলে নি কিছু। টেস্ট-ফেস্ট করতে দিয়েছে।

এসো আমার সঙ্গে। তাঁরা বারান্দায় বসেছেন। তোমার ব্যাগে কী?

কিছু না। ব্যাগটা এখানে রেখে যাই?

সঙ্গে থাক। অসুবিধা কিছু নেই। চাদর খুলে ফেলো। চাদর গায়ে জড়িয়ে রাখার মানে কী? দাও, আমার কাছে দাও।

জামান সাহেব মনজুরের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুর বিনীত ভঙ্গিতে বলল, সরি আপনাদের দেরি করিয়ে দিয়েছি।

জামান সাহেব কিছু বললেন না। মনজুরকে তাঁর চেনা চেনা মনে হচ্ছে— কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছেন না। তিনি ইতস্তত করে বললেন, ‘আপনাকে কি আমি আগে দেখেছি? বা আপনি কি আমাকে আগে দেখেছেন?’

মনজুর খনিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মনে করতে পারছি না। আমার স্মৃতিশক্তি বিশেষ ভালো না।

আমার যথেষ্টই ভালো; কিন্তু আমিও মনে করতে পারছি না। যদিও খুব চেনা চেনা লাগছে।

জালালউদ্দিন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে সুস্পষ্ট বিরক্তি তিনি বললেন, কাজের কথা শুরু করলে কেমন হয়? এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

জামান সাহেব বললেন, কাজের কথা আর কী? দু'জনের পুরোপুরি সম্মতিতেই ব্যাপারটা ঘটছে। আমি সব কাগজপত্র তৈরি করে এনেছি। কয়েকটা সই হলেই হবে। মনজুর সাহেব, আপনি বরং ডকুমেন্টগুলো পড়ুন।

মনজুর নরম গলায় বলল, পড়তে হবে না। কোথায় সই করব বলুন।

দেখুন ক্রস দেয়া আছে। সই করবার সময় পুরো নাম লিখবেন।

জি আচ্ছা।

একবার আপনাকে কোর্টেও আসতে হবে। পারবেন না?

পারব। কবে?

সোমবার ঠিক এগারোটায়। আপনি আমার চেম্বারে চলে আসুন। সেখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাব। এই কার্ডটা রাখুন। এখানে ঠিকানা দেয়া আছে।

মনজুর হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মীরা এলো তার পেছনে পেছনে। তবে সে কিছু বলল না। এই প্রথম ঘর থেকে বেরবার সময় সে চৌকাঠে ধাক্কা খেল না।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। চাদরটা ফেলে আসায় মাথা ভিজ়ে যাচ্ছে। জ্বর-জ্বারি না হলে হয়।



‘উড কিং’-এর মালিক বদরুল আলম, মনজুরের মেজো মামা। ‘উড কিং’ ছাড়াও ঢাকা শহরে তাঁর আরও দুটি ফার্নিচারের দোকান আছে। মূল কারখানা মালিবাগে। কারখানার সঙ্গে তাঁর হেড অফিস।

এই মুহূর্তে তিনি মালিবাগের হেড অফিসে বসে আছেন। চায়ের কাপে মুড়ি ভিজিয়ে চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাচ্ছেন। তাঁর সামনে কারখানার ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা। ইয়াসিন মোল্লার হাতে গোটা দশেক রসিদ। একটু দূরে কান ধরে উড কিং ফার্নিচারের সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারী নসু মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স এগারো। সে এক টিন তার্পিন তেল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। বদরুল আলম দু'পাশ শেষ করেই নসুর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। নসুকে আসন্ন শাস্তির আশঙ্কাতে খুব উদ্ভিষ্ট মনে হচ্ছে না।

বদরুল আলমের বয়স একষাট। শক্ত-সমর্থ চেহারার বেঁটেখাটো মানুষ। তিনি ধমক না দিয়ে কোনো কথা বলতে পারেন না। কিছুদিন হলো আলসার ধরা পড়েছে। আলসারের চিকিৎসা হিসাবে সারাক্ষণ কিছু-না-কিছু খাচ্ছেন। চায়ে মুড়ি ভিজিয়ে খাওয়া সেই চিকিৎসারই অঙ্গ।

মনজুর ঘরে ঢুকে মামার দিকে তাকিয়ে হাসল। বদরুল আলম সেই হাসির দিকে কোনোরকম গুরুত্ব দিলেন না। এটাও তাঁর স্বভাবের অংশ। যে-কোনো আগন্তুককে প্রথমে কিছুক্ষণ তিনি অগ্রাহ্য করেন। ভাব করেন যেন দেখতে পান নি।

মনজুর পাশের চেয়ারে বসল। আমার দৃষ্টি আকর্ষণের কোনো চেষ্টা করল না। কারণ সে জানে চেষ্টা করে লাভ হবে না।

ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার, নসুর শান্তির ব্যাপারটা শেষ করে দেন।

বদরুল আলম কড়া গলায় বললেন, শেষ করাকরি আবার কী? তার্পিন তেলের টিনটা উদ্ধার হয়েছে?

জি স্যার।

তাহলে ঐ টিন থেকে বড় চামচে দুই চামচ তেল খাইয়ে দাও। এটাই ওর শান্তি।

শান্তির এই ব্যবস্থায় নসুকে খুব আনন্দিত মনে হলো। সে ফিক করে হেসেও ফেলল। ইয়াসিন মোল্লাকে দেখে মনে হচ্ছে শান্তির এই ধারাটি তার পছন্দ না। সে বিরস গলায় বলল, স্যার, রসিদগুলো একটু দেখবেন? দুই হাজার সিএফটি কাঠ...

বদরুল আলম শুকনো গলায় বললেন, সবকিছু যদি আমি দেখি তাহলে আপনি আছেন কী জন্য? এখন যান। নসুকে নিয়ে যান। শান্তি দেন।

তেল সত্যি সত্যি খাওয়াব?

অবশ্যই খাওয়াবেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যান।

ঘর খালি হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বদরুল আলম বললেন, আমার এই ম্যানেজার বিরাট চোর। থিফ নাম্বার ওয়ান।

মনজুর বলল, থিফ নাম্বার ওয়ান হলে বিদায় করে দেন না কেন? চোর পোষার দরকার কী?

দরকার আছে। পোষা চোর কী করে চুরি করে সেই কায়দা-কানুন জানা থাকে। ম্যানেজার ব্যাটা চুরি করামাত্র ধরে ফেলি। নতুন একজনকে নিলে তার চুরির কায়দা-কানুন ধরতে ধরতে এক বৎসর চলে যাবে। এক বৎসরে সে দোকান ফাঁক করে দেবে, বুঝলি?

হ্যাঁ বুঝলাম।

কিছুই বুঝিস নাই। ম্যানেজার রসিদগুলো নিয়ে ঘুরঘুর করছে। ^{কিন্তু}কি করছে? কারণ চুরি আছে ওর মধ্যে। বিরাট ঘাপলা। আমি তাকে কী বললাম? বললাম— আমি কিছু দেখতে পারব না— সে নিজে যেন দেখে। এখন সে নিশ্চিত হয়ে চুরি করবে। আগের মতো সাবধান থাকবে না। ধরা পড়ে যাবে কীক করে ঘাড় চেপে ধরব। বুঝলি?

বুঝলাম।

কিছুই বুঝিস নাই। আমার কাছে কী ব্যাপার তোমাকে দেখতে এলাম।

ঠাট্টা করছিস নাকি?

ঠাট্টা করব কেন? মাসে একবার তোমাকে দেখতে আসি না?

বদরুল আলম চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। মনজুর সত্যি কথাই বলছে। সে মাসে একবার আসে। প্রতিমাসের শেষের দিকে। ঘন্টাখানেক থাকে।

কেন আসিস আমার কাছে?

তোমাকে দেখতে আসি।

কেন?

কী যন্ত্রণা! এত জেরা করছ কেন?

বদরুল আলম চোখ থেকে চশমা খুলে খানিকক্ষণ মনজুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চশমা খুললে তিনি প্রায় কিছুই দেখেন না। তবু কাউকে বিশেষভাবে দেখার প্রয়োজন হলে চশমা খুলে ফেলেন।

তোর কি শরীর খারাপ নাকি?

হঁ।

সমস্যা কী?

শরীরের রক্ত ঠিকমতো পরিষ্কার হচ্ছে না।

কালোজাম খা। কালোজামে রক্ত পরিষ্কার হয়।

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, শীতকালে কালোজাম পাব কোথায়? তা ছাড়া কালোজামের স্টেজ পার হয়ে গেছে। কিডনি যেটা ছিল সেটাও যাই-যাই করছে।

কী বলছিস তুই।

সত্যি। আমি এখন কিডনির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ইয়ারকি করছিস নাকি?

ইয়ারকি করছি না। দু'জন বড় ডাক্তার তাই বললেন।

বড় ডাক্তাররা কিছুই জানে না। ছোট ডাক্তারদের কাছে যা।

ছোট ডাক্তারদের কাছে যাব?

হ্যাঁ। ওরা যত্ন করে দেখবে। এই পাড়ায় একজন এল.এম.এফ ডাক্তার আছে। ভূপতি বাবু। খুব ভালো। তার কাছে যাবি? আমি নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে খুব ভালো খাতির। যাবি?

না।

ছোট বলে অবহেলা করিস না। ছোট কাঁচামরিচের ঝাল বেশি।

ঝাল পচা আদারও বেশি। তাই বলে পচা আদা কোনো কাজের জিনিস না।

বদরুল আলম দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন, পচা আদার কোনো ব্যবহার মনে পড়ে কিনা। মনে পড়ল না।

তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি মামা।

টাকা-পয়সার কোনো ব্যাপার না হলে বল। টাকা-পয়সা ছাড়া সর্ব পাবি।

টাকাপয়সা কি তোমার নেই?

আছে। দেয়া যাবে না। টাকা ব্যবসায় খাটে। ব্যাংকে ফেলে রাখি না।

ব্যাংকে কিছু তো আছে?

তা আছে।

সেখান থেকে এক লাখ দেয়া যাবে?

এত লাগবে কেন?

কিডনি কিনতে হবে। লাখখানিক টাকা লাগবে কিনতে। অপারেশন করতে দেশের বাইরে যেতে হবে। সব মিলিয়ে দরকার তিন থেকে চার লাখ টাকা।

বদরুল আলম টেবিলে রাখা চশমা চোখে পরলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, তুই কি জনে জনে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিস?

হ্যাঁ।

কোনো লাভ নাই— অন্য পথ ধর।

অন্য কী পথ ধরব?

তা আমি কী বলব। ভেবে-চিন্তে বার কর। তুই গরিব মানুষ, বাঁধাবি গরিবের অসুখ— দাস্ত, খোস-পাঁচড়া, হাম, জলবসন্ত, তা না... চা খাবি?

না।

খা চা খা। ফ্রেশ মুড়ি আছে, খেজুর গুড় দিয়ে খা।

মনজুর উঠে দাঁড়াল।

বদরুল আলম বললেন, তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস নাকি? রাগ নিয়ে যাওয়া ঠিক না। তুই রাগড়া কর আমার সঙ্গে। চিৎকার, চেষ্টামেচি কর। তাহলে তোর মনটা থাকা হবে। তুই রোগী মানুষ, মনটা হাক্কা থাকা দরকার।

আমার মন হাক্কাই আছে।

আরে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

বোস বোস। চা খেয়ে তারপর যা। সিগারেটখোররা বিনা সিগারেটে চা খেতে পারে না। এজন্য মুরক্বিদের সামনে তারা চা খায় না। যা, তোকে সিগারেটের অনুমতি দিলাম। এখন চা খাবি তো? নাকি এখনও না!

মনজুর বসল।

বদরুল আলম গলার স্বর নিচু করে বললেন, মনটা খুবই খারাপ। তোর অসুখ-বিসুখের জন্য না। অসুখ-বিসুখ তো মানুষের জীবনে আছেই। এই দেখ না, বুড়ো বয়সে আমার হয়ে গেল আলসার।

মন খারাপ কি এই জন্য?

আমার ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে মনটা খারাপ। তারা এখন লায়েক হয়ে গেছে। সমাজে পজিশন হয়েছে। আমি যে একজন কাঠমিস্ত্রি এইজন্য তারা লজ্জিত। আমাকে লোকজনের সামনে কীভাবে পরিচয় করিয়ে দেয় জানিস? বলে— ইনি আমার ফাদার। ব্যবসা করেন। টিম্বার মার্চেন্ট। আমি তখন কী করি জানিস? আমি গম্ভীর হয়ে বলি— না রে ভাই। আমি কোনো টিম্বার মার্চেন্ট না। আমি একজন কাঠমিস্ত্রি।

তুমি তো সত্যি কাঠমিস্ত্রি না।

না তোকে বলল কে? কাঠের কাজ আমি করি না? এখনও করি।

চা এসে গেছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়েছে। বদরুল আলম খেজুর গুড় দিয়ে মুড়ি চিবুচ্ছেন। ম্যানেজার ইয়াসিন মোল্লা একটু আসে এসে বলে গেছে— নসু মিয়া'র শান্তি দেয়া হয়েছে। তর্পিন তেল খাওয়ানো হয়েছে। সে এখন বমি করছে। বদরুল আলম বলেছেন— করুক। তুমি ফট করে ঘরে ঢুকবে না। কথা বলছি।

এর মধ্যে একবার টেলিফোন এসেছে। বদরুল আলম রিসিভার তুলে রেখেছেন। এখন তাঁর টেলিফোনে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলতে ভালো লাগছে। ছেলেটা ভালো। কোনো কথা বললে মন দিয়ে শোনে— দশজনের কাছে গিয়ে বলে না।

মনজুর।

জি।

আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের কাণ্ডকারখানা শুনবি?

বলো।

বিয়ে করার পর মনে করছে— আহা কী করলাম! রাজকন্যা পেয়ে গেলাম। চোখে-মুখে সব সময় 'সখী ধর ধর' ভাব। মুখে হাসি লেগেই আছে। কী মধুর হাসি। এখন কথা বলে শান্তিনিকেতনী ভাষায়— এলুম, গেলুম এইসব। ব্যাটা রবিঠাকুর হয়ে গেছে!

অসুবিধা কী?

অসুবিধা আছে। সবটা না শুনলে বুঝবি না— গত বৃহস্পতিবার সকালে বারান্দায় এসে দেখি মতিন নেইল কাটার দিয়ে তার বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। আমি না-দেখার ভান করে ঘরে ঢুকে গেলাম। তোর মামিকে বললাম— এই কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চাই না। লাথি দিয়ে একে ঘর থেকে বের করে দাও। একে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম।

নখ কাটা এমন কী অপরাধ?

বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দেয়া অপরাধ না? তুই কখনও বৌমার পায়ের নখ কেটে দিয়েছিস?

না।

তাহলে?

আমি কি আদর্শ মানব? আমি যা করব সেটাই ঠিক, অন্যেরটা ঠিক না?

বদরুল আলম বিরক্ত গলায় বললেন, তুই আদর্শ মানব হবি কেন? তুই হচ্ছিস গাধা-মানব। এখন কথা হলো, গাধা-মানব হয়ে তুই যে কাজটা করছিস না সেই কাজটা আমার কুলাঙ্গার করছে— বৌয়ের পায়ের নখ কেটে দিচ্ছে। তাও কোনো রাখঢাক নেই। বারান্দায় বসে কাটছে। হারামজাদা!

মতিনের বৌকে তো তুমি পছন্দ করো? করো না।

অবশ্যই করি। ও ভালো মেয়ে। ভেরি গুড গার্ল। আমার কুলাঙ্গারটা মেয়েটার মাথা খাচ্ছে। একদিন কী হবে জানিস? এই মেয়ে নেইল কাটার নিয়ে আমার কাছে এসে বলবে, বাবা, আমার পায়ের নখগুলো একটু কেটে দিন তো।

মনজুর হেসে ফেলল। বদরুল আলম রাগী গলায় বললেন, হাসি কেন? হাসবি না। হাসি-তামাশা এখন আমার সহ্য হয় না। হাসি শুনলেই ব্রহ্মপ্রেসার বেড়ে যায়।

উঠি মামা?

আচ্ছা যা। কোনো চিন্তা করিস না। আল্লাহর ওপর নির্ভরসা রাখ। গড অলমাইটি ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

মনজুর রাস্তায় এসেই রিকশা নিয়ে নিল। আজ ইটতে ভালো লাগত। এখন আর লাগে না। কয়েক পা এগোলেই ক্লান্তি হাত-পা এলিয়ে আসে। কয়েক বার সে রিকশাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ যে-রকম ক্লান্ত লাগছে তাতে মনে হয়— রিকশায় ওঠা-মাত্রই ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাইবেন সাব?

মনজুর কিছু বলল না। কোথায় যাবে এখনও সে ঠিক করে নি। অফিসে যাওয়া যেত কিন্তু আজ অফিস বন্ধ। তাদের অফিস হচ্ছে একমাত্র অফিস যা সপ্তাহে দু'দিন

এক থাকে— শুক্রবার এবং রোববার। আফসার সাহেব তাঁর সব কর্মচারীকে বলে দিয়েছেন— দু'দিন বন্ধ দিচ্ছি এই কারণে যাতে বাকি পাঁচদিন আপনারা দশটা-পাঁচটা অফিস করেন এবং মন দিয়ে করেন।

আজ রোববার।

সব জায়গায় কাজকর্ম হচ্ছে। তাদের অফিস বন্ধ। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকা যেত। শরীরের ক্লান্তি তাতে হয়তো খানিক কাটত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, অফিস যেদিন থাকে সেদিনই শুধু ঘরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। অফিস বন্ধের দিন ইচ্ছে করে বাইরে বেরিয়ে পড়তে। আজ যেমন করছে। অবশ্যি যাবার মতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেনে করে গ্রামের দিকে গেলে কেমন হয়? পছন্দ হয় এমন কোনো স্টেশনে নেমে পড়া। বিকেলের দিকে ফিরে আসা।

সাব, যাইবেন কই?

সামনে।

রিকশাওয়ালা রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। বারবার ফিরে তাকাচ্ছে।

স্যারের শইলকি খরাপ?

হঁ।

কী হইছে?

কিডনি নষ্ট— বেশিদিন বাঁচব না।

না বাঁচাই ভালো। বাঁচ্যা লাভ কী কন? চাউলের কেজি হইল তেরো টেকা। গরিবের খানা যে আটা হেইডাও এগারো টেকা কেজি।

খুবই সত্যি কথা। দেখি তুমি কমলাপুরের দিকে যাও তো।

রেল ইস্টিশন?

হঁ।

ঘুম আসছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনজুর শক্ত করে রিকশার হুড চেপে ধরল। ঘুম হচ্ছে অনেকটা মৃত্যুর মতো। মৃত মানুষের শরীর যেমন শক্ত হয়ে যায়, ঘুমন্ত মানুষদের বেলায়ও তাই হয়। শরীর খানিকটা হলেও শক্ত হয়। ঘুমিয়ে পড়লেও হুড ধরা থাকবে। ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশা থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা কমে যাবে। অক্ষত অবস্থায় কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌঁছানো যেতে পারে।

অবশ্যি পৌঁছলেও যে শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যাবে তা মনে হয় না। ইচ্ছা মরে যাবে। মানুষের কোনো ইচ্ছাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কিছুদিন ধরে মনজুরের ইচ্ছা করছে অচেনা একজনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় গল্প করা; যে তাকে চেনে না কিন্তু না চিনলেও যে গল্প শুনবে আগ্রহ নিয়ে। প্রয়োজনে আগ্রহ নিয়ে গল্প শোনার জন্য কিছু টাকাপয়সাও দেয়া যেতে পারে। সমস্যা হলো, কেউ গল্প শুনতে চায় না। সবাই বলতে চায়। সবার পেটে অসংখ্য গল্প।

মেজো মামার সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ থাকলে তিনি মতিনের নতুন কিছু গল্প শুনাতে। গল্প বলতে পারার আনন্দের জন্য মেজো মামার মতো মানুষও তাকে সিগারেট খাবার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

স্যার নামেন। কমলাপুর আইছে।

মনজুরের নামতে ইচ্ছা করল না। কেমন যেন মাথাটা ঘুরাচ্ছে। বমি-বমি

লাগছে। ঝকঝকে রোদ। সেই রোদ এমন কড়া যে চোখে লাগছে। খুবই তীক্ষ্ণ কোনো সূচ দিয়ে রোদের ছবি কেউ যেন চোখের ভেতর আঁকছে।

সাব নামেন।

ভাই শোনো, এখানে নামব না। তুমি আমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাও। ভাড়া নিয়ে চিন্তা করবে না। যা ভাড়া হয় তার সঙ্গে পাঁচ টাকা ধরে দেব বকশিশ।

বাসা কোন্‌হানে?

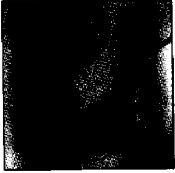
বলছি— তুমি চালাতে শুরু করো, তারপর বলছি।

টাইট হইয়া বহেন।

বসেছি। টাইট হয়ে বসেছি। তুমি আস্তে চালাও।

রিকশাওয়ালা খুবই ধীরগতিতে রিকশা চালাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে রিকশার প্যাসেঞ্জার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়লে ভালো কথা— অজ্ঞান না হয়ে পড়লেই হয়। রিকশাওয়ালা পথের পাশে গজিয়ে-ওঠা একটা চায়ের স্টলের কাছে এনে রিকশা থামাল। প্যাসেঞ্জার খানিকক্ষণ ঘুমাতে। এই ফাঁকে সে টোস্ট দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নেবে। ভাড়া হিসেবে বাড়তি কিছু টাকা পাওয়া যাবে। একটা টাকা চা-টোস্টের জন্য খরচ করা যায়। সে চায়ের কাপ নিয়ে উবু হয়ে বসেছে, এমন সময় হৈহৈ শব্দ উঠল। ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার গড়িয়ে রিকশা থেকে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়েও তার ঘুম ভাঙছে না। তার মানে ঘুম না— লোকটা হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয় মারা গেছে।

লোকজন লোকটাকে ধরাধরি করে তুলছে। তুলতে থাকুক, এই ফাঁকে সে দ্রুত চা-টা শেষ করতে চায়। চা-টা মজা হয়েছে। দ্রুত চা খেতে গিয়ে রিকশাওয়ালা মুখ পুড়িয়ে ফেলল।



স্যার, আপনি কেমন আছেন?

মনজুর জবাব দিল না। জবাব না দেয়ার দুটি কারণের একটি হচ্ছে প্রশ্নকর্তার গলার স্বর সে চিনতে পারছে না। অচেনা একজনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার তেমন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় কারণ— কথা বলতে ইচ্ছে পাচ্ছে না। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদায়ক আলস্য। তন্দ্রা ভাব। প্রচণ্ড ঘুম। অঙ্গার আগের অবস্থা। একটা কোলবালিশ জড়িয়ে পাশ ফিরে ঘুমাতে পারছে না। শীত শীত লাগছে। গায়ের উপর কমল দেয়া আছে কি? সম্ভবত আছে। তবে সেই কমল খুব ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে রাবারের কমল।

স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি জাহানারা। এখন আপনার শরীর কেমন?

চোখ না মেলেই বলল, শরীর ভালো।

আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?

মনজুর বিরক্ত হচ্ছে। এটা কী ধরনের প্রশ্ন? তাকে চিনতে পারা না-পারায় কী যায় আসে? কিছুই যায় আসে না। তবে সে চিনতে পারছে। মনজুর তাকাল। না থাকানোই ভালো ছিল। তীব্র আলো ধক করে চোখে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা শুরু হলো। ডান হাত অসাড় হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। হাতে কী স্যালাইন দেয়া হচ্ছে? এটা হাসপাতাল, না ক্লিনিক? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। হাসপাতাল না হওয়ারই কথা।

স্যার, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?

কেমন আছ জাহানারা?

জি স্যার ভালো।

এটা কি কোনো ক্লিনিক?

জি-না— মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

ও আচ্ছা।

আপনি যে হাসপাতালে সেটা জানতাম না। বারোটোর সময় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন করল অফিসে। আপনার মানিব্যাগে ভিজিটিং কার্ড ছিল। আপনি স্যার পুরো একুশ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন।

ও আচ্ছা।

টেলিফোন ধরেছিলেন চিত্ত বাবু। তিনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। আমাকে বললেন, জাহানারা, হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এসেছে। কী বলছে কিছুই বুঝতেছি না। তুমি মেসেজটা রেখে দাও তো। আমি তখন...

জাহানার হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে।

মনজুর স্বপ্নেও ভাবে নি, এই মেয়ে এত কথা বলতে পারে। এতদিন পর্যন্ত তার ধারণা ছিল, এই মেয়ে শুধু প্রশ্ন করলেই জবাব দেয়। নিজ থেকে কথা বলে না। এখন মনে হচ্ছে মেইল ট্রেন। দাঁড়ি-কমা ছাড়া কথা বলে যাচ্ছে। মেয়েটা বোধহয় ভয় পেয়েছে। যেসব মানুষ এমনিতে কম কথা বলে তারা ভয় পেলে প্রচুর কথা বলে। স্যার, আপনার এখন কেমন লাগছে?

ঘুম পাচ্ছে।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। ডায়ালাইসিস করা হবে। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেশি হয়ে গেছে। এগুলো ডায়ালাইসিস করে সরাবে। তখন ভালো লাগবে।

আচ্ছা, তুমি তাহলে এখন যাও। আমি খানিকক্ষণ ঘুমাব।

আমার স্যার এখন যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। আপনার আত্মীয়স্বজন কাকে কাকে খবর দিতে হবে, বলুন, আমি খবর দিয়ে দিব।

কাউকে খবর দিতে হবে না।

ভাবি? ভাবিকে খবর দিব না?

দাও— টেলিফোন নাম্বার হলো...

উনার টেলিফোন নাম্বার আমি জানি। গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার আপনার খোঁজে টেলিফোন করেছিলেন— তখন উনি তাঁর নাম্বার বললেন। আমি আমার নোটবইয়ে উনার নাম্বার লিখে রেখেছি...

মনজুর অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছে।

এত কথা বলছে কেন. এই মেয়ে? কে তাকে এখানে আসতে বলেছে? মনজুর মনে-মনে বলল, মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি, ইউ হ্যাভ নো বিজনেস হিয়ার। কেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বকবক করছ? কে তোমার বকবকানি শুনতে চাচ্ছে? তুমি দয়া করে বিদেয় হও। আমাকে ঘুমাতে দাও। ঘুম পাচ্ছে।

আরাম করে একটা ঘুম দিতে পারলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যেত। এই মেয়ে তা হতে দেবে না। মানুষ ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে। অফিসে এই মেয়ে একটা কথাও বলে না। হাসপাতালে দাঁড়ি-কমা ছাড়া কথা বলে। বাসায় সে কী করে?

স্যার, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

মনজুর জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। যাতে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে মেয়েটা তাকে মুক্তি দেয়।

স্যার, এখন ঘুমাবেন না। ডাক্তার সাহেব আসছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে তারপর ঘুমান। আপনাকে কি আরেকটা বালিশ দিতে বলব? এদের বালিশগুলো খুব পাতলা।

ডাক্তার সাহেব বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনজুরের টেম্পারেচার চাট দেখছেন। ডাক্তার ভদ্রলোক খুব রোগা। তাঁকে সরলরেখার মতো লাগছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সটি বেশ গোলগাল। মনজুরের মনে হলো— নার্সটিকে ‘০’ এর মতো দেখাচ্ছে। ডাক্তার যদি ইংরেজি এক হয় তাহলে এই দু’জনে মিলে হলো দশ। ... এইসব কী সে ভাবছে? তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? ডাক্তার নিচু হয়ে মনজুরের কপালে হাত রাখলেন। অন্তরঙ্গ গলায় বললেন, কেমন আছেন?

ভালো।

শরীর কি খুব দুর্বল লাগছে? বমি ভাব আছে?

আছে।

মাথা ঘুরছে?

না— তবে মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

এ ছাড়া আর কোনো অসুবিধা আছে?

আছে। আপনাকে গোপনে বলতে চাই। অন্যদের যেতে বলুন।

ডাক্তারকে কিছু বলতে হলো না। সবাই দূরে সরে গেল। মনজুর গলার স্বর নিচু করে বলল, ঐ যে প্রিন্টের শাড়িপরা মেয়েটাকে দেখছেন— তাকে যেতে বলুন। সে আমাকে বড় বিরক্ত করছে। ঘুমাতে দিচ্ছে না।

তাকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। এটাই কি আপনার গোপন কথা, না আরও কিছু বলবেন?

না, আর কিছু বলব না। আমার অবস্থাটা কী— জানতে পারি?

টেস্ট প্রায় সবই করা হয়েছে। আপনার কিডনি ভালো কাজ করছে না। তবে এই মুহূর্তে চিন্তার কিছু নেই। ডায়ালাইসিস করলেই আরামবোধ করবেন। ইতিমধ্যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি চেষ্টা করে দেখুন কোনো ডোনার পাওয়া যায় কিনা। আপনার ভাইবোন হলে ভালো হয়। না পাওয়া গেলে রক্ত-সম্পর্ক আছে এমন কেউ। সন্ধ্যাবেলা ডক্টর ইমতিয়াজ আসবেন। উনি সব বুঝিয়ে বলবেন।

আপনি এখন রেস্ট নিন। চূপচাপ শুয়ে থাকুন। ঘুমাবার চেষ্টা করুন। যে-কোনো সমুখেই বিশ্রাম চমৎকার মেডিসিন।

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই মনজুর ঘুমিয়ে পড়ল। এমন ঘুম যা মানুষকে আরও ক্লান্ত করে দেয়। কারণ, সে ঘুমাচ্ছে অথচ আশপাশের সমস্ত শব্দ শুনছে। পাশের বেডের রোগী কাশছে। এই শব্দও ঘুমের মধ্যে শুনতে পাচ্ছে। নার্স এসে থাকে যেন ধমকাচ্ছে— সেই ধমকের প্রতিটি শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষের শাশক্তি কাজ করে না— তার কাজ করছে। ঘর মুছে যখন ফিনাইল দেয়া হলো— সে ঘুমের মধ্যে ফিনাইলের কড়া গন্ধ পেল।

মনজুরের ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে আগে। বিছানার কাছে দুটি ডাব হাতে কুদ্দুস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরাধী-অপরাধী ভাব। কুদ্দুস অস্পষ্ট স্বরে বলল, স্যারের শরীরটা এখন কেমন?

শরীর ভালো।

দুইটা ডাব আনলাম স্যার। আমার নিজের গাছের ডাব।

বেডের নিচে রেখে দাও।

কেটে দেই স্যার? এখন একটা খান?

এখন খেতে ইচ্ছা করছে না।

না খেলে তো স্যার শরীরে বল হবে না।

বল না হলেও কিছু করার নাই। তুমি এখন আমার সামনে থেকে যাও। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

ঐ দিনের ঘটনার জন্য আমি মাফ চাই স্যার।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আপনি মাফ না দিলে...

মাফ না দিলে কী?

কুদ্দুস মাথা চুলকাচ্ছে— কথা পাচ্ছে না। আগে ভালোমতো রিহার্সেল দিয়ে আসে নি। কুদ্দুসের উচিত ছিল কী কথাবার্তা বলবে সব ঠিক করে আসা। তা করে নি। অবশ্যি অনেক সময় ঠিক করে এলেও বলার সময় সব এলোমেলো হয়ে যায়। এই ব্যাপারটা তার বেলায় অসংখ্যবার ঘটেছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করে রাখা কথা একটাও সে কোনো দিন বলতে পারে নি।

কুদ্দুস, তুমি এখন যাও। কথা বলা আমার নিষেধ আছে।

জি আচ্ছা।

অফিসেও সবাইকে বলবে— তারা যেন না আসে।

আচ্ছা স্যার বলব।

থাংকস। তোমার ডাব আমি একসময় খাব।

কুদ্দুস মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, স্যার, শুনলাম আপনার একটা কিডনি দরকার?

ঠিকই শুনেছ। তুমি কি দিতে চাও?

কুদ্দুস হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

মনজুর সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, দিতে চাইলে পরে এ নিয়ে কথা বলব।
এখন যাও।

ডাব দুইটা মনে করে খাবেন স্যার।

বললাম তো খাব।

নিজের গাছের ডাব। বাবা নিজ হাতে গাছ পুঁতেছিলেন।

মনজুর মৃদু গলায় বলল, যাত্রাবাড়ির ঐ বাড়ি কি তোমার নিজের?

জি-না, ভাড়া বাড়ি।

কবে এসেছ ঐ বাড়িতে?

দুই বছর আগে। শ্রাবণ মাসে।

দুই বছর আগে পোতা গাছে ডাব হয়ে গেল?

কুদ্দুস ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মনজুর বড়ই বিরক্তবোধ করছে। এ ভালোমতো মিথ্যা বলাও শেখে নি। জেরায় টিকতে পারে না। সামান্য বুদ্ধি থাকলে বলত— দেশের বাড়ির ডাব। বাবা দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন। তা না বলে কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মনজুর চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল। কুদ্দুস ক্ষীণ গলায় বলল, স্যার আমি যাই?

আচ্ছা যাও।

কুদ্দুস ‘যাই’ বলেও অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

মনজুর চোখ বন্ধ করেও তা বুঝতে পারছে। অসুখের সময় মানুষের ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়। মনজুর চোখ মেলল কুদ্দুস চলে যাবার পর। প্রথমেই চোখে পড়ল বিছানার পাশের একগাদা ম্যাগাজিন। কয়েকটা কবিতার বই। কবিতার বইগুলোতে মীরার নাম লেখা। নিশ্চয়ই জাহানারার কাণ্ড। অফিসে তার ঘরের শেল্ফ থেকে নিয়ে এসেছে। জাহানারার হয়তো ধারণা মনজুর কবিতার পোকা। মনে করাই স্বাভাবিক। সে অনেকবার মনজুরের হাতে কবিতার বই দেখেছে। সে জানেও না মনজুর এসব বই মুখের সামনে ধরে পাতা উল্টানো ছাড়া কিছুই করে না। দু’একবার যে পড়ার চেষ্টা করে নি তা না। চেষ্টা করেছে— ভালো লাগে নি।

ডান হাতে এখনো স্যালাইনের সূচ বিঁধে আছে। মনজুর বাঁ হাতে একটা কবিতার বই টেনে নিল।

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম

কেউ দেখে নি, কেউ টের পায় নি

প্রবল ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মধ্যে

মিশে গিয়েছিল আমার থুতু

তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই

সমুদ্রের অভিষাপ।

মনজুর খানিকটা হকচকিয়ে গেল। তার নিজের সঙ্গে কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। মীরাকে নিয়ে সে কল্পবাজার গিয়েছিল। সমুদ্রের মতো এত সুন্দর জিনিস অথচ সে কিনা থুতু ফেলল সমুদ্রে। মীরা জু কুঁচকে বলল, আশ্চর্য! তুমি সমুদ্রে থুতু ফেললে। হিঃ! সে নিজেও হকচকিয়ে গেল। মীরা বলল, এত বিশাল একটা জিনিসের গায়ে তুমি থুতু ফেলতে পারলে?

মনজুর হাল্কা গলায় বলল, সমুদ্র তো আমাদের দেবতা না মীরা। ওর গায়ে থুতু ফেললে কিছু যায় আসে না।

অবশ্যই সমুদ্রের কিছু যায় আসে না। সমুদ্রের কথা আমি ভাবছি না। আমি তোমার কথা ভাবছি। তুমি কোন মানসিকতায় এটা পারলে?

মুখে থুতু এসেছিল— ফেলে দিয়েছি। এর বেশি কিছু না।

মীরা পুরো বিকেলটা কাটাল চুপচাপ। যেন বড় ধরনের আঘাত পেয়েছে।

তলপেটে ব্যথা হচ্ছে।

তীব্র ব্যথা না— এক ধরনের আরামদায়ক ব্যথা। যে ব্যথায় শরীরে বিমবিম ভাব হয়। কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার পর শরীরে যেমন আবেশের সৃষ্টি হয়— ব্যথাটা ঠিক সে-রকম আবেশ তৈরি করেছে। কবিতার বইয়ের পাতা উল্টাতে ভালো লাগছে না। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে— বমি বমি ভাবটা যাচ্ছে না।

রাতের খাবার নিয়ে এলো সন্ধ্যা মিলানোর আগেই। ভাত, মাছ, সবজি। তবে কিছু-কিছু রোগীর জন্য অন্য ধরনের খাবারও আছে। যেমন তার জন্য এসেছে দু'স্লাইস রুটি, এক বাটি দুধ এবং একটা কলা।

মনজুর আধখান কলা খেলো। তার পাশের বেডের রোগী বলল, ভাইজান, কলাডা ফালাইয়েন না। রাইখ্যা দেন। রাইতে ক্ষিধা চাপলে খাইবেন। এরা রাইতে কোনো খাওন দেয় না। ক্ষিধায় কষ্ট হয়।

মনজুর বলল, আপনার নাম কী?

রোগী এই প্রশ্নের জবাব দিল না। পাশ ফিরে কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। যেন একটা জরুরি খবর দেয়ার প্রয়োজন ছিল, সে দিয়েছে। তার আর কিছু বলার নেই।

স্যার, আপনার জন্য খাবার এনেছি।

ছোট টিফিন ক্যারিয়ার হাতে জাহানারা দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার পাশে রোগা পনেরো-ষোলো বছরের একটা ছেলে। সে দেখতে অবিকল জাহানারার মতো। তবে মনে হচ্ছে খুব লাজুক। একবারও মুখ তুলে তাকায় নি।

স্যার, ও আমার ছোট ভাই— ফরিদ। এইবার ম্যাট্রিক দেবে। ওকে নিয়ে এসেছি। ও আপনার সঙ্গে থাকবে।

আমার সঙ্গে থাকবে কেন?

যদি কখনও কিছু দরকার হয়।

কোনো কিছু দরকার হবে না। আর দরকার হলে কত লোকজন আছে।

স্যার, ও বারান্দায় হাঁটাইটি করবে। মাঝে মাঝে আপনাকে দেখে যাবে।

মনজুর বিরক্ত গলায় বলল, জাহানারা তুমি প্রশ্ন করা করছ কেন? ওকে নিয়ে তুমি যাও তো। আর শোনো, রাতের খাবার আমি খেয়ে নিয়েছি। খাবারও নিয়ে যাও। এফুনি।

জাহানারার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার ভাই ভীত চোখে তাকাচ্ছে বোনের দিকে। জাহানারার চোখ তখন জলে ভিজে উঠল। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, ফরিদ আয়।

দুই ভাইবোন ক্লান্ত পায়ে এগোচ্ছে বারান্দার দিকে। ফরিদ ফিসফিস করে

বলল, আপা এত লোকজনের সামনে কাঁদছ? সবাই তাকিয়ে আছে তোমার দিকে।
জাহানারা বলল, থাকুক।

ফরিদ বলল, আপা চল বাসায় চলে যাই।

জাহানারা বলল, না।

আমরা তাহলে কী করব?

এখানে থাকব। বারান্দায় হাঁটাইটি করব।

ফরিদ তার বোনের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। বড় বোনকে সে খুব ভয়
পায়।

হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কিন্তু জাহানারা
দাঁড়িয়ে আছে। সে হাসপাতাল থেকে যেতে পারছে না। এই মানুষটা তার জন্য যা
করেছে তার কিছুই সে ফেরত দিতে পারছে না। কিন্তু সে ফেরত দিতে চাচ্ছে। সে-
ইচ্ছাটাও এই মানুষটা জানতে পারছে না।

এই মানুষটা তাকে এবং তার পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে
বাঁচিয়েছে। সে সময় কী ভয়াবহ অবস্থা! খবরের কাগজে যেখানে যা দেখেছে সে
অ্যাপ্লিকেশন করে দিচ্ছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কর্মী, সেলসম্যান, টেলিফোন
অপারেটর, ফুলের দোকানের কর্মচারী, বিউটি পার্লারের বিউটিশিয়ান। যোগ্যতা
আছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। অ্যাপ্লিকেশন করা এবং সন্ধ্যায় মন
খারাপ করে মা'র সঙ্গে বসে থাকা— এই ছিল কাজ। মা কাঁদতেন নিঃশব্দে এবং
একসময় বলতেন, এখন কী হবে রে?

জাহানারা বলত, জানি না মা।

দেশের বাড়িতে যাবি? তোর এক চাচা আছেন। উনি কি আর ফেলে দেবেন?
যাবি দেশের বাড়িতে?

জানি না মা।

তুই বল— এখন কী করব?

আল্লাহ্ আল্লাহ্ করো। এ ছাড়া কী আর করবে।

এই রকম অবস্থায় সে ইন্টারভ্যু দিতে এলো থ্রী পি-তে। থ্রী পি-র মালিক
নিজেই আছেন ইন্টারভ্যু বোর্ডে। তাঁর সঙ্গে আরও তিনজন, সেই তিনজনের
একজন মনজুর সাহেব।

বড় সাহেব বললেন, আপনার টাইপিং স্পিড কত?

জাহানারা ক্ষীণস্বরে বলল, টাইপ জানি না স্যার।

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বললেন, চাওয়া হয়েছে টাইপিং আর আপনি টাইপ
না জেনেই দরখাস্ত করেছেন?

স্যার আমি শিখে নেব।

ডায়ার ইয়াং লেডি, এটা তো টাইপ শেখার স্কুল নয়। আচ্ছা আপনি যান। নেস্টট।

তেতাল্লিশ জন ইন্টারভ্যু দিচ্ছে। তাদের সবারই নিশ্চয়ই চাকরি প্রয়োজন কিন্তু
তার মতো কি প্রয়োজন? না, তার মতো প্রয়োজন কারোরই নেই। জাহানারা বাড়ি
চলে গেল না। সারাদিন বসে রইল। ইন্টারভ্যু শেষ হবার পর আরেকবার সে যাবে।
দরকার হলে চিৎকার করে কাঁদবে।

তার প্রয়োজন হলো না। মনজুর বের হয়ে এসে তাকে দেখে বলল, আপনার ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? জাহানারা প্রায় অস্ফুটস্বরে বলল, না, আপনার সঙ্গে কি আমি একটু কথা বলতে পারি?

বলুন।

স্যার, আমি এক রাতের মধ্যে টাইপ শিখব।

আপনার কি চাকরিটা খুব বেশি দরকার?

জি।

বসুন এখানে। দুপুরে কিছু খেয়েছেন?

জাহানারা জবাব দিল না।

মনজুর খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কনফারেন্স রুমে ঢুকে গেল। বেরিয়ে এলো আধঘণ্টা পর। হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। বাড়ি ভাড়া, মেডিক্যাল অ্যালাউন্স সব মিলিয়ে তিন হাজার দু'শ' টাকা। অকল্পনীয় ব্যাপার।

মনজুর বলল, তোমার বয়স খুবই কম। আমি 'তুমি' করে বললে আশা করি শ্রদ্ধা পাবে না। এই নাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এসো আমার সঙ্গে, চা খাও।

জাহানারা কোনো কথা না বলে পেছনে পেছনে এলো। তার খুব ইচ্ছা করছে চিৎকার করে বলে— থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। সে বলতে পারল না। তার গলা ভার ভার হয়ে আসছে। চোখ জ্বালা করছে।

বসো জাহানারা।

জাহানারা বসল। মনজুর বলল, আমি ধার হিসেবে তোমাকে এখন কিছু টাকা দেব যা তুমি মাসে মাসে আমাকে শোধ করবে। দেব?

জাহানারা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

জাহানারার মা মানত করেছিলেন— মেয়ের চাকরি হলে এক শ' রাকাত নামাজ পড়বেন। সেই এক শ' রাকাত নামাজ শেষ হতে রাত চারটা বেজে গেল। জাহানারা তখনও জেগে। বারান্দায় অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে।

মা বারান্দায় এসে বললেন, পৃথিবীতে মানুষ এখনও আছে। এই রকম মানুষ বেশি থাকার দরকার নেই। কিছু থাকলেই হয়। একবার কি তুই উনাকে এই বাসায় নিয়ে আসবি? শুধু দেখব। উনাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

জাহানারা কিছু বলল না।

তার তখনও পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে স্বপ্ন। পুরোটাই স্বপ্ন। এসব জিনিস বাস্তবে কখনও ঘটে না। স্বপ্নেই ঘটে।



জার্মান কালচারাল সেন্টারে ছবির এক্সিবিশন।

সুভেনিয়ারে লেখা— 'Sunrise 71'। পঞ্চাশটি নানা মাপের ছবি। মীরা সুভেনিয়ার হাতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। মীরার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই— মইন

তার সঙ্গে আছে। লোকজন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে মইনের দিকে। তাকে পুরো বিদেশী বলে মনে হচ্ছে। মইন প্রায় ছ' ফুটের মতো লম্বা। মাথার বেশিরভাগ সাদা হওয়ায়- চুলে লালচে কালো রং দিয়েছে। লাল চুলের ধবধবে ফর্সা এ- মানুষ। পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির উপর কাজ করা, গাঢ় লাল রঙের চা- এমন চাদর পরতে যথেষ্ট সাহস লাগে। মইনের সাহসের কোনো অভাব নেই। বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে। চোখের কোল ঈষৎ ফোলা। এ ছাড়া চেহারা বয়সের কোনো ছাপ নেই। মীরার সঙ্গে মইনের দেখা এগারো বছর পর। এগারো বছর আগে এক মেঘলা দুপুরে মীরার মনে হয়েছিল, এই মানুষটিকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। এই মানুষটি আছে বলেই পৃথিবী আছে, চন্দ্র-সূর্য আছে। এই মানুষটি পৃথিবীতে আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর।

মইন বেশ উঁচু গলায় বলল, ইন্টারেস্টিং!

তার আশপাশে যারা ছিল সাবই তাকাল। মীরার চোখে চোখ রেখে বলল, একান্তরের স্বাধীনতায়ুদ্ধ নিয়ে ছবি অথচ সব ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। মজার ব্যাপার না মীরা?

মীরা কিছু বলল না।

মইন আগের মতোই উঁচু গলায় বলল, আমি এই এক মাসে তিনটা ছবির এক্সিবিশন দেখলাম। তিনটাতেই দেখি ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে। সম্ভবত আর্টিস্টরা তাদের ছবির জন্য বাংলা ভাষাকে যোগ্য মনে করে না।

মীরা বলল, চুপ করুন তো। আপনাকে নিয়ে কোথাও যাওয়াই মুশকিল। আর্টিস্টদের নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে।

সেই যুক্তিটা শুনতে চাচ্ছি। তুমি কি জানো?

না, আমি জানি না। চলুন যাই বেরিয়ে পড়ি। আর ভাল্লাগছে না।

আমার তা ভালোই লাগছে। একটা ছবি কিনব বলে ভাবছি। ছবি কেনা কায়দা-কানুন তুমি জানো? কার সঙ্গে কথা বলব?

আমি জানি না কার সঙ্গে কথা বলবেন। ঐ যে ডেকের কাছে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন— উনাকে জিজ্ঞেস করুন। উনিই আর্টিস্ট।

বুঝলে কী করে?

সুভেনিয়ারে উনার ছবি আছে।

মইন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। ইংরেজিতে নিখুঁত ব্রিটিশ উচ্চারণে যা বলল তার বঙ্গানুবাদ হলো, স্বাধীনতা বিষয়ক আপনার ছবিগুলো দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। এ দেশের শিল্পীরা যে স্বাধীনতা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে তা বোঝা যায়। আপনার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে একটি খুবই পছন্দ হয়েছে— ছবির নাম 'দ্য বায়োনেট'। আমি ছবিটি কিনতে চাই। ইউএস ডলারে আমাকে কত দিতে হবে?

আর্টিস্ট ভদ্রলোক খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। কী বলবেন তা ইংরেজিতে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারলেন না। শুধু বললেন— জাস্ট এ মিনিট। তিনি ব্যাকুল হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। সম্ভবত ইংরেজি জানা পরিচিত কাউকে খুঁজছেন যিনি বাঙালি পোশাক-পরা এই বিদেশীর সঙ্গে ছবির দরদাম নিয়ে কথা চালাতে পারবেন।

মইন আবার আগের মতোই ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল, Is there any problem sir?

আর্টিস্ট অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললেন, জাস্ট এ মিনিট। My English very bad.

মইন আবার বাংলায় বলল, আপনার ইংরেজির জ্ঞান অল্প, তাহলে ছবির ক্যাপশন ইংরেজিতে দিয়েছেন কেন? আপনি রাগ করবেন না। কৌতূহল থেকে প্রশ্ন করছি। অনেকদিন দেশের বাইরে ছিলাম, দেশের নিয়ম-কানুন জানার চেষ্টা করছি।

মইন ভেবেছিল আর্টিস্ট রেগে যাবে। রেগে গেলেই লজিকবিহীন উল্টাপাল্টা কথা শুরু করবে। তখন মোটামুটি একটা ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশান হতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, আর্টিস্ট একেবারেই রাগ করল না, বরং হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, আপনাকে দেখে আমেরিকান ভেবেছিলাম। আজকাল আমেরিকানরা খুব পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। শাল গায়ে দিয়ে ভাবে— এ দেশের সংস্কৃতি শিখে ফেলছে। আমি ভাই আপনার ইংরেজি শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম। আমি সরাসরি ইংরেজি বলতে পারি না। প্রথমে বাংলায় চিন্তা করি তারপর মনে-মনে ট্রান্সলেশন করি। মেট্রিকে ইংরেজিতে কত পেয়েছিলাম জানেন? চৌত্রিশ। একেবারে কানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে।

আপনি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি।

দিচ্ছিরাে ভাই দিচ্ছি। আমার সাথে বারান্দায় আসেন। বারান্দায় চা খেতে খেতে আপনাকে বুঝিয়ে দেই।

মইন বারান্দায় চলে এলো। আর্টিস্ট হাসিমুখে বললেন, আর্ট কলেজ থেকে বের হয়েছি চার বছর আগে। কোনো চাকরি-বাকরি নেই। ছবির এক্সিবিশন করি, কিছু ছবি বিক্রি হয়, তা দিয়ে দিন চলে। ঐসব ছবি কারা কিনে— বিদেশীরা। আমাদের দেশের মানুষরা ভাত খেতে পারে না— ছবি কিনবে কী? ঐ বিদেশীদের জন্যই ক্যাপশনগুলো ইংরেজিতে লেখা।

আপনার যুক্তি গ্রহণ করা যায়।

তাহলে আরেকটা কথা শুনে যান— সুভেনিয়ারে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায়ও ছবির নাম দেয়া আছে। আমাকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে আপনি এতই উল্লসিত ছিলেন যে ব্যাপারটা লক্ষ করেন নি।

সরি।

আপনাদের মতো লোকজন যারা সারাজীবন বাইরে থাকে— মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য দেশে আসে এবং দেশের প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি মমতায় অসম্ভব কাতর হয়ে পড়ে— তাদেরকে আমি কী মনে করি জানতে চান?

না জানতে চাই না। এই জানাটা আমার জন্য খুব আনন্দজনক হবে না তা বুঝতে পারছি।

জানতে না চাইলে বলব না। ছবি কি সত্যি সত্যি কিনবেন না চাল দেখালেন?

কিনব। সত্যি সত্যি কিনব।

ছবির দাম দশ হাজার টাকা। ইউ.এস. ডলারে আপনি দু’শ’ ডলার দিলেই হবে। বন্ধু হিসেবে এটা হলো আমার কমিশন।

মইন দুটি এক শ’ ডলারের নোট বের করল।

আর্টিস্ট নির্লিপ্ত গলায় বলল, এক্সিবিশন আরও তিনদিন চলবে। থার্ড ডে-৩৩ বিকেলে যদি আসেন ছবি নিয়ে যেতে পারবেন। কিংবা আপনার ঠিকানা দিয়ে গেথে ছবি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

আমি নিজেই আসব। চা খাবার কথা বলে বারান্দায় এনেছিলেন। চা কোথায়? চা আসছে। একটু অপেক্ষা করুন।

কাউকে চায়ের কথা বলেছেন— এমন শুনি নি কিন্তু।

কাউকে বলি নি তবে ব্যবস্থা করা আছে। রাস্তার ওপাশে ঐ যে চায়ের দোকান দেখছেন ওদের বলা আছে— যখনই আমাকে বারান্দায় দেখবে, চা নিয়ে আসবে।

মইন লক্ষ করল, একটা বাচ্চা ছেলে দু'কাপ চা নিয়ে সত্যি সত্যি আসছে।

মইন জার্মান কালচারাল সেন্টারে গাড়ি নিয়ে এসেছিল।

মীরাকে বলল, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলে কেমন হয়? রিকশা নিয়ে খানিকক্ষণ ঘুরি, কেমন? খিদেটা ভালোমতো জমুক, তারপর কোনো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাবে। এখন বাজে মাত্র বারোটা দশ। একটা-দেড়টার দিকে খাওয়া-দাওয়া করব, কেমন?

আজ বাদ দিলে কেমন হয়। কেন জানি ভালো লাগছে না, খুব ক্লান্ত লাগছে।

ভালো না লাগলে অবশ্যি প্রোগ্রাম বাতিল করে দিতে হবে। তবে দ্বিতীয়বার আর এই প্রোগ্রাম করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। নয় তারিখ আমি চলে যাচ্ছি।

টিকিট পেয়ে গেছেন?

ইয়েস মাই ফেয়ার লেডি।

বেশ, তাহলে চলুন রিকশা করে খানিকক্ষণ ঘুরি।

রিকশায় উঠতে উঠতে মইন বলল, তুমি খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে যাচ্ছ— কোনো অসুবিধা নেই। অনিচ্ছা দূর হয়ে যাবে। আমি একজন ভালো কোম্পানিয়ন, আশা করি তা স্বীকার করো।

জি স্বীকার করি।

একসময় আমার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে— এটাও বোধহয় ভুল না।

না ভুল না। অপেক্ষা করতাম। যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখনই আপনাকে দেবতার মতো মনে হতো।

এখন মনে হয় না?

না।

এখন কী মনে হয়?

এখন সাধারণ একজন মানুষ বলে মনে হয়।

সাধারণ?

হ্যাঁ সাধারণ এবং একটু বোকা।

মইন বিস্মিত হয়ে বলল, বোকা! এই প্রথম কেউ আমাকে বোকা বলল।

মীরা সহজভাবে বলল, আমিই বুঝি প্রথম বললাম? আমার ধারণা ছিল আমার আগেও আরও কেউ বলেছে।

না বলে নি। তুমি কী কারণে আমাকে বোকা বলেছ একটু ব্যাখ্যা করো তো।

আপনার মধ্যে একটা লোক-দেখানো ব্যাপার আছে। প্রবলভাবেই আছে।

আপনার মেধার একটি বড় অংশ আপনি ব্যয় করেন কীভাবে লোকদের ইমপ্রেস করবেন তার কায়দা-কানুন বের করার জন্য। এই যে আর্ট গ্যালারিতে নাটকটা করার চেষ্টা করলেন তার পেছনে একই জিনিস কাজ করেছে। এই যে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশা নিলেন তার পেছনেও আমাকে ইমপ্রেস করার ব্যাপার আছে। আছে না? আপনি নিশ্চয় ভাবছেন— এই কাণ্ডটা করার ফলে আমি ভাবব— মানুষটা সাধারণ আর দশটা মানুষের মতো না।

মইন বলল, আমি কি সিগারেট ধরাতে পারি?

পারেন।

আশা করি ধোঁয়ায় তোমার অসুবিধা হবে না।

না, হবে না।

মইন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তুমি অসম্ভব স্মার্ট হয়েছ। ভেরি ভেরি স্মার্ট।

আপনি কি ভেবেছিলেন এখনও আমি ক্লাস টেনের ছাত্রী?

তা ভাবি নি। তবে...

তবে কী?

এ-রকম স্মার্টনেসও আশা করি নি। স্মার্টনেসের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কার্টিন্যও চরিত্রে চলে এসেছে— আই লাইক ইট। হাসছ কেন মীরা?

‘আই লাইক ইট’ শুনে হাসলাম। মনে আছে আপনি প্রায়ই ‘আই লাইক ইট’ বলতেন?

বলতাম নাকি? আমার মনে নেই। রিকশায় ঘুরতে ভালো লাগছে না, চল কোথও গিয়ে বসি। রিকশায় কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না। মুখ দেখা যায় না। তাকিয়ে থাকতে হয় রিকশাওয়ালার পিঠের দিকে।

মীরা বলল, আমার কিন্তু রিকশায় ঘুরতে ভালোই লাগছে। মাথা ধরেছিল। মাথাধরাটা এখন গেছে।

তাহলে চলো খনিকক্ষণ ঘুরি। এক কাজ করি— রিকশা করেই গুলশানে যাই। গুলশানে সি ফুডের ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। লবস্টার খাওয়া যাবে।

মীরা কিছু বলল না।

মইন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মীরার হাঁটুতে হাত রেখেছে। তার মনে কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচ নেই। মীরাও কোনোরকম অস্বস্তিবোধ করছে না।

মীরা।

জি।

আমার রিকশা নেবার পেছনে যে যুক্তি তুমি দিয়েছ তা পুরোপুরি ঠিক না। রিকশার সবচে’ বড় সুবিধা হচ্ছে— ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার সুযোগ পাওয়া যায়। এই যে আমি আমার বাঁ হাত তোমার হাঁটুতে রাখলাম— এটাও খুব অস্বাভাবিক লাগছে না তোমার কাছে। কারণ, আমার এই হাত রাখার জায়গা নেই। হা-হা-হা।

মীরা বলল, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার কোনো বাসনা কি কখনও আপনার মধ্যে ছিল?

মইন বলল, ছিল না। যখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন তুমি ছিলে নিতান্তই বালিকা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তাভাবনায় তোমার মাথাটা ছিল ঠাসা। তা

ছাড়া আমার প্রতি তোমার আগ্রহ ছিল এতই প্রবল, এতই তীব্র যে, আমার আগ্রহ অপ্রয়োজনীয় ছিল।

এতদিন পর আপনারই বা হঠাৎ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার ইচ্ছা হলো কেন?

জানি না। বয়স হয়েছে বলেই হয়তো। অবশ্যি তুমি অনেক সুন্দর হয়েছ। বালিকা বয়সে তোমার চেহারা দিশাহারা দিশাহারা ব্যাপার ছিল— তাতে তোমাকে খানিকটা হলেও পাগলের মতো দেখাত।

এখন দেখাচ্ছে না?

না।

মীরা হাক্কা গলায় বলল, বালিকা বয়সে আমি দিশাহারা ছিলাম না। আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার জন্য আপনি ছিলেন। এখন আমি দিশাহারা।

দিশাহারা হলেও চেহারা কিছু তার ছাপ নেই। এখন তোমার কথা বলো। আমি সিগারেট ধরিয়ে সিগারেট টানব। তুমি কথা বলতে থাকবে, আমি শুনব। একসময় আমি কথা বলতাম— তুমি হা করে শুনতে; এখন তুমি বলবে— আমি শুনব।

রিকশাওয়ালাও শুনবে।

শুনুক, ক্ষতি কী? তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। হলেও কিছু যায় আসে না। অবশ্যি তুমি ইংরেজিতেও বলতে পারো।

আমার বলার মতো কিছু নেই।

বিয়ে করছ, সেই খবর পেয়েছিলাম।

পাওয়ারই তো কথা। আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম।

তোমার একটা বাচ্চা মারা গেছে, এই খবর কিন্তু জানাও নি। দেশে এসে শুনলাম। মাই ডিপেস্ট সিমপ্যাথি।

মীরা কিছু বলল না। মুখের উপর সরাসরি রোদ এসে পড়েছে। কপাল বিড়বিড় করছে।

মীরা।

জি।

তোমার ম্যারেজ ব্রেকডাউন করল কেন বলো তো? আমি বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ স্পেসিফিক্যালি কিছু বলতে পারে না। তোমার রড় ভাই জালাল সাহেবকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনিও কিছু বলতে পারেন নি। শুধু বলেছেন— লোকটা গাধা টাইপের। তাকে মানুষ বলে খায় না। সে হচ্ছে ফার্নিচারের মতো। সত্যি?

খানিকটা সত্যি।

তোমার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে জেনেশুনে একটা ফার্নিচার বিয়ে করবে।

আমি বুদ্ধিমতী না। বুদ্ধিমতী হলে আপনাকে জান্য এমন পাগল হতাম না।

একসময় আমার জন্য পাগল হয়েছিলে তার জন্য এখন কি তুমি রিপেনটেড?

না, রিপেনটেড না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিল এটা। আর আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি এখন চুপ করে থাকব।

মীরা সত্যি সত্যি চুপ করে গেল। রেস্টুরেন্টেও তেমন কিছু বলল না। মইন হড়বড় করে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। মীরার কেন জানি মনে হয়েছিল মইনের

এখন আর তাকে আকর্ষণ করবে না। দেখা গেল— তা নয়। এগারো বছর আগেও মইনের গল্প শুনতে তার ভালো লাগছে। শুধু ভালো না, অসম্ভব ভালো লাগছে। তার কারণ কী? বালিকা বয়সের তীব্র আবেগের স্মৃতির কারণে? এই আবেগের একটি অংশ কি এখনও রয়ে গেছে?

এবলে মীরা, যদিও তুমি আমাকে আধঘণ্টা আগে বোকা বলেছ— আমি বোকা হই। কারণ, আমি যুক্তি দিয়ে চারপাশের জগৎ বুঝতে চেষ্টা করি। একজন বোকা তা পারে না। আমি যদি আবেগ দিয়ে সবকিছু বিচার করতাম তাহলে হয়তো এগারো বছর আগে তোমাকে বিয়ে করতাম। তার ফল খুব শুভ হতো না। আমরা মিলেপেটেবল না। তেল এবং জলের মতো ঝাঁকিয়ে মেশানো যায়। কিছুক্ষণ রাখলেই আলাদা হয়ে যায়।

আমি অনেক ভেবেচিন্তে এক আমেরিকান তরুণীকে বিয়ে করেছি। আমেরিকান তরুণীরা এশিয়ান পুরুষদের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে। কারণ তারা জানে এশিয়ানরা বিবাহবিচ্ছেদ জিনিসটা খারাপ চোখে দেখে। সহজে বিবাহবিচ্ছেদ করতে চায় না। আমেরিকান তরুণীরা সঙ্গত কারণেই স্থায়ী সম্পর্কে যেতে চায়।

আমার স্ত্রী মিশেলের হোমটাউন হচ্ছে— নিউ অরলিন্স। বাবা কোটিপতি। মার্মিং করে মিলিওনিয়ার হয়েছে। তার বিপুল অর্থের একটা অংশ আমার স্ত্রী পাবে। বিয়ের সময় এটিও আমার হিসেবে ছিল।

ধনী স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অনেকাংশে ক্ষমা করার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, দোষ-ত্রুটি তার কিছুই নেই। চমৎকার একটি মেয়ে, A loving and caring wife. এখন আমার তিনটি বাচ্চা। মিশেল তার বাচ্চাগুলোকে পাগলের মতো ভালোবাসে। আমাকে দেবতা মনে না করলেও দেবতার কাছাকাছি মনে করে এবং আমাকে খুশি করার জন্য যা করে তাকেও পাগলামির পর্যায়ে ফেলা চলে। একটা উদাহরণ তোমাকে দেই। তোমার বোরিং লাগছে না তো মীরা?

না, বোরিং লাগছে না। ঝগড়াঝাঁটির গল্প হলে বোরিং লাগত।

একবার মিশেল বলল, তোমার আসছে জন্মদিনে তোমাকে আমি চমৎকার একটা উপহার দেব। এত চমৎকার যে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। আমি বললাম, খুব এক্সপেনসিভ গিফট? সে বলল, মোটেই এক্সপেনসিভ নয়— তবে অসম্ভব। আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। জন্মদিন এসে গেল। মিশেল বলল, তোমার জন্মদিনের উপহার হলো, আমি এখন বাংলায় কথা বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারি। তোমাকে খুশি করার জন্য আমি একটি বাঙালি পরিবারের কাছে গত আট মাস ধরে বাংলা শিখছি। তুমি এখন বাংলায় আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো। এই বলেই সে পরিষ্কার বাংলায় বলল— মইন, আমি ভালোবাসি তোমাকে। অল্প নয়। বেশি পরিমাণে ভালোবাসি।

মীরা হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মইন ভাই। আপনার স্ত্রীর ছবি কি আপনার কাছে আছে? একটু দেখান না।

মিশেলের ছবি আমার কাছে নেই। থাকলে দেখতাম। She is quite pretty. তুমি তো কিছুই খাও নি মীরা!

কেন জানি খেতে ভালো লাগছে না।

তুমি খুব ডিসটার্বড?

না।

তোমার বড়ভাই বলছিলেন তুমি নাকি খুব ব্যস্ত হয়ে চাকরি খুঁজছ?

হ্যাঁ খুঁজছি।

আমি যদি তোমার জন্য একটা চাকরি যোগাড় করে দেই তাহলে কেমন হয়?

ভালোই হয়।

সব মিলিয়ে সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার পাবে।

অনেক টাকা।

বড় একটা কোম্পানির পিআরও— জনসংযোগ। এইসব কাজ মেয়েরা খুব ভালো পারে।

আমিও ভালোই পারব। চলুন আজ তাহলে উঠি?

আরেকটু বসো। আইসক্রিম খাও। আইসক্রিম খাবে?

না।

আমি তোমাকে ছোটখাটো একটা সারপ্রাইজ দেবার ব্যবস্থা করেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তুমি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস্ দেখো।

মীরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চিঠিটা নিল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখল। রেগে দিল তার হ্যান্ডব্যাগে। হান্কা গলায় বলল, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

মইন নিচু গলায় বলল, তোমার বিষয়ে আমার মনে বড় ধরনের অপরাধবোধ আছে। তোমার জন্য সামান্য কিছু করতে চাচ্ছি অপরাধবোধ খানিকটা হলেও কমানোর জন্য।

মীরা শীতল গলায় বলল, অপরাধবোধ কেন?

মইন চুপ করে রইল।

মীরা আবার বলল, অপরাধবোধ কী জন্য পরিষ্কার করে বলুন।

থাক বাদ দাও। চল ওঠা যাক।

মীরা উঠল না। চেয়ারে বসেই রইল। তার চোখ ছোট হয়ে এসেছে। ভুরু দুটো কাছে ঈষৎ ঘাম। হাতের পাতলা আঙুলগুলো অল্প অল্প কাঁপছে। এগারো বছর আগের এক দুপুরে এই পৃথিবী হঠাৎ তার কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল সে মারা যাচ্ছে। এক ধরনের অদ্ভুত কষ্ট, অদ্ভুত আনন্দ। সে চুপি চুপি তাদের কলাবাগানে ফ্ল্যাটের তিনতলায় উঠে গেল। সেই ফ্ল্যাটের দরজা সব সময়ই খোলা থাকে। মীরা ঘরে ঢুকে দেখল, ঠাণ্ডা মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে মইন ভাইয়ের মা শুয়ে আছেন। মীরাকে ঢুকতে দেখে বললেন, আয় দি, আয়। কী গরম পড়েছে দেখেছিস। শরীরের সব চর্বি ঘাম হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মীরা কোনোমতে বলল, মইন ভাই কোথায় খাওয়া?

তিনি ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, আছে বোধহয় তার ঘরে। ঠাণ্ডা পানি চাচ্ছিল। মা, ফ্রিজ থেকে একটা পানির বোতল দিয়ে আয় তো।

মীরা পানির বোতল ছাড়াই ঘরে ঢুকেছিল।

সেই নির্জন ঘুমকাতর দুপুর। বারান্দায় রেলিঙে কা-কা করে একঘেয়ে স্বরে কাক ডাকছে। মাথার উপর কর্কশ শব্দে ঘুরছে ফ্যান। মইন ভাই উবু হয়ে কী যেন লিখছেন।

মইন ভাই পায়ের শব্দে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, হোয়াট এ সারথ্রাইজ! কী ব্যাপার মীরা!

মীরা কোনো মতে চাপা গলায় বলল, আপনাকে দেখতে এসেছি।

এগারো বছর আগে ঐ ঘরে যা ঘটেছিল তার জন্য মীরার মনে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে অনেকবার ভেবেছে। নানাভাবে ভেবেছে। প্রতিবারই মনে হয়েছে— তাকে যদি আবার এই জীবন নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেয়া হয় সে এই ভুল আবারও করবে। আগ্রহ ও আনন্দ নিয়েই করবে।

মীরা বাসায় ফিরল সন্ধ্যায়।

মীরার ভাবি বললেন, জাহানারা নামে একটা মেয়ে টেলিফোন করেছিল। বলল, মনজুর খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে।

মীরা বলল, ও আচ্ছা।

দেখতে যেতে চাও?

আজ আর যাব না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

জাহানারা মেয়েটা কে? তিন বার টেলিফোন করেছে।

ওর অফিসে কাজ করে— টাইপিস্ট।

বলেছে রাত আটটায় আবার টেলিফোন করবে।

আমাকে চাইলে বলবে আমি বাসায় নেই।

মীরা তার ঘরে ঢুকে সুইচে হাত দিয়ে শক খেল।

সুইচ ঠিক করা হয় নি। গত দু'দিন ধরে তার ঘরের সুইচ নষ্ট। বাতি জ্বলছে না। দিনের বেলা সমস্যা হয় না। রাতে অন্ধকার ঘরে ঢুকতে হয়। মশারি ফেলতে হয় অন্ধকারে। দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানায় ওঠার পর চারপাশের অন্ধকার ভয়াবহ লাগে। এক বিন্দু আলোর জন্য প্রাণ ছটফট করতে থাকে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে চোখ বন্ধ করে কল্পনায় আলো-ঝলমল দিন দেখা। ভাগ্যিস কল্পনা করার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে পাঠানো হয়েছিল।

মীরা!

মীরা চমকে পেছনে তাকাল। অন্ধকারে মানুষ খুব সহজেই ভুলে যায়। তা ছাড়া কাপড়ের অদ্ভুত এক জোড়া স্যান্ডেল পরে জালালউদ্দিন আজকাল নিঃশব্দে হাঁটা শুরু করেছেন। আচমকা উপস্থিত হন, চিকন গলায় 'মীরা' বলে এমনভাবে ডাকেন যে কঁপে উঠতে হয়।

তোর ঘরের সুইচ আজও ঠিক করা হয়নি। দোষ আমার। আমি ইলেকট্রিশিয়ানকে খবর দিতে ভুলে গেছি।

মীরা বলল, নো প্রবলেম।

একটা টেবিল ল্যাম্প লাগিয়ে দিয়ে গেছি। দেখ তো জ্বলে কিনা।

টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা তা দেখার জন্য এত রাতে ভাইয়া তার ঘরে আসবে এটা মীরা আশা করে না। নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে। এমন কোনো বিষয় যা সহজভাবে বলা যায় না। যার জন্য অজুহাত তৈরি করে ঘরে আসতে হয়।

মীরা, ল্যাম্পটা কি জ্বলছে? এটার সুইচটাও খারাপ, খুব জোরে চাপ দে। জ্বলছে?

হুঁ। ভাইয়া এসো ঘরে এসো।

জালালউদ্দিন বললেন, রাত সাড়ে দশটা বাজে— এখন তোর ঘরে ঢুকে কী করব। তুই ঘুমাতে যা। আমি ঘুমাব।

তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলো।

জালালউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার আবার কী বলার থাকবে? তুই কি কিছু বলতে চাস?

না।

তাহলে ঘুমিয়ে পড়। ও আরেকটা কথা, চাকরির জন্য তোর ছোট্টাছুটি করার কোনো দরকার নেই। মাসে মাসে তোকে যে হাতখরচ দেই সেটা সামনের মাস থেকে ডাবল করে দেব।

কোনো দরকার নেই ভাইয়া। চাকরি একটা পেয়েছি।

সে-কি!

তোমাকে বলেছিলাম না, একজন স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট তরুণীর চাকরি পাওয়া খুবই সহজ।

বেতন কত?

বেতন কত, কী চাকরি— সবই বলব, আগে জয়েন করে নিই। তোমার পিঠের ব্যথার অবস্থা কী?

ব্যথা এখন নেই। স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার কি জানিস, ব্যথাটা দিনে থাকে— রাতে থাকে না। তুই তো সবকিছুতেই একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলিস, এই ব্যাপারে তোর যুক্তি কী?

কোনো যুক্তি নেই। তুমি ঘুমাতে যাও। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। তবে তোমার যদি বিশেষ কিছু বলার থাকে তাহলে ভেতরে আসো। আমার ধারণা তুমি কিছু বলতে চাও। আমার ঘরের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলে কিনা সেই খোঁজে তুমি আসবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জালালউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, তোর সবচে' বড় সমস্যা কি জানিস? সবচে' বড় সমস্যা হচ্ছে তোর ধারণা তুই সবকিছু বুঝে ফেলিস। যেখানে বোঝার কিছু নেই সেখানেও তুই A থেকে Z পর্যন্ত বুঝে ফেলেছিস।

রাগ করছ কেন?

রাগ করছি না। সত্যি সত্যি টেবিল ল্যাম্প জ্বলে কিনা দেখতে এসেছিলাম, তুই তারও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেললি!

তুমি যে প্রচণ্ড রাগ করছ তা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমার ব্যাখ্যা ঠিক আছে। ব্যাখ্যা ভুল হলে মোটেই রাগ করতে না।

তুই তোর ব্যাখ্যা নিয়ে থাক। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।

যে কাপড়ের স্যাডেলে তিনি নিঃশব্দে হেঁটে গেছেন সেই স্যাডেলেই তিনি শব্দ করে হেঁটে নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। রাগে তাঁর গা জ্বলে যাচ্ছে, কারণ মীরার কথা সত্যি। তিনি আসলেই মীরার সঙ্গে জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করতে এসেছিলেন।

তিনি বলতে এসেছিলেন মীরা যেন মনজুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য হাসপাতালে না যায়। অসুখ অবস্থায় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। মনজুরেরও

মাথার ঠিক নেই। সে আবোল-তাবোল অনেক কিছু বলে ফেলতে পারে। এইসব শুনে মীরার যদি মনে হয়— ডিভোর্স নেয়া ঠিক হয় নি, তাহলেই সর্বনাশ। সম্পর্ক তেঁদের পরের এক মাস খুবই সর্বনেশে মাস। এই এক মাস কেটে যাওয়া সম্পর্কের অন্য মন হা-হা করতে থাকে। তিনি নিজের চোখে বন্ধু ফজলুকে দেখেছেন। স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত ঝগড়া, কিছুতেই বনিবনা হয় না। ফজলু উত্তরে গেলে তার স্ত্রী যায় দক্ষিণে। ফজলু যদি কোনো ব্যাপারে ‘হ্যাঁ’ বলে তার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে পরপর তিন বার বলবে ‘না’। একসময় ফজলু বলল, তোমার সঙ্গে বাস করা সম্ভব হচ্ছে না। এই এক বারই দেখা গেল তার স্ত্রীরও এই অভিমত। ডিভোর্স হয়ে গেল। ফজলু হাসতে হাসতে জালালউদ্দিনকে বলল, ভাই বাঁচলাম। জীবন প্রায় যেতে বসেছিল। এখন নিজেকে মনে হচ্ছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো।

সেই মুক্ত বিহঙ্গকে দেখা গেল ডিভোর্সের দশদিন পর তার স্ত্রীর বাবার বাড়ির সামনের রাস্তায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে। মাথার চুল এলোমেলো, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। হাতে সিগারেটের প্যাকেট। একটার পর এটা সিগারেট ধরাচ্ছে, কয়েকটা টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনেও একই অবস্থা। তার স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে এলো এবং কঠিন গলায় বলল, কী চাও তুমি? ফজলু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, বাসায় চলো।

বাসায় যাব মানে? কী বলছ তুমি?

ফজলু আবারও বলল, বাসায় চলো।

তোমার মাথা আগেই খারাপ ছিল, এখন তো মনে হয় আরও খারাপ হয়েছে। বাসায় কী করে যাব? পাগলের মতো কথা বলছ কেন?

ফজলু একটা রিকশা দাঁড় করাল এবং তৃতীয়বার বলল, বাসায় চলো।

তার স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, শাড়িটা বদলে আসি। এই শাড়ি পরে যাব নাকি?

এখনও তারা একসঙ্গেই আছে। দুটি বাচ্চা হয়েছে। মনের মিলের ছিটেফোঁটাও নেই। ঝগড়াঝাঁটি দশ গুণ বেড়েছে। তা নিয়ে ফজলুর মাথাব্যথা নেই। জালালউদ্দিনের ধারণা, মীরার ব্যাপারেও তাই হবে। যদিও মীরা আর দুইটা মেয়ের মতো না। বেশ খানিকটা অন্য রকম, তবু শেষ পর্যন্ত তাই হবে। বিছানায় শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে মনজুর কিছু-একটা বলতেই মীরার চোখে শ্রী এসে যাবে। সে আর হাসপাতাল থেকে নড়বে না। সেটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে।

তিনি একেবারে গোড়া থেকেই এই ছেলেটাকে বিয়ে না করার জন্য মীরাকে বলেছিলেন। মীরা তাঁর কথা শোনে নি। কোনোরকম প্রতিজ্ঞিতে কান দেয় নি। আজ তার ফল মীরা কি হাতে হাতে দেখছে না? বেশ বুঝলে তার ফল এই হয়। জালালউদ্দিনের মতিঝিলের অফিসে একদিন মীরা এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, ব্যাপার কী রে?

মীরা বলল, তুমি কি খুব ব্যস্ত?

ব্যস্ত তো বটেই। তুই চাস কী?

পনেরো মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলব।

জরুরি কিছু?

অবশ্যই জরুরি। বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি।

জালালউদ্দিন অসম্ভব খুশি হলেন। হাসতে হাসতে বললেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো? চিরকুমারী থাকব, নিজের মতো থাকব—ঐ পোকাগুলো মাথা থেকে নেমেছে?

হ্যাঁ নেমেছে।

ছেলেটা কে? আমি চিনি?

না, তুমি চেন না—আমি নিজেও চিনি না।

আমি নিজেও চিনি না মানে? তোর সঙ্গে পরিচয় নেই?

পরিচয় আছে। পরিচয় থাকলেও তো সবাইকে চেনা যায় না। ও এই রকম।

ছেলেটা সম্পর্কে বল তো শুনি।

নাম হচ্ছে মনজুর।

নাম যাই হোক—ছেলেটা কী। কী করে? পড়াশোনা কী?

মোটামুটি ধরনের একটা চাকরি করে—প্রাইভেট ফার্মে। পড়াশোনা কী জিজ্ঞেস করি নি। বি.এ. পাস নিশ্চয়ই।

পরিচয় কত দিনের?

খুব বেশি হলে দু'মাস।

ফ্যামিলির অবস্থা কী?

ফ্যামিলি নেই—আর ফ্যামিলির অবস্থা।

ফ্যামিলি নেই মানে?

বাবা-মা ভাই-বোন নেই। মা মারা গেছেন দু'বছর বয়সে, বাবা ষোলো বছর বয়সে।

সে-কি!

মীরা খুব শান্ত গলায় বলল, এই ব্যাপারটাই আমাকে খুব আকর্ষণ করেছে। ভালোবাসাহীন পৃথিবীতে সে মানুষ হয়েছে। অতি প্রিয়জন সে কাউকে কখনও পায় নি। এই প্রথম পাবে। প্রবল আবেগ ও ভালোবাসায় সে বাকি জীবনটা আচ্ছন্ন থাকবে।

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, উল্টোটাও তো হতে পারে—ভালোবাসা কী এই ছেলে জানেই না। ভালোবাসবে কী?

না জানলে তো ভাইয়া আরও ভালো। আমি তাকে ভালোবাসা শেখাব।

জালালউদ্দিন চিন্তিত মুখে বললেন, তোর ব্যাপার কোনোটাই আমার কখনও পছন্দ হয় নি; এটিও হচ্ছে না। আরও ভালোমতো আলোচনা করব। তুই চা খাবি?

খাব। চা খেতে খেতে তুমি কি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে? ওকে নিয়ে এসেছি।

নিয়ে এসেছিস!

হঁ। বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ঠিক করে রেখেছি চা খাবার সময় তাকে ডাকব। চা খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র বিদায় করে দেব। তোমার সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ কথা বলব। তুমি ছেলেটিকে দেখার পর কী বোধ করছ তা শুনব।

দেখার আগেই বলছি আমার পছন্দ না।

মীরা মানিব্যাগ থেকে মুখ-বন্ধ একটা খাম বের করে ভাইয়ের হাতে দিয়ে হাল্কা গলায় বলল, ছেলেটিকে দেখার পর, তার সঙ্গে কথা বলার পর তুমি যা বলবে তা আমি লিখে এনেছি। তুমি দেখবে কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। খামটা এখন খুলবে না ভাইয়া।

জালালউদ্দিন খাম হাতে বসে রইলেন। মীরা বারান্দা থেকে মনজুরকে নিয়ে এলো। তিনি ছেলেটির মধ্যে এমন কিছুই পেলেন না যা দেখে খুব উৎসাহ বোধ করা যায়। গায়ে চকলেট রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট, ধবধবে সাদা প্যান্টের উপর ভালোই দেখাচ্ছে। চুল আঁচড়ানো, চেহারা মোটামুটি। চোখ-মুখে এক ধরনের অনাগ্রহ যা এই বয়সী ছেলেদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না।

জালালউদ্দিন লক্ষ করলেন, ছেলেটি তাকে ঠিক পাত্তা দিচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে সে যে তা করছে তা হয়তো না। তার স্বভাবই হয়তো এ-রকম। তিনি বসতে বলার আগেই সে চেয়ার টেনে বসল।

তিনি যখন বললেন, চা, না কফি?

সে বলল, কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

জালালউদ্দিন সিগারেট বের করে বললেন, চলবে?

সে কোনো কথা না বলে সিগারেট নিল। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার ভাইয়ের কাছ থেকে এ-রকম সহজভাবে সিগারেট নেয়া যায় না। সামাজিক কিছু ব্যাপার আছে।

মীরা বলল, ভাইয়া এর নাম মনজুর।

তিনি শুকনো গলায় বললেন, শুধু মনজুর? আগে-পেছনে কিছু নেই? আহম্মদ বা মোহাম্মদ?

মনজুর বলল, জি-না।

সে-কি!

মনজুর বলল, বাবা ডাকনাম রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন, ভালো নাম রাখার সুযোগ পান নি। আমার ডাকনাম মঞ্জু। স্কুলের খাতাতে আমার নাম ছিল মঞ্জু। এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় হেড স্যার বললেন, মঞ্জু নাম তো দেয়া যায় না; এটাকে মনজুর করে দেই। মনজুর হোসেন। হোসেন আমার খুবই অপছন্দ কিন্তু তা বলতে পারলাম না কারণ হেড স্যারকে খুব ভয় পেতাম।

তাহলে তো আপনার নাম মনজুর হোসেন। মনজুর বলছেন কেন?

এডমিট কার্ড যখন আসলো তখন দেখা গেল হেড স্যার আমার নামের শেষে হোসেন দিতে ভুলে গেছেন। আমার আগে যে ছিল জহির আহম্মদ, তার নামের শেষে হোসেন লাগিয়ে দিয়েছেন। সেই বোচারার নাম এখনি জহির আহম্মদ হোসেন।

জালালউদ্দিন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। গল্পটা শুনি খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না।

একদল মানুষ আছে যাদের ভাগ্যে এ-রকম প্যাঁচেক গল্প থাকে। গল্পগুলো বলে তারা আলাপে লোকজনদের মুগ্ধ করে। সত্যি ভাবে— বাহ্ বেশ! এই লোকটা রসিক তো। কিন্তু রস যে এই প্যাঁচটিতেই সীমাবদ্ধ তা তারা জানতে পারে না।

তার মনে হলো— ছেলেটা কথাও বেশি বলে। নাম জিজ্ঞেস করলে যে লম্বা গল্প ফেঁদে বসে, সে তো সারাক্ষণই বকবক করবে। শেষ পর্যন্ত মীরা এমন একজনকে পছন্দ করল? আশ্চর্য! জালালউদ্দিনের ইচ্ছা ছিল আরও দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করার— যেমন, বাড়ি কোথায়, পড়াশোনা কোন পর্যন্ত করেছেন? কিন্তু এখন আর আগ্রহবোধ করছেন না।

মীরা বলল, আচ্ছা তুমি এখন যাও। ভাইয়ার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আগামী কাল এগারোটার দিকে তোমার অফিসে যাব।

মনজুর চলে গেল। যাবার আগে সাধারণ ভদ্রতার 'স্লামালিকুম' বলার কথাও তার মনে হলো না। জালালউদ্দিনের মনটাই কালো হয়ে গেল। তিনি দুঃখিত হয়ে ভাবলেন— এই ছেলে? শেষ পর্যন্ত এই ছেলে?

মীরা বলল, ভাইয়া এখন তোমার মতামত বলো। তোমার মতামত আমার কাগজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব।

জালালউদ্দিন বললেন, তোর পছন্দ হয়েছে তুই বিয়ে কর, অসুবিধা কী। এটা তোর ব্যাপার। আমার তো কিছু না।

মীরা হাসতে হাসতে বলল, তুমি এটা বলছ যাতে কাগজের লেখার সাথে তোমার কথা না মেলে। তুমি ইচ্ছা করেই উল্টো কথা বলছ। তাই না?

জালালউদ্দিন বিরক্ত হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন— মীরার কথা সত্যি।

মীরা বলল, উঠি ভাইয়া। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

মীরা ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর জালালউদ্দিন খাম খুললেন। মীরা গোটা গোটা করে লিখেছে—

ভাইয়া, তুমি মত দেবে। তুমি বলবে— হ্যাঁ। তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলবে। দেখলে আমার কেমন বুদ্ধি? এ-রকম একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে কখনও ভুল করবে না। আমি যা করছি ঠিকই করছি। তুমি ভয় পেয়ো না। ছেলেটা ভালো।

বুদ্ধিমতী মেয়ে ভুল করে না তার নমুনা এখন দেখা যাচ্ছে। তিন বছরের মাথায় তাকে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হতে হয়েছে।



বদরুল আলম ভাগ্নেকে দেখতে এসেছেন।

খালি হাতে আসেন নি। দু'ডজন কমলা, এক ডজন কলা এবং চারটা ডাব এনেছেন। একটা হরলিক্সের কৌটাও সঙ্গে আছে। তিনি বিছানার পাশে বসতে বসতে বললেন, তুই আছিস কেমন?

মনজুর বলল, ভালো।

ভালো সেটা বুঝতেই পারছি। ভালো যা হলে এইভাবে বিছানায় বসে কেউ চা খায়? তাকে চা খেতে দিচ্ছে?

হ্যাঁ দিচ্ছে। শুধু তাই না— ডাক্তার বলেছে ইচ্ছা করলে আমি বাসায় চলে যেতে পারি।

বলিস কি!

গত কাল ডায়ালাইসিস হলো। তারপর থেকে শরীর ইমপ্রুভ করছে। এখন বেশ

ভালো। যে কিডনিটা কাজ করছিল না সেটাও কাজ করা শুরু করেছে বলে আমার ধারণা।

তোর কিডনি প্রবলেম তাহলে সলভড। বাঁচলাম। আমি মনে-মনে ঠিক করে রেখেছিলাম প্রয়োজনে একটা তোকে দেব।

মনজুর দরজা গলায় বলল, সেই সুযোগ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব না মামা। সুযোগ এখনও আছে। এক শ' ভাগ আছে। কিডনি বদলাতে হবে।

বদরুল আলম চুপ করে গেলেন।

মনজুর বলল, শুনে মনে হচ্ছে চুপসে গেলে!

বদরুল আলম বললেন, চুপসে যাব না তো কী? এই বয়সে কিডনি দিলে কি আর বাঁচব? অপারেশনের ধকলই সহ্য হবে না। তুই ঠিকই বেঁচে থাকবি, মাঝখান থেকে আমি শেষ।

তোমার আর বাঁচার দরকার কী? অনেক দিন তো বাঁচলে।

এই বাঁচা কি কোনো বাঁচা? পরিশ্রম করতে করতে জীবন গেল, সুখের মুখ দেখলাম না। এখন একটু দেখতে শুরু করেছি, এখন যদি মরে যাই তাহলে লাভটা কী?

তাও ঠিক।

বদরুল আলম বললেন, নে কলা খা।

কলা খাব না মামা, তুমি খাও।

কলা হলো ফ্রুটসের রাজা। একটা কলায় কতটুকু আয়রন থাকে জানিস?

কতটুকু থাকে?

অনেক— বলতে গেলে পুরোটাই আয়রন।

তুমি বসে বসে আয়রন খাও। আমার ইচ্ছা করেছে না। আর কিডনি নিয়েও তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এমনি বললাম।

কিডনি লাগবে না?

লাগবে হয়তো। লাগলেও তোমারটা না।

বদরুল আলম বেশ নিশ্চিতবোধ করলেন। দুটো কলা এবং একটা কমলা খেলেন। হুস্ট গলায় বললেন, তোর এখানে কোনো লোকটোক যেই? একটা দা পেলে ডাব কেটে খাওয়া যেত।

এখানে কোনো লোক নেই মামা। ডাব সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তোমার অফিসের লোকজন কেটে দেবে।

ডাবের শাঁসেও কিন্তু আয়রন আছে।

মনজুর বিরক্ত গলায় বলল, তুমি আয়রনের এত স্টোজ কোথায় পেলে বলো তো মামা?

কাঠের মিস্ত্রি বলে তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস না?

বিশ্বাস করছি। বিশ্বাস করছি।

বদরুল আলম বললেন, এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হতো না।

মনজুর বলল, এখানে চা মুখে দিতে পারবে না মামা। ভয়াবহ চা। প্রচুর চিনি প্রচুর দুধ এবং প্রচুর জীবাণু।

প্রচুর জীবাণু মানে?

হাসপাতাল হচ্ছে অসুখের গুদাম। এখানকার চায়ে জীবাণু থাকবে না তো কোথায় থাকবে? কিলবিল করছে জীবাণু। তুমি বরং চলে যাও।

তুই আমাকে বিদায় করে দিতে চাচ্ছিস কেন?

বিদায় করতে চাচ্ছি কারণ তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। তোমার গা থেকে তার্পিন তেলের গন্ধ আসছে— গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে।

বদরুল আলম দুঃখিত গলায় বললেন, তুই কি কোনো কারণে আমার ওপর রেগে আছিস? রেগে থাকলে সেটা খোলাখুলি বল। খামাখা তার্পিন তেলের কথা আনলি কেন? আমি কি গায়ে তার্পিন তেল মাখি, নাকি আমি একটা ফার্নিচার যে আমার গায়ে দু'বেলা তার্পিন তেল দিয়ে বার্নিশ করা হয়? তোর রাগটা কী জন্য, শুনি?

আমার কোনো রাগ নেই।

অবশ্যই আছে। এবং কারণটাও জানি। কাঠমিস্ত্রি হয়েছি বলেই কি আমার বুদ্ধিশুদ্ধি থাকবে না?

ঠিক আছে, কী কারণ তুমি বলো।

আমি তোকে বলেছিলাম তোর বিয়েতে একটা খাট বানিয়ে দেব। এমন খাট যে যে-ই দেখবে ট্যারা হয়ে যাবে। সেই খাট দেয়া হয় নি— তোর রাগটা এই কারণে। কাঠ এখন কেনা হয়েছে। বার্মাটিক খুঁজেছিলাম, পাই নি। চিটাগাং টিক কিনেছি। সিজন করা কাঠ। খুব ভালো জিনিস। ছ'মাসের মধ্যে তোর খাট আমি দেব— যা, কথা দিলাম।

ছ'মাস আমি টিকব না মামা।

পাগলের মতো কথা বলিস না।

সত্যি বলছি ছ'মাস টিকব না।

ডাক্তার বলছে এই কথা?

ডাক্তাররা কি আর সরাসরি এই কথা বলে?

তাহলে কি স্বপ্ন দেখেছিস?

হ্যাঁ।

কী স্বপ্ন?

মনজুর হাসল, কিছু বলল না। বদরুল আলম উদ্দিগ্ন গলায় বললেন, স্বপ্নটা কখন দেখেছিস? মাঝরাত্রে, না শেষরাত্রে? মাঝরাত্রে স্বপ্নের কোনো গুরুত্ব নেই। শেষরাত্রে স্বপ্ন হলে চিন্তার কথা।

শেষরাত্রেই দেখেছি। ঘুম ভেঙে দেখি সকাল।

বদরুল আলম আরও উদ্দিগ্ন হয়ে বললেন, পেট ঠিক ছিল তো? বদহজম অবস্থায় স্বপ্ন দেখলে— ভুলে যা।

বদহজম-টজম কিছু না। পেট ঠিকই ছিল।

স্বপ্নে কী দেখলি?

দেখলাম আমি এই বিছানায় শুয়ে আছি। একটা ধবধবে সাদা চাদরে আমার সারা শরীর ঢাকা। আমি বুঝতে পারছি আমি মারা গেছি। একজন ডাক্তার এসে বললেন, ডেডবডি এখনও সরানো হয় নি? কোনো মানে হয়? খামাখা একটা বেড দখল করে আছে। সবাই তখন ধরাধরি করে আমাকে নিচে নামিয়ে দিল। আমার

নিধানায় নতুন একজন রোগী চলে এলো। তার কিছুক্ষণ পর জাহানারা হাসপাতালে ঢুকল। সে অবাক হয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে স্যার কোথায়? কেউ বলতে পারছে না। অথচ আমি মেঝেতেই পড়ে আছি।

জাহানারাটা কে?

আমাদের অফিসে কাজ করে।

স্বপ্নটা এখানেই শেষ, না আরও আছে?

আর নেই। তার পরপরই আমার ঘুম ভেঙে যায়।

এই স্বপ্ন দেখে তোর ধারণা হলো তুই আর ছ'মাস বাঁচবি?

হুঁ।

তুই তো দেখছি বিরাট গাধা। তোকে আমি খাবনামা বই দিয়ে যাব। পড়ে দেখিস। পরিষ্কার লেখা আছে— স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দেখলে দীর্ঘায়ু হয়। তুই বাঁচবি অনেক দিন।

বাঁচলে তো ভালোই। তুমি কি এখন যাবে; না বসবে আরও খানিকক্ষণ?

বসি কিছুক্ষণ। আমার তো আর অফিস না যে ঘড়ির কাঁটা ধরে যেতে হবে। আমার হলো স্বাধীন ব্যবসা। ইচ্ছা হলে যাব, ইচ্ছা না হলে যাব না। সারাদিন তোর সঙ্গে বসে থাকতে পারি। কোনো সমস্যা না।

মনজুর আঁতকে উঠে বলল, তুমি কি সারাদিন থাকার প্ল্যান করছ?

বদরুল আলম বললেন, কোনো প্ল্যান-ট্যান নেই। এক কাপ চা খেতে পারলে হতো।

তোমার চায়ের ব্যবস্থা করছি। দয়া করে চা খাও। চা খেয়ে বিদেয় হও।

মনজুর বিছানা থেকে নামল। শরীর বেশ ভালো লাগছে। মাথা ঘুরছে না বা দুর্বল-দুর্বল লাগছে না। বাসায় চলে গেলে কেমন হয়? গরম পানিতে ভালো করে গোসল করে একটা লম্বা ঘুম দিলে শরীর অনেকখানি ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

মনজুর গেল চায়ের খোঁজে।

আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল জাহানারা। অবিকল স্বপ্নদৃশ্যের মতো একটা ব্যাপার হলো। সে চোখ বড় বড় করে বলল, স্যার কোথায়? স্যার?

বদরুল আলম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা সুন্দর। সুন্দর না, বেশ সুন্দর। সবচে' সুন্দর তার গলার স্বর। কানে এসে গানের মতো বাজে।

জাহানারা আবার বলল, স্যার কোথায়? স্যার?

বদরুল আলম বললেন, তোমার নাক কি জাহানারা?

জাহানারা সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় পাশের বেডের রোগীকে বলল, স্যার কোথায়?

জাহানারা আজ অফিসে যায় নি। বাসা থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে। ঘর থেকে বের হবার সময় ধাক্কা লেগে পানির একটা গ্লাস ভেঙেছে। তখনই তার বুক ছ্যাৎ করে উঠেছে। নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ আছে।

যে বাসে আসছিল মাঝপথে সেই বাসের চাকা বসে গেল। খারাপ সংবাদ, খারাপ সংবাদ, নিশ্চয়ই কোনো খারাপ সংবাদ। কখনও বাসের চাকা বসে না— আজ বসল কেন?

বদরুল আলম আবার বললেন, মা, তোমার নাম কি জাহানারা ?

জাহানারা বলল, এই বিছানায় যে রোগী ছিলেন উনি কোথায়?
মনজুর আমার জন্য চা আনতে গেছে। তুমি বসো এখানে। আমি মনজুরের
মামা হই। জাহানারা তোমার নাম, তাই না?

জি।

কী করে বললাম বলো তো?

জাহানারা তাকিয়ে রইল। সে সত্যি বুঝতে পারছে না।

কলা খাবে? খেয়ে দেখো। মনজুর খাবে বলে মনে হয় না। নাও একটা খাও।
প্রচুর আয়রন আছে।

ফরিদও জাহানারার সঙ্গে এসেছে। সে দরজার ওপাশ থেকে ভীত চোখে
তাকিয়ে আছে। তার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার।

মনজুর চা নিয়ে ফিরে এলো। তার হাতে ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক, সঙ্গে দশ-বার বছরের
একটি ছেলে যার এক হাতে দুটো খালি কাপ, অন্য হাতে কয়েকটা নোনতা বিস্কিট।
সে বিস্কিটগুলো বদরুল আলমের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

তিনি বললেন, মারব এক থাপ্পড়, হাতে করে বিস্কিট নিয়ে আসছে!

ছেলেটি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ইচ্ছা হইলে খাইবেন, ইচ্ছা না হইলে নাই।
থাপ্পড় মারামারি ক্যান?

মনজুর বলল, খেয়ে ফেলেন মামা। হাত যেমন নোংরা, প্লেটও সে-রকম
নোংরা। বরং হাতে দেয়ার মধ্যে এক ধরনের আন্তরিকতা আছে।

জাহানারা হাসছে। তার খুব ভালো লাগছে। যে মানুষটা মর-মর হয়ে বিছানায়
পড়ে ছিল তাকে এমন সুস্থ স্বাভাবিক দেখবে সে ভাবেই নি। চোখের নিচের কালিও
অনেক কম। গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কেটে ফেললেই কেউ বুঝবে না এই
মানুষটা বড় ধরনের অসুখে ভুগছে।

জাহানারা, কখন এসেছ?

কিছুক্ষণ আগে।

চা-বিস্কিট কিছু খাবে?

জি-না।

কলা খেতে পারো। প্রচুর আয়রন আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মামাকে
জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।

বদরুল আলম চা খাচ্ছেন। নোনতা বিস্কিটও খাচ্ছেন। ফেরত নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। তার হাতে এখনও দুটো বিস্কিট ধরা
আছে।

জাহানারা বলল, আপনার শরীর তো সেরে গেছে বলে মনে হয়।

মনজুর বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। দশটার দিকে ডাক্তার এসে দেখবে।
তাকে বলব, আমাকে রিলিজ করে দিতে। আবার যখন শরীর খারাপ হবে, ভর্তি হব।
ইতিমধ্যে কিডনি যোগাড়ের চেষ্টা চালাব। পাওয়া গেল তো ভালোই। না পাওয়া
গেলে নাই।

জাহানারা বলল, স্যার, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার কিছুই লাগবে
না।

না লাগলে তো ভালোই।

বদরুল আলম বললেন, আমি তোকে একজন পীর সাহেবের কাছে নিয়ে যাব।
ও পাওয়ারফুল পীর। ক্ষমতা অসাধারণ। পান-বিড়ির একটা দোকান চালায়।
এ থেকে বোঝার কোনো উপায় নাই। গভীর রাতে মিনিস্টার, সেক্রেটারি, এরা
।।

মনজুর বলল, দিনে আসে না কেন?

দিনে আসলে তো লাভ নাই। দিনের বেলা পীর সাহেব হচ্ছে দোকানদার।

গাতে পীর।

পীর সাহেবকে গিয়ে আমার অসুখের কথা বলবে?

হঁ। এরা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে? আজ যাবি?

না।

তোকে যদি রিলিজ করে দেয় তাহলে চল না আমার সাথে। ক্ষতি তো কিছু নাই।

জাহানারা বলল, স্যার, যান না। পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী এদের অনেক রকম
ক্ষমতা থাকে।

মনজুর বলল, এদের একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে লোকজনদের ধোঁকা দেয়া। এর
বাইরে এদের কোনো ক্ষমতাই নেই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা না বলেই তুই বুঝে ফেললি? আগে কথা বল— তারপর
ডিসিশান নে। পীর সাহেবের তাবিজ যে গলায় বাঁধতেই হবে, এমন তো কথা নেই।

উনি কি তাবিজও দেন নাকি?

না। মাঝে মাঝে গলায় হাত বুলিয়ে দেন।

গলায় কেন?

আমি কী করে বলব কেন! তুই যাবি কিনা বল! আমি ফল পেয়েছি। হাতে হাতে
ফল পেয়েছি।

আচ্ছা যাও যাব। তোমাকে খুশি করবার জন্য যাব। যদি হাসপাতাল থেকে
ছাড়ে তাহলে সরাসরি চলে যাব তোমার ওখানে। এখন দয়া করে তুমি বিদায় হও।
জাহানারা, তুমিও যাও। আমি এখন খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুম পাচ্ছে।

জাহানারা বলল, স্যার, আপনি ঘুমান। আমি এই চেয়ারে বসে থাকি। আমি
স্যার তিনদিনের ছুটি নিয়েছি।

তিনদিনের ছুটি নেয়ার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেই কাল অফিসে জয়েন
করছি।

স্যার, এই শরীরে আপনি অফিসে জয়েন করবেন?

হঁ।

যে দুটি বিস্কিট নিয়ে ছেলেটি বসে ছিল বদরুল আলম সেই দুটিও নিয়ে
নিলেন এবং নিচু গলায় বললেন, বাবা, চট করে আরেক কাপ চা আনতে পারবি?

গলির ভেতর গলি, তার ভেতর আরেক গলি।

মনজুর বলল, তোমার পীর সাহেব তো মামা ভালো আস্তানা বের করেছেন!

বদরুল আলম বললেন, পীর-ফকির মানুষ, এরা কি ধানমণ্ডি গুলশান এলাকায়
থাকবে? এরা থাকবে চিপা গলিতে, বস্তিতে।

তুমি একে খুঁজে বের করলে কীভাবে?
 সে বিস্তর ইতিহাস। তোকে একদিন বলব। হাঁটতে পারছিস?
 হঁ।
 শরীরটা ঠিক আছে তো?
 এখনও আছে। চোখে এখন কিছুই দেখছি না, নর্দমায়-উর্দমায় পড়ব না তো?
 তুই আমার হাত ধরে ধরে আয়।
 তুমি কি এখানে প্রায়ই আস?
 সপ্তাহে একদিন আসি। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।
 যে-রকম নির্জন রাস্তা, আমার তো মনে হচ্ছে ফেরার পথে হাইজ্যাক হয়ে যাব।
 তোমার কাছে টাকা-পয়সা বিশেষ নাই তো?
 কিছু আছে, অসুবিধা নাই— বাবার কাছে যারা আসে তারা কখনও হাইজ্যাকড হয় না।
 উনাকে বাবা ডাকো নাকি?
 বদরুল আলম কিছু বললেন না। মনজুর বলল, তুমি বাবা ডাকলে তো আমাকে নানাজান বলতে হয়।
 বদরুল আলম বিরক্ত গলায় বললেন, উনার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করিস না। এরা ঠাট্টা-তামাশা পছন্দ করে না।
 বাবা দোকানের ঝাঁপ ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।
 ধাক্কাধাক্কির পর উঠে বসলেন। মধ্যবয়েসী একজন ভদ্রলোক— যাকে বাবা ডাকা বেশ কঠিন। স্বাস্থ্যবান মানুষ। গায়ে হলুদ রঙের গলাবন্ধ নোংরা সুয়েটার। মাথার চুল লম্বা, চোখ লাল। ঘুমাবার আগে বাবা হয়তো মুখভর্তি করে পান খেয়েছিলেন। পানের রসে কালো ঠোট লালচে হয়ে আছে। ঘুম ভাঙানোয় বাবাকে বেশ বিরক্ত মন হলো। কঠিন গলায় বললেন, কী চাই?
 আমাকে চিনেছেন? আমি উড কিং-এর মালিক। বদরুল আলম। আর এ আমার ভাগ্নে। এর নাম মনজুর।
 চাই কী?
 কিছু চাই না। একে একটু দোয়া করে দেন— এর শরীরটা ভালো না।
 নিজের দোয়া নিজের করা লাগে। অন্যে কী দোয়া করব। এখন ঘুমান, বাড়িতে গিয়া ঘুমান।
 একটু গলায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেন।
 বললাম তো বাড়িতে গিয়া ঘুমান। ঘুমের মধ্যেও দোয়া আছে। ঘুমের সময় শইল আরাম পায়। শইল দোয়া করে। হেই দোয়া কামি লাগে।
 মনজুর হাই তুলে বলল, মামা, চলুন যাই। আমায় সত্যি সত্যি ঘুম পাচ্ছে।
 বদরুল আলম যেতে চাচ্ছেন না। মনে হচ্ছে দোয়া না করিয়ে তিনি যাবেন না।
 আমার ভাগ্নের শরীরটা খুবই খারাপ। একটু যদি দোয়া করেন।
 বাবার মন মনে হয় গলল, বাঁ হাত উঠিয়ে আচমকা মনজুরের কণ্ঠার উপর রাখলেন। মনজুরের মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে ওঠার ঠিক আগে আগে হাত সরিয়ে নেয়া হলো। তখনও মনজুরের নিশ্বাস স্বাভাবিক হয় নি।
 শইল তো খারাপ, খুবই খারাপ।

বদরুল আলম বললেন, আপনি কি দোয়া করেছেন?
না। দোয়ায় কিছু হওনের নাই। আইচ্ছা শুনের, আফনের কি কোনো সন্তান
মারা গেছে?

কয়েক মুহূর্ত হকচকিত থেকে মনজুর বলল, জি।

কন্যা সন্তান?

জি। কীভাবে বললেন?

অনুমানে বলছি। অনুমান। আইচ্ছা এখন যান। পরে একদিন আইসেন। দেখি
কিছু করা গেলে করমু।

বাবা দোকানের ভিতর ঢুকে কাঁপ ফেলে দিলেন। উৎকট বিড়ির গন্ধ পাওয়া
গেল। বাবা সম্ভবত ঘুমাবার আগে বিড়ি খান।

বদরুল আলম বললেন, উনার পাওয়ার দেখলি? কীভাবে বলে দিল।

মনজুর হাই তুলতে তুলতে বলল, তুমি এসে আগে বলে গেছ। খুব অন্যায় কাজ
করেছ মামা।

বদরুল আলম হতভম্ব গলায় বললেন, আমি আগে এসে বলে গেছি?

হুঁ।

আমার স্বার্থ কী?

আমাকে চমকে দেবে। আমি হতভম্ব হয়ে ভাবব— পীরবাবার কী ক্ষমতা!
ভাগ্যিস মামা আমাকে ইনার কাছে এনেছেন। তোমার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হব। তুমি তা
দেখে খুশি হবে— এটাই তোমার স্বার্থ। চল যাই।

দু'জনে হাঁটছে।

মনজুর খুবই ক্লান্তবোধ করছে। মামার সঙ্গে তার আসাই ঠিক হয় নি। উচিত
ছিল হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা। ডাক্তাররা তাকে ছাড়তে রাজি হয় নি।
মনজুর যখন বলল, আমি তো এখানে শুয়ে থাকি, বাসায় গিয়েও শুয়েই থাকব।
নিজের পরিষ্কার বিছানায় আরাম করে ঘুমাব। আর আপনাদেরও তো খালি বেড
দরকার। দরকার না?

এতেই ডাক্তাররা রাজি হলেন। ডাক্তারদের একজন বললেন, প্রিয় মানুষের সঙ্গে
থাকলে মন ভালো থাকবে। মন ভালো থাকলে তার প্রভাব পড়বে শরীরে। ঠিক
আছে যান।

মনজুর চলে এসেছে এবং তার একজন প্রিয় মানুষ মামা মামার সঙ্গে ঘুরছে।
উচিত হয় নি; একেবারেই উচিত হয় নি।

মনজুর।

জি।

তুই কি আমার উপর রাগ করলি নাকি?

রাগ করব কেন?

পীর সাহেবকে তোর বাচ্চা মারা যাবার খবরটা আগে দেয়া ঠিক হয় নি।

তুমি তাহলে আগে-ভাগে খবর দিয়ে রেখেছ?

বদরুল আলম কিছু বললেন না। মাফলার দিয়ে কান ঢেকে দিলেন। ভাবটা এ-
রকম যেন কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। কাজে ব্যস্ত।

বমি-বমি লাগছে মামা।

বলিস কি! শরীর কি আবার খারাপ করেছে?

মনে হচ্ছে সে-রকম।

মনজুর রাস্তার পাশে বসে হড়হড় করে বমি করতে লাগল। বদরুল আলম দোয়া কুনুত পড়ে মনজুরের মাথায় ফুঁ দিতে লাগলেন।

এত বমি করছিস— ব্যাপারটা কী? তুই দেখি নাড়িভুঁড়ি সব বের করে ফেলবি।

মনজুর একসময় উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগেই তার চোখ স্বাভাবিক ছিল। এখন টকটকে লাল। যদিও অন্ধকারে তা দেখা যাচ্ছে না।

মামা, হাত ধরে ধরে তুমি আমাকে একটা রিকশায় নিয়ে তোলা তো।

মনজুর, তুই কি আমার ওপর খুব বেশি রাগ করেছিস?

হঁ করেছি— আমার বাচ্চার মৃত্যুর খবর আমি কাউকে বলি না। তুমি সেটা তৃতীয় শ্রেণীর এক ভণ্ডকে বলেছ। উচিত হয় নি।

তৃতীয় শ্রেণীর বলছিস কেন? উনি খুব কামেল মানুষ। মানুষের চেহারা ছবি দিয়ে তো সবকিছু বিচার করা ঠিক না।

আমি চেহারা-ছবি দিয়ে কাউকে বিচার করি না। এই লোকটা ভণ্ড। তুমি প্রতিসপ্তাহে একবার তার কাছে আসো। তোমাকে সে খুব ভালো করেই চেনে। অথচ আজ না চেনার ভান করল। না চেনার ভান করলে তার জন্য সুবিধা।

সুবিধা কী?

সে যখন আমার অতীত বলল, তখন আমি আর সন্দেহ করলাম না যে তুমি আগেই সব বলে বসে আছ। আর কী কী বলেছ? ডিভোর্সের কথাটা বলো নি?

বদরুল আলম কিছু বলার আগেই মনজুর আবার বসে পড়ল। হড়হড় করে দ্বিতীয় দফায় বমি করল।



ছ'দিন পর মনজুর অফিসে এসেছে।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে অসুস্থ। বরং চকলেট বন্ডের শাটে তাকে অন্যদিনের চেয়ে হাসিখুশি লাগছে। অনেকদিন পর ক্লিন শেভ করলে গালে এক ধরনের আভা দেখা যায়, তাও দেখা যাচ্ছে।

কুদ্দুস বিস্মিত হয়ে বলল, স্যার, আপনি অফিসে আইলেন?

মনজুর বলল, আসা কি নিষেধ নাকি?

কুদ্দুস দাঁত বের করে হাসল। অফিসের অন্য কেউ হাসল না। কনসট্রাকশন সাইডের ম্যানেজার পরিমল বাবু বললেন, শুনেছিলাম আপনি গুরুতর অসুস্থ, তা বোধহয় মিথ্যা।

মনজুর হ্যাঁ-না কিছু বলল না। পরিমল বাবু মানুষটিকে সে পছন্দ করে না। কেন করে না তাও জানে না। এমনিতে পরিমল বাবু নিতান্তই ভদ্রলোক, পরোপকারী। অফিসের কাজেও অত্যন্ত দক্ষ। তিনি খুব অল্পসংখ্যক কর্মচারীদের

জন যিনি দশটা-পাঁচটা অফিস করেন এবং চেয়ারের পেছনে কোট ঝুলিয়ে বাড়ি যান না।

পরিমল বাবু বললেন, মনজুর সাহেব, অফিসে আপনার সমস্যা কী বলুন তো?

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, আমি তো কোনো সমস্যার কথা জানি না।

না, মানে পে-স্লিপ দেখছিলাম, লক্ষ করলাম পে-স্লিপে আপনার নাম নেই। এ মাসে বেতন হয় নি।

ও আচ্ছা।

আপনি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখুন তো ব্যাপারটা কী? আমি নিজেই জিজ্ঞেস করতাম, তারপর বাবলাম, আমি বাইরের লোক, আই মিন আমি ইন্ভলভড নই। যার সমস্যা তাঁকেই প্রথমে খোঁজ নিতে হবে। আপনি ক্যাশিয়ারকে জিজ্ঞেস করুন।

মনজুর বলল, মনে হয় চাকরি চলে গেছে।

চাকরি চলে গেছে মানে? এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি জন্মলগ্ন থেকে আছেন। এগতে গেলে এই প্রতিষ্ঠান আপনার নিজের হাতে তৈরি। সেখানে বিনা নোটিসে চাকরি চলে যাবে? আপনি এফুনি ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলুন।

আচ্ছা বলব।

স্যারও অফিসে আছেন। উনার সঙ্গে কথা বলে দেখুন কী ব্যাপার। আপনার মতো মানুষের হুট করে চাকরি চলে যাওয়া তো ভয়াবহ কথা। আপনারই যদি এই ব্যাপার হয় তাহলে আমাদের কী হবে?

মনজুর ক্যাশিয়ার সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেল না। ক্যাশিয়ার সাহেব নিজেই এলেন। বেশ খানিকক্ষণ শরীরের খোঁজখবর নিয়ে বললেন, আপনি কি খবর কিছু শুনেছেন?

কোন খবরের কথা বলছেন?

আপনার পে-স্লিপের ব্যাপার।

শুনলাম।

আমি যথারীতি সব পে-স্লিপ বড় সাহেবের কাছে পাঠিয়েছি। বড় সাহেব সব পে-স্লিপেই সই করলেন, আপনারটায় করলেন না।

মনজুর উদাস গলায় বলল, না করলে কী আর করা।

আপনি স্যারের সঙ্গে দেখা করুন। আমরা সবাই এই ব্যাপারে আপসেট। আমার তো মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। আপনি অসুস্থ মানুষ। এখন টাকা দরকার। আমি বড় সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন...

ক্যাশিয়ার সাহেব কথা শেষ করলেন না। অসুস্থ নিয়ে চুপ করে গেলেন। মনজুরও কিছু জিজ্ঞেস করল না। বেশি জানা ভালো না। জানলে মন খারাপ হবে।

মনজুরকে বড় সাহেবের ঘরে নিজ থেকে যেতে হলো না। বড় সাহেবই তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মনজুর ঘরে ঢোকামাত্র নুরুল আফসার বললেন, তোর শরীর কেমন?

মনজুর বলল, ভালো না। মারা যাচ্ছি বলে মনে হয়।

কবে নাগাদ মারা যাচ্ছিস?

সম্ভবত মাস ছয়েক টিকব।

কিডনি বদলে ফেল।

চেষ্টা করছি।

পাচ্ছিস না?

না।

এই দরিদ্র দেশে কিডনি পাৰি না একটা কথা হলো? পাঁচ শ' টাকা দিয়ে এই দেশে মানুষ খুন করা যায়। তুই কিডনি চেয়ে বিজ্ঞাপন দে, লিখে দে কুড়ি হাজার টাকা নগদ দেয়া হবে; দেখবি পাঁচ শ' এ্যাপ্লিকেশন পড়ে গেছে। নে সিগারেট নে।

মনজুর সিগারেট ধরাল।

চা খাবি মনজুর?

না।

খা এক কাপ আমার সঙ্গে। মুখ অন্ধকার করে বসে আছিস কেন? ইজ এনিথিং রং?

না।

ভালো করে চিন্তাভাবনা কর; তারপর বল— ইজ এনিথিং রং?

না।

ভেরি গুড। তোর বেতন এ মাসে হয় নি, সেটা দেখেছিস?

শুনলাম।

কিছু বলতে চাস?

না।

এক অক্ষরে সব কথার উত্তর দিচ্ছিস— ব্যাপার কী? তুই কি কোনো কারণে আমার ওপর রেগে আছিস?

না। রেগে নেই।

তাহলে এমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? একটা রসিকতা গুনবি— শোন, রিডার্স ডাইজেস্টে পড়লাম। এক ভদ্রলোক মৃত্যুর সময় বললেন, সবাই বলে পরকালে টাকাপয়সা কোনো কাজে লাগে না। কথাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। আমি মৃত্যুর পর সঙ্গে করে পঞ্চাশ হাজার ডলার নিয়ে গিয়েছি। ভদ্রলোক নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, আমায় কফিনে এই টাকাটা দিয়ে দিও। ভুল হয় না যেন। তাঁর স্ত্রী করলেন কী— নগদ ডলার রেখে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা চেক দিয়ে দিলেন। হা-হা-হা।

নুরুল আফসার সমস্ত শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, তুই হাসলি না, ব্যাপার কী? যাকে বলছি সে-ই হাসছে। হা-হা-হা। শুধু পলিন হাসে নি। সে চোখ গোল গোল করে বলছে— What is so funny about it? ভালো কথা, পলিন তার তিন কন্যার সঙ্গে আমেরিকা চলে যাবে বলে কথা হচ্ছে। যাকে বলে পুরোপুরি চলে যাওয়া।

তুই? তুই একা থাকবি?

না। আমিও চলে যাব।

মনজুর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা রসিকতা কিনা। রসিকতা বলে মনে হচ্ছে না। নুরুল আফসার বললেন, পলিন কিছুতেই নিজেকে এডজাস্ট করতে পারছে না। বাচ্চাগুলোও পারছে না। চার মাস ধরে এই

নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। ঝগড়া চলছে, মনকষাকষি চলছে। এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

ফার্মের কী হবে?

একটা-কিছু নিশ্চয়ই হবে। নে, আরেকটা সিগারেট নে। সিগারেটের সঙ্গে এক টোক হুইস্কি খাবি? আছে এখানে। সমানে হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছি। বাসায় খাই। অফিসে এসেও খাই।

নূরুল আফসার ড্রয়ার খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন, গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বললেন, খাবি?

না।

আমি পুরোপুরি অ্যালকহলিক হয়ে গেছি। আমার আগে অ্যালকহলিক হয়েছে পলিন। আমেরিকায় পৌঁছেই এর চিকিৎসা করাতে হবে। পলিন অ্যালকহল ছাড়া কোনো তরল পদার্থই খাচ্ছে না। গত দু'মাসে সে এক চামচ বিশুদ্ধ পানি খেয়েছে কিনা আমি জানি না।

আগে তো কিছু বলিস নি।

কেন বলব? মীরা যে তোকে লাথি মেরে চলে গেল তুই কি আমাকে বলেছিস?

লাথি মেরে চলে যায় নি।

ঐ একই হলো।

নূরুল আফসার গ্লাসে অনেকখানি হুইস্কি ঢাললেন। পানি মেশালেন না। ঢেলে দিলেন গলায়। তার মুখ বিকৃত হলো না। তবে মুহূর্তের মধ্যেই চোখ টকটকে লাল হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় বললেন, মনজুর, তোকে একটা কথা বলব, মন দিয়ে শোন।

শুনছি।

এই ফার্ম ছেড়ে যাওয়া আমার জন্য কী রকম কষ্টের তা নিশ্চয়ই তুই জানিস। জানিস না?

জানি।

পলিনকে ছেড়ে দেয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ওকে পাগলের মতো ভালোবাসি। তা ছাড়া ও গেলে আমার বাচ্চাগুলোও যাবে। যাবে না?

হ্যাঁ যাবে।

কাজেই ওকে খুন করার একটা সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আমার আছে। ওর হুইস্কির সঙ্গে খানিকটা আর্সেনিক মিশিয়ে দিলেই হলো। আর্সেনিক যোগাড় করেছি। একটা শুভদিন দেখে জিনিসটা মেশানো হবে। বারোই ফেরেশতার হচ্ছে খুব শুভদিন— ওর জন্মদিন।

তোর নেশা হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা।

নেশা হয় নি। যা বলছি সুস্থ মাথায় বলছি। আজই তো বারো তারিখ, তাই না?

হ্যাঁ।

তুই কি সত্যি খাবি না? খা একটু আমার সঙ্গে। মদ হচ্ছে এমন এক তরল পদার্থ যা কখনও একা খাওয়া যায় না। তা ছাড়া জিনিসটা কিউনির জন্য ভালো। সত্যিই ভালো।

মনজুর চুপ করে রইল।

নুরুল আফসার বললেন, না খেলে চুপচাপ বসে থাকবি না। চলে যা। আর পলিনকে খুন করা সম্পর্কে যা বললাম সবই রসিকতা। নেশা হলেই বলি। নেশা হয়েছে— তোকে বলেছি। নেশা কেটে গেলে সব ভুলে যাব। তবে মনটা খারাপ। খুবই খারাপ। এত কষ্ট করে ফার্মটা তৈরি করেছি— সব জলে ভেসে যাবে। কাঁদতে ইচ্ছা হয়। নেশা খুব বেশি হলে কাঁদি। মুশকিল হচ্ছে নেশা আগের মতো হয় না। আমি পুরো বোতল শেষ করে ফেলব কিন্তু তেমন নেশা হবে না। যা তুই যা।
Leave me alone.

মনজুর বেরিয়ে এলো।

জাহানারা হাতে টাইপ করা একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ অসম্ভব মলিন। মনে হচ্ছে টাইপ করতে করতে সে খানিকটা কেঁদেছে। তার চোখের কাজল লেপ্টে গেছে। আজকালকার মেয়েরা চোখে কাজল দেয় বলে মনজুরের ধারণা ছিল না। এই মেয়েটা দেয়। মীরাও দিত। মীরার সঙ্গে কি এই মেয়েটির কোনো মিল আছে? না, কোনো মিল নেই। দু'জন সম্পূর্ণ দু'রকম।

জাহানারা বলল, স্যার, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

মনজুর বলল, টাইপ হয়ে গেছে?

জি।

ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দাও। বলো পরপর তিনদিন ছাপাতে।

আপনি কি দেখে দেবেন না?

না।

স্যার একটু দেখে দেন।

মনজুর দ্রুত চোখ বুলাল—

কিডনি প্রয়োজন

একটি কিডনি কিনতে চাই।

কেউ আগ্রহী হলে অতি সত্বর

যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঠিকানা দেয়া আছে উড কিং-এর। কেয়ার অফ বদরুল আলম, মনজুরের মনে পড়ল— মামাকে এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয় নি। বিজ্ঞানটা ছাপা হবার আগেই জানানো উচিত।

জাহানারা বলল, স্যার, আপনি কি কিছুক্ষণ অফিসে পৌঁছবেন, না চলে যাবেন?

আছি কিছুক্ষণ।

আপনার শরীর কেমন?

ভালো। বেশ ভালো।

জাহানারা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, স্যার, আপনি কি একদিন আমাদের বাসায় আসবেন?

আসব। অবশ্যই আসব।

জাহানারা মনে-মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। এর আগেও এই মানুষটিকে সে কয়েক বার তাদের বাসায় যেতে বলেছে। প্রতিবারেই মনজুরের উত্তর ছিল— যাব।

অংশই যাব। কেন যাব না? অথচ কোনো বারই জিজ্ঞেস করে নি— ঠিকানা কী?
এবারো জিজ্ঞেস করলেন না। আসলে উনি যাবেন না। কোনোদিনও না।

জাহানারা ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
জিজ্ঞেস করো।

অফিসে সবাই বলাবলি করছে আপনার চাকরি নেই। কথাটা কি সত্যি?
জানি না। সত্যি হতেও পারে।

আপনি বড় সাহেবকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি?

না। তবে সত্যি হওয়া সম্ভব— অনেকদিন ধরেই দেখছি আমার টেবিলে কোনো
ফাইল নেই। অফিসে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছি। আমাকে ছাড়াই সব কাজ
চলছে এবং খুব ভালোভাবে চলছে। আমাদের বড় সাহেবকে আমি খুব ভালো করে
চিনি। সে কখনও অপ্রয়োজনীয় মানুষজন রাখবে না। তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও না।
ফার্মকে বড় করতে হলে কিছু কঠিন নিয়মকানুনের দরকার হয়।

মনজুর নিজের অফিসে ঢুকে গেল।

খুব ক্লান্ত লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। টেবিলে কোনো ফাইলপত্র নেই। ইজিচেয়ারে
ওয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা যায়। মনজুর ইজিচেয়ারে কাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
ঘুমিয়ে পড়ল।

জাহানারা পেছনে পেছনে আসছিল। ঘুমন্ত মনজুরকে দেখে তার মনটা অসম্ভব
খারাপ হলো। কী অসুস্থ একটা মানুষ! শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথা
কাত হয়ে আছে। কেমন অসহায় ভঙ্গি! একটা বালিশ থাকলে মাথার নিচে দিয়ে
দেয়া যেত।



জাহানারা মাছ কুটছিল।

ঘরে ছাই নেই। ছোট ছোট মাছ, কুটতে এমন অসুবিধা হচ্ছে, পিছলে পিছলে
যাচ্ছে। একটা ঠিকা-ঝি আছে; সে মাসের গোড়ায় পলিথিনের ভাগে এক ব্যাগ ছাই
দিয়ে যায়। এক ব্যাগ ছাইয়ের দাম দু'টাকা। এই মাসে তদু ছাই রাখা হয় নি। এক
ব্যাগ ছাইয়ের জন্য সে চাইল পাঁচ টাকা। জাহানারা বদলি, এক ধাক্কায় আড়াই গুণ
দাম বেড়ে গেল, ব্যাপারটা কী?

ঠিকা-ঝি গম্ভীর গলায় বলল, সব জিনিসের দাম বাড়তাছে আফা। আর এই ছাই
হইল আসল। আমার কাছে নকলের কারবার নাই।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বলল, ছাইয়ের আবার আসল-নকল কী? যাও, নিয়ে
যাও— ছাই লাগবে না।

না লাগলে নাই— ধমক দেন ক্যান?

ধমক দিলাম কোথায়? খামাখা তর্ক না করে কাজ শেষ করো।

হিসাব মিটাইয়া দেন আফা— আফনাগো বাড়ি কাম করুম না। আফনেরা মানুষ বালা না।

ঝি চলে গেলে মহা সমস্যা জেনেও জাহানারা হিসাব মিটিয়ে দিল। বুড়ি ছাইয়ের ব্যাগ হাতে মুখ অন্ধকার করে চলে গেল। এখন মনে হচ্ছে পাঁচ টাকা দিয়ে এক ব্যাগ আসল ছাই কেনাই ভালো ছিল। ছাই থাকত, কাজের লোকও থাকত।

দরজার কড়া নড়ছে। জাহানারাকেই উঠতে হবে। ঘরে আর কেউ নেই। মা'র দাঁতে যন্ত্রণা, ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে মেডিক্যাল কলেজে। দুপুরের আগে ফিরতে পারবে না। এর মধ্যেই রান্না শেষ করে রাখতে হবে। তারা ফিরে এলে তবেই জাহানারা অফিসে যাবে। সমস্যা হবে না, সে বলে এসেছে। তবু খারাপ লাগে।

জাহানারা দরজা খুলে হকচকিয়ে গেল। মনজুর দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারার ইচ্ছা করল আনন্দে চিৎকার করে উঠতে। এ-রকম অদ্ভুত ইচ্ছার জন্য পরমুহূর্তেই লজ্জায় প্রায় নীল হয়ে গেল।

মনজুর বলল, তোমাদের বাসা খুঁজতে খুব যন্ত্রণা হয়েছে। এখানে বাসার নাম্বারের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কেমন আছ জাহানারা?

জি স্যার ভালো।

আসতে বলেছিলে— আসলাম। তোমার মা ভালো আছেন?

জি স্যার আসুন— ভেতরে আসুন।

জাহানারা লক্ষ করল সে ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। তার শরীর কাঁপছে। কেন এ-রকম হচ্ছে? এ-রকম হচ্ছে কেন?

কোনো সাড়াশব্দ নেই, তুমি কি বাসায় একা?

জি স্যার। আমার মা গেছেন দাঁত তুলতে। ফরিদ মাকে নিয়ে গেছে। আপনি বসুন।

তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তুমি অফিসে থাকবে, আমি তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করে চলে যাব।

মা এসে পড়বেন। আপনি বসুন।

মনজুর বসল। জাহানারার কান্না পাচ্ছে। বসার ঘরটা ফরিদ কী করে রেখেছে! এলোমেলো হয়ে আছে বিছানার চাদর। বসার ঘরে ফরিদের খাট না রাখাই উচিত ছিল। বসার ঘরটা থাকবে সুন্দর, গোছানো।

জাহানারা বিছানার চাদর ঠিক করতে গিয়ে হাতের মুঠোয় মাখামাখি করে ফেলল। মাছ কুটতে কুটতে সে উঠে এসেছে, তার মনেই নেই। হাত ধোয়া হয় নি।

জাহানারা!

জি।

আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিতে পারবেন?

স্যার, এক্ষুনি আনছি।

ঘরের গ্লাসগুলো এত বাজে! কী ক্ষতি ছিল একটা সুন্দর গ্লাস যদি ঘরে থাকত? রমিজদের বাসা থেকে একটা গ্লাস নিয়ে আসবে? তার সঙ্গে ফ্রিজের এক বোতল ঠাণ্ডা পানি? ওরা আবার কিছু মনে করবে না তো? করুক মনে। কিছু যায় আসে না। ভালো চায়ের কাপও একটা আনতে হবে। জাহানারা ঠিক করে ফেলল, এবারের বেতন পেয়ে সে আর কিছু করুক বা না করুক, চমৎকার একটা গ্লাস কিনবে, একটা

দায়ের কাপ কিনবে। আচ্ছা, স্যারকে কি সে দুপুরে খেতে বলবে? বললেই কি উনি খাবেন? যদি খেতে রাজি হন— কী দিয়ে সে খাওয়াবে?

জাহানারা বারান্দায় এসে দেখল বিড়াল মহাআনন্দে মাছ খাচ্ছে। খাক, যা ইচ্ছে ঝরক। তার ভালো লাগছে না। জ্বর-জ্বর লাগছে। জাহানারা পাশের বাসা থেকে পানির বোতল এবং গ্লাস আনতে গেল।

ঘরে কিছু নেই। শুধু এক গ্লাস পানি কি কাউকে দেয়া যায়? পানির গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে জাহানারা নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, স্যার, আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খাবেন?

মনজুর বিস্মিত হয়ে বলল, ভাত?

খেলে খুব খুশি হব স্যার। আর এর মধ্যে মা এসে যাবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। ভাত খাব। কী রান্না?

জাহানারার মুখ শুকিয়ে গেল। কিছুই তো রান্না নেই। সে কী খাওয়াবে? কেন সে ভাত খাওয়ার কথা বলতে গেল? কেন সে এত বড় বোকামি করল? ফরিদ এলে তাকে রিকশা করে কাঁচাবাজারে পাঠালে সে কি মাছ-মাংস কিছু আনতে পারবে না? না হয় আজ একটু দেরি করেই খাওয়া হবে।

কী রান্না তা তো বললে না?

এখনও কিছু রান্না হয় নি স্যার।

তাহলে বরং এক কাজ করি। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাব। আজ থাক। শরীরটাও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে।

জাহানারার চোঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে, স্যার, আপনি যেতে পারবেন না। আপনাকে থাকতে হবে। আমি নিজের হাতে রান্না করে আপনাকে খাওয়াব। শুধু একদিন, শুধু এক বার।

মানুষ হবার অনেক যন্ত্রণার একটি হচ্ছে— যা বলতে প্রাণ কাঁদে তা কখনও বলা হয় না।

মনজুর বলল, উঠি, কেমন? আরেকদিন এসে তোমার মার সঙ্গে দেখা করব।



টেলিফোনের শব্দে মনজুরের ঘুম ভেঙে গেল।

সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। সে কোথায়? অফিসে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা মনে আছে। এখনও কি অফিসেই ঘুমাচ্ছে? তাকে সঙ্গে অফিস বন্ধ করে সবাই চলে গেছে? না তা কেমন করে হয়? চারদিক অন্ধকার। অফিস এত অন্ধকার হবে না। আরে এ তো তার নিজের বিছানা! সে বাসায় কখন ফিরল? টেলিফোন বেজেই চলেছে। টেলিফোন ঠিক হয়ে গেল নাকি? নিশ্চয়ই ভৌতিক কোনো ব্যাপার। ঐ ছেলেটিই বোধহয় টেলিফোন করছে— ‘ভিমরুল’। একমাত্র ঐ ছেলেটিই টেলিফোন করে তাকে পায়। আর কেউ পায় না।

মনজুর আধো ঘুম আধো জাগরণে রিসিভার কানে লাগিয়ে বলল, হ্যালো ভিমরুল?

ওপাশ থেকে অভিমানী গলা শোনা গেল, আপনি আমাকে ভিমরুল বলছেন কেন?

ঠাট্টা করছি। তোমাকে খ্যাপাচ্ছি।

আমার কিন্তু খুব রাগ লাগছে।

খুব বেশি রাগ লাগছে?

হ্যাঁ।

খুব বেশি রাগ হলে তুমি কী করো?

কিছু করি না।

কাঁদো না?

না। আমি তো ছেলে। ছেলেদের কাঁদতে নেই।

তা তো বটেই— আমি যখন তোমার মতো ছিলাম তখন ছেলে হয়েও খুব কাঁদতাম। তারপর হঠাৎ একদিন কান্না বন্ধ করে দিলাম।

কেন?

সেটা এক মজার গল্প। তখন আমার মা মারা গেছেন। বাবা, আমি আর একটা কাজের ছেলে— এই তিনজন থাকি। বাবা খুব কঠিন মানুষ। কথায় কথায় শাস্তি দেন। একবার কী অন্যায় যেন করেছি, বাবা আমাকে শাস্তি দিলেন— বাথরুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর কী হলো জানো? তিনি আমার কথা ভুলে গেলেন। চলে গেলেন বাইরে। সেই রাতে আর ফিরলেন না। আমি সারারাত অন্ধকার বাথরুমে আটকা পড়ে রইলাম।

কাজের ছেলে আপনার খোঁজ করল না?

না। সে ভেবেছিল আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছি।

আপনি কান্নাকাটি করলেন না? চিৎকার করলেন না?

প্রথম কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলাম, তারপর কান্না বন্ধ করে দিলাম। পরদিন ভোরে বাবা এসে বাথরুমের দরজা খুলে আমাকে বের করলেন।

উনি তখন কী করলেন?

সেটা আমি তোমাকে বলব না— এ-কী ভিমরুল, তুমি কাঁদছ না কি?

না।

আমি যেন ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ শুনলাম।

কাঁদলে কী?

কিছুই না— নাথিং...

ওপাশের কথা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

টেলিফোন পুরোপুরি ডেড। মনজুর উঠে বাতি জ্বালাল। ঘড়ি দেখল— রাত দুটো। রাত দুটোর সময় ইমরুল নিশ্চয় তাকে টেলিফোন করে নি। পুরো ব্যাপারটিই কি তার কল্পনা? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

মনজুর বাথরুমের দিকে রওনা হলো।

বাথরুম সেরে গরম এক কাপ চা খাবে। চিনি, দুধ সবই কেনা আছে। চিনি সে রেখেছে 'সমুদ্র' নামের কৌটায়। এটা ঠিক হয় নি। সমুদ্র নামের কৌটায় রাখা

উচিত ছিল লবণ— চিনি নয়। আমরা সব সময় যাকে যেখানে রাখার কথা সেখানে না রেখে ভুল জায়গায় রাখি।

আপনার কিছু লাগবে?

মনজুর চমকে তাকাল। পনেরো-ষোলো বছরের লাজুক ছেলেটিকে সে চিনতে পারল না। সে কে? এখানে এলোইবা কোথেকে?

তুমি কে?

স্যার, আমার নাম ফরিদ।

ফরিদ নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।

আমি জাহানারা আপার ছোট ভাই।

ও আচ্ছা আচ্ছা। জাহানারা তোমাকে এখানে পোস্টিং দিয়ে গেছে?

জি।

মেয়েটা তো বড় যন্ত্রণা করছে।

ফরিদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মনজুর বলল, আমার এই কথায় তুমি কি মন খারাপ করলে?

জি-না স্যার।

স্যার বলছ কেন? আমি তো তোমার স্যার না। তুমি কী পড়ো?

এইবার এসএসসি দেব।

স্যায়েন্স না আর্টস?

কমার্স। আমি পড়াশোনায় খুব খারাপ।

তুমি কি চা বানাতে পার?

জি-না।

গুধু পড়াশোনায় না, তুমি তো মনে হচ্ছে কাজকর্মেও খারাপ। পানি গরম করতে পার?

জি পারি।

ভেরি গুড। পানি গরম করো। আমি বাথরুম থেকে এসেই চা বানাব এবং তোমাকে চা বানানো শিখিয়ে দেব।

ফরিদ হেসে ফেলল।

রাত আড়াইটা।

দু'জন নিঃশব্দে চা খাচ্ছে। মনজুর সিগারেট ধরিয়ে সুইজ গলায় বলল, ফরিদ, সিগারেট খাবে নাকি?

ফরিদ চমকে উঠল।

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, অল্পবয়স্কদের সিগারেট সাধা হচ্ছে আমার সস্তা ধরনের রসিকতার একটি। এই রসিকতা করে একবার কী বিপদে পড়েছিলাম শোনো। ক্লাস টুতে পড়ে একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম— খোকা, সিগারেট খাবে? সে গম্ভীর গলায় বলল, জি খাব। দিন একটা।

মনজুর খুব হাসতে লাগল।

হাসছে ফরিদও। প্রথম দিন এই মানুষটিকে খুব খারাপ লেগেছিল। আজ লাগছে না। আজ ভালো লাগছে।

ফরিদ।

জি।

আমি একটা ছেলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলাম। তুমি কি কিছু শুনতে পেয়েছ?

জি-না।

তুমি কি জেগে ছিলে?

জি জেগে ছিলাম। নতুন জায়গায় আমার ঘুম হয় না।

তুমি যদি জেগে থেকে কিছু না শুনে থাকো তাহলে ধরে নিতে হবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি একটা কাজ করো— আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করো। দেখি বলতে পারি কিনা। পাগলেরা ধাঁধার উত্তর পারে না।

ফরিদ বলল, আপনি শুয়ে থাকুন। আপনার বিশ্রাম দরকার।

এখন আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে। বিশ্রামের কোনোই দরকার নেই। এসো দু'জন বারান্দায় বসে থাকি।

আপনার ঠাণ্ডা লাগবে।

তা লাগবে। লাগুক না। চলো, ভোর হওয়া দেখি।

ভোর হতে এখনও অনেক দেরি।

মোটের দেরি নয় ফরিদ সাহেব। সময় অত্যন্ত দ্রুত যায়। আমরা জীবন শুরু করি, তারপর হঠাৎ একদিন দেখি— সময় শেষ, দুয়ারে পাক্কি এসে দাঁড়িয়েছে।



আজ মীরার নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কথা।

জালালউদ্দিন গাড়ি রেখে গেছেন। প্রথম দিন সে গাড়ি করে যাক। মীরা বলেছে গাড়ি লাগবে না। তবু খুশিই হয়েছে। গাড়ি সে ছেড়ে দেবে না। প্রথম দিনটিতে তারা নিশ্চয়ই তাকে সারা দিনের জন্যে রেখে দেবে না। কাজটাজ খানিকটা বুঝিয়ে দিয়ে বলবে— বাসায় চলে যান। প্রথম দিনেই এত কাজের দরকার নেই। সে তখন গাড়ি নিয়ে খুব ঘুরবে। বিশেষ কোথাও যাবে না। এমনি ঘুরবে। গুলশান মার্কেটে যেতে পারে। সুন্দর সুন্দর কিছু বিছানার চাদর কেনা যেতে পারে। বিছানার চাদর কেনা মীরার হবি বিশেষ। কত ধরনের চাদর যে আছে— তারপরেও কেনা চাই।

কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকে বলল, আফসোস আপনার কাছে আইছে।

কে এসেছে?

কাজের মেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল। যার মানে যে এসেছে তার পরিচয় দিতে লজ্জা লাগছে এবং কিঞ্চৎ হাসি পাচ্ছে। নিশ্চয়ই মনজুর। মীরা কঠিন গলায় বলল, হাসছ কেন?

হাসি থেমে গেল। কাজের মেয়েটি এখন ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। মীরা এমন

করে কথা বলবে তা হয়তো সে ভাবে নি। মীরা শীতল গলায় বলল, উনি যদি
কখনও এমন করে হাসবে না, যাও দু'কাপ চা দিতে বলো।

খাটটা চল্লিশ বাজে। এখনও অনেক সময় আছে। দশটা বাজার পনেরো মিনিট
। রওনা হলেই হবে। মীরা আয়নার দিকে তাকাল। চুল বাঁধা হয় নি। এভাবেই
। যাবে, না চুল বাঁধবে? শাড়িটাও গুছিয়ে পরা নেই। একটু কি গুছিয়ে পরা উচিত
। সে চিরুনি হাতে নিয়ে দ্রুত চুলের উপর টানতে লাগল।

আশ্চর্য! মীরাকে ঢুকতে দেখে মনজুর উঠে দাঁড়াল। বাইরের একজন মহিলাকে
সে যেন সম্মান দেখাচ্ছে। কোনো মানে হয়? মীরা বলল, কেমন আছ?

ভালো।

কী রকম ভালো সেটা শুনি।

মোটামুটি ভালো। চলাফেরা করতে পারছি। কতদিন পারব জানি না।

তোমার হাসপাতালে ভর্তি হবার খবর শুনেছি। সরি, দেখতে যেতে পারি নি।
হাসপাতাল আমার ভালো লাগে না। বাবা একবার অসুখ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন।
দশ দিন ছিলেন। আমি দেখতে যাই নি। হাসপাতালের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

মনজুর হেসে বলল, কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন? আমি কি কৈফিয়ত তলব করতে
এসেছি?

কী জন্য এসেছ?

তোমার অনেক জিনিসপত্র আমার কাছে রয়ে গেছে— ঐসব কী করবে তাই
জানতে এসেছি।

থাকুক তোমার ওখানে। একসময় নিয়ে আসব।

আমি এখন কিছুদিন মেজো মামার সঙ্গে থাকব। তোমার জিনিসপত্র আবার নষ্ট
না হয়।

নষ্ট হলে হবে, কী-বা আছে!

মনজুর উঠে দাঁড়াল। মীরা বলল, বসো চা আসছে। তুমি যাবে কোথায়—
অফিসে?

হ্যাঁ।

আমি নামিয়ে দেব। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। সাড়ে নটার সময় আমি বের
দেব। চলবে তো?

চলবে।

কাজের মেয়েটি চা নিয়ে ঢুকেছে। শুধুই দু'কাপ চা, সঙ্গে কিছুই নেই। সামান্য
ওদ্রতটুকুও কি এরা এই মানুষটাকে দেখাবে না?

নাও, চা খাও। চিনি হয়েছে?

হয়েছে।

আমি এর মধ্যে তোমার খোঁজ নেয়ার জন্য তোমাদের অফিসে টেলিফোন
করেছিলাম। তুমি ছিলে না। অফিসের এক ভদ্রলোক বললেন, তুমি আজকাল
অফিসে খুব কম আসো। তোমার শরীর কি বেশি খারাপ?

শরীর খুব বেশি খারাপ না। অফিসে যাই না, কারণ মনে হচ্ছে আমার চাকরিটা
নেই।

কী বলছ তুমি!

এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না, তবে এদের ভাবভঙ্গিতে তাই মনে হচ্ছে।

তুমি ভালোমতো জানতেও চাও নি?

না।

কেন না— সেটা আমাকে গুছিয়ে বলো।

আমার ইচ্ছা করছিল না। যা হবার হবে।

তুমি গা এলিয়ে পড়ে থাকবে?

সব সময় তো তাই করেছি।

এটা কি কোনো বাহাদুরি?

মনজুর কিছু বলল না। মনে হয় একটু হাসল। মীরা রাগী গলায় বলল, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন গা এলিয়ে পড়ে থাকা খুব অহঙ্কারের ব্যাপার। যেন তুমি মস্ত কাজ করে ফেলছ।

রেগে যাচ্ছ কেন মীরা?

রাগের কাণ্ড করছ তাই রেগে যাচ্ছি। এই ফার্ম দাঁড় করাবার পেছনে তোমার কনট্রিবিউশন আমি কি জানি না? তুমি কখনও বলো নি, তোমার বস বলেছে। আর সে তোমাকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলবে— তুমি কোনো কথা বলবে না?

মনজুর সিগারেট ধরিয়ে বলল, একেকজন মানুষ একেক রকম হয়। আমার ছোটবেলা থেকেই এ-রকম। কত বড়বড় ঘটনা ঘটে, প্রথমে খুব হকচকিয়ে যাত তারপর মনে হয়— আচ্ছা ঠিক আছে। কী আর করা।

তুমি তাহলে একজন সাধুপুরুষ? মহামানব?

আরে কী যে বলো! তুমি এতদিন পর আজ হঠাৎ এত রাগ করছ কেন?

জানি না। তোমাকে দেখে কেন জানি খুব রাগ লাগছে। যাও আর রাগ কর না। তুমি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আরেক কাপ চা খাও। আমি কাপড় বদলে আসি।

আচ্ছা।

তোমাকে বলা হয় নি, আজ আমি একটা চাকরিতে জয়েন করছি।

বাহ্ ভালো তো।

সামনের মাসেই নতুন বাসা নেব।

ভেরি গুড। তোমার নতুন বাসার জন্য কোনো ফার্নিচার দরকার হলে আমাকে বলবে। আমি মামাকে বলে ভালো ফার্নিচারের ব্যবস্থা করে দেবো।

থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে এখন কাপড় বদলাতে যাই। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

মীরার এত সময়ও লাগল না। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখল মনজুর সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। মনজুর ডাকতেই ধড়মড় করে উঠে পড়ল। লজ্জিত গলায় বলল, আমার এখন একটা সমস্যা হৈছে ক্লান্তি। হেঁটে হেঁটে তোমার এখানে এসেছি তো, ক্লান্ত হয়েছি— ঘুম এসে গেছে। সরি এবাউট ইট।

হেঁটে হেঁটে এলে কেন?

রিকশায় ওঠা আমার জন্য বিরাট সমস্যা, দুলুনিতে ঘুম পেয়ে যায়। রিকশায় ঘুমিয়ে পড়া বিরাট রিস্কি ব্যাপার।

তোমার শরীর তো খুবই খারাপ।

মনজুর সহজ গলায় বলল, কিডনি ট্রান্সফার করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
কিডনি সত্যি সত্যি ট্রান্সফার করতে হচ্ছে?

হঁ।

কে দিচ্ছে কিডনি?

এখনও ঠিক হয় নি। ডোনার চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

কবে দিয়েছ?

তিনদিন হলো। এখনও কেউ আসে নি।

কত টাকা দিচ্ছ ডোনারকে?

এক লাখ।

এত টাকা!

একজন তার শরীরের মূল্যবান অংশ দিয়ে দেবে আর তাকে এক লাখ টাকাও
না?

আছে তোমার কাছে এত টাকা?

না। আমার খালা কিছু দিয়েছেন— আর মামাও দিচ্ছেন।

ট্রান্সপ্লান্টটা হবে কোথায়?

মাদ্রাজে। ভেলোর। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

যোগাযোগটা করছে কে? তুমি নিশ্চয়ই না।

মামাই সব দেখাশোনা করছেন।

তোমার তো অনেক টাকা লাগবে।

তা লাগবে।

আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে
আমি কিছু দিতে পারি। পরে ফেরত দিয়ে দিও।

মনজুর কথা বলল না।

গাড়িতে সে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে গেল। মীরা তীক্ষ্ণ গলায় বলল,
ওখানে বসছ কেন? পেছনে আসো। মনজুর বিনা বাক্যব্যয়ে পেছনে মীরার সঙ্গে বসল।

মীরা বলল, আমার সঙ্গে বসতে অস্বস্তিবোধ করছ নাকি?

না— অস্বস্তিবোধ করার কী আছে?

কিছুই নেই, কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে অনেক কিছুই আছে।
আরাম করে বসো। আবার যেন ঘুমিয়ে যেও না।

না, এখন আর ঘুমাব না— তোমাদের বাসায় সোফায় শুয়ে ঘুম হয়েছে।

তুমি এখন তাহলে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছ?

হঁ। অসুখটা মনে হয় আমাকে কাবু করে ফেলছে।

অসুখ ছাড়াও তো তুমি ভালো ঘুমাতে। রাত্রে রাতে কী ঘুমটাই ঘুমিয়েছিলে,
মনে আছে?

মনে আছে। এক ঘুমে রাত কাবার।

দ্বিতীয়বার যদি বিয়ে করো— তাহলে এই ভুল করবে না।

না, তা করব না।

মীরা মনজুরকে তার অফিসের সামনে নামিয়ে দিল।

মনজুর কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগোচ্ছে। মানুষটা এত অসুস্থ!

মনজুর লিফ্টে করে ওঠার সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করল।

অফিসের দু'জন কর্মচারীও তার সঙ্গে উঠছে। তারা সালাম দিল না। এমন কোনো বড় ব্যাপার না, কিন্তু চোখে লাগে। মনজুর তাদের দিকে তাকিয়ে হাসি বলল, কী ভালো? ওরা দু'জনেই লজ্জা পেল বলে মনে হলো। একজন বলল, ভালো। তবে সে 'স্যার' বলল না। মনে হচ্ছে এখন কেউ আর তাকে 'স্যার' ব আগ্রহী নয়। নিচের অফিসারদের কেউই উঠে দাঁড়ায় না। তাকে সম্মান দেখানো প্রয়োজন সম্ভবত ফুরিয়েছে।

চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট সেদিন হঠাৎ কী মনে করে তার ঘরে এসেছিলেন। প্রথমদিকে মনজুর তার উদ্দেশ্য ঠিক ধরতে পারল না। মনে হলো গল্প-গুণন করতেই এসেছেন। চা খেলেন, সিগারেট খেলেন। শরীরের খোঁজখবর করলেন। একসময় বললেন, মনজুর সাহেব, আপনার এই ঘরের সাইজ কত? তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। ভদ্রলোক মনজুরের ছেড়ে যাওয়া কামরায় এসে উঠতে চান। ঘরের মাপে কার্পেট কিনতে হবে। মনজুর বলল, ঘরের মাপ তো জানি না। একটা গজ ফিতা দিয়ে মেপে ফেললে হয়। মাপব?

না থাক।

জানতে চাচ্ছেন কেন?

এমনি প্রশ্নটা মনে আসল। আমার ঘর আবার সাইজে খুবই ছোট। আপনার ঘরে ক্রস ভেন্টিলেশনের সুবিধা আছে।

এই ঘরে আসতে চান?

সরাসরি প্রশ্নে চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট নার্ভাস হয়ে গেলেন। খতমত খাওয়া গলায় বললেন, আরে না। আপনার ঘরে আপনি আছেন। আমি আসব কী করে?

আমি তো নাও থাকতে পারি।

যখন থাকবেন না তখন দেখা যাবে। আচ্ছা যাই মনজুর সাহেব। শরীরের দিকে লক্ষ রাখবেন এবং মনে সাহস রাখবেন। সব ওষুধের সেরা ওষুধ হলো মনের জোর।

ভদ্রলোক চলে যাবার পরপরই কুদ্দুসকে ডাকিয়ে মনজুর কামরা মাপাল। কাগজে সেই মাপ লিখে পাঠিয়ে দিল চিফ অ্যাকাউন্টেন্টকে। ভদ্রলোককে খানিকটা লজ্জায় ফেলা হলো। মাঝে মাঝে মানুষকে লজ্জা দিতে খারাপ লাগে না। অবশি একদল মানুষ আছেন যারা কখনও লজ্জা পান না। চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট সেই রকম একজন মানুষ।

মনজুর নিজের ঘরে ঢুকল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে হবে। আজকাল অতি শীতল হওয়ায় শরীর ভেঙে আসে। মনে হচ্ছে আরেকবার ডায়ালাইসিস করিয়ে রক্তের স্রোত থেকে দূষিত জিনিসগুলো বের করে দিতে হবে। হাঁটাইটি, ঘোরাফেরা বন্ধ করে হাসপাতালের বিছানায় ফিরে যেতে হবে।

মনজুর ডিভানে বসল। ডিভানের এক মাথায় ছোট্ট একটা বালিশ। নিশ্চয়ই জাহানারার কাণ্ড। মেয়েটা তার সেবাযত্নের নানান চেষ্টা করছে। কোনো কিছুতেই তার মন ভরছে না। গত কাল তাকে অবাক করে দিয়ে বলল, স্যার, কয়েকটা দিন আমাদের বাসায় এসে থাকবেন? বলেই সে এমন লজ্জা পেল যে মনজুর এই প্রশ্নে

কোনো কথা না বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। মনে হলো প্রসঙ্গ পাল্টানোয় জাহানারা
দুঃখ পেয়েছে।

খাবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে কুদ্দুস মাথা ঢুকিয়ে বলল, বড় সাব আফনেরে ডাকে।
কি শয় দরকার।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মনজুরের ইচ্ছে করছে বলতে— বড়
সাবকে এইখানে আসতে বলো। আমার নড়াচড়ার শক্তি নেই। তা বলা সম্ভব নয়।

নুরুল আফসার এই ভোরেই মদ্যপান করেছেন।

ঘরময় অ্যালকহল এবং সিগারেটের কটু গন্ধ। এয়ারকুলার চলছে। এয়ারকুলার
থেকে পাতলা ধাতব আওয়াজ আসছে যা সূক্ষ্মভাবে মাথার উপর চাপ ফেলে।
একসময় মাথায় যন্ত্রণা হতে শুরু করে।

নুরুল আফসার টেবিলে পা তুল আধশোয়া হয়ে আছেন। মনজুরের দিকে
দাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, তুই আছিস কেমন?

ভালো।

তোকে একটা কমপ্লিমেন্ট দেয়ার জন্য ডাকিয়েছি।

কী কমপ্লিমেন্ট?

পৃথিবীতে নির্লোভ মানুষ আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। তুই প্রমাণ করেছিস
যে আছে। তুই কি ছোটবেলা থেকেই এমন, না বড় হয়ে হয়েছিস?

ছোটবেলায় আমি বিরাট চোর ছিলাম।

নুরুল আফসার আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মনজুরের কথায় তিনি বেশ মজা
পাচ্ছেন।

তুই ছোটবেলায় চোর ছিলি?

হঁ।

কী চুরি করতি?

খালার বিছানার নিচ থেকে ভাংতি পয়সা সরাতাম।

রেগুলার সরাতি?

হঁ। পরে জানতে পারলাম আমি যাতে পয়সা চুরি করতে পারি সে জন্যই খালা
এক সময় তোশকের নিচে ভাংতি পয়সা রাখতেন; কারণ এমনতে আমি কখনও
চাকাপয়সা নিতাম না। হাজার সাধাসাধিতেও না।

তোর খালাও মনে হচ্ছে তোর মতোই ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।

খালা একজন চমৎকার মানুষ। তোর কথা কি শেষ হয়েছে? আমি এখন ডিভানে
ওয়ে খানিকক্ষণ ঘুমাব। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কথা শেষ হয় নি। আসল কথা, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথাটাই বাকি।

যদি সম্ভব হয় তাড়াতাড়ি বলে ফেল।

নুরুল আফসার টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখের
চুষ্টি তীক্ষ্ণ। তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এই ফার্মটা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। তুই
আমার পাশে দাঁড়িয়ে গাধার মতো খেটেছিস। মনে আছে?

আছে।

তোকে অনেকবার বলেছিলাম আমাকে তুই দাঁড় করিয়ে দে; তোকে আমি ঠকান না। কি মনে আছে?

আছে।

তুই তোর কথা রেখেছিস— আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিস। আমি আমার কথা রাখতে চাই। তুই কি লক্ষ করেছিস পে-ব্লিপে তোর নাম নেই?

লক্ষ করেছি।

কেন নেই এ নিয়ে তোর মনে প্রশ্ন ওঠে নি?

উঠলেও খুব মাথা ঘামাই নি।

আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ফিরে আসতে পারি, আবার নাও আসতে পারি। এই ফার্মের মালিকানার একান্ন ভাগ তোকে দিয়ে যাচ্ছি। বাকি ঊনপঞ্চাশ ভাগ থাকবে আমার। পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা থাকবে তোর হাতে। তেরো হাজার মাইল দূর থেকে আমি সুতা নাড়ব না। অনেস্ট।

মনজুর হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

সে খুশি হলো, না অখুশি হলো তাও বোঝা গেল না। বড় বড় ঘটনা তার ওপর কোনোই প্রভাব ফেলে না। তার চোখ ছোট ছোট। তাকে দেখে মনে হচ্ছে জেগে থাকার জন্য তাকে কষ্ট করতে হচ্ছে।

নুরুল আফসার বললেন, মনজুর, কোম্পানির এসেটস যেমন আছে— লায়বিলিটিসও আছে। আমাদের ব্যাংক লোন আছে দু'কোটি টাকার উপর। সবকিছু মাথায় রাখতে হবে। কিছু ডিসঅনেস্ট কর্মচারী আমাদের আছে। ডিসঅনেস্ট হলেও তারা খুব এফিসিয়েন্ট। এদের কখনও হাতছাড়া করবি না, আবার কখনও এদের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবি না। তুই কি ঘুমিয়ে পড়ছিস নাকি?

না।

তুই তোর ঘরে গিয়ে বস। কাগজপত্র পাঠাচ্ছি। অনেক কাগজে সিগনেচার করতে হবে।

মনজুর তার ঘরে ঢুকল। তার মনে হচ্ছে খবরটা ছড়িয়ে গেছে, অফিসের সবাই এখন জানে। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই কেমন অন্যরকম করে তাকাচ্ছে। মনজুরের ঘরে যাবার পথ মূল অফিস ঘরের ভেতর দিয়ে। মূল অফিসে পা দেয়ার সময় সবার কাজকর্ম থেমে গেল। তাদেরকে কেমন যেন নার্ভাস লাগছে।

মনজুর তার ঘরে ঢুকে ডিভানে গা এলিয়ে দিল। খুব তমস্বী লাগছে। অথচ উঠে পানির বোতলের কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা একগাদা কাগজ হাতে ঢুকেছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, বড় সাহেব পাঠিয়েছেন— সই করতে হবে স্যার।

কলম আছে তোমার কাছে?

জি আছে।

দস্তখত করতে করতে মনজুর বলল, তুমি কাঁদছ কেন জাহানারা?

জাহানারা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খবরটা শোনার পর থেকে একটু পরপর তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে কিছুতেই চোখের পানি আটকাতে পারছে না। কী যে আনন্দ হচ্ছে! কেন এত আনন্দ? কেন?

জাহানারা আজ বাড়ি ফেরার পথে কয়েকটা জিনিস কিনল। একটা গ্লাস, সুন্দর

একটা চায়ের কাপ, ভালো একটা চীনাটির পেট। জাহানারার মা অবাক হয়ে বললেন, সব জিনিস একটা একটা করে কেন রে মা?

জাহানারা বিব্রত গলায় বলল, আমার কি টাকা আছে? ধীরে ধীরে কিনব। জিনিসগুলো সুন্দর হয়েছে না মা?

হ্যাঁ সুন্দর। পরে কি তুই সেট মিলিয়ে কিনতে পারবি?

পারব।

জাহানারা মুখে বলল পারবে কিন্তু সে ঠিক করে রেখেছে সেট মিলিয়ে সে কিনবে না। এই জিনিসগুলো তার কাছে একটা করেই থাকবে।



দশজার কড়া নড়ছে।

মনজুর বড় বিরক্ত হলো। এত ভোরে কে এলো? ইদানীং সবাই মিলে তাকে খুব ক্রোধ করছে। অফিসের লোকজন আসছে— কখনও একা, কখনও দল বেঁধে। আর এলে আর যেতে চাচ্ছে না। সেদিন করিম সাহেব এলেন, সঙ্গে নীল রঙের টা বোতল। এই বোতলে হালুয়াঘাটের এক পীর সাহেবের পানি-পড়া আছে।

বস্তু যোগাড় করতে তাকে যে কী পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে সে গল্প এক ঘণ্টা করে করলেন। গল্প শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই পানি-পড়া যোগাড় করার চেয়ে সুন্দরবনে গিয়ে বাঘিনীর কোল থেকে বাচ্চা নিয়ে আসা অনেক সহজ।

গতকাল এসেছিলেন বাসারত সাহেব, একা আসেন নি— নিত্যনন্দ চক্রবর্তী নামে একজন আয়ুর্বেদশাস্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন। ছোটখাটো মানুষ হলেও নিত্যনন্দ বাবু একাধারে কাব্যতীর্থ, আয়ুর্বেদাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, জ্ঞানশ্রী এবং বিদ্যাশ্রী। ওদলোক মনজুরের নাড়ি ধরে ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট চোখ বন্ধ করে বসে বইলেন। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর মনজুর বলল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভাই?

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী হাতের ইশারায় তাকে চুপ করে থাকতে বললেন এবং আরও দশ মিনিট এভাবেই কেটে গেল। মনজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল, কী যন্ত্রণা!

নিত্যনন্দ চক্রবর্তী চোখ মেলে বললেন, আপনাকে একটা ওষুধ তৈরি করে দেব। ওষুধটার নাম 'নলাদি ক্বাথ'। নল, কুশ, কাশ এবং ইক্ষু— এই চার উপাদানে নির্মিত। ওষুধটা এক মাস ব্যবহার করুন। তারপর এই যুগের বড় বড় ডাক্তারের কাছে যান। তারা বলবে— কিডনি ঠিক আছে যদি তা না বলে আমি আমার সংগ্রহে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যে শতাধিক পুস্তক আছে সব পুড়িয়ে ছাই বানাব। সেই ছাই মুখে লেপন করে আপনাকে দেখিয়ে যাব।

মনজুর বলল, কত লাগবে ওষুধ তৈরি করতে?

বাসারত সাহেব চোঁচিয়ে উঠলেন, এটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। কী লাগবে না-লাগবে তা আমি দেখব।

বেশ দেখুন।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী তখন তাঁর চিকিৎসার গল্প শুরু করলেন। এক এমআরসিপি ডাক্তার কীভাবে তাঁর কাছে ছুটে এসে করজোড়ে বলেছিলেন— নিত্যবাবু, আপনার মতো চিকিৎসক আমার জীবনে দেখি নি। আপনি বয়োজনীয়, নয়তো আপনার পায়ের ধুলা নিতাম।

মনজুর তাদেরকে জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল। নিত্যবাবু এবং বাসারত দু'জনের কেউই যাবার নামটি মুখে আনছিল না।

আজ সেই নিত্যবাবুই এসেছেন মনে হচ্ছে। চারদিন পর তাঁর ওষুধ দিয়ে যাবার কথা— ‘নলাদি কুথ’। চারদিন পার হয়েছে। আজ পঞ্চম দিন।

মনজুর উঠে দরজা খুলল।

এই ভোরবেলায় জাহানারা চলে এসেছে। তার শরীর হলুদ রঙের চাদরে ঢাকা চাদরে পুরোপুরি শীত মানছে বলে মনে হচ্ছে না। অল্প অল্প কাঁপছে। জাহানারা হাতে টিফিন ক্যারিয়ারের একটি বাটি।

স্নামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। সূর্য ওঠার আগে চলে এসেছ, ব্যাপার কী?

আপনি কেমন আছেন?

ভালোই আছি। কিছুক্ষণের মধ্যে নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামের এক লোক আমাকে ‘নলাদি কুথ’ দিয়ে যাবে। ঐ বস্তু খাওয়ার পর শরীর আরও ভালো হয়ে যাবে কিডনি যেটা নষ্ট সেটা তো ঠিক হবেই— অন্য যেটা কেটে বাদ দেয়া হয়েছে সেটাও সম্ভবত গজাবে। এসো ভেতরে এসো। টিফিন বসে কী?

ভাপা পিঠা। মা করে দিয়েছেন স্যার।

ভেরি গুড। চলো ভাপা পিঠা খাওয়া যাক। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি— তুমি ততক্ষণে চায়ের পানি বসিয়ে দাও। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে। নয়তো নিত্যবাবুর জালে আটকা পড়ে যেতে হবে।

জাহানারা রান্নাঘরে চলে গেল।

তার মুখ মলিন। রাতে সে এক ফোঁটা ঘুমাতে পারে নি। পুরো রাত ছটফট করেছে। শেষরাতের দিকে বারান্দায় এসে বসেছে। বারান্দার কোণে জাহানরার মাও বসে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ডাকলেন, এদিকে আয় মা— জাহানারা মা'র কাছে গেল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

তিনি বললেন, তোর কী হয়েছে তুই আমাকে বল তো মা।

জাহানারা বলল, কিছুই হয় নি।

অনেক দিন থেকেই দেখছি— তুই ছটফট করছিস। আমাকে বল তো মা, তোর কী হয়েছে?

জাহানারা তীব্র গলায় বলল, বললাম তো কিছু হয় নি।

সে আবার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। জাহানারার মা তার পেছনে পেছনে ঢুকলেন এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর মেয়ে বিছানায় শুয়ে ছোট বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না। বাকি রাতটা বিছানার পাশে চুপচাপ বসে কাটালেন। মেয়ের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করার সাহসও তাঁর হলো না।

স্যার, দেখুন তো চায়ে চিনি ঠিক আছে কিনা?

মনজুর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, সব ঠিক আছে। তুমি চা খাচ্ছ না?

জি-না। আমি খালিপেটে চা খেতে পারি না।

খালিপেটে খেতে হবে কেন? পিঠা তো আছে। পিঠা নাও।

এখন কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মৃদু গলায় বলল, আপনাকে একটা কথা বলার জন্য আমি এত ভোরে এসেছি। কথাটা বলেই আমি চলে যাব।

বলো।

স্যার, আপনি কিডনি চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আমি আপনাকে একটা কিডনি দিতে চাই।

মনজুর বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটি একেক সময় একেকভাবে কথা বলে। আজ সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে কথা বলছে।

তুমি কিডনি দিতে চাও?

জি।

কেন বলো তো?

জাহানারা জবাব দিল না। তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। মেয়েটা যে আজ কথা অন্যভাবে বলছে শুধু তাই নয়— তাকে দেখাচ্ছেও অন্যরকম। মনজুর বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।

জাহানারা বসল না। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনজুর বলল, তুমি কিডনি দিতে চাইলেই তো হবে না। ক্রস ম্যাচিঙের ব্যাপার আছে।

ক্রস ম্যাচিঙের অসুবিধা হবে না। আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম, আপনার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। তিনি বলেছেন— ঠিক আছে।

মনজুর অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমি একবার তোমাকে কিছু সাহায্য করেছিলাম। তুমি কি তার প্রতিদান দিতে চাচ্ছ?

না। সেসব কিছু না।

তাহলে কী?

জাহানারা জবাব দিল না, তবে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

মনজুর বলল, দেখো জাহানারা, আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছি। নগদ টাকা দিয়ে আমি কিডনি কিনব।

আপনাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে না স্বামী।

আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। যাও, তুমি বাসায় যাও।

জাহানারা একটিও কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সে এটা রিকশা নিয়েছে। চাদরে মুখ ঢেকে সারাপথ ফুঁপাতে ফুঁপাতে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারছে না। রিকশাওয়ালা একসময় বলল, আন্মা, কাইন্দেন না। মনডা শান্ত করেন।



বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে পাঁচটি।

বদরুল আলম সাহেব পাঁচজনের ভেতর থেকে চারজনকে ইন্টারভ্যুতে ডেকেছেন। পঞ্চমজন বাদ পড়েছে। বাদ পড়ার কারণ তার নাম ডেরেন কুইয়া। ডেরেন কুইয়া নামের কাউকে ইন্টারভ্যু নেয়ার পেছনে তিনি কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। নিশ্চয়ই খ্রিস্টান। মুসলমান বডিতে অন্য ধর্মের মানুষের শরীরের অংশ ফিট করবে না বলেই তাঁর ধারণা। ইন্টারভ্যুতে একজন বাদ পড়ল। কারণ, তাকে খুনীর মতো দেখাচ্ছিল। যে তিনজন টিকে গেল তাদের ভেতর থেকে ডাক্তাররা একজনকে বেছে নিলেন। ক্রস ম্যাচিঙে তারটাই নাকি সবচে' ভালো মেলে। ছেলেটির নাম আমানুল্লাহ খান। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। রোগা, শ্যামলা এবং বেশ লম্বা। শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে শুনে মনে হলো সে খানিকটা ঘাবড়ে গেল। হাসপাতালেই বদরুল আলম সাহেবকে বলল, স্যার, ভয়-ভয় লাগছে।

বদরুল আলম ধমকে উঠলেন, ভয়ের কী?

অপারেশনে মরে-টরে যদি যাই!

এসব অপারেশনে কেউ মরে না। কিডনি কেটে বাদ দেয়া হলো ডাল-ভাত অপারেশন। ডাক্তার লাগে না, এক্সপেরিয়েন্সড নার্সও করে ফেলতে পারে। তোমারটা তো নার্স করবে না। ভেলোরের বড় বড় ডাক্তাররা করবেন।

তবু ভয় লাগছে।

বদরুল আলম গম্ভীর মুখে বললেন, তার মানে কী দাঁড়ায়? তুমি রাজি না? রাজি না থাকলে বলো, আমাদের হাতে অন্য ক্যান্ডিডেট আছে। ওরা এক পায়ে খাড়া।

তাঁর হাতে অন্য কেউই নেই। এইসব বলার কারণ আমানুল্লাহকে জ্ঞানিয়ে দেয়া যে সে সবেধন নীলমণি নয়। এতে টাকাপয়সা নিয়ে দরদাম করার সুযোগ থাকে। নয়তো আকাশছোঁয়া টাকা হেঁকে বসবে।

বদরুল আলম বললেন, কথা পাকাপাকি হওয়ার আগে ট্রান্সপারেন্ট সেটল হওয়া উচিত। কত চাও তুমি?

আমানুল্লাহ মাথা নিচু করে বসে রইল।

বদরুল আলম বললেন, তোমার ডিমাল্ড কী আগ্রহে শুনি, তারপর আমাদের কথা আমরা বলব। পছন্দ হলে ভালো কথা। পছন্দ না হলে কিছু করার নাই। আসসালামু আলায়কুম বলে বিদায় করে দিতে হবে। বরখাস্ত কী তোমার দাবি?

আমানুল্লাহ বলল, আপনারটাই আগে শুনি। আপনি কত দিতে চান?

আমার নিজের হলে বিশ হাজারের বেশি একটা পয়সা দিতাম না। দশ হাজারে আস্ত মানুষ পাওয়া যায়— সেখানে কুড়ি। ডাবল দেয়া। তবে আমার ভাগ্নে বলে দিয়েছে— এক লাখ। এক লাখই দেয়া হবে। এক পয়সা কমও না। এক পয়সা বেশিও না।

টাকাটা দেবেন কীভাবে?

কীভাবে মানে? ক্যাশ পেমেন্ট হবে, তবে একটা কিছু আছে।

কিছুটা কী?

পাঁচ হাজার টাকা তোমাকে আগে দেয়া হবে। এটাকে তুমি বুকিং মানি বলতে পারো। বাকি পঁচানব্বই দেয়া হবে কার্য সমাধা হবার পর।

পুরো টাকাটা আগে দেবেন না?

না।

না কেন? যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাই?

হ্যাঁ। অসম্ভব কিছু না। এতগুলো টাকা।

আমানুল্লাহ বলল, উল্টাও তো হতে পারে। আমি কিডনি দিয়ে দিলাম তারপর আপনারা আর টাকা দিলেন না।

কী যে তুমি বলো। স্ট্যাম্পের ওপর দলিল করা থাকবে।

টাকা না দিলে কে আর কোর্ট-কাছারি করবে বলুন! তা ছাড়া অপারেশন টেবিলে মরেও তো যেতে পারি। তখন টাকাটা দেবেন কাকে?

খোদা না খাস্তা সে-রকম কিছু হলে তোমার আত্মীয়স্বজন পাবে।

আত্মীয়স্বজনদের জন্য তো আমার টাকাটা দরকার নেই। আত্মীয়স্বজনদের আমি কিছু জানাতে চাই না। তারা কিছু জানবেও না।

কাউকে জানাতে চাও না?

জি-না। শুধু একটা জিনিসই আমি চাই— পুরো টাকাটা অ্যাডভান্স চাই। আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। টাকা নিয়ে পালিয়ে যাব না।

আমানুল্লাহ যে ভদ্রলোকের ছেলে সে খোঁজও বদরুল আলম নিলেন। তার বাবা একটা স্কুলের হেডমাস্টার। চার ছেলেমেয়ের মধ্যে আমানুল্লাহ সর্বকনিষ্ঠ। বড় এক বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজো ভাই টাঙ্গাইল কৃষি ব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার। আমানুল্লাহ নিজেও এ-বছর বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে।

বদরুল আলম বললেন, টাকাটা তুমি কাকে দেবে?

আমানুল্লাহ ঠাণ্ডা গলায় বলল, তা দিয়ে আপনার দরকার কী? আপনার যে জিনিসটা দরকার তা হলো আমার একটা কিডনি। আর কিছু না। আপনি যদি নগদ টাকা দেন— কিডনি আপনি পাবেন।

বদরুল আলম চিন্তায় পড়ে গেলেন। ছেলেটাকে যতটা সরল সাদাসিধা মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ততটা সে না, তঁাদড় আছে।

আমানুল্লাহ বলল, আপনি যদি মনস্থির করতে পারেন তাহলে আমাকে খবর দেবেন। তবে আমার বাড়িতে আপনি কিছু বলবেন না। আরেকটা কথা, ভেলোর যেতে হলে আমাকে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট কীভাবে করতে হয় তাও আমি জানি না। ঐ ব্যাপারেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

বদরুল আলম বললেন, পাসপোর্ট কোনো ব্যাপারই না। এক ঘণ্টায় পাসপোর্ট পাওয়া যায়। আসল সমস্যা টাকাটা। আমি আমার ভাগ্নের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারি। সে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

আপনি উনার ঠিকানাটা আমাকে দিন। আমি নিজেই কথা বলব।

তোমার কথা বলার কোনো দরকার নেই। আমরা মনজুরকে এর বাইরে রাখতে চাই। সে রোগী মানুষ।

উনার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। তাকে আমি আমার শরীরের একটা অংশ দেব আর তাঁর সঙ্গে আগে কথা বলব না তা তো হয় না। আগে তাঁকে আমার পছন্দ হতে হবে।

পছন্দ না হলে কিডনি দেবে না?

দেব। পছন্দ না হলেও দেব। টাকাটা আমার খুবই দরকার।

বদরুল আলম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনজুরের ঠিকানা লেখা একটা কাগজ তার হাতে দিলেন। দিয়েই বুঝলেন বিরাট ভুল করা হয়েছে। মনজুর এক কথায় টাকা দেবে। একটা হাতে লেখা রসিদও রাখবে না। মনজুর হচ্ছে তার ভাষায় ‘বুদ্ধিমান গাধা-মানব’। যথেষ্ট বুদ্ধি, যথেষ্ট চিন্তাশক্তি; কিন্তু কাজকর্ম গাধার মতো। ছেলেটিকে ঠিকানা দেয়া উচিত হয় নি। না দিয়েই বা কী করা?



থ্রি পি কনস্ট্রাকশনের মালিকানা বদলে তেমন কোনো পরিবর্তন হলো না। তবে সবাইকে খানিকটা উদ্বিগ্ন মনে হলো। প্রধান ব্যক্তির প্রতি আস্থার অভাব থাকলে সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সেই ধরনের নিরাপত্তাহীনতা। উড়া-উড়া খবর পাওয়া গেল অনেকের চাকরি চলে যাবে। নতুন স্টাফ আসবে। কোম্পানির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করছেন। কিছু গুজব নিয়ে কানাঘুসা হচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে আতঙ্কজনক গুজব হচ্ছে— বেতন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বড় সাহেব তিন কোটি টাকা নিয়ে আমেরিকা চলে গেছেন। কোম্পানির লিকুইড প্রপার্টি বলতে কিছুই নেই। ঈদ বোনাস তো দূরের কথা, বেতনই হবে না। এই গুজব বিশ্বাসযোগ্যভাবে ছড়িয়েছে। উপরের মহলের আফিসারও বিশ্বাস করেছেন।

আজ সেই গুজব মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সবার বেতন হলো। যাদের ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট ডিউ হয়েছিল, তারা তা পেল। ঈদের বোনাস পাওয়া না গেলেও বলা হলো ঈদের ছুটির আগের দিন দেয়া হবে। যে চাপা উদ্বেগ ও অস্বস্তি সবার মধ্যেই ছিল তা অনেকাংশে কেটে গেল। দুপুরের দিকে মনজুর ডেকে পাঠাল চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট করিম সাহেবকে।

করিম সাহেব ঘরে ঢুকলেন চিন্তিত মুখে। তাঁকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এ-রকম একটি গুজবও খুব ছড়িয়েছে; গুজব অবশ্যি শুরু করেছেন তিনি নিজেই।

মনজুর হাসিমুখে বলল, কেমন আছেন করিম সাহেব?

জি স্যার, ভালো।

বসুন। আমার সঙ্গে চা খান।

করিম সাহেব বসলেন। মনজুর নিজেই চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। করিম সাহেব চায়ে চুমুক দিলেন, সিগারেট নিলেন না।

কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা তো আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। সবার বেতন হবে, ঈদ বোনাস হবে— এগুলো আপনি জানেন। তারপরেও কী করে গুজব ছড়াল যে বেতন বন্ধ?

গুজবের কি স্যার কোনো মা-বাবা আছে?

অবশ্যই আছে। গুজবের মা থাকে, বাবা থাকে এবং গুজবের পেছনে একটা উদ্দেশ্যও থাকে। গুজবটা আপনার অফিস থেকে ছড়িয়েছে— এটাই দুঃখজনক।

আমার অফিস থেকে ছড়িয়েছে— এটা কে বলল?

আমি অনুমান করছি। করিম সাহেব, আমার অনুমান খুব ভালো।

করিম সাহেব আর কিছুই বললেন না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ঠাণ্ডা ঘর, তবু তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, তাঁর সামনে বসা মানুষটিকে আজ এত অন্যরকম মনে হচ্ছে কেন? কেমন কঠিন চেহারা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ক্ষমতা মানুষকে বদলে দেয় তা ঠিক, কিন্তু এত দ্রুত বদলাতে পারে? এই লোকটির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত বদলে গেছে।

করিম সাহেব।

জি স্যার।

আমি যে ঘরে বসতাম এ ঘরটা আপনার বেশ পছন্দ— আপনি ঐ ঘরে বসুন। নিজের মতো করে ঘরটা সাজিয়ে নিন।

করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর হঠাৎ পানির পিপাসা পেয়ে গেল। আগের বড় সাহেবের বেলায় এ-রকম কখনও হয় নি। আজ কেন হচ্ছে? ব্যাপারটা কী? তিনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

করিম সাহেব।

জি স্যার।

আমাদের বেশ বড় একটা সরকারি বিল দীর্ঘদিন আটকে ছিল। নুরুল আফসার সাহেব দেশ ছাড়ার আগে ঐ বিল ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন— কোন বিলটির কথা বলছি বুঝতে পারছেন?

পারছি।

আমি ঐ বিলের টাকার অর্ধেকটা একটা বিশেষ কাজে ব্যবহার করতে চাই।

বলুন স্যার কী কাজ।

আমাদের এত বড় কনস্ট্রাকশন ফার্ম— বাড়িঘর সমানে তৈরি করে যাচ্ছি। যাচ্ছি না?

যাচ্ছি।

অথচ আমাদের কর্মচারীদের কোনো কোয়ার্টার নেই। ভাড়া বাসায় তারা থাকে। তাদের বেতনের একটা বড় অংশ চলে যায় বাড়িভাড়া। আমি চাই খ্রি পি কনস্ট্রাকশনের প্রতিটি কর্মচারীর জন্য ফ্ল্যাট হবে। কাউকেই ভাড়া করা বাড়িতে থাকতে হবে না।

অনেক টাকা ব্লকড হয়ে যাবে স্যার।

হোক। কত দ্রুত কাজটা করা যাবে বলুন তো? মালিবাগে আমাদের কিছু রিয়েল এস্টেট আছে না?

আছে।

এখানেই ফ্ল্যাট উঠুক। তিন ধরনের ফ্ল্যাট হবে। প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের জন্য এক ধরনের, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য এক ধরনের, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য এক ধরনের। আমি চাই কাজটা যেন দ্রুত শেষ হয়। দ্রুত। আমার হাতে সময় বেশি নেই।

সময় বেশি নেই বলছেন কেন?

আমি অসুস্থ, এটা আপনার চোখে পড়ছে না?

চিকিৎসা তো স্যার হচ্ছে। কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হবে, তখন আর সমস্যা থাকার কথা না।

তা ঠিক। আচ্ছা, আপনি এখন উঠুন। বিকেলের দিকে একটা মিটিং ডাকুন। সেখানে ঠিক করব কীভাবে কী করা যায়।

জি আচ্ছা স্যার।

করিম সাহেব চলে যাবার পরপরই কুদ্দুস ঢুকল হাসিমুখে। তার হাতে কাঁঠাল আকৃতির দুটি পাকা পেঁপে। সে স্যারের জন্য নিয়ে এসেছে। কুদ্দুস মাথা চুলকে বলল, গাছের পেঁপে স্যার।

তাই নাকি?

বাবার নিজের হাতে পোঁতা গাছ।

ভালো, খুবই ভালো। দাম পড়ল কত?

চল্লিশ টাকা। পঞ্চাশ টাকা জোড়া চায়— চল্লিশে দিল।

মনজুর হেসে ফেলল। কুদ্দুসের মুখ অসম্ভব বিষণ্ণ হয়ে গেল। জেরার মুখে সে এক সেকেন্ডও টিকতে পারে না। তা ছাড়া এই মানুষটাকে সে আগে থেকেই ভয় পায়। এখন যেন সেই ভয় সাত গুণ বেড়েছে। ছায়া দেখলেই ভয় লাগে। মূল মানুষটাকে দেখতে হয় না।

কুদ্দুস।

জি স্যার।

ওয়েটিং রুমে আমানুল্লাহ নামে একটা ছেলে বসে আছে। তাকে নিয়ে আসো।

জি আচ্ছা স্যার।

কুদ্দুস ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। মনে-মনে ঠিক করল, আগামী এক মাস এই মানুষটার ত্রিসীমানায় সে থাকবে না। নগদ টাকা সাধবে না।

আমানুল্লাহর সঙ্গে মনজুরের আগে একবার দেখা হয়েছে। এটা দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আজ সে আমানুল্লাহকে আসতে বলেছে। আজ তাকে টাকা দেয়ার কথা। মনজুর রাজি আছে আমানুল্লাহর শর্তে। নগদ এক লক্ষ টাকা আগেই দেয়া হবে।

আমানুল্লাহ আজ সুন্দর একটা শার্ট পরেছে। চুল আঁচড়ানো। ইঙ্গি করা প্যান্ট। সকালবেলাতেই গোসল করেছে বলে বোধহয় তাকে সুন্দর লাগছে। চোখে-মুখে স্নিগ্ধ ভাব।

কেমন আছ আমানুল্লাহ?

জি স্যার, ভালো।

মনজুর ব্রাউন রঙের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, তোমার টাকা এখানেই আছে। পাঁচ শ' টাকার নোট দিয়েছি। তুমি গুনে নাও।

আমানুল্লাহ টাকা গুনছে।

মনজুর বলল, তুমি কিছু খাবে?

জি-না।

চা-টাও খাবে না?

না।

টাকা গোনা শেষ হয়েছে। প্যাকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে আমানুল্লাহ বলল, আমি একজনকে টাকাটা দেয়ার জন্য তিন/চারদিনের জন্য বাইরে যাব। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন আমি পালিয়ে গেছি— এইজন্য বললাম।

মনজুর বলল, আমি এ-রকম কিছুই ভাবব না।

আমার পাসপোর্ট হয়ে গেছে। যেদিন যেতে বলবেন আমি যাব। শুধু...

শুধু কী?

না, কিছু না।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

ভয়? হ্যাঁ একটু পাচ্ছি।

কেন?

মনে হচ্ছে অপারেশনে আমি মারা যাব।

তাই যদি মনে হয় তাহলে রাজি হলে কেন?

টাকাটা আমার খুবই দরকার।

মরে যাবে জেনেও টাকার জন্য তুমি রাজি হচ্ছে?

জি। অবশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা নেই। মানুষ তো আর সারাজীবন বেঁচে থাকবে না। একসময় না একসময় মরতে হয়। আগে আর পরে— এই আর কি। আচ্ছা আমি যাই।

তোমার সঙ্গে একটা গাড়ি দিয়ে দি। গাড়ি নিয়ে যাও— এতগুলো টাকা সঙ্গে নেবে!

অসুবিধা নেই। কেউ বুঝবে না আমার কাছে এত টাকা। সাময়িকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

মনজুর চুপচাপ বসে আছে। তার খুব খারাপ লাগছে। মন খারাপ শুধু না, শরীরও খারাপ। বমি ভাব হচ্ছে। মাথায় যন্ত্রণা। কবুস দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢোকাল। মনজুর বলল, কিছু বলবে কুদ্দুস?

স্যার পেঁপে কেটে দিব?

না। তোমার দেশের বাড়ির পেঁপে পরে খাব।

আপনার কি স্যার শরীর খারাপ লাগছে?

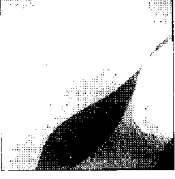
হঁ।

বাসায় চলে যাবেন?

তাই ভাবছি।

গাড়ি বের করতে বলব স্যার?

মনজুরের মনে পড়ল এখন তার দখলে একটা গাড়ি আছে যে গাড়িতে চড়ে সে এখন সারা শহর ঘুরতে পারে।



অফিসের কাজ মীরার মনে ধরেছে।

তেমন কিছু করার নেই। সেজেগুজে বসে থাকাই মনে হচ্ছে কাজের প্রধান অংশ। দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে অফিস পলিটিক্স। দুটি প্রধান দল আছে অফিসে। জি.এম. সাহেবের দল, এন্টি জি.এম. দল। দু'দলই চেষ্টা করছে মীরার মন ফেরাতে। এন্টি জি.এম. দলের প্রধান— মোসাদ্দেক সাহেব একদিন মীরাকে অফিস ক্যানটিনে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন এবং নানান কথার ফাঁকে একসময় নিচু গলায় বললেন, আপনার বয়স অল্প, আপনাকে একটা কথা বলছি শুনে রাখুন, জি.এম. সাহেব যদি গাড়িতে লিফ্ট দিতে চান— এভয়েড করবেন। কী জন্য এভয়েড করতে বলছি জিজ্ঞেস করবেন না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব না।

মীরা হেসে বলল, ঠিক আছে জিজ্ঞেস করব না।

মোসাদ্দেক সাহেব খানিকটা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন মীরা শোনার জন্য অনুরোধ করবে, তখন রসিয়ে গল্পটা বলা যাবে।

মিস মীরা, আপনি আছেন যখন সবই শুনবেন। এইসব হচ্ছে ঘরের কথা। কাউকে বলাও যায় না, সহ্য করাও যায় না।

জি.এম. সাহেবকে মীরার বেশ পছন্দ হলো। ভদ্রলোক হাসিখুশি। মহিলা কর্মচারী আশপাশে থাকলে তাঁর হাসিখুশির পরিমাণটা বেড়ে যায়। এ ছাড়া অন্য কোনো দোষ মীরার চোখে পড়ল না।

জি.এম. সাহেব মীরাকে বললেন, আপনি কি রিকশায় যাওয়া-আসা করেন?

জি.স্যার তবে মাঝমধ্যে ভাইয়ের গাড়িতে আসি।

ভবিষ্যতে আর রিকশায় যাওয়া-আসা করবেন না। অফিসীদের আনা-নেয়ার জন্য গাড়ি আছে। ঐ গাড়িতে যাবেন-আসবেন। মাঝেমাঝে আমার গাড়িতেও যেতে পারেন। কোনো অসুবিধা নেই। বললেই হবে। আমি ইচ্ছা করলেই দিয়েই যাই।

থ্যাংক ইউ স্যার।

কাজকর্ম কেমন লাগছে?

ভালো। অবশ্যি কাজকর্ম তেমন কিছু তো নেই।

হবে। ধীরে ধীরে হবে। আপনার পোস্টটা নতুন ক্রিয়েট করা হয়েছে। এই পোস্ট আগে ছিল না। মইন সাহেবের জন্যই ক্রিয়েট করা। ইনি আপনার কে হন?

দূরসম্পর্কের আত্মীয়।

খুব চমৎকার মানুষ— তাই না মিস মীরা?

জি চমৎকার মানুষ।

শুনলাম তিনি বিদেশে ফিরে যাচ্ছেন না। দেশে সেটেল করবেন। শুনে ভালো লাগল। তাঁর মতো একটিভ, ইনোভেটিভ মানুষ হচ্ছে দেশের সম্পদ। দেশ গড়ার কাজে এদের মতো লোক দরকার—তাই না?

মীরা কিছু বলল না।

মইন ফিরে যাচ্ছে না, দেশেই থাকছে—এই খবর তার জানা ছিল না। মীরার সঙ্গে শেষ দেখা জার্মান কালচারাল সেন্টারে। মীরার ধারণা ছিল উনি চলে গেছেন। মীরা অবশিষ্ট খোঁজ নেয় নি। একবার খোঁজ নেয়া উচিত ছিল। কেন জানি খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে নি।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে কিছু সময় আসে যখন কোনো কিছুই ভালো লাগে না। মীরার এখন এই সময় যাচ্ছে। ভালো লাগার একটা ভঙ্গি করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু তার কিছু ভালো লাগছে না। কখনও-কখনও তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়—আমার কিছু ভালো লাগছে না। কিছু না। সে অনেক চিন্তা করেছে, এ-রকম হচ্ছে কেন? মনজুরের অভাব কি সে বোধ করছে? তা তো না। তার জীবনের শূন্য অংশ মনজুর ভরাট করতে পারে নি। কাজেই তার অভাবে কাতর হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অন্য কোনো ব্যাপার। কী ব্যাপার তা সে ধরতে পারছে না। নিজেকে সে যতটা বুদ্ধিমতী ভাবত এখন মনে হচ্ছে সে ততটা নয়। তার সমস্যাটা কেউ ধরে দিতে পারলে চমৎকার হতো। একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে কেমন হয়। আছে এমন কেউ? তাকে গিয়ে সে কী বলবে? ছোট বাচ্চাদের মতো বলবে—‘আমার কিছু ভালো লাগছে না’ রোগ হয়েছে। আপনি সারিয়ে দিন।

মীরার অফিস ছুটি হয় চারটায়।

ছুটির পরপর তার বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করে না। বাসায় ফিরে সে কী করবে? নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবে?

বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে না। তার বন্ধুবান্ধব নেই। যারা আছে তাদের সঙ্গে গল্প বেশিদূর চালানো যায় না। মেয়েলি গল্পের বাইরে তারা যায় না কিংবা যেতে পারে না।

আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে সে সব সময় দূরে দূরে থেকেছে। এখন আরও বেশি দূরে থাকতে ইচ্ছা করে। তাঁদের কারও সঙ্গে দেখা হলোই অসম্ভব, চট করে বিয়ে-ভাঙা সমস্যায় চলে আসেন। সমস্ত চোখে-মুখে বিষাদের ভঙ্গি এনে বলেন—বুঝলি মীরা, সবই কপাল। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে জীবন শুরু কর। কী আর করবি? বেঁচে তো থাকতে হবে।

নতুন সংসার যাতে শুরু করতে পারে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেও তার আত্মীয়স্বজন অস্থির। প্রায়ই খোঁজ আনছেন, ছেলের ছবি নিয়ে আসছেন। যে ছেলে আগে বিয়ে হয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী।

মীরার ছোট ফুপু এক ছেলের খোঁজ আনলেন—খুব নাকি চমৎকার ছেলে। ভালো বংশ, ভালো টাকাপয়সা, ভালো চোহারা। ছেলের আগে বিয়ে হয় নি, এখন বিয়ে করতে চায়। তবে কুমারী মেয়ে নয়, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা।

মীরা বলল, এই ছেলে তো পাগল। আপনি শেষ পর্যন্ত একটা পাগল ছেলের খোঁজ আমার জন্য নিয়ে এলেন?

ফুপু চোখ কপালে তুলে বললেন, পাগল বলছিস কি! স্মার্ট ইয়াং ছেলে, সুন্দর চেহারা।

স্মার্ট ইয়াং ছেলে বিধবা ছাড়া বিয়ে করতে চায় না— এর মানে কী? ছেলে বিদ্যাসাগরের চ্যালা?

এখনই এত রেগে যাচ্ছিস কেন? আগে ছেলের সঙ্গে কথা বল। তারপর রাগারাগি করবি।

আমি ঐ ছেলের সঙ্গে কথা বলব না। তোমার সঙ্গেও না। তুমি আর এ বাড়িতে এসো না।

তোমার নিজেরই মাথাটা খারাপ হয়েছে মীরা।

তা ঠিক। মাথা আমার নিজেরই খারাপ।

এই সন্দেহ আজকাল মীরার হচ্ছে। তার কি মাথা খারাপ? এমন কিছু কি তার মধ্যে আছে যার জন্য তার লজিক মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যায়? আছে। নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্কের সেই অংশটা কি ঠিক করা যায় না?

জি.এম. সাহেব বললেন, মিস মীরা আজ আমি সাড়ে তিনটার দিকে অফিস থেকে বেরুব। একটা বিয়ের পার্টি আছে। গিফ্ট কিনতে হবে। ভালো গিফ্ট কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো?

মীরা বলল, ভালো বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

ভালো মানে, যা দেখে তারা এপ্রিসিয়েট করবে। আমার রুটির প্রশংসা করবে।

মীরা বলল, আজকাল রুটিটুকি কেউ দেখে না। উপহারটার দাম কত তাই দেখে। আপনি দামি একটা-কিছু কিনে দিন তাহলেই হবে।

কী দেব বলুন তো?

আপনার বাজেট কত স্যার?

হাজারখানেক। এরচে' কম হলেই ভালো।

শাড়ি দিয়ে দিন।

আপনি কি আমাকে পছন্দ করে দিতে পারেন? অবশ্যি আপনার যদি সময় থাকে। আমার আবার রুচি বলে কিছু নেই। একবার আমার স্ত্রীর জন্য একটা শাড়ি কিনেছিলাম। শাড়ি দেখে সে বলল— এটা লুঙ্গির কাপড়। আমি নাকি থান থেকে সাড়ে তিন গজ লুঙ্গির কাপড় কিনে এনেছি।

মীরা হাসল।

পুরনো রসিকতা। সব স্বামীই স্ত্রীর জন্য শাড়ি কেনে নিয়ে এই একটি রসিকতাই করে। এবং মনে করে খুব উচ্চ শ্রেণীর রসিকতা করা হলো।

মিস মীরা।

জি স্যার।

আমার স্ত্রী, অন্য দশজন মানুষের স্ত্রীর মতো না। অন্য দশজন শাড়িটাকে লুঙ্গির কাপড় বলে খনিকক্ষণ চিৎকার চোঁচামেচি করবে, তারপর অনুতপ্ত হয়ে সেই শাড়ি পরে বলবে— পরার পর তো ভালোই দেখাচ্ছে! তোমার রুচি খুব খারাপ না।

আপনার স্ত্রী কী করলেন?

সে ঐ শাড়ি কেটে আমার জন্য তিনটা লুঙ্গি বানিয়ে দিল। সে লুঙ্গি আমাকেই পরাতে হলো।

মীরা কিছু বলল না। সাধারণ রসিকতার গল্প এখন সেনসেটিভ পর্যায়ে চলে গেছে। এখন কিছু না বলাই ভালো।

আপনার কি সময় হবে মিস মীরা?

জি স্যার হবে।

তাহলে চলুন যাই। শাড়ি কোথায় পাওয়া যায় তাও তো জানি না— শাড়িটাড়ি অবশ্যি আমার স্ত্রী কেনে। খুব আত্মহ নিয়ে কেনে। তবে আজকেরটা কিনবে না। কারণ কি জানেন?

জি-না।

অনুমান করতে পারেন?

না— তাও পারছি না।

যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে সে আমার দিকের আত্মীয়। আমার দিকের আত্মীয়ের কোনো কর্মকাণ্ডে সে থাকবে না। বিয়েতেও সে যাবে না। সাজগোজ সে করবে ঠিকই। গাড়িতে ওঠার আগ মুহূর্তে বলবে— মাথা ধরেছে, বমি বমি লাগছে। বলেই ছুটে বাথরুমে ঢুকে গলায় আঙুল দিয়ে হড়হড় করে বমি করবে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হবে— থাক যেতে হবে না। এই হচ্ছে আমার জীবন। অনেক কথা আপনাকে বলে ফেললাম, চলুন যাওয়া যাক।

শাড়ি কেনা হয়ে গেল পনেরো মিনিটে। দোকানদার কয়েকটা শাড়ি মেলে ধরল। মীরা সাদা জামদানির উপর নীল লতাপাতা আঁকা একটা শাড়ি তুলে নিয়ে বলল— এইটা নিন স্যার। চমৎকার।

জি.এম. সাহেব বললেন, আরেকটু ঘুরেফিরে দেখলে হয় না?

গুধু গুধু হাঁটাইটি করে কোনো লাভ নেই— এটা ভালো শাড়ি। আপনি আমার বুটির ওপর ভরসা করেছেন— এটাই নিন। আমি এখান থেকে বিদায় নেব। বইয়ের দোকানে খানিকক্ষণ ঘুরব।

আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি— তারপর আপনাকে নামিয়ে দেব।

স্যার, কোনো দরকার নেই।

মীরা বইয়ের দোকানগুলোতে বেশ কিছু সময় কাটাল। তিনটা বই কিনল— তিনটিই কবিতার। বই তিনটিই তার আছে, তবু কিনল কেন কে জানে? মানুষের কিছু কাজকর্ম আছে চট করে যার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। অবচেতন মনে কোনো ব্যাখ্যা হয়তো আছে যা এই মুহূর্তে মীরা নিজেও জানে না।

মীরা ঘড়ি দেখল। মোটে চারটা বাজে। দীক্ষা যায়? মনজুরের খোঁজে কি একবার যাবে? অফিস ছুটি হয়ে গেছে। তাকে এখন অফিসে পাওয়া যাবে না। আগের বাসায় গেলেও তাকে পাওয়া যাবে না। বাসা বদলে সে তার মেজো মামার কাছে গিয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। সেখানে যাওয়া যেতে পারে, তবে ঐ লোকটিকে তার নিতান্তই অপছন্দ। অশিক্ষিত, অশালীন গ্রাম্য ধরনের মানুষ। মনজুরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে মীরা যখন তার বাবার বাড়িতে চলে এসেছে তখনকার ঘটনা। বদরুল আলম এক সন্ধ্যাবেলায় দুই কেজি মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত। অতি নম্র গলায়

বললেন, মা'র কাছে ছেলের একটা আবদার। আবদার রক্ষা না করলে ছেলে এ' বাড়ি থেকে যাবে না। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। হাতি দিয়ে টেনেও ছেলে' নড়াতে পারবে না মা।

মীরা শুকনো গলায় বলেছে— বলুন কী আবদার।

মনজুরের কাছে শুনলাম— তুমি ওকে ছেড়ে এই বাড়িতে চলে এসেছ। এখন মা জননী, তুমি আমার সঙ্গে চলো। বাইরে একটা বেবিট্যাক্সি আছে। দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

বাইরে বেবিট্যাক্সি আছে?

হ্যাঁ মা।

দেখুন মামা, আমি রাগের মাথায় হুট করে চলে আসি নি। আমি পুরো এক বছর এটা নিয়ে চিন্তা করেছি। ভেবেছি। রাতের পর রাত নিরুশ্বাস কাটিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুরের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মনজুর কি আপনাকে এখন পাঠিয়েছে?

না, আমি নিজেই এসেছি। মনজুর যদি শোনে সে রাগ করবে। তাকে তুমি এই বিষয়ে কিছু বোলো না।

আমি কিছুই বলব না। আপনি চা খান। চা খেয়ে চলে যান।

বদরুল আলম সাহেবের নিশ্চয়ই অনেক কিছু বলার ছিল। সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। মীরার শীতল চোখের সামনে সব এলোমেলো হয়ে গেল। চা না খেয়েই চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আবার এলেন, সঙ্গে দু'কেজি মিষ্টি। তৃতীয় দিন আবার সঙ্গে সেই মিষ্টি।

মীরা বাধ্য হয়ে মনজুরকে বলল সে যেন তার মামাকে সামলায়। নির্বোধ ধরনের মানুষকে সামলানো বড়ই কঠিন কাজ।

সেই মামার কাছে মনজুরের খোঁজে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করবেন। ভেবে বসবেন— সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে; আবারও হয়তো লোক পাঠিয়ে দু'কেজি মিষ্টি আনাবেন। কোনো দরকার নেই। তারচে' মইনের কাছে যাওয়া যেতে পারে। তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। তবু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। এই চাকরিটি তাঁর কারণেই হয়েছে। সেই হিসেবে ধন্যবাদ তো তাঁর প্রাপ্য।

নিউমার্কেট থেকে বের হয়ে মীরা রিকশা নিল। রিকশায় উঠতে উঠতে মনে হলো— ভালো লাগছে না। কিছু ভালো লাগছে না। বেচে থাকা, খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো— সব অর্থহীন মনে হচ্ছে। কী যেন সেই কবিতাটা?

অর্থ নয় কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়...

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাইবেন আম্মা?

মীরা চমকে উঠল। এত মিষ্টি গলায় অনেক দিন তাকে কেউ 'আম্মা' ডাকে নি। অজানা অচেনা অপূষ্টিতে জিরজিরে বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা এত মিষ্টি করে তাকে 'আম্মা' ডাকল? এত মমতা ছিল তার গলায়?

মীরা বলল, আপনি সোজা যেতে থাকুন। আমি আপনাকে বলব।

জি আচ্ছা আশ্মা।

মীরার মন ভালো হতে শুরু করেছে। কেন?

মীরা জানে না। মইনের বাসায় যাবার আগে একবার কি মনজুরের অফিস দেখে যাবে? এত বড় কোম্পানির মালিক সে, নিশ্চয়ই পাঁচটা বাজতেই বাসায় চলে যায় না। তাকে নিশ্চয়ই অনেক কাগজপত্র সই করতে হয়।

আসব?

মনজুর হাসিমুখে বলল, এসো।

তোমার বসগিরি দেখতে এলাম।

খুব ভালো করেছ।

শরীর কেমন?

ভালো। মাঝখানে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ডায়ালাইসিস করার পর ঠিক আছে। সেই সঙ্গে চলছে আয়ুর্বেদী চিকিৎসা— ‘নলাদি ক্বাথ’ খাচ্ছি।

‘নলাদি ক্বাথ’টা কী জিনিস?

গোবর পানিতে গুললে যে বস্তু হয় তার নাম নলাদি ক্বাথ, কিডনির মহৌষধ বলতে পারো।

এখন তাহলে আয়ুর্বেদী চিকিৎসাও চলছে?

যে যা বলছে তাই করছি। একজন হালুয়াঘাট থেকে পীর সাহেবের পানি পড়া এনে দিলেন— তাও খেলাম।

কেন করছ এসব?

আগ্রহ করে তারা নানান চিকিৎসার কথা বলে। তাদের খুশি করার জন্য কোনো কিছুতেই না করি না। মানুষকে খুশি করতে আমার ভালো লাগে। তুমি কিছু খাবে মীরা?

না।

পেঁপে খেতে পারো। কুদ্দুস নামে আমার এখানে একজন কর্মচারী আছে— সে রোজ নিউমার্কেট থেকে পেঁপে কিনে এনে বলছে, নিজের গাছের পেঁপে স্যার। বাবার হাতে পোঁতা গাছ। কুদ্দুস খুব পিতৃভক্ত। তার সব গাছই থাকে বাবার হাতে পোঁতা।

মীরা তার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, রসিকতা করার চেষ্টা করছ বলে মনে হয়।

রসিকতা পছন্দ হচ্ছে না?

না। আজ তাহলে উঠি।

মীরা উঠে দাঁড়াল। মনজুর দুঃখিত গলপ বলল, সত্যি সত্যি উঠছ? বসো না একটু। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাও।

এক জায়গায় যাব। দেরি হয়ে যাবে, সন্ধ্যার পর রিকশায় যেতে ভয় ভয় লাগে।

আমার সঙ্গে গাড়ি আছে— যেখান যেতে চাও নিয়ে যাবে।

ও আচ্ছা, তোমার তো এখন গাড়ি আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম। তাহলে খানিকক্ষণ বসা যায়। বলো, চা আনতে বলো। ভালো কথা, ডোনার পাওয়া গেছে?

হ্যাঁ। নাম আমানুল্লাহ।

মীরা অতি দ্রুত চা শেষ করে ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল। মনজুর বলল, চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। তুমি যাবে কোথায়—মইন সাহেবের কাছে?

মীরা খানিকটা হকচকিয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ। তুমি উনাকে চেনো?

উনি একদিন আমার কাছে এসেছিলেন।

কী জন্য?

এমনি বোধহয় এসেছিলেন। কথাবার্তা বলার জন্য।

মীরা নরম গলায় বলল, তাঁর প্রতি একসময় আমার ভয়ঙ্কর টান ছিল, তা কি উনি বলেছেন?

মনজুর হেসে বলল, সবই বলেছেন। কিছুই বাদ দেন নি। আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় ভদ্রলোক তোমাকে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চান। তোমাকে কী করে বলবেন বুঝতে পারছেন না।

তুমি তোমার উর্বর মাথা থেকে এটা বের করলে?

হ্যাঁ। আমার কিডনি ফেল করতে পারে, ব্রেন ফেল করে নি।

করেছে। কারণ তুমি জানো যে মইন ভাই তাঁর স্ত্রী এবং বাচ্চাদের নিয়ে খুব সুখে আছেন।

মনজুর সহজ গলায় বলল, আমি যতদূর জানি তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে লুসিয়ানায় চলে যাবার পরই তিনি দেশে এসেছেন। ফিরে যাবেন না বলেই এসেছেন।

উনি নিজে তোমাকে বললেন?

হ্যাঁ। এবং আমার কি মনে হয় জানো মীরা, আমার মনে হয় তোমার উচিত তাঁকে বিয়ে করা। এই ভদ্রলোকের প্রতি তোমার যে প্রচণ্ড মোহ ছিল তার সবটাই এখনও আছে। আছে বলেই আমার সঙ্গে থাকতে পারলে না। আমার মধ্যে তুমি মইন সাহেবের ছায়া দেখতে চেয়েছিলে। তা কি সম্ভব? আমি হচ্ছি আমি।

মীরা কিছু বলল না।

গাড়িতে উঠেও চুপ করে রইল। মনজুর বলল, মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ করিয়ে দিয়েছি। সরি।

মীরা বলল, সরি হবার কিছু নেই।

মনজুর বলল, তোমার মোহ প্রসঙ্গে যা বললাম তা কি ভুল?

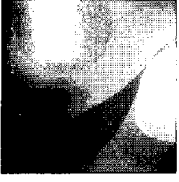
না, ভুল না।

ভুল না হলে তুমি এত লজ্জাবোধ করছ কেন?

লজ্জা বোধ করছি না তো।

করছ। খুব মন খারাপ করেছ। প্লিজ, মন খারাপ করবে না। আমার সঙ্গে তিনটি বছর তোমার খুব খারাপ কেটেছে। খারাপের পর ভালো আসে। সামনের দিনগুলো তোমার ভালো যাবে। আমি এক শ' ভাগ নিশ্চিত।

মনজুর মীরাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।



মইন বারান্দায় কাগজ, কাচি এবং গাম নিয়ে এসেছে। তৈরি করেছে কাগজের এ্যারোপ্লেন মডেল। তার সামনে একটা বই খোলা। বইয়ে লেখা মাপমতো প্রতিটি মডেল তৈরি হচ্ছে এবং তা সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়িয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাকে ঘিরে নানান বয়সী কিছু বাচ্চাকাচ্চা বসে আছে। তাদের বিস্ময় এবং মুগ্ধতা সীমাহীন।

মইন মীরাকে দেখে সহজ গলায় বলল, এসো মীরা, এসো। প্লেন বানাচ্ছি। মইনের গলায় কোনো বিস্ময় নেই। মনে হতে পারে সে এই মুহূর্তে মীরার জন্যই অপেক্ষা করছিল। বিস্মিত না হবার অভিনয় দুরুহ অভিনয়। এই মানুষটি সেই অভিনয় এত চমৎকার করেছে কী করে? নাকি সে আসলেই বিস্মিত হয় নি। ধরেই নিয়েছিল মীরা যে-কোনোদিন আসবে। মইন কাগজ কাটতে কাটতে বলল, এই মোড়াটায় আরাম করে বসো। আমার চারপাশে যারা বসে আছে তারা আমার নেফিউ এবং নিস। এদেরকে আমি এই মুহূর্তে এ্যারোডায়নামিক্স শিখাচ্ছি। সামান্য কাগজের তৈরি প্লেন বাতাসে ভর করে কুড়ি থেকে পঁচিশ গজ যেতে পারে যদি ঠিক ডিজাইনে তাদের তৈরি করা হয়। এই দেখো, এটাকে দেখো— ফড়িঙের মতো স্লিম বডি, আকাশে ভেসে থাকার ক্ষমতা দেখলে তুমি হকচকিয়ে যাবে।

মইন কাগজের প্লেন আকাশে ছুড়ে মারল। সেই প্লেন সত্যি সত্যি উড়তে উড়তে বাড়ির কম্পাউন্ড ছাড়িয়ে রাস্তার দিকে রওনা হলো। পেছনে পেছনে ছুটে গেল শিশুর দল। মইন মীরার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, কেমন আছ?

ভালো।

কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ, না এমনি এসেছ?

এমনি এসেছি। আপনার না চলে যাবার কথা ছিল?

যাওয়া হয় নি। আরও মাসখানেক থাকব।

আমাদের জি.এম. বলছিলেন, পুরোপুরি থেকে যাওয়ায় সম্ভাবনাও নাকি আছে।

না। কথার কথা বলেছিলাম। সেটাকেই ভদ্রলোক বিশ্বাস করে বসে আছেন। বর্তমান বাংলাদেশের সমস্যা কি জানো? সিরিয়াসলি সেসব কথা তুমি বলবে সেসব কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু রসিকতা করে তুমি যদি কিছু কথা বলো, যদি Casual remarks কিছু করো, সবাই বিশ্বাস করবে। চলো ভেতরে বসে কথা বলি।

প্লেন বানানো শেষ?

আজকের মতো শেষ। তুমি কি অফিস থেকে আসছ?

না। নিউমার্কেট থেকে। আমাদের জি.এম. সাহেবের সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম। আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে তিনি শাড়ি কিনলেন। আমাকে পছন্দ করে দিতে হলো।

মইন হাসিমুখে বলল, উনি নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাকে বলেছেন যে তাঁর পারিবারিক জীবন কী রকম বিষময়। বলেন নি?

বলেছেন।

ঐ গল্পটি কি করেছেন— তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য শখ করে একটা শাড়ি কিনে নিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা সেই শাড়ি কেটে তিনটি লুঙ্গি বানিয়ে তাঁকে প্রেজেন্ট করলেন। এই গল্প কি শোনা হয়েছে, না শোনা হয় নি?

মীরা বলল, শোনা হয়েছে।

মইন বলল, এসব গল্প এক বর্ণও বিশ্বাস করবে না। সুন্দরী মহিলাদের সহানুভূতি আদায়ের জন্য এই গল্প তিনি করেন। ভদ্রলোক হার্মলেস। তুমি নিশ্চিত মনে তাঁর সঙ্গে ঘুরতে পারো। কোনোদিন ভুলেও সে তোমার হাত ধরবে না। সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে গল্প করার আনন্দই তাঁর একমাত্র আনন্দ। তাঁর পারিবারিক জীবনও খুব ভালো। ভদ্রলোকের স্ত্রী একজন রূপবতী মহিলা এবং অত্যন্ত ভালো মহিলা। মীরা, তুমি মনে হয় আমার কথা শুনে হকচকিয়ে গেছ।

কিছুটা হকচকিয়ে গেছি তা ঠিক।

বুঝলে মীরা, পৃথিবীটা আসলে মোটামুটি ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা। এখন বলো তোমার পরিকল্পনা কী?

আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। আপনার কল্যাণে চাকরি হয়েছে, আমি তার জন্য আপনাকে থ্যাংকস্ দিতে এসেছি। এর বেশি কিছু না।

তুমি এমনভাবে 'এর বেশি কিছু না' বললে, যাতে মনে হচ্ছে এর বেশি কিছু হলে তোমার আপত্তি আছে। বসো, আমার সঙ্গে চা খাও। চা খেয়ে চলো ঘুরতে বের হই। রাতে ডিনারের পর তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসব। ভয়ের কিছু নেই। আমিও তোমাদের জি.এম. সাহেবের মতো হার্মলেস। ভালো কথা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে মনটা খুব খারাপ। কী হয়েছে বলো তো?

মীরা বলল, কিছু হয় নি আমি বেশিক্ষণ থাকব না। চা খাব, তারপর বাসায় চলে যাব। কাজ আছে।

কাজ পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কাজেই আর কোনো কথা নয়। আমার পরিকল্পনা কী ছিল জানো? পরিকল্পনা ছিল সন্ধ্যার পর তোমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও খেতে যাব। তোমাদের বাসায়, আই মিন তোমার ভাইয়ের বাসায়, খবর দিয়ে রেখেছিলাম। তুমি যখন এলে তখন ভাবলাম খবর পেয়ে নিজেকেই এসেছ। তুমি হয়তো লক্ষ কর নি যে তোমাকে দেখে আমি মোটেও অবাক হই নি। পরে অবশ্য বুঝলাম যে নিজ থেকেই এসেছ। খবর পাও নি। এর পরেও যদি যেতে না চাও তাহলে আমার হাতে আরেকটি কঠিন অস্ত্র আছে।

কী অস্ত্র?

আজ আমার জন্মদিন। তুমি এই দিনটা ভুলে গেলে এটা খুবই দুঃখের কথা। আমার ধারণা ছিল আমার জন্য অনেকখানি আবেগ তুমি সব সময় ধরে রাখবে। ধারণা দেখা যাচ্ছে ঠিক না। তুমি সব ভুলেটুলে বসে আছ।

তাই কি ভালো না?

জানি না, হয়তো ভালো। এখন বলো তুমি যাবে, না যাবে না।

চলুন যাই।

তুমি খুব অনাগ্রহ নিয়ে আমার সঙ্গে রওনা হচ্ছে। আমি হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি— এই অনাগ্রহ তোমার থাকবে না।

বাজিতে আপনি হারবেন। আজকাল কোনো কিছুতেই আগ্রহবোধ করি না।

কেন করো না তাও জানতে চাই।

জানতে চান কেন?

আজকের অনাগ্রহের পেছনে— অনেকদিন আগে আমার ঘরে যা ঘটেছিল তার কোনো যোগ আছে কিনা জানতে চাই। আমি নিজে অত্যন্ত সুখী মানুষ। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই।

দু'জন হাঁটত হাঁটতে রওনা হলো। মইনের ইচ্ছা অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর তারা রিকশা নেবে। রিকশায় করে ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন কোনো চাইনিজ রেস্তোরাঁয় আধো আলো আধো আঁধারে রাতের খাবার শেষ করবে।

মীরা লক্ষ করল মইনকে অসম্ভব খুশি খুশি লাগছে। মনে হচ্ছে সে তার আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। মীরাকে সে কোনো কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না। অনবরত কথা বলে যাচ্ছে।

মীরা, জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটে একটা ছবি কিনেছিলাম, তোমার মনে আছে? নগদ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। এক্সিবিশন শেষে ছবি নিয়ে আসার কথা ছিল। আমি আর ছবি আনতে যাই নি। ঐ আর্টিস্ট যেহেতু আমার ঠিকানা জানে না— ছবি দিয়ে যেতেও পারছে না। হা-হা-হা।

এতে খুশি হচ্ছেন, কারণটা কী?

খুশি হচ্ছি, কারণ আর্টিস্ট সাহেবকে এক ধরনের মানসিক কষ্ট দিতে পারছি। সে ঐদিন আমাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করেছিল। কঠিন অপমান। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম শোধ নেব। এখন নিচ্ছি। বেচারি এখন ছবিটা নিয়ে পড়েছে বিপদে। নিজের কাছে ছবিটা রাখতে হচ্ছে। যতবার তাকাচ্ছে ছবিটার দিকে, ততবার আমার কথা মনে হচ্ছে। মনটা খারাপ হচ্ছে— টাকা দিল অথচ ছবি নিল না। কঠিন মানসিক চাপ। হা-হা-হা।

আপনি মানুষটা বেশ অদ্ভুত।

অদ্ভুত না— ক্রুয়েল। নিষ্ঠুর। শুধু সদৃশ নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া না— এসবও কিছু কিছু লাগে। যাদের ভেতর শুধু সদৃশ, মানুষ হিসেবে অনেক নিচের দিকে তাদের অবস্থান।

কী পাগলের মতো কথা বলছেন!

পাগলের মতো কথা বলছি না। ভেবেচিন্তে বলছি। তোমাকে এই কথাগুলো বলার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্যও আছে। কী বলছি মন দিয়ে শোনো। খুব মন দিয়ে। একজন মানুষ যার ভেতরে মহৎ গুণাবলি ছাড়া কিছুই নেই, রাগ নেই, হিংসা নেই, ঘৃণা নেই সে কী করে জানো? সে আশপাশের মানুষদের অসম্ভব কষ্ট দেয়। আমরা তাকে এড়িয়ে চলি। ক্ষেত্রবিশেষে পরিত্যাগ করি। কারণ আমরা তাকে সহ্য করতে পারি না।

মীরা থমথমে গলায় বলল, আমাকে এসব কেন বলছেন?

মইন হাঁটা বন্ধ করে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেশ কিছু সময়

তাকিয়ে রইল মীরার দিকে। সন্ধ্যার শেষ আলোয় মীরার মুখ কেমন জানি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তিত।

মইন হাক্কা গলায় বলল, বুঝলে মীরা আমি কয়েক দিন আগে মনজুর নামের ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এক ধরনের কৌতূহল থেকেই গিয়েছিলাম। তোমার মতো একটা মেয়ে সবার মতের বিরুদ্ধে এমন সাদামাটা একজন মানুষকে কেন বিয়ে করল, আবার ছাড়াছাড়িই বা কেন হলো খুব জানার ইচ্ছা ছিল। আমার সঙ্গে এই লোকটি প্রতিযোগিতা করেছে এবং এক অর্থে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক, তাই না? কাজেই দেখা করলাম।

কেমন দেখলেন?

অন্য দশজন যা বলেছে তাই— নিতান্তই সাধারণ একজন মানুষ।

মীরা চাপা গলায় বলল, আপনার ধারণা ঠিক না। ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ না।

মইন হেসে ফেলে বলল, প্রথম দর্শনে আমার যা মনে হলো তা বললাম— সাধারণ মানুষ, খুবই সাধারণ। তারপর অবাক হয়ে দেখি হিসেবে কী যেন গুণগোল হয়ে যাচ্ছে। কী একটা জিনিস যেন মিলছে না। লোকটি পরিপূর্ণ মানুষ না। তার মধ্যে মানুষের ত্রুটিগুলো অনুপস্থিত। আমার ধারণা এই যে তার সঙ্গে তোমার বনল না তার কারণ এই।

আপনি তো অদ্ভুত কথা বলছেন মইন ভাই। একজন মানুষের ভেতর ত্রুটি নেই বলেই তাকে আমার পছন্দ হবে না?

হ্যাঁ, তুমিই তার ত্রুটিগুলো বলো। তার সবচে' বড় ত্রুটি কী যা তোমাকে সবচে' বেশি আহত করেছে?

ভালোবাসা বলে কিছু তার মধ্যে ছিল না। তার মধ্যে যা ছিল তা হলো আশপাশের সবার সম্পর্কে অনাগ্রহ।

ভালোবাসার বাস হচ্ছে হৃদয়ে। তাকে চোখে দেখা যায় না। আমরা করি কী, নানান কাণ্ডকারখানা করে তা দেখাতে চাই। যেমন ফুল কিনে আনি, উপহার দেই। এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে এক ধরনের ভান আছে— ভানটা হচ্ছে আমাদের ত্রুটি। যে মানুষের মধ্যে এই ত্রুটি নেই সে ভালোবাসা দেখানোর চেষ্টা করবে না।

ভালোবাসা যদি থাকে তা দেখানোয় দোষ কী?

কোনোই দোষ নেই। দেখানোই উচিত। কিন্তু খুব ক্ষুদ্র একদল মানুষ আছে যাদের কাছে এই অংশটি অপ্রয়োজনীয় মনে হবে। এদেরকে আমরা যখন বিচার করব তখন মানুষ হিসেবে এদের স্থান হবে অনেক পেছনে। কারণ এরা দুর্বোধ্য।

মীরা শীতল গলায় বলল, ওর সঙ্গে সামান্য কিছুক্ষণ কথা বলে ওকে আপনি মহাপুরুষদের দলে ফেলে দিয়েছেন?

সামান্য কিছুক্ষণ কথা হয়েছে তা ঠিক না। প্রচুর কথা হয়েছে। আমি তাঁকে খোলাখুলি অনেক কথাই বলেছি। কেন জানি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করল। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ পাওয়া যায় যাদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। করে না?

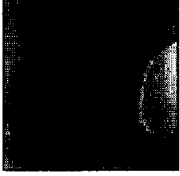
হ্যাঁ করে।

মীরা, আমি তোমাকে কিছু মিথ্যা কথাও বলেছি। আমি কনফেশন করতে চাই এবং...

মইন থেমে গেল। মীরা বলল, থামলেন কেন, কথা শেষ করুন।

মইন খুবই নিচু গলায় বলল, অনেক আগে তুমি প্রচণ্ড ঘোর এবং প্রচণ্ড মোহ নিয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছিলে। আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেই নি। আজ যদি আমি ঠিক সেই রকম মোহ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসি, তুমি কি আমাকে ফিরিয়ে দেবে?

মীরা জবাব দিল না। তার সমস্ত হৃদয় হাহাকারে পূর্ণ হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করল চিৎকার করে ওঠে— আমার ভালো লাগছে না। আমার কিছুই ভালো লাগেছে না।



ডাক্তার সাহেবের নাম শাহেদ মজুমদার।

ডাক্তারা কখনও পুরো নামে পরিচিত হন না।

শাহেদ মজুমদার সেই কারণেই এস. মজুমদার নামে পরিচিত। বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। এই বয়সেই প্রচুর খ্যাতি এবং অখ্যাতি কুড়িয়েছেন। ডাক্তার সাহেবকে মনজুরের পছন্দ। মানুষটি রসিক। রস ব্যাপারটা ডাক্তারদের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায় না। প্রথম দিন মনজুর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, ভাই, আমি কি মারা যাচ্ছি নাকি?

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বলেছেন, হ্যাঁ যাচ্ছেন।

মনজুর যখন পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে তখন তিনি বলছেন, ভয় পাবেন না। আমরা সবাই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় ষাট বছর পার করে মারা যাচ্ছি— এই অর্থে বলেছি। নির্দিষ্ট সময়টুকু আপনি যাতে পান সে চেষ্টা আমি করব এই আশ্বাস দিচ্ছি।

আজ মনজুরকে তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। দেখা শেষ করে বললেন, আপনাকে কমপ্লিট রেস্টে চলে যেতে হবে। আগেও তো বলেছি। আপনি কথা শোনেন নি।

মনজুর বলল, কিছু ঝামেলা ছিল, শেষ করেছি। এখন লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ব।

কবে শোবেন? আজ থেকেই শুরু করুন।

আপনি বললে আজই শুয়ে পড়ব। ভালো কথা ডাক্তার সাহেব, আমার এই সমস্যায় কি মাথায় গুণ্ডগোল হয়?

আপনার কথা বুঝতে পারছি না— মাথায় গুণ্ডগোল মানে?

মনজুর লাজুক গলায় বলল, আমার ঘরে একটা টেলিফোন আছে। হঠাৎ হঠাৎ সেই টেলিফোন বেজে ওঠে। বেজে ওঠার কথা না। টেলিফোনটা অনেকদিন ধরেই ডেড। একটা ছেলের নাম ইমরুল, সে রাত দুটো আড়াইটার দিকে টেলিফোন করে। মজার মজার কথা বলে। আমি জানি এটা অসম্ভব না। আমার এক ধরনের হেলুসিনেশন হচ্ছে। আমি কি ঠিক বলছি ডাক্তার সাহেব?

ঠিকই বলেছেন। রক্তে টক্সিক মেটেরিয়াল বেড়ে গেলে হেলুসিনেশন হতে পারে। এ-রকম ঘটনার নজির আছে। ছেলেটার সঙ্গে কী কথা হয়?

ছেলেমানুষি ধরনের কথা, গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।
হয়তো পুরো ব্যাপারটা আপনি স্বপ্নে দেখেছেন।
তাও হতে পারে।

শেষ করে টেলিফোন পেলেন?

গত কাল রাত তিনটার দিকে। সে বলল, যে ছেলেটি আপনাকে কিডনি দিচ্ছে তার একমাত্র কিডনিটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন সে কী করবে?

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেলে বললেন, আপনার কথা শুনে তো মনে হয় না ঐ ছেলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে না। সে তো বেশ সিরিয়াস ধরনের কথা বলেছে। এই কথাগুলো নিশ্চয় আপনার মনেও আছে। আছে না?

জি আছে।

এসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবেন না। আপনার সাব-কনশাস মাইন্ড আপনাকে নিয়ে খেলছে। এটাকে গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন।

তা দিচ্ছি। গুরুত্ব দেয়ার কারণও আছে। আমি কি কারণটা আপনাকে বলব?

বলুন।

কারণটা কোনো একজনকে বলা দরকার। আমি বলার মতো কাউকে পাচ্ছি না। সবাই কথা বলতে চায়। কেউ শুনতে চায় না।

ডাক্তার সাহেব নরম গলায় বললেন, আমি আপনার কথা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি। আপনি ধীরেসুস্থে বলুন।

আমি আমানুল্লাহ ছেলেটির সঙ্গে নিজের খুব মিল দেখতে পাচ্ছি। সে একটি কিডনি বিক্রি করেছে। আমিও তাই করেছিলাম। আপনাকে এই তথ্য আগেই দিয়েছি। বাবার চিকিৎসার জন্য এটা করতে হয়েছিল। তাঁর থোট ক্যান্সার হয়েছিল। ক্যান্সার হয়েছে জানার পর থেকে তিনি বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হলো বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করালেই তিনি সেরে উঠবেন। টাকা টাকা করে তিনি একেবারে অস্থির হয়ে গেলেন। সারাক্ষণ বলতেন, এক লাখ টাকা হলেই বিদেশে গিয়ে জীবনটা রক্ষা করতাম। এই সময় আমি বাবাকে এক লাখ টাকা দেই। টাকা হাতে নেয়ার দু'দিনের মাথায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তখনও আপনার কিডনি কেটে বাদ দেয়া হয় নি?

জি-না। আমি ইচ্ছা করলে টাকাটা ফেরত দিতে পারতাম, বলতে পারতাম আমি কিডনি বিক্রি করতে চাই না। তা করি নি। যথাসময়ে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়। যাক ঐ প্রসঙ্গ। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আমানুল্লাহ নামের ছেলেটিরও একই ব্যাপার ঘটছে। সে একটি কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকবে এবং একসময় দেখা যাবে আমার মতো সমস্যা হয়েছে।

তেমন সম্ভাবনা খুবই কম।

কম হলেও তো আছে। আছে না?

ডাক্তার জবাব দিলেন না।

মনজুর বলল, আপনার এখানে কি একটা সিগারেট খেতে পারি। প্রচণ্ড তৃষ্ণা হচ্ছে। যদি অনুমতি দেন।

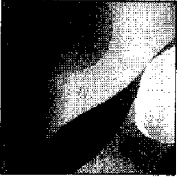
অনুমতি দিলাম।

মনজুর সিগারেট ধরিয়ে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ডাক্তার সাহেব— আমি ঐ ছেলেটির কিডনি নেব না। যে ক’দিন বাঁচব নিজের যা আছে তা নিয়েই বাঁচব।

এই সিদ্ধান্ত কি এখন নিলেন?

না। যেদিন আমানুল্লাহকে নগদ এক লাখ টাকা গুনে গুনে দিলাম সেদিনই নিয়েছি। ডাক্তার সাহেব, আমার শরীরটা এখন বেশ খারাপ লাগছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিন— আমি আজ রাতেই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পড়তে চাই। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। জ্বর আসছে বলেও মনে হচ্ছে। প্লিজ, একটু দেখবেন আমার গায়ে টেম্পারেচার আছে কিনা?

মনজুর ডাক্তারের দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিল। ডাক্তার সাহেব সেই হাত ধরলেন না। তিনি তাকিয়ে রইলেন মনজুরের দিকে। সেই চোখ কোমল ও শান্ত। অস্ত্রিতার কোনো ছাপ চোখের মণিতে নেই।



মনজুর অপারেশন করতে রাজি নয়।

এই খবর জাহানারা পেয়েছে গত কাল রাতে। ফরিদ এসে খবর দিয়েছে। জাহানারা তৎক্ষণাৎ ফরিদকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছে— ফরিদ এসব কী বলছে স্যার?

মনজুর বলল, ও যা বলছে ঠিকই বলেছে। আমি অনেক ভেবেচিন্তে ডিসিশান নিয়েছি। এর নড়চড় হবে না। তুমি আমাকে অনুরোধ করো না বা কান্নাকাটিও করো না।

জাহানারা হতভম্ব হয়ে গেল। এ-রকম হতে পারে সে কল্পনাও করে নি।

জাহানারা থাকতে থাকতেই বদরুল সাহেব এলেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি রাগী গলায় বললেন, তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

মনজুর হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ।

ঐ এক লাখ টাকা কী হবে? ঐ টাকা তো আর উদ্ধার হবে না।

তা হবে না। মামা, টাকাটা আমি দান করেছি।

তুই পাগল, ষোলো আনা পাগল।

মনজুর ক্লান্ত গলায় বলল, মামা, আমার শরীরটা খুবই খারাপ। তোমার চিৎকারে আরও খারাপ হচ্ছে। দয়া করে বিন্দেহ হও।

বদরুল আলম নড়লেন না। জাহানারা বের হয়ে এলো। ফরিদকে হাসপাতালে রেখে একা এলো মীরার কাছে।

জাহানারা মীরার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। সারা পথই সে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে। তার চোখ ফোলা। মুখ অসম্ভব বিষণ্ণ।

মীরা বলল, আমি বললেই কি মনজুর আমার কথা শুনবে?

জাহানারা ধরাগলায় বলল, হ্যাঁ, আপনি বললে শুনবে।

আপনি কী করে জানেন?

আমি জানি। আপনি স্যারের হাত ধরে যদি একবার বলেন, স্যার রাজি হবেন। কিডনি আমি দেব। সেটা কোনো সমস্যাই না। আপনি শুধু স্যারকে রাজি করাবেন। বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।

সেটা আপনি জানেন, আমিও জানি। কিন্তু ও জানে না। ওর কিছু নিজস্ব বিচিত্র লজিক আছে। সে ঐ লজিকে চলে। অন্য কারও কথাই শোনে না। আমার কথাও শুনবে না।

আপনার কথা শুনবেন। আপনার কথা না শুনে স্যারের উপায় নেই।

এত নিশ্চিত হয়ে কী করে বলছেন?

স্যারের রাইটিং প্যাডের একটা পাতা আমি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। ঐটা দেখলেই আপনি বুঝবেন তিনি আপনার কথা ফেলবেন না।

জাহানারা রাইটিং প্যাডের একটা পাতা মীরার দিকে বাড়িয়ে ধরল। সেখানে গোটা গোটা করে অসংখ্যবার লেখা— মীরা, মীরা, মীরা।

জাহানারা বলল, মোট তিন শ' ছ' বার লেখা আছে।

আপনি বসে বসে শুনেছেন?

জি।

মীরা জাহানারার দিকে কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে রইল। মীরার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। এই হাসি সে তৎক্ষণাৎ মুছে ফেলে স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনার স্যারকে আপনার খুব পছন্দ তাই না?

জাহানারা সহজ গলায় বলল, হ্যাঁ।

কেন পছন্দ সেটা কি জানেন?

জানি।

আমাকে বলবেন?

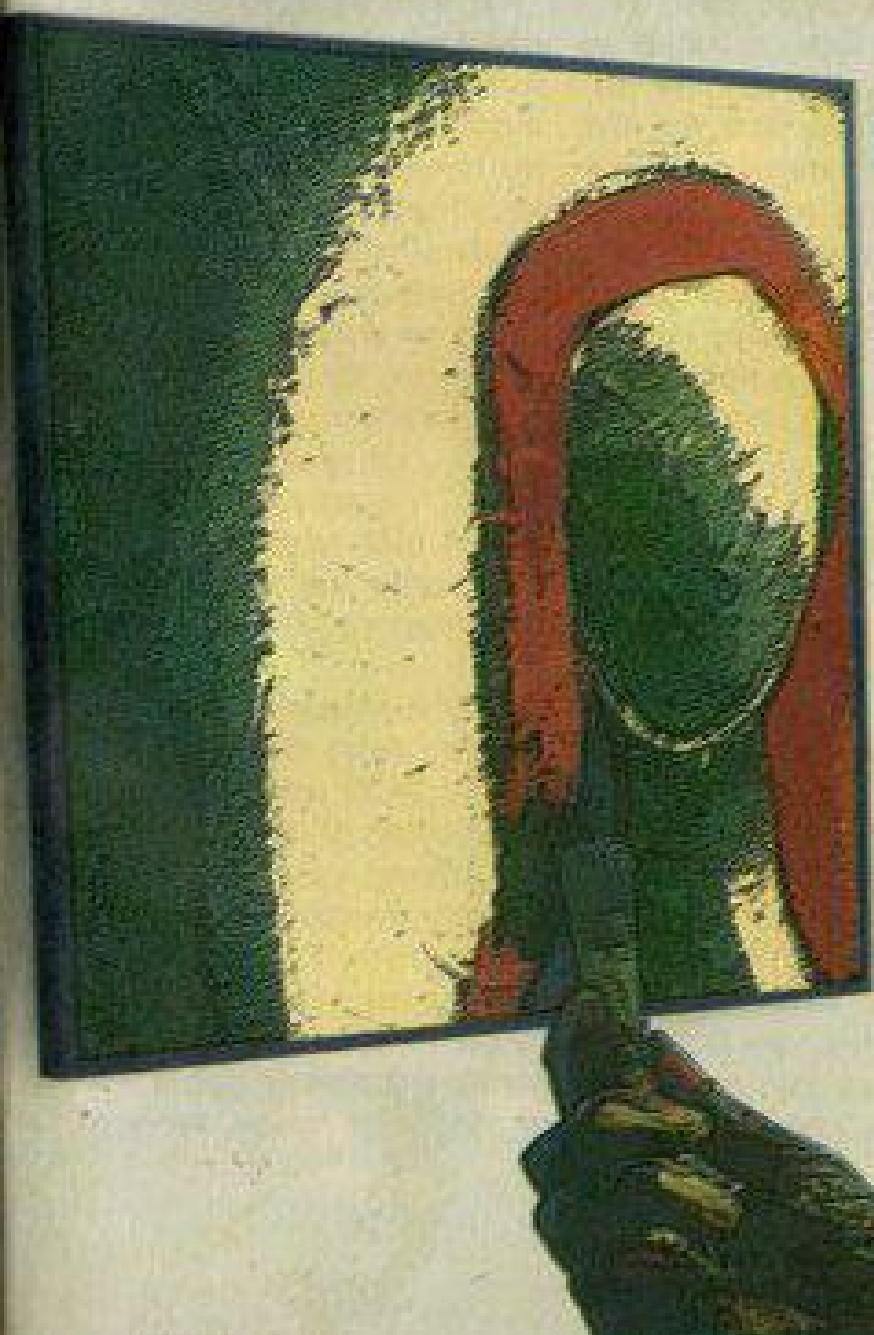
জাহানারা স্পষ্টস্বরে বলল, না।

মীরা বলল, আচ্ছা থাক বলতে হবে না। সবকিছু বলতে নেই। চলুন আপনার স্যারের কাছে যাই। দেখি তাকে রাজি করানো যায় কিনা। ওর সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয় তখন আমার পরনে আসমানি রঙের একটা শাড়ি ছিল। ঐ শাড়িটা পরে গেলে কেমন হয়?

খুব ভালো হয়।

আপনি তাহলে অপেক্ষা করুন, আমি শাড়ি বদলে আসছি। আর শুনুন, এত কাঁদবেন না। আপনার কান্না দেখে আমারই কান্না পেয়ে যাচ্ছে। দেখি, কাছে আসুন তো, আপনাকে একটু আদর করে দিই।

সে ও নর্তকী



সে ও নর্তকী



স্বাতীর দরজায় টুক টুক করে দু'বার টোকা পড়ল।

স্বাতী চাদরে মুখ ঢেকে ছিল, চাদরের ভেতর থেকেই বলল— কে? নাজমুল সাহেব দরজার বাইরে থেকে বললেন, শুভ জন্মদিন মা। স্বাতী বলল, থ্যাংক যু। সে চাদরের ভেতর থেকে বের হলো না, দরজা খুলল না। নাজমুল সাহেব চলে গেলেন না। দরকার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ফুল নিয়ে এসেছিলেন। মেয়ের একুশ বছরে পা দেয়ার জন্য একুশটা ফুল। ফুলদানিতে ফুলগুলো সুন্দর করে সাজানো। মেয়ের পড়ার টেবিলে ফুলদানি রাখবেন, মেয়ের কপালে চুমু খাবেন— এই হলো তাঁর পরিকল্পনা। কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। স্বাতী দরজা খুলছে না। নাজমুল সাহেব আবার দরজায় টোকা দিলেন। স্বাতী বলল, আমি এখন দরজা খুলব না বাবা। সারা রাত আমার ঘুম হয় নি। আমি এখন ঘুমুচ্ছি।

‘ঘুমুচ্ছিস না, তুই জেগে আছিস। দরজা খুলে দে।’

‘না। তুমি তোমার গিফট দরজার বাইরে রেখে যাও।’

‘ইজ এনিথিং রং মা?’

‘নো। নাথিং ইজ রং।’

নাজমুল সাহেব উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। নাথিং ইজ রং বলার সময় তাঁর মেয়ের গলা কি ভারী হয়ে গেছে? গলাটা কাঁদো-কাঁদো শুনিয়েছে? তিনি চিন্তিত মুখে ফুলদানি হাতে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে এবং তাঁর গোলাপগুলোকে লজ্জিত বলে মনে হচ্ছে।

একতলার বারান্দায় স্বাতীর মা রওশন আরা বসে আছেন। ছোট্ট নিচু টেবিলের তিন দিকে তিনটা বেতের চেয়ার। মেয়ের জন্মদিনের ভোরবেলা একমুঠো চা খাওয়া হবে। তাঁর সামনে টি-পট ভর্তি চা। ঠাণ্ডা যেন না হয় সে জন্য টি-কোজি দিয়ে ঢায়ে পট ঢাকা। টি-কোজিটা দেখতে মোরগের মতো। যেন টেবিলের উপর একটা লাল মোরগ বসে আছে। মোরগটা এত জীবন্ত— মনে হয় একটু বাগ দেবে। তার গায়ের পালক, সত্যিকার পালকে তৈরি। তার পুঁতির নীচে সত্যিকার চোখের মতোই জ্বলে। এই মোরগ রওশনের আরার খুব পছন্দ। শুধু বিশেষ বিশেষ দিনেই তিনি মোরগটা বের করেন। আজ একটা বিশেষ দিন— তার মেয়ে একুশে পা দিয়েছে। তার জন্ম এপ্রিলের চার তারিখ ভোর ছটা দশ। এখন বাজছে ছটা কুড়ি।

নাজমুল সাহেবকে ফুলদানি হাতে ফিরে আসতে দেখে রওশন আরা অবাক হয়ে থাকালেন। নাজমুল সাহেব বিব্রত মুখে বললেন, ‘ও ঘুমুচ্ছে।’

রওশন আরা বললেন, ‘ঘুমুবে কেন? একটু আগেই তো শুনলাম গান বাজছে?’

‘রাতে ঘুম হয় নি। এখন বোধহয় শুয়েছে।’

রওশন আরার ভুরু কঁচুকে গেল। রাতে ঘুম হয় নি কথাটা ঠিক না। তিনি রাতে একবার মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলেন। স্বাতী ভেতর থেকে তালাবন্ধ করে শোয়। তবে রওশন আরার ঘরে ঢোকায় কোনো সমস্যা হয় না। তাঁর কাছে একটা লুকানো চাবি আছে। তিনি প্রায় রোজই গভীর রাতে তালা খুলে একবার ঢোকেন। ঘুমন্ত মেয়েকে দেখে চলে আসেন। স্বাতীর পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি এই কাজটা করে আসছেন। পাঁচ বছর বয়সে মেয়ে প্রথম আলাদা ঘরে ঘুমুতে গেল। তখন দরজা খোলা থাকত। যখন-তখন ঘরে ঢোকা যেত। তারপর স্বাতী ঘরে চাবি দিতে শিখল। স্বাতী চোখ বড় বড় করে বলল, ‘খবরদার মা, আর আমাকে বিরক্ত করবে না। যখন-তখন আমার ঘরে আসবে না। আমার ভালো লাগে না।’

‘রাতে ঘর বন্ধ করে ঘুমুতে ভয় লাগবে না তো বাবু?’

‘খবরদার, আমাকে বাবু ডাকবে না।’

‘ভয় লাগবে না তো ময়না সোনা?’

‘ময়না সোনাও ডাকবে না।’

‘কী ডাকব তাহলে?’

‘যা নাম তা-ই ডাকবে। স্বাতী! স্বাতী নক্ষত্র!’

রওশন আরা বললেন, ‘আচ্ছা এখন থেকে শুধু নাম ধরেই ডাকব। এখন তুই বলতো মা, দরজা তালাবন্ধ করে ঘুমুতে ভয় লাগবে না?’

‘লাগবে, তবু আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমুব।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে।’

স্বাতী দরজা ভেতর থেকে লক করেই ঘুমোয়। তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। কাল রাতেও ঢুকেছেন। মেয়ে তখন গভীর ঘুমে। গায়ে দেবার চাদরটা খাটের নিচে। ঠাণ্ডায় সে কঁকড়ে আছে অথচ মাথার উপরের ফ্যান ফুল স্পিডে ঘুরছে। তিনি একবার ভাবলেন, ফ্যান বন্ধ করে দেবেন। সেটা করা ঠিক হবে না, মেয়ে বুঝে ফেলবে কেউ একজন রাতে তার ঘরে ঢুকেছিল। তিনি ফ্যানের স্পিডটা কমিয়ে দিলেন। ফ্যানের কাঁটা পাঁচ থেকে দুই-এ নামিয়ে আনলেন। চাদরটা খাটের নিচ থেকে তুলে পায়ের কাছে রেখে দিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা করছিল ঘুমন্ত মেয়ের কপালে আলতো করে চুমু দেন। ভাগ্য ভালো এই ভুল করেনি নি। এই বয়সের মেয়েরা ঘুমুলেও তাদের শরীর জেগে তাকে। সামান্য স্পর্শেও এরা কেঁপে ওঠে। ধড়মড় করে উঠে বসে। ভীতগলায় চৈঁচিয়ে বলে— কে? কে?

রওশন আরা স্বামীর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বললেন, ‘ওর সমস্যাটা কী?’

নাজমুল সাহেব চায়ের টেবিলের পাশে ফুটপ্যাশে রাখতে রাখতে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। রওশন আরা বললেন, ‘তোমাকে চাই দিয়ে দেব?’

‘না থাক। দেখি ও যদি ওঠে।’

‘তোমাকে এ-রকম চিন্তিত লাগছে কেন?’

নাজমুল সাহেব নিচু গলায় বললেন, ‘মনে হচ্ছে স্বাতী কাঁদছে। চাদরে মুখ ঢেকে কাঁদছে।’

‘সে-কি!’

‘নাও হতে পারে। আমার মনে হলো ওর গলার স্বরটা চাপা চাপা। তুমি গিয়ে দেখবে?’

রওশন আরার যেতে ইচ্ছা করছে না। স্বামীর সঙ্গে অনকদিন থেকে একটা ব্যাপার ঠিক করা আছে। বার্থ ডে উইশ একেক বছর একেকজন করবে। প্রতিবারই নতুন কিছু করা হবে যেন মেয়ে চমকে ওঠে। গত বছর তিনি এই দিনে ভোর ছ’টা দশ মিনিটে বলেছেন— ‘শুভ জন্মদিন মা।’ জন্মদিনের উপহার হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন চল্লিশ ক্যারেটের গোল্ডেন টোপাজ। হাঁসের ডিমের মতো পাথর। ধবধবে সাদা চিনামাটির প্লেটে পাথরটা সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল এক খণ্ড সূর্য যেন সাদা প্লেটে ঝকঝক করছে। স্বাভী আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়েছে— ‘এটা কী মা? এটা কী?’

‘গোল্ডেন টোপাজ।’

‘পেলে কোথায় তুমি?’

‘তোমার মামাকে দিয়ে নেপাল থেকে আনিয়েছি। তোমার জন্মদিনের উপহার। পছন্দ হয়েছে মা?’

‘এত সুন্দর একটা উপহার তুমি আমাকে দেবে আমার পছন্দ হবে না! আমার তো মা মনে হচ্ছে আমি কেঁদে ফেলব।’

রওশন আরা তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বললেন, ‘কেঁদে ফেলতে ইচ্ছা করলে কেঁদে ফেল।’

‘এই পাথরটা দিয়ে আমি কী করি বলতো মা?’

‘লকেট বানিয়ে গলায় পরতে ইচ্ছা করছে?’

‘আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে।’

মেয়ের আনন্দ দেখে রওশন আরার চোখে পানি এসে গেল। এ-বছর নাজমুল সাহেব এ-রকম সুন্দর কিছু যোগাড় করেন নি— তবে তাঁর উপহারটাও কম সুন্দর না। একুশটা গোলাপ তিনি একুশ রকমের যোগাড় করেছেন। সাদা গোলাপ আছে, কালো গোলাপ আছে, ঈষৎ নীল গোলাপ আছে, একটা গোলাপ আছে ডালিয়ার মতো বড়, আর একটা তারা ফুলের চেয়েও ছোট-নাকছাবি হিসেবে নাকে পরা যায় এমন। মেয়ের চিৎকার এবং উল্লাস দেখবেন এই আশায় নাজমুল সাহেব পরিশ্রম করে গোলাপগুলো সংগ্রহ করেছেন। মেয়ে দরজা খোলে নি।

রওশন আরা স্বাভীর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বললেন, ‘দরজা খোল মা।’

স্বাভী বলল, ‘তোমার কাছে তো চাবি আছে তুমি খুলে ফেলো।’

‘তোমার সঙ্গে চা খাওয়ার জন্য আমরা দু’জন নিচে বসে আছি।’

‘এখন ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছা করছে না।’

‘তোমার কী হয়েছে?’

‘দারুণ মন খারাপ লাগছে।’

‘কেন?’

‘জানি না কেন।’

‘হাত-মুখ ধুয়ে নিচে আয়। ভালো লাগবে। তোমার বাবা তোমার জন্য একুশ টোপাজের গোলাপ যোগাড় করেছে। বেচারী একুশ রকমের গোলাপ যোগাড় করতে

গিয়ে খুব কষ্ট করেছে। একদিনে তো সব যোগাড় হয় না। একেকটা করে যোগাড় করেছে, লবণ পানিতে ডুবিয়ে, পলিথিনে মুড়ে ডীপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছে।’

‘আমি যদি আরও দশ বছর বাঁচি তাহলে বাবার খুব কষ্ট হবে। একত্রিশটা বিভিন্ন রকমের গোলাপ পাওয়া তো সহজ কথা না।’

‘স্বাভী।’

‘কী মা?’

‘বের হয়ে আয়।’

‘আসছি। পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি। তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না মা। তুমি বাবার কাছে যাও। আমি সেজেগুজে নিচে নামব।’

নাজমুল সাহেব উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন। রওশন আরা বললেন, ‘ও আসছে।’

‘ব্যাপারটা কী?’

‘কোনো ব্যাপার না। মন খারাপ আর কি! মানুষের মন খারাপ হয় না?’

‘উৎসব-টুৎসবের দিন মন খারাপ বেশি হয়। তোমাকে একটু চা দেব?’

‘না, ও আসুক।’

‘ওর মনে হয় আসতে দেরি হবে। সেজেগুজে আসছে। তোমার তো আবার ঘুম থেকে উঠেই চা খাবার অভ্যাস।’

‘একদিন অভ্যাসের হেরফের হলে কিছু হবে না। আমার কেন জানি দুশ্চিন্তা লাগছে। মেয়েটার কী হয়েছে বলতো?’

‘হবে আবার কী? কিছু হয় নি। একা একা থাকে তো, এজন্যই মুড়ি ধরনের হয়েছে। কয়েকটা ভাইবোন থাকলে হেসে-খেলে, ঝগড়াঝাঁটি করে বড় হতো, তাহলে কোনো সমস্যা হতো না।’

‘ওর বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়? স্বামীর সঙ্গে হইচই করবে, গল্প করবে, ঝগড়াঝাঁটি করবে। ভালো একটা ছেলে দেখে...’

‘কোথায় পাবে ভালো ছেলে?’

‘ভালো ছেলে পাওয়া সমস্যা তো বটেই।’

‘একজন কাউকে ধরে আনলেই যে তোমার মেয়ের পছন্দ হবে, কে বলল?’

নাজমুল সাহেব চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন। নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘ওর পছন্দের কেউ আছে?’

‘না। থাকলে জানতাম। ওর পছন্দের কেউ নেই।’

‘থাকলেও তোমাকে হয়তো সে বলবে না।’

রওশন আরা বললেন, ‘অবশ্যই বলবে। আমাকে নাকি বলার কী আছে?’

‘মায়েরা সব সময় একটা ভুল করে। মায়েরা মনে করে তার মেয়ে যেহেতু তার অংশ সেহেতু মেয়ে তার জীবনের সব কথা মায়েকে বলবে। ব্যাপারটা সে রকম না। তুমি কি তোমার সব গোপন কথা তোমার মায়েকে বলেছ?’

‘প্রয়োজনের কথা সবই বলেছি।’

‘তার পরেও অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে গেছে।’

‘আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে ভালো লাগছে না। চুপ করে থাকো।’

‘আচ্ছা যাও চুপ করলাম। খবরের কাগজ এসেছে?’

‘এত সকালে তো খবরের কাগজ আসে না। তুমি শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছ কেন?’

‘তোমাকে রাগিয়ে দেবার জন্য জিজ্ঞেস করছি। তুমি যে কত অল্পতে রেগে যাও তা তুমি জানো না। যাতে জানতে পারো সে জন্য ছোটখাটো দু’একটা ব্যাপার করে তোমাকে রাগাই।’

রওশন আরা টি-পট নিয়ে উঠে গেলেন। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নতুন এক পট চা বানাবেন। ঘরে বেশ কয়েকজন কাজের মানুষ আছে, তারপরেও রান্নাবান্নার সব কাজ তিনি নিজে করেন। রান্নাবান্নার ব্যাপারে তাঁর সামান্য শুচিবায়ুর মতো আছে।

কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে স্বাতী নিচে নামছে না। রওশন আরা আবার উঠে গেলেন। স্বাতীর ঘরের দরজা খোলা। সে সাদা ফুল দেয়া নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে। চুল আঁচড়াচ্ছে। তার মুখ হাসি হাসি। স্বাতী বলল, ‘মা-বাবা কি বারান্দায় বসে আছে?’

‘হ্যাঁ।’

বাবাকে চমকে দেয়ার একটা ব্যবস্থা করি। তুমি বাবাকে বলো যে, আমি বিছানায় শুয়ে কাঁদছি। বাবা আমার খোঁজে আসবে। এর মধ্যে আমি করব কি কোলবালিশটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখব। মনে হবে আমি শুয়ে আছি। বাবা চাদর টেনে তুলতে যাবে আমি পেছন থেকে বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। কেমন হবে মা?’

‘ভালোই হবে।’

‘ড্রাইভার চাচা এসেছে মা?’

‘এসেছে বোধহয়।’

ড্রাইভার চাচার হাত দিয়ে আমি আমার বান্ধবী লিলিকে একটা চিঠি পাঠাব। চিঠি লিখে রেখেছি। ড্রাইভার চাচার হাতে পাঠিয়ে দাও।’

‘এখন পাঠাব? সাতটাও বাজে নি।’

‘লিলি খুব ভোরে ওঠে মা।’

‘আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

‘লিলিকে আসতে বলেছি। জন্মদিন উপলক্ষে আমরা দু’জন সারাদিন হইচই করব। চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঁদর দেখব।’

‘চিড়িয়াখানায় বাঁদর দেখতে হবে কেন?’

‘বাঁদরের জন্যই তো মানুষ হয়ে জন্মাতে পেরেছি। এজন্য বাঁদরদের খ্যাংকস দিয়ে আসব।’

রওশন আরা স্বস্তিবোধ করছেন। স্বাতী স্বাভাবিক অবস্থায় উঠে এসেছে। তিনি চিঠি হাতে নিচে নামছেন। স্বাতী আগের পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে মা’র পেছনে নেমে আসছে। সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেই নাজমুল সাহেব বললেন, ‘স্বাতী লিটল ড্যান্সার, আমার ছোট নর্তকী, হ্যাপি বার্থ ডে। শুভ জন্মদিন।’

স্বাতী সিঁড়ির মাঝামাঝি থেকে প্রায় উড়ে এসেছে। নাজমুল সাহেব চট করে উঠে দাঁড়ালেন। তার এই মেয়েটার অভ্যাস হচ্ছে বেশ অনেকখানি দূর থেকে গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ছোট বেলাতেই মেয়ের এই ঝাঁপিয়ে পড়া সামলাতে পারতেন না। এখন মেয়ে বড় হয়েছে, তাঁরও বয়স হয়েছে। তাঁর ভয় হচ্ছে মেয়েকেসুদ্ধ তিনি না গাড়িয়ে পড়ে যান। মেয়েকে এভাবে ছুটে আসতে দেখলেই অনেকদিন আগের একটা ছবি তার মনে হয়।

স্বাতী তখন ক্লাস টু-তে পড়ে। স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অনুষ্ঠান। স্বাতী

সেখানে নাচবে। সে একা না, তার সঙ্গে ন'টি মেয়ে আছে। নাচের নাম— এসো হে বসন্ত। তারা সবাই হলুদ শাড়ি পরেছে। মাথায় ফুলের মুকুট। গলায় ফুলের মালা।

নাজমুল সাহেব মুগ্ধ দর্শক। দর্শকদের সঙ্গে প্রথম সারিতে বসে আছেন। খুব আফসোস হচ্ছে কেন ক্যামেরা নিয়ে এলেন না। নাচের শুরুতেই একটা ঝামেলা হয়ে গেল— স্বাতীর মাথা থেকে ফুলের মুকুট পড়ে গেল। দর্শকরা হেসে উঠেছে। স্বাতী মুকুট কুড়িয়ে মাথায় পরার চেষ্টা করছে। অন্যরা নেচে যাচ্ছে। তিনি লক্ষ করলেন স্বাতীর চোখে পানি। সে এক হাতে পানি মুছল। তারপর মুকুটটা ঠিক করল। ঠিক করে আবার নাচ শুরু করতে গেছে— আবার মুকুট পড়ে গেল। দর্শকদের হাসির স্বরগ্রাম আরও উঁচুতে উঠল। স্বাতী আবারও মুকুট কুড়িয়ে পরতে শুরু করল। এবার মুকুটটা পড়ল উল্টো করে। নাচের চেয়ে ছোট মেয়েটির কাণ্ডকারখানায় দর্শকরা অনেক বেশি মজা পাচ্ছে। তাদের হাসি আর থামছে না। স্বাতী কাঁদছে। সে চোখের পানি মুছে আবার নাচতে গেল। ততক্ষণে নাচ শেষ হয়ে গেছে। স্বাতী বাবার দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় ডাকল, বাবা!

নাজমুল সাহেব স্টেজের দিকে এগিয়ে এলেন আর তখন এই মেয়ে আচমকা স্টেজ থেকে তাঁর উপর লাফিয়ে পড়ল। তিনি এই ধাক্কা সামলাতে পারলেন না। মেয়েকে নিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

আজও মেয়ে সেদিনের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজও তিনি সেদিনের মতোই গাঢ় গলায় বললেন, 'মাই লিটল ড্যান্সার। মাই লিটল ড্যান্সার। আমার ছোট নর্তকী হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।'

রওশন আরার একটু মন খারাপ রাগছে। কারণ, ঝাঁপিয়ে পড়ার এই ব্যাপারটি স্বাতী শুধু তার বাবার সঙ্গেই করে। তাঁর সঙ্গে করে না।

তিনি চিঠি হাতে ড্রাইভারে খোঁজে গেলেন। ড্রাইভার এখনও আসে নি। আজ শুক্রবার ছুটির দিন। ছুটির দিনে ড্রাইভার দশটার আগে আসে না। খাম বন্ধ চিঠি। আঠা এখনও শক্ত হয়ে লাগে নি। খাম খুলে চিঠি পড়ে দেখলে কেমন হয়? ব্যাপারটা অন্যায়। বড় ধরনের অন্যায়। তবু মা'দের এসব অন্যায় করতে হয়। তিনি একটু আড়ালে গিয়ে চিঠি পড়লেন। স্বাতী লিখেছে—

প্রিয় লিলি ফুল,

আজ যে আমার জন্মদিন তোর কি মনে আছে? তুই কি পারবি আসতে? ছুটির দিনে তোকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয় না তা জানি। তবু একবার চেষ্টা করে দেখ। তোর বাবাকে বল টিউটোরিয়াল পরীক্ষার জন্য আমার সঙ্গে ডিসকাস করে পড়া দরকার। ও আচ্ছা ভুলেই গেছি তুই তো আবার সত্যবাদী! মিথ্যা বলতে পারিস না। তুই বরং সত্য কথাই বল। বল— আমার বাবাবীর জন্মদিন। শুধু তাকে শুভ জন্মদিন জানিয়ে চলে আসব। মাত্র এক ঘণ্টার 'ভিসা' দিন।

লিলি তোর আসা খুব দরকার। আমি ভয়ঙ্কর একটা অন্যায় করেছি। অন্যায়টা চাপা দেয়ার জন্য এখন আমাকে আরও কয়েকটা ছোটখাটো অন্যায় করতে হবে। তোর সঙ্গে আলাপ করা দরকার।

ইতি স্বাতী নক্ষত্র

রওশন আরা চিঠিটা দু'বার পড়লেন। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে খাম বন্ধ করলেন। ফিরে এলেন চায়ের টেবিলে। স্বাতী বলল, 'স্বাতী বললেন, 'দু'ইভার এখনও আসে নি। আজ শুক্রবার তো দশটার আগে আসবে না।'

স্বাতী বলল, 'দশটার সময় পাঠিও। আর শোনো মা, চিঠিতে কী লেখা সেটা পড়ে তুমি এমন হকচকিয়ে গেছ কেন? ইন্টারেস্টিং কিছু না লিখলে লিলি আসবে না। ওকে আনার জন্য এসব লিখেছি।'

নাজমুল সাহেব বললেন, 'কী নিয়ে কথা হচ্ছে?'

স্বাতী বলল, 'বাবা তুমি বুঝবে না। মাতা ও কন্যার মধ্যে কথা হচ্ছে। মা চা দি তোমাকে?'

রওশন আরা বললেন, 'দে।'

রওশন আরা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মেয়ে তাঁকে ঠিক কথা বলে নি। কিছু-একটা হয়েছে। ভয়ঙ্কর কিছু।



লিলি ভালো ঘুমুতে পারে নি। তিন চার বার ঘুম ভেঙেছে। বিশ্রী বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখেছে। একটা স্বপ্ন ছিল ভয়াবহ। তার যেন বিয়ে হচ্ছে। সেজেগুজে বিয়ের আসরে সে বসে আছে, হঠাৎ গুঁটকো ধরনের একটা ছেলে দৌড়ে ঢুকল। তার হাতে কয়েকটা জর্দার কৌটা। সে বলল, 'খবরদার কেউ নড়বে না। বোম মেরে উড়িয়ে দেব। চারদিকে কান্নাকাটি, হইচই। এর মধ্যে বোমাফাটা শুরু হয়েছে। দৌড়ে পালাতে গিয়ে দরজার কাছে হুমড়ি খেয়ে লিলি পড়ে গেছে। স্বাতী এসে তাকে তুলল। স্বাতী বলল, চল পালাই। লেট আস রান। রান বেবি রান।

তারা দু'জনই দৌড়াচ্ছে। স্বাতীর গাভর্তি বলল, 'গয়না থেকে ঝামঝাম শব্দ আসছে। লিলি ভাবছে, বিয়ে হচ্ছে তার আর স্বাতীর গায়ে এত ঝামঝাম কেন?'

রাতের ভয়ঙ্কর স্বপ্ন সাধারণত দিনে হাস্যকর লাগে। এই স্বপ্নটা লাগছে না। ভোরবেলা দাঁত মাজতে মাজতে লিলির মনে হলো— স্বপ্নটার কোনো খারাপ অর্থ নেই তো? মা'র কাছে খাবনামার একটা বই আছে। বই থেকে স্বপ্নের কোনো অর্থ পাওয়া যাবে?

লিলি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দাঁত মাজল। স্মৃতিতে নিজেকে দেখতে-দেখতে দাঁত ব্রাশ করার আলাদা আনন্দ। তবে আজ আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালো লাগছে না। ঘুম না হওয়ায় চোখ লাল হয়ে আছে। চেহারাটাও কেমন শুকনা শুকনা লাগছে।

বাথরুম থেকে বের হয়ে লিলি ইতস্তত করতে লাগল। সে কি একতলায় যাবে? গাশত দেয়া হয়েছে কি-না দেখবে? না নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বই নিয়ে এসবে? আজ বই নিয়ে বসেও লাভ হবে না। মাথায় পড়া ঢুকবে না। তারচেয়ে নিচে

যাওয়াই ভালো। নিচে যাওয়ামাত্র এই বাড়ির প্রবল স্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। মিশতে ইচ্ছা করে না। পৃথিবীতে বাস করতে হলে ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কিছু করতে হয়।

লিলি তার বড় চাচার ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

বড় চাচা আজহার উদ্দিন খাঁ সাহেবের দরজা ভেজানো। ভেতর থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। অর্থাৎ, তিনি জেগে আছেন। তিনি জেগে থাকলে বিরাট সমস্যা, তাঁর বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি প্রায় অলৌকিক উপায়ে টের পেয়ে যাবেন এবং শ্লেষ্মা জড়ানো ভারী গলায় ডাকবেন, কে যায়? লিলি না? মা, একটু শুনে যা তো!

এই ডাকার পেছনে কোনো কারণ নেই। অকারণে ডাকা।

‘পর্দাটা টেনে দে তো।’

‘ক’টা বাজছে দেখ তো।’

তাঁর ঘরের দেয়ালেই ঘড়ি, তিনি মাথা হেলিয়ে ঘড়ি দেখতে পারেন। হাত বাড়ালেই পর্দা। পর্দা টানার জন্য বাইরের কাউকে ডাকতে হয় না। এমন না যে, তাঁর ঘাড়ে ব্যথা মাথা ঘুরাতে পারেন না, কিংবা হাতে প্যারালাইসিস হয়েছে, হাত বাড়িয়ে পর্দা ছুঁতে পারেন না।

আজও লিলি বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে যাচ্ছিল— বড় চাচা ডাকলেন, ‘শুনে যা।’

লিলি মুখ কালো করে ঘরে ঢুকল।

‘একতলায় হইচই হচ্ছে কেন?’

লিলি কী করে বলবে কেন? বড় চাচা যেমন দোতলায়, লিলিও তেমন দোতলায়।

‘ভোরবেলাতেই হইচই চেষ্টামেচি। দেখে আয় তো ব্যাপারটা কী?’

লিলি ব্যাপার দেখার জন্য নিচে নেমে এসে হাঁপ ছাড়ল। বড় চাচার বেলায় একটা সুবিধা হচ্ছে তাঁর স্মৃতিশক্তি নেই বললেই হয়। একতলার হইচইয়ের কারণ লিলিকে আবার ফিরে গিয়ে জানাতে হবে না। তিনি এর মধ্যে ভুলে যাবেন। এমন ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির একটা মানুষ এত বড় সরকারি চাকরি দীর্ঘদিন কী করে করলেন সে এক রহস্য। কে জানে সরকারি চাকরিতে হয়তো-বা স্মৃতিশক্তির কোনো ভূমিকা নেই। এই জিনিস যার যত কম থাকবে সে তত নাম করবে।

একতলায় হইচইয়ের কারণ জানার লিলির কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু হইচইটা এমন পর্যায়ে যে আগ্রহ না থাকলেও জানতে হলো। তাদের দুধওয়ালার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। গতকাল সে তিন লিটার দুধ দিয়েছিল। সেই দুধ জ্বাল দেবার পর সেখানে একটা মরা তেলাপোকা পাওয়া গেছে। লিলিদের বুয়া সেই তেলাপোকা প্রমাণস্বরূপ খানিকটা দুধসহ একটা গ্লাসে রেখে দিয়েছে। প্রমাণসহ মামলা। দুধওয়ালার প্রমাণ গ্রাহ্য করছে না। অতি মিষ্টি ভাষায় সে বলছে— ‘তেইল্যাচুরা জন্মেও দুধ খায় না।’

লিলির ছোট চাচা জাহেদুর রহমান ফরিয়াদি পক্ষের উকিলের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘তেলাপোকা দুধ খায় না?’

‘জে না স্যার?’

‘সে কী খায়?’

‘তেল খায়। এইজন্য এর নাম তেইল্যাচুরা।’

‘দুধ খাক বা না খাক তোমার আনা দুধের মধ্যে তাকে পাওয়া গেছে। ...’

লিলির গা ঘিনঘিন করছে। তেলাপোকা তার কাছে জগতের কুৎসিত প্রাণীদের একটি। তার মন বলছে গতকাল বিকেলে এই তেলাপোকা ভেজানো দুধই তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। পুরো এক গ্লাস। তাদের বাড়ি এমন না যে সামান্য তেলাপোকাকার কারণে পুরো তিন লিটার দুধ ফেলে দেয়া হবে। লিলি রান্নাঘরে তার মাকে ধরল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ‘মা কাল বিকেলে তুমি যে আমাকে দুধ খেতে দিলে সেটা কি তেলাপোকা মাখা দুধ?’

ফরিদা পেঁপের হালুয়া বানাচ্ছেন। তিনি চোখ না তুলেই বললেন, ‘আরে না। কী যে তুই বলিস!’

‘কাল যে দুধ খেলাম সেটা কোন দুধ?’

‘তার আগের দিনের দুধ। ফ্রিজে তোলা ছিল। তোকে গরম করে দিয়েছি।’

‘তেলাপোকাকার দুধ কী করেছ?’

ফরিদা বিরক্ত মুখে বললেন, ‘তোকে খেতে দেইনি বললাম তো। কেন অকারণে ঘ্যানঘ্যান করছিস?’

লিলির বমি বমি লাগছে। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। কী অবলীলায় মা মিথ্যা বলে যাচ্ছেন। মিথ্যা বলার সময় তাঁর মুখের চামড়া পর্যন্ত কুঁচকাচ্ছে না!

ফরিদা বললেন, ‘লিলি যা তো, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে আয় চা খাবে না-কি। কাল রাতে বেচারি যা কষ্ট করেছে। পেটে গ্যাস হয়েছে। গ্যাস বুকে চাপ দিচ্ছে। এই বয়সে গ্যাস ভালো কথা না। গ্যাস থেকে হার্টের ট্রাবল হয়।’

লিলি বলল, ‘তেলাপোকাকার দুধ কী করেছ?’

ফরিদা চোখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখে বিরক্তি নেই, আনন্দও নেই। পাথরের মতো চোখ-মুখ। দীর্ঘদিন সংসারে থাকলে মায়েরা রোবট জাতীয় হয়ে যান। কোনো কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। ফরিদা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘যন্ত্রণা করিস না তো লিলি।’

‘যন্ত্রণা করছি না মা। দুধটা তুমি কী করেছ বলো? ফেলে দিয়েছ?’

‘না।’

‘তাহলে কী করেছ?’

‘বুয়ারা খেয়ে ফেলেছে।’

‘তিন লিটার দুধ দু’জনে মিলে খেয়ে ফেলেছে?’

ফরিদা এবার চোখ-মুখ করুণ করে বললেন, ‘তোমার বাবা চা খাবে কি-না জিজ্ঞেস করে আয়। লক্ষ্মী মা।’

লিলি বাবার ঘরের দিকে রওনা হলো। তিনিও দৌতলায় থাকেন। তবে তাঁর ঘর বড় চাচার ঘরের উল্টো দিকে। আবারও বড় চাচার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, তবে সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে উঠতে হবে। বড় চাচা পায়ের শব্দও চেনেন। পায়ের শব্দ শুনেই ডেকে বসতে পারেন, ‘যাচ্ছে কে লিলি না? একটু শুনে যা মা।’

লিলির বাবা নেয়ামত সাহেব জেগে আছেন। খালি গা, লুঙ্গি হাঁটুর উপর উঠে এসেছে। মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি। চোখের নিচে কালি। দু’চোখের নিচে না, এক

চোখের নিচে। মানুষের দু'চোখের নিচে কালি পড়ে। তাঁর কালি পড়ে শুধু ডান চোখের নিচে। তাঁর বোধহয় একটা চোখ বেশি ক্লান্ত হয়। কেমন অসুস্থ অসুস্থ চেহারা।

‘চা খাবে বাবা?’

নেয়ামত সাহেব চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, ‘হাত-মুখ কিছু ধুই নি, চা খাব কি? সব সময় ইডিয়টের মতো কথা।’

‘মা জানতে চাচ্ছিল চা খাবে কি-না।’

‘খবরের কাগজ দিয়ে যা।’

‘কাগজ এখনও আসে নি।’

‘ন’টা বাজে এখনও কাগজ আসে নি? হারামজাদা হকারকে ধরে মার লাগানো দরকার। শুয়োরের বাচ্চা...’

লিলি বাবার ঘর থেকে বের হয়ে এলো। কী বিশী পরিবেশ চারদিকে! কোনো আনন্দ নেই। একটা হট্টগোলের বাড়ি। যে বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকলেই মাথা ধরে যায়। যে বাড়িতে অনেকগুলো মানুষ বাস করে কিন্তু কারও সঙ্গেই কারও যোগ নেই। যে বাড়ির মানুষগুলো সুন্দর করে, ভদ্র করে কথা বলা কী জানে না।

একতলায় ভেতরের বারান্দায় রুমু রুমুর স্যার তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে বসেছেন। দু’জনেই ক্লাস এইটে পড়ে। এবার নাইনে পড়ার কথা ছিল। একসঙ্গে ফেল করায় এইটে। প্রাইভেট মাস্টারের ব্যবস্থা করে রুমু রুমুর প্রতি দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে। এই প্রাইভেট মাস্টার না-কি দারুণ ভালো। ‘গেরেন্টি’ দিয়ে পড়ায়। একটা বেতের চেয়ারকে সে যদি তিন মাস একনাগাড়ে পড়ায় তাহলে বেতের চেয়ারও ফিফটি পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে পাস করে যাবে। অঙ্কে পাবে সেভেন্টি পার্সেন্ট।

এই মাস্টারের তেমন কোনো বিশেষত্ব লিলির চোখে পড়ে নি। সে দেখেছে মাস্টার সাহেব কারও চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না। তিনি যতক্ষণ পড়ান ততক্ষণই মাথা নিচু করে থাকেন। এবং ততক্ষণই অতি কুৎসিত ভঙ্গিতে নাকের ভেতর থেকে লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করেন। রুমু রুমু এই কুৎসিত দৃশ্য কিভাবে সহ্য করে লিলি জানে না। রুমু রুমুর জায়গায় সে হলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যেত। মাস্টার সাহেবকে খুন-টুন করে ফেলত।

রুমু রুমু দু’জনই বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। রুমু লিলির ছোট্ট বোন, রুমু বড় চাচার একমাত্র মেয়ে। এরা দু’জন সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকে। কেউ কাউকে চোখের আড়াল করে না। তবে তারা যে গল্পগুজব করে তা না। রুমু মুখে কোনো কথা নেই। নিঃশব্দ চলাফেরা। মাঝে মাঝে তারা কোনো একটা বিশেষ ধরনের অন্যায় করে, তখন ফরিদা দু’জনকে ঘরে নিয়ে আটকান। দরজা-জানালা বন্ধ করে বেদম মারেন। মারতে মারতে নিজেই ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বের হয়ে আসেন। এরা টু শব্দ করে না। নিঃশব্দে মার খায়। লিলি যদি জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে মা?

তিনি ক্লান্ত গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, কিছু হয় নি।

‘ওদের মারলে কেন?’

‘সারাক্ষণ মুখ ভোঁতা করে থাকে। মুখে কথা নেই, মারব না তো কি!’

মায়ের কথা লিলির কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। সারাক্ষণ মুখ ভোঁতা করে রাখা, কারও সঙ্গে কথা না বলা এমন কোনো অপরাধ না যার জন্য দরজা-

জানালা বন্ধ করে মারতে হয়। রুমু রুমুকে জিজ্ঞেস করলেও কিছু জানা যাবে না। এরা মরে গেলেও মুখ খুলবে না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু করে ফেলবে। ফিক ফিক করে হাসবে।

লিলি প্রায়ই ভাবে তাদের যদি আলাদা একটা বাড়ি থাকত। ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি। দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনে অনেকখানি জায়গায় নানা ধরনের ফুল গাছ— আম-জাম-কাঁঠাল। একটা গাছে দোলনা ঝুলানো। বাড়িটা একতলা হলেও ছাদে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ছাদে অসংখ্য টবে ফুল গাছ। সেই বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই। শুধু তারাই থাকে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর। তারা খেতে বসে একসঙ্গে এবং খাবার টেবিলে নানান গল্পগুজব করে। বাবা বলেন তাদের অফিসে মজার কি ঘটল সেই গল্প। লিলি বলে তার ইউনিভার্সিটির গল্প। ইউনিভার্সিটির কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আছে। সেই ঘটনা শোনার মানুষ নেই। ঐ বাড়িটার পরিবেশ এমন হবে যে সবাই সবার গল্প শুনবে। কারও মজার কোনো কথা শুনে সবাই একসঙ্গে হো হো করে হাসবে।

কোনো কোনো দিন রুম বৃষ্টির সময় একসঙ্গে সবাই ছাদে গিয়ে ভিজবে। বছরে একবার তারা বেড়াতে বের হবে। কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কুয়াকাটা, সিলেটের চা বাগান। বাড়ির সুন্দর একটা নাম থাকবে— ‘আয়না ঘর’ বা এই জাতীয় কিছু...

তাদের এখনকার এই বাড়িতে কোনো দিন এ-রকম কিছু হবে না। এই বাড়ির মা নির্বিকার ভঙ্গিতে তেলাপোকা চোবানো দুধ খাইয়ে দেবেন। বাবা হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে চোঁচামেচি করবেন খবরের কাগজের জন্য। রুমু রুমুর মাস্টার নাকের লোম ছিঁড়তে ছিঁড়তে পা দোলাবে। বড় চাচা সামান্য পায়ের শব্দেই কান খাড়া করে ডাকবেন— কে যায়? লিলি? জানালার একটা পাল্লা খুলে দিয়ে যা তো।

তাদের বর্তমান বাড়ি লিলির দাদাজান ইরফানুদ্দিন খাঁর বানানো। বাড়ি যেমন কুৎসিত, বাড়ির নামও কুৎসিত। রহিমা কুটির—রহিমা তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম।

লিলির ধারণা তার দাদাজান সবার একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে বেহেশত কিংবা দোজখ কোনো এক জায়গায় চলে গেছেন। দোজখ হবার সম্ভাবনাই বেশি। তিনি ছিলেন ইনকামট্যাক্স অফিসের হেড ক্লার্ক। এই চাকরি থেকে করেন নি হেন জিনিস নেই।

কয়েকটা বাড়ি বানালেন। ট্রাক কিনলেন, বাস কিনলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার বিয়ে করলেন। চৌদ্দ বছর বয়সের এক খুকি।

তাঁর একটা হিন্দু কাজের মেয়ে ছিল। রেবতী। একদিন দেখা গেল তার নামেও কলতাবাজারের বাড়িটা লিখে দিলেন। সেই খুকির নামে বাড়ি লিখে দিলেন। দরাজ গলায় বললেন, এর আত্মীয়স্বজন সব ইন্ডিয়া চলে গেছে— এ যাবে কোথায়? খাবে কী? জীবনে সৎ কাজ তো কিছু করি নাই। একটা কিসল্যাম আর কি! ক্ষুদ্র একটি সৎ কর্ম। হা হা হা।

এসব ঘটনা লিলি দেখে নি, শুনেছে। দাদাজান যখন মারা যান তখন লিলি ক্লাস সিক্সে পড়ে। পরদিন ভূগোল পরীক্ষা, দরজা বন্ধ করে পড়ছে। বাবা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন। তখন দাদাজানের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে নিশ্বাস ষাণ্ডাবিক হয় তখন কথা বলেন। সব কথাবার্তাই কিভাবে আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকা যায় সেই বিষয়ে...

‘খাঁটি মৃগনাভি পাওয়া যায় কি-না দেখ। মৃগনাভি মধুর সঙ্গে বেটে খাওয়ালে জীবনী শক্তি বাড়ে।’

মৃগনাভির সন্ধানে হেকিমী ওষুধের দোকানে লোক গেল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, ‘রাতটা কোনো রকমে পার করে দিতে পারলে আর চিন্তা নাই। আজরাইল কখনও দিনে জান কবজ করে না। আজরাইল জান কবজ করে রাতে।’

তিনি রাতটা টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। আশা ছেড়ে দিলেন। ততক্ষণে মৃগনাভি পাওয়া গেছে। মরা মানুষের শুকনা চামড়ার মতো এক টুকরা চামড়া যার মধ্যে লোম লেগে আছে। মৃগনাভি থেকে কড়া অডিকোলনের মতো গন্ধ আসছে। তিনি বললেন, ‘মৃগনাভি রেখে দে, লাগবে না। কোরান মজিদ নিয়ে আয়।’

কোরান শরিফ আনা হলো। তিনি তাঁর ছেলের বললেন— কোরান মজিদে হাত রেখে তোমরা প্রতিজ্ঞা করো ভাইয়ে ভাইয়ে মিল মহব্বত রাখবে। তিন ভাই এক বাড়িতে থাকবে এবং আমার মৃত্যুর কারণে বেকুবের মতো চিৎকার করে কাঁদবে না। তিন ভাই মিলে তখনই কান্নাকাটি শুরু করল। হইচই এবং ঝামেলায় এক ফাঁকে আজরাইল টুক করে জান কবজ করে ফেলল।

লিলি তার বাপ-চাচার মতো পিতৃভক্ত মানুষ এখনও দেখে নি। কী অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি! বিরাট এক অয়েল পেইন্টিং বসার ঘরে লাগানো। সবার ঘরের যাবতীয় আসবাবে ধুলা জমে আছে কিন্তু পেইন্টিংয়ে ধুলা নেই। সব সময় ঝকঝক করছে। পেইন্টিং দেখলে যে-কেউ বলবে— পুরনো দিনের কোনো ছোটখাটো শুকনো মহারাজ। যার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা বলে মুখ আপাতত বিকৃত।

নেয়ামত সাহেব তাঁর ছেলেমেয়ের জন্য তারিখ জানেন না। নিজের বিয়ের তারিখ জানেন না। অথচ তাঁর বাবা মুনশি ইরফানুদ্দিন খাঁ সাহেবের মৃত্যু তারিখ ঠিকই জানেন। ঐ দিন বাড়িতে বাদ আছর মিলাদ হয়। রাতে গরিব-মিসকিন খাওয়ানো হয়। এতিমখানায় খাসি দেয়া হয়। নেয়ামত সাহেব পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে অনেক রাত পর্যন্ত কোরান পাঠ করেন। রাতে খেতে বসে ঘনঘন বলেন— থ্রেটম্যান ছিলেন, কর্মযোগী পুরুষ। এ-রকম মানুষ হয় না। কী দরাজ দিল! কী বুদ্ধি! ওহ ওহ...। বাবার সদৃশ্যের কিছুই পেলাম না। বড়ই আফসোস।

পিতৃভক্ত ছেলের মুখে মায়ের নাম তেমন শোনা যায় না। মার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় না। কেন হয় না লিলি জানে না। লিলি এ মহিলাকে খুব ছোটবেলায় দেখেছে— সেই স্মৃতি তার মনে পড়ে না। দু’নম্বর দাদিজন বেঁচে আছেন। তাঁর কোনো ছেলেপুলে হয় নি। তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে আলাদা থাকেন। যদিও কাগজপত্রে লিলিরা যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়িটা তাঁর।

এই মহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও চেহারা খুঁকি খুঁকি ভাব আছে। স্বামীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তিনি লিলিদের বাড়িতে আসেন। তাঁকেও ভালোই খাতির-যত্ন করা হয়। লিলির কাছে খুব আশ্চর্য লাগে, এই মহিলাও দারুণ স্বামীভক্ত। লিলিকে ফিসফিস করে বলেন, ‘অসাধারণ একটা মানুষ ছিলরে লিলি। অসাধারণ।’

‘কোনদিক দিয়ে অসাধারণ?’

‘সব দিক দিয়ে।’

‘কাজের মেয়েকে বাড়ি লিখে দিলেন তারপরও অসাধারণ?’

‘লিখে দিয়েছে বলেই তো অসাধারণ। কাজের মেয়ের সঙ্গে কতজন কতকিছু করে। কে আর বাড়িঘর লিখে দেয়।’

‘আপনার এইসব ভেবে অস্বস্তি লাগে না?’

‘মেয়েদের এত অস্বস্তি লাগলে চলে না। পুরুষ মানুষ এ-রকম হয়ই। আদরে আদরে ছোক ছোক স্বভাব হয়। দোষটা স্বভাবের— মানুষের না।’

‘কী যে আপনি বলেন দাদিজান! মানুষ আর তার স্বভাব বুঝি আলাদা?’

‘অবশ্যি আলাদা। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এইসব বুঝবি না। এইসব তো আর ইউনিভার্সিটিতে শেখায় না। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করবি। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুই তোর দাদাজানের বুদ্ধি খানিকটা পেয়েছিস, তুই বুঝতে পারবি। তোর বাপ-চাচার কেউ তাঁর বুদ্ধি পায় নি। সব ক’টা ছাগল মার্কী হয়েছে। বুদ্ধি-গুদ্ধি, চলাফেরা, কাজকর্ম সবই ছাগলের মতো। সবচেয়ে বড় ছাগল হচ্ছে তোর বড় চাচা। জ্ঞানী ছাগল। ওর পাশ দিয়ে গেলে ছাগলের বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যায়।’

বড় চাচা সম্পর্কে দাদিজানের এই কথাগুলো লিলির সত্যি মনে হয়। বড় চাচার কারণে লিলিরা দ্রুত পথে বসতে বসেছে। এই সত্য স্বীকার করা ছাড়া এখন আর পথ নেই। বিষয়-সম্পত্তি সব দেখার দায়িত্ব তাঁর। তাঁকেই পাওয়ার অব এ্যাটর্নি করে সেই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তিনি একে-একে সব বিক্রি করছেন। অন্য দুই ভাই এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। সংসার ঠিকমতো চলছে, খাওয়া-দাওয়ার কোনো সমস্যা হচ্ছে না, কাজেই অসুবিধা কী? অসুবিধা হোক, তারপর দেখা যাবে। তা ছাড়া মুনশি ইরফানুদ্দিন খাঁ মৃত্যুর সময় বলে গেছেন ভাইয়ে ভাইয়ে মিল-মহক্বত রাখবা। পিতৃ আজ্ঞার অন্যথা হয় নি। ভাইয়ে ভাইয়ে মিল মহক্বত আছে। ভালোই আছে।

এই বাড়ি হলো অসুবিধাহীন বাড়ি। এ বাড়িতে কারও অসুবিধা হয় না। সবাই ভালো থাকে। সুখে থাকে। কারও অসুখ হলে ডাক্তার চলে আসে। বাসায় এসে রোগী দেখে যায়। ডাক্তার হলো বড় চাচার বন্ধু সামছুদ্দিন তালুকদার হোমিওপ্যাথ। এক সপ্তাহ তাঁর চিকিৎসা চলে। এক সপ্তাহে কিছু না হলে অন্য ডাক্তার, রমজান আলী, এলোপ্যাথ।

লিলির বড় চাচার নিয়মে হোমিওপ্যাথির জন্য এক সপ্তাহ দিতে হবে। এক সপ্তাহে রোগ যত প্রবলই হোক অন্য চিকিৎসা হবে না। সাত দিন সময় না দিলে বুঝা যাবে কেন ওষুধ কাজ করছে না। এলোপ্যাথি হলো দীর্ঘ-চিকিৎসা। যত কম করানো যায়।

তবে আজাহার উদ্দিন খাঁ অবিবেচক নন। পরিবারের সদস্যদের সুবিধা-অসুবিধা তিনি দেখেন। লিলির দিকে তাকিয়ে তিনি গাঢ় কানলেন। সেই গাড়ি কেনার ইতিহাস হচ্ছে— লিলি একবার রিকশা করে আসার সময় রিকশা উল্টে পড়ে গেল। হাত কেটে রক্তারক্তি। হাসপাতাল থেকে সেলাই করিয়ে আনার পর আজাহার উদ্দিন খাঁ বললেন, রিকশা নিরাপদ না। বাচ্চাদের স্কুল-কলেজের যাতায়াতের জন্য গাড়ি দরকার। টু ডোর কার, যাতে পেছনের দরজা হঠাৎ খুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে।

আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো, একটা টু ডোর কার এবং একজন বুড়ো

ড্রাইভার। স্ত্রী যেমন যত বুড়ি হয় তত ভালো হয়, ড্রাইভারও তেমন। যত বুড়ো ততই অভিজ্ঞ।

এক সপ্তাহের মধ্যে লিলিদের গাড়ি চলে এলো। ফোন্সওয়াগন। রাস্তার সঙ্গে মিশে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলে। গাড়িতে ঢুকতেও হয় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে। গাড়ির ড্রাইভারও দর্শনীয়, জহির-বুড়ো। এক চোখে ছানি পড়া, অন্য চোখেও ঝাপসা দেখে। সামনে কিছু পড়লে হর্ন দেয় না। জানালা দিয়ে মুখ বের করে অতি ভদ্র এবং অতিশালীন ভাষায় গালি দেয়— ঐ রিকশা। গাড়ি আসতেছে শব্দ শুনো না? নড়ো না কেন? গজব পরবো। বুঝা, গজব।

লিলি যদি বলে, আপনি হর্ন দেন না কেন ড্রাইভার চাচা? হর্ন দিতে অসুবিধা আছে?

ড্রাইভার উদাস গলায় বলে, অসুবিধা আছে গো মা। ব্যাটারির যে অবস্থা— হর্ন দিলে ব্যাটারি বসে যাবে। গাড়ি চলবে না। ব্যাটারির কারেন্টের বারো আনাই চলে যায় হর্নে। মানবজাতির দিকে তাকিয়ে দেখো মা, যে যত কথা বলে তত আগে তার মৃত্যু। কথা বলে বলে কারেন্ট শেষ করে ফেলে।

দার্শনিক ধরনের উক্তি। লিলির বলতে ইচ্ছে করে— আপনি যে হারে কথা বলেন তাতে আপনার কারেন্ট ছেলেবেলাতেই শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। শেষ তো হয় নি। যত বুড়ো হচ্ছেন কারেন্ট তত বাড়ছে।

কঠিন কিছু কথা বলতে ইচ্ছে হলেও লিলি শেষ পর্যন্ত কিছুই বলে না। তার কাউকে কিছু বলতে ভালো লাগে না। তাদের এই বিচিত্র সংসারে বড় হয়ে আজ তার এই সমস্যা হয়েছে। সব সময় মনে হয়— হোক যা ইচ্ছা, ড্রাইভার সারাক্ষণ কথা বলে— বলুক। কারেন্ট খরচ করুক।

লিলি কিছুক্ষণ দোতলার টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেল। আজ কী বার মনে করতে পারল না। আজ কি তার ইউনিভার্সিটি আছে? সে কি কোনো বিশেষ কারণে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে? হঠাৎ মনে হলো মাস্টার সাহেব রুমু বুমুকে সকালে পড়াতে এসেছেন, কাজেই আজ শুক্রবার। একমাত্র শুক্রবারই তিনি সকালে আসেন। ইউনিভার্সিটিতে কোনো ক্লাস নেই। লাইব্রেরিতে গিয়ে নোট করার কথাও নেই। আজ কোথাও যাওয়া যাবে না।

লিলি আবার একতলায় নেমে এলো। কোথাও তার মনে ইচ্ছে করছে। কোথাও যাওয়া যায়?

টেবিলে নাশতা সাজানো হচ্ছে। গাদাখানিক কুচি ভাজি। বড় এক বাটি পেঁপের হালুয়া। দিনের পর দিন একটাই নাশতা। এই নিয়েও কারও বিকার নেই। একদিন একটু অন্য কিছু করলে হয়। লিলি ভাজি দেখে না দিয়েই বলে ভাজিতে লবণ বেশি হয়েছে। মতির মা বুয়া লবণ বেশি না দিয়ে ভাজি করতে পারে না। লবণ বেশি দেবে, বকা খাবে। মতির মা ধরেই নিয়েছে ভাজি নিয়ে বকাঝকা দিন গুরুর অংশ।

লিলির ছোট চাচা জাহেদুর রহমান লিলিকে দেখেই আনন্দিত গলায় বলল, 'হারামজাদার নাকে এক ঘুসি দিয়েছি, গলগল করে ব্লাড বের হয়ে এসেছে।'

'কার নাকে ঘুসি দিলে?'

'দুধওয়ালার নাকে। আমার সঙ্গে তর্ক করে। অন্যায় করেছে ক্ষমা চাও। ক্ষমা

করে দেব। ক্ষমা মানবধর্ম। তা না, তর্ক। হারামজাদার সাহস কত। রগে রগে সাহস। সাহস বের করে দিয়েছি।’

‘সত্যি সত্যি মেরেছ?’

‘অবশ্যই মেরেছি। গদাম করে ঘুসি। হারামজাদা, তুমি মানুষ চেনো না। রোজ তেলাপোকা খাওয়াও...।’

দুধওয়ালা নাক ভেঙে দিয়ে জাহেদুর রহমানকে অত্যন্ত উৎফুল্ল লাগছে। জাহেদুর রহমানের বয়স পঁয়ত্রিশের উপর কিন্তু চলাফেরা হাবভাব আঠারো উনিশ বছরের তরুণের মতো। সব সময় সেজেগুজে থাকে। প্যান্টের ভেতর শার্ট ইন করা। চকচকে জুতা। রঙচঙে শার্টের কলারের নিচে সোনার চেন ঝকঝক করে। জাহেদুর রহমান গত সাত বছর ধরে ইমিগ্রেশন নিয়ে আমেরিকা যাবার চেষ্টা করছে। তার অধ্যবসায় দেখার মতো। লিলির ধারণা তার ছোট চাচা যদি আমেরিকা যাবার জন্য এখন পর্যন্ত কি কি করেছে তার একটা তালিকা করে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে পাঠায় তাহলে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তাকে সিটিজেনশিপ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে আমেরিকা নিয়ে যাবেন।

লিলি বলল, ‘ছোট চাচা তুমি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে?’

জাহেদুর রহমান পা নাচাতে নাচাতে বলল, ‘ফর গুড দিতে পারব না। ধার হিসেবে দিতে পারি।’

‘ধার হিসেবেই দাও।’

‘কত?’

‘পাঁচ শ’।’

‘এত টাকা দিয়ে করবি কী? পাঁচ শ’ তো অনেক টাকা। প্রায় পনেরো ডলার। পনেরো ডলার দিয়ে তুই করবি?’

‘রিকশায় করে শহরে চক্কর দেব। ঘুরব। একদিনের জন্য হিমু হয়ে যাব। মহিলা হিমু।’

‘হিমুটা কে?’

‘তুমি চিনবে না। দিতে পারবে পাঁচ শ’ টাকা?’

‘তিন শ’ দিতে পারব। বাকি দু’শ’ অন্যখান থেকে ম্যানেজ কর। ভাইজানকে গিয়ে বল ইউনিভার্সিটিতে পিকনিক হচ্ছে, দু’শ’ টাকা চাঁদা।’

‘মিথ্যা কথা বলতে পারব না।’

‘মিথ্যা কথাটা তুই এত ছোট করে দেখিস কেন লিলি। মিথ্যা আছে বলেই জগতসংসার এত সুন্দর। গাদা-গাদা গল্প উপন্যাসের পড়িস সবই তো মিথ্যা। লেখকেরা সত্যি কথা লেখা শুরু করলে বই আর পড়তে হতো না। মিথ্যা কথা বলা না শিখলে লাইফ হেল হয়ে যাবে।’

লিলি হেসে ফেলল। জাহেদুর রহমান গম্ভীর গলায় বলল, ‘হাসিস না। আমি হাসির কোনো কথা বলছি না। সত্যি কথা হলো ডিস্টিল ওয়াটারের মতো টেস্টলেস। আয় আমার সঙ্গে, টাকা নিয়ে যা।’

‘কত দেবে, তিন শ’?’

‘পাঁচ শ’ দেব। তোকে খুব পছন্দ করি। এইজন্যই দিচ্ছি। তুই হচ্ছিস অনেক একটা মেয়ে।’

লিলি হাসতে হাসতে বলল, ‘তুমি যে আমাকে পছন্দ করো তার কারণ হলো আমি সব সময় সত্যি কথা বলি। আমি যদি তোমার মতো মিথ্যা বলতাম তাহলে পছন্দ করতে না। কাজেই সত্যি বলার কিছু এ্যাডভানটেজ আছে।’

জাহেদুর রহমান চিলেকোঠায় থাকে। তার ঘর ছবির মতো সাজানো। খাটে টানটান করে চাদর বিছানো। টেবিলের বইগুলো সুন্দর করে সাজানো। কোথাও এক কণা ধুলা নেই। জুতা বা স্যান্ডেল পরে তার ঘরে ঢোকা যাবে না। বাইরে খুলে ঢুকতে হবে। লিলি বলল, ‘ঘরে ঢুকব না ছোট চাচা। আমি বাইরে দাঁড়াছি তুমি দিয়ে দাও।’

‘আয়, একটু বসে যা।’

লিলি স্যান্ডেল খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ‘তোমার আমেরিকা যাবার কিছু হয়েছে?’

‘নতুন একটা লাইন ধরেছি। ভালো লাইন। হয়ে যেতে পারে।’

‘কী লাইন?’

‘আমেরিকান এক মরমন পাদ্রির সঙ্গে খাতির জমিয়েছি। প্রতি রোববারে যাই। এমন ভাব করি যেন যিশুখ্রিস্টের অমর বাণী শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। তাকে পটাচ্ছি। সে ভাবছে সে আমাকে পটাচ্ছে।’

‘তাকে পটিয়ে লাভ কী?’

‘এক স্টেজে খ্রিস্টান হয়ে যাব। তারপর তাকে বলব— আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা এখন আমাকে মেরে ফেলার জন্য ঘুরছে। আমাকে বাঁচাও। আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও। পলিটিক্যাল এসাইলেমের ব্যবস্থা করো। বুদ্ধিটা তোর কাছে কেমন লাগছে?’

লিলি জবাব দিল না। জাহেদুর রহমান ড্রয়ার থেকে টাকা বের করতে করতে বলল, ‘অনেক চিন্তাভাবনা করে এগুচ্ছি। এইবার একটা-কিছু হবেই।’

‘যদি না হয় কী করবে?’

‘আরও দু’বছর দেখব। এই দু’বছরে না হলে, আশা ছেড়ে দিয়ে বিয়ে-শাদি করব। ফেইথফুলি সংসার করব। টু বাংলাদেশী হয়ে যাব। পয়েলা বৈশাখে রমনা বটমূলে যাব। গব-গব করে পাত্তাভাত খাব।’

‘আমেরিকা যাবে এই জন্যই বিয়ে করছ না?’

‘অবশ্যই। একজনেরই ব্যবস্থা হয় না দু’জনের কীভাবে হবে? আমি ভিসা পেয়ে চলে গেলাম তোর চাচি দেশে পড়ে রইল, চোখের জল নাশে জল ক্রমাগত মিক্স করে যাচ্ছে। তখন অবস্থাটা কি হবে? নে, টাকা গুনে নে।’

‘পাঁচ শ’ টাকার নোট গুনে নেব কি?’

‘ভুলে দুটি চলে গেল কিনা দেখ। আর শোন লিলি, এই টাকা তোকে ফেরত দিতে হবে না। টাকাটা তোকে আমি উপহার দিয়ে দিলাম।’

‘কেন?’

‘এমনি দিলাম। তুই হচ্ছিস একজন সত্যবাদী মহিলা...’

আজ সকাল থেকেই লিলির মন খারাপ হয়েছিল। এখন মন ভালো হতে শুরু করল। ছোট চাচার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই তার মন ভালো হয়।

জাহেদুর রহমান একটু ঝুঁকে এসে বলল, ‘টাকাটা তোকে যে শুধু শুধু দিয়ে দিয়েছি তা না। এর বদলে তোকে একটা কাজ করতে হবে।’

‘কী কাজ?’

‘আমার যেন কিছু ব্যবস্থা হয় সেই দোয়া করবি। সত্যবাদী মহিলার দোয়া আল্লাহ শুনবেন।’

‘আচ্ছা যাও, দোয়া করব।’

‘আল্লাহকে বলবি এই যে খ্রিস্টান হচ্ছি এটা আমার একটা ট্রিক্স। উনি যেন এটাকে আবার সিরিয়াসলি না নেন।’

লিলি হাসছে। শব্দ করে হাসছে।

জাহেদুর রহমান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘গুড গার্ল। চল, নাশতা খেয়ে আসি।’

নাশতার টেবিলে দারুণ হইচই হচ্ছে। নেয়ামত সাহেব ভাজির বাটি মেঝেতে ছুড়ে ফেলে ভেঙেছেন। এখন বিকট চিৎকার করছেন। ‘ঐ বেটির মুখে এক পোয়া লবণ ঢুকিয়ে দাও। তাহলে যদি শিক্ষা হয়।’

মতির মা ভাঙা বাটির টুকরা কুড়াচ্ছে। ফরিদা নতুন করে ভাজি বসিয়েছেন।

লিলি রান্নাঘরে মা’র পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, ‘বাবা এ-রকম বিশী করে চেষ্টাচ্ছে কেন মা?’

ফরিদা বললেন, ‘পুরুষ মানুষ একটু চেষ্টামেচি তো করবেই। পুরুষদের সবকিছু ধরতে নেই। লবণটা একটু দেখ তো মা। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভয়ের চোটে দু’বার লবণ দিয়ে ফেলেছি।’

লিলি সামান্য ভাজি মুখে নিয়ে বলল, ‘দু’বার না মা, তুমি তিনবার লবণ দিয়েছ।’ বলতে বলতে লিলি হাসল। লিলির হাসি দেখে ফরিদা হাসলেন। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, ‘তুই তো দারুণ সুন্দর হয়েছিস লিলি। কী আশ্চর্য কাণ্ড! আমি তো লক্ষ্যই করি নি। তুই কি সকালে গোসল করেছিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোর বয়েসী মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর দেখা যায় গোসলের পরপর। এত সকালে গোসল করলি কেন?’

‘জানি না কেন। আচ্ছা মা শোনো, আজ আমার কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে।’

‘কোথায়?’

‘বিশেষ কোথাও না— এই ধরো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো। নিউমার্কেটের দোকানগুলো দেখলাম।’

‘যাই করিস তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে করবি।’

‘সমস্যা তো এইখানেই।’

রুমু রান্নাঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা পুস্তক। সে লিলির হাতে দিয়ে যেভাবে চুপিচুপি এসেছিল সেভাবেই বের হয়ে গেল। ফরিদা বললেন, ‘কার চিঠি?’

‘স্বাতীর চিঠি।’

‘যাক, বাঁচা গেল। আমি ভাবলাম রুমু রুমুর মাস্টার বুঝি প্রেমপত্র লিখে ফেলেছে। ওর তাকানো ভালো না। শকুনের মতো কেমন করে যেন তাকায়। স্বাতী ঠাণ্ড চিঠি লিখল কেন?’

‘আজ ওর জন্মদিন। যেতে বলেছে। মা, যাব?’

‘তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কর।’

‘বাবা যেতে দেবে না।’

‘দিতেও পারে। তোকে পছন্দ করে। নরম গলায়, কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে দেখ।’

‘এখন বলব?’

‘না, এখন না। খবরের কাগজটা আসুক। খবরের কাগজ হাতে পড়লে মেজাজ একটু ভালো থাকে। তখন এক কাপ চা নিয়ে যাবি তারপর বলবি।’

নেয়ামত সাহেব খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সামনে এসট্রে আছে। ছাই এসট্রেতে ফেলছেন না, চারপাশে ফেলছেন। লিলি চায়ের কাপ তাঁর সামনে রাখতে রাখতে বলল, বাবা আমার এক বান্ধবী যে আছে স্বাভী, আজ ওর জন্মদিন।

নেয়ামত সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। লিলি বলল, ‘আমাকে খুব করে যেতে লিখেছে। এক ঘণ্টার জন্য।’

‘তোমার বান্ধবীর জন্মদিন?’

‘জি।’

‘বুড়ো ধাড়ি মেয়ের আবার জন্মদিন কি? এসব আমার পছন্দ না। ছুটির দিন বাসায় থাকবি। বাইরে বাইরে ঘুরবি কেন? যা, মাকে সাহায্য কর। একা মানুষ চারদিক সামলাচ্ছে, তাকে দেখে একটু মায়্যাও হয় না।’

নেয়ামত সাহেব আবার কাগজ পড়তে শুরু করলেন। লিলি চায়ের কাপ নামিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।



স্বাভী ভেবে রেখেছিল সে তার জন্মদিনে লিলিকে ব্যাপারটা বলবে। ভয়ঙ্কর অন্যায় যে সে করেছে সেই ব্যাপারটা। লিলি আতঙ্কে শাদা হয়ে যাবে। পরপর কয়েক বার বলবে, এখন কী হবে রে? এখন কী হবে? তখন স্বাভী তার পরিকল্পনার কথা বলবে। সেটা শুনে লিলি আরও আতঙ্কগ্রস্ত হবে।

নিজের আতঙ্ক অন্যের ভেতর দেখলে নিজের আতঙ্ক খানিকটা কমে। স্বাভী খানিকটা স্বস্তি পাবে। এবং কিছুটা সাহসও পাবে। সেই সাহসটা পাবার পর স্বাভী ব্যাপারটা তার মা’কে বলতে পারবে। মা’কে কিভাবে বলবে তা সে ঠিক করে রেখেছে। ভয়ঙ্কর অন্যায়ের ব্যাপারটা মা’কে বলা হবে সবার শেষে। চেষ্টা করবে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা না বলতে। তবে তিনি জানতে চাইলে বলতেই হবে।

সে শুরু করবে এই ভাবে— রাতে ঘুমুতে যাবার আগে মা’র ঘরে গিয়ে বলবে, ‘মা... আজ জন্মদিন উপলক্ষে আমি তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে ঘুমুব। বাবাকে গেস্ট রুমে ঘুমুতে বলো।’

মা সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে বলবে— ‘ঠিক আছে, ঘুমুবি।’

সে বলবে ‘ছোটবেলায় যেভাবে ঘুমুতাম ঠিক সেইভাবে ঘুমুবি। তুমি তোমার চুল খোলা রেখে শুয়ে থাকবে। আমি তোমার চুল শরীরে ফেলে ঘুমুবি।’

মা আরও খুশি হবে। হাসিমুখে বলবে, ‘সেই লম্বা চুল কী আছে রে মা?’

স্বাতীর ছোটবেলার ঘুমের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মায়ের চুল তার সারা শরীরে ছড়িয়ে দিতে হতো। এই ঘুমের বিশেষ একটা নাম ছিল— ‘চুল ঘুম’। মায়ের চুল ভেজা হলে এই ‘চুল ঘুম’ দেয়া যেত না। স্বাতী কান্নাকাটি করে বাড়ি মাথায় তুলত।

অনেকদিন পর ‘চুল-ঘুমের’ ব্যবস্থা করে স্বাতী বলবে— ‘মা শোনো, আমি যদি পছন্দের কোনো ছেলেকে বিয়ে করি তাহলে তুমি কি আপত্তি করবে?’

মা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চমকে উঠে বলবে, ‘ছেলেটা কে?’

স্বাতী বলবে, ‘ছেলেটা কে সেই প্রশ্ন পরে আসছে। আগে বলো, আমার নিজের পছন্দের কাউকে বিয়ে করতে দিতে তোমার আপত্তি আছে কি-না।’

মা নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রায় ফিসফিস করে বলবেন— ‘না।’

তখন স্বাতী বলবে, ভালো ছেলে বলতেই বাবা-মা’র চোখে যে ছবি ভাসে ঐ ছেলে সে রকম না।

‘কী করে সে?’

‘সে একজন কবি।’

‘কী সর্বনাশ!’

‘কী সর্বনাশ— বলে লাফ দিয়ে ওঠার কিছু নেই মা। কবিরা ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণী না।’

‘করে কী?’

‘বললাম না, কবি। কবিতা লেখে। আর করবে কি?’

‘সংসার চালায় কীভাবে? কবিতা লিখে কি সংসার চলে?’

‘সেটা একটা কথা। কবিতা লিখে সংসার চলে না। তবে সে কবিতা ছাড়া আর কিছু লিখতেও পারে না।’

‘আমার মনে হচ্ছে তুই মিথ্যা কথা বলছিস। তুই ঠিকঠাক করে বল ছেলে করে কী?’

‘মা ও একজন পেইন্টার।’

‘পেইন্টার মানে কী? গাড়িতে যে রঙ করে সেও তো পেইন্টার।’

‘ও গাড়িতে রঙ করে না মা। কাগজে ছবি আঁকে।’

‘ও গাড়িতে রঙ করে না মা। কাগজে ছবি আঁকে।’

‘সামান্য বেশি মানে কত বেশি?’

‘কত বেশি তা তো বলতে পারব না।’

‘পরিচয় হলো কীভাবে?’

‘খুব ইন্টারেস্টিংভাবে পরিচয় হয়েছে। আমি ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে একটা বই এনেছিলাম। আমার কাছে থেকে সেই বই নিয়ে গেল যুথী। আর তো বই ফেরত দেয় না, শুধু ফাইন হচ্ছে। শেষে একদিন করলাম কি অফিস থেকে যুথীর ঠিকানা নিলাম। বাসা খুঁজে বের করব। যুথী থাকে ভূতের গলিতে— কলাবাগান হয়ে যেতে

হয়। আমি একে-ওকে জিজ্ঞেস করে করে যাচ্ছি— এভাবে ভদ্রলোকের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। খুব সুন্দর এটা বাড়ি। ছায়া ছায়া বাড়ি। শহরের মাঝখানে যেন ছোট্ট একটা বাঁশবনওয়ালা গ্রাম। বাড়ির সামনে জঙ্গলমতো হয়ে আছে। সেই জঙ্গলে ফুটফুটে একটা মেয়ে একা একা খেলছে। মেয়েটাকে দেখে এমন মজা লাগল। আমি বললাম, ‘এই খুকি, এটা কার বাড়ি?’

মেয়েটা বলল, ‘আমাদের বাড়ি।’

‘নাম্বার কত বাড়ির?’

‘আমি তো জানি না নাম্বার কত।’

‘জানো না কেন? তোমার এখন কঠিন শাস্তি হবে। আমি ইচ্ছা বাড়ির ইন্সপেকটর।’

আমি যে মজা করছি মেয়েটা চট করে বুঝে ফেলল। ‘সে হাসিমুখে বলল, ভেতরে আসুন, আন্টি।’

বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে আমার তখন পানির পিপাসা পেয়ে গিয়েছিল। কোনো বাড়িতে ঢুকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেতে পারলে ভালোই হয়। আমি বললাম, ‘তোমাদের বাড়িতে কি ফ্রিজ আছে।’

‘আছে।’

‘সেই ফ্রিজে পানির বোতল আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘সেই পানির বোতলে পানি আছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে পানি খাওয়ার জন্য যাওয়া যায়। তোমাদের বাড়িতে তুমি ছাড়া আর কে আছে।’

‘বাবা আছে।’

‘মা কোথায় গেল?’

‘মা মারা গেছেন। আমার জনোর সময় মারা গেছেন।’

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী ফুটফুটে একটা মেয়ে! মায়ের আদর কী জানে না। আমি বললাম, ‘তাহলে এই সুন্দর বাড়িটাতে শুধু তুমি আর তোমার বাবা থাকো?’

‘বুয়া ছিল। গত বুধবার বুয়া করেছে কি, বাবার মানিব্যাগ আর আমার পানির বোতলটা নিয়ে পালিয়ে গেছে।’

‘বলো কি! এখন রান্না করছে কে?’

‘বাবা আর আমি আমরা দু’জনে মিলে রান্না করছি।’

‘সেটা তো ভালোই।’

‘আসুন আন্টি। ভেতরে আসুন।’

‘তোমার বাবা আবার রাগ করবেন নাতো?’

‘বাবা রাগ করবে না। বাবা ছবি আঁকছে। বাবা কিছু বুঝতেই পারবে না।’

আমি বাড়িতে ঢুকলাম। পানি খেলাম। জাহিন আমাকে তার বাবার স্টুডিওতে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক ছবি আঁকছিলেন। কি ছবি জান মা, বিরাট সর্ষে ক্ষেতের মাঝখানে বাচ্চা একটা মেয়ে। পুরো হলুদ হয়ে আছে। সেই হলুদ মাঠে লাল ডুরে

শাড়ি পরা বাচ্চা মেয়েটা কে জানো? উনার মেয়ে জাহিন। কী সুন্দর করে যে উনি ছবিটা এঁকেছেন!

‘তুই পছন্দ করেছিস বিপত্নীক একটা মানুষ?’

‘হ্যাঁ।’

স্বাতীর মা এই পর্যায়ে বিছানা থেকে উঠে বসবেন। হতভম্ব হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। স্বাতী বলবে— ‘তুমি এ-রকম করে তাকিয়ে আছ কেন? বিপত্নীক মানুষকে পছন্দ করা যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধানে এমন নিয়ম নেই।’

স্বাতীর মা থমথমে গলায় বলবেন, ‘তুই ঐ মানুষটাকে বিয়ে করবি?’

‘হুঁ।’

মা চোখে পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকবেন। তখন স্বাতী নিচু গলায় বলবে, ‘বিয়ে না করে আমার উপায় নেই মা। আমি ভয়ানক একটা অন্যায্য করে ফেলেছি।’

লিলি আসে নি। কাজেই স্বাতীর পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে গেল। মেজাজও খারাপ হতে লাগল। সারাদিন মানুষ আসছে— ফুপা, ফুপু, মামারা। ফুল আসছে। টেলিফোন আসছে এবং সবাইকে নাজমুল সাহেব সন্ধ্যার পর আসতে বলেছেন। হোটেল সোনারগাঁওয়ে কেকের অর্ডার দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা কেক কাটা হবে। সন্ধ্যার আগে আগে স্বাতী বলল— ‘মা আমি একটু ঘুরে আসি?’

রওশন আরা অবাক হয়ে বললেন, এখন কোথায় যাবি? সন্ধ্যাবেলা সবাই আসবে।

‘সন্ধ্যার আগে আগে চলে আসব মা।’

‘তাহলে গাড়ি নিয়ে যা।’

‘গাড়ি লাগবে না।’

কলিং বেলে হাত রাখার আগেই জাহিনের তীব্র ও তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল— আন্টি আন্টি আন্টি।

স্বাতী বলল, চৈঁচাবি না। চৈঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে ফেলেছিস। বাবা আছে?

‘হুঁ।’

‘কী করছে?’

‘ছবি আঁকছে।’

‘কীসের ছবি?’

‘একটা বুড়ো লোকের ছবি।’

‘ছবি আঁকার জিনিস পাচ্ছে না, বুড়ো লোকের ছবি আঁকতে হবে?’

‘বুড়ো লোকটা ছাতা মাথায় বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছে।’

‘সুন্দর একটা মেয়ের ছবি আঁকবে যে বৃষ্টির ভেতর হাঁটবে— তা না...’

‘আন্টি, আজ তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে গল্প করবে। বাবার সঙ্গে না। এর আগের দু’বার যে এসেছিলে আমার সঙ্গে কোন গল্প কর নি।’

‘তোর সঙ্গে কী গল্প করব? তুইতো কোনো গল্পই জানিস না।’

জাহিনের একটু মন খারাপ হলো, কারণ সে আসলেই কোনো গল্প জানে না। খাটা বলল, যারা দিনরাত গল্পের বই পড়ে তারা কোনো গল্প বলতে পারে না। যারা খাটা জমিয়ে গল্প করে খোঁজ নিয়ে দেখবি তারা কোনো গল্পই জানে না।

‘আন্টি, তুমি কি আমার জন্য কিছু এনেছ?’

‘হুঁ।’

‘কী এনেছ?’

‘এখন বলব না। এখন আমি চা খাব।’

‘আমিও তোমার সঙ্গে চা খাব।’

‘ভেরি গুড। চল রান্নাঘরে যাই।’

‘আন্টি, তুমি কি গান জানো?’

‘গান জানি না। নাচ জানি।’

‘নাচ জানো? সত্যি?’

‘সত্যি। ছোটবেলায় আমার নাম কি ছিল জানিস? ‘লিটল ড্যান্সার। ছোট নর্তকী।’

‘সবাই তোমাকে ছোট নর্তকী ডাকত?’

‘সবাই ডাকত না। শুধু বাবা ডাকত— এখনও ডাকে।’

‘স্কুলে আমাকে কি ডাকে জানো?’

‘না।’

‘স্কুলে আমাকে ডাকে চার চোখ। চশমা পরি তো এইজন্য চার চোখ। স্কুলে আমাদের আরেকটা মেয়ে আছে তার নাম কাঁচা মরিচ। স্কুলে তোমাকে কী ডাকত আন্টি।’

‘স্কুলে আমার নাম ছিল ‘মিস গুণ্ডি’। সবার সঙ্গে গুণ্ডামি করতাম এজন্য মিস গুণ্ডি নাম। শোন জাহিন, তোর সঙ্গে বকবক করে আমার মাথা ধরে গেছে। তুই আর কোনো কথা বলতে পারবি না। আমি চা বানাব তুই চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে থাকবি।’

‘ইশারায় কি কথা বলতে পারবি?’

‘হ্যাঁ, ইশারায় বলতে পারবি।’

স্বাতী চা বানাচ্ছে। তিন কাপ চা হচ্ছে। তার জন্য, জাহিনের জন্য এবং জাহিনের বাবার জন্য। জাহিন বেচারি আসলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একবার শুধু ইশারায় বলেছে তাকে চিনি বেশি দিতে হবে। স্বাতীর মায়া লাগছে সে বলল, আচ্ছা বল, তোকে আর তিন মিনিট কথা বলার সুযোগ দেয়া গেল।

জাহিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, ‘আন্টি, তোমার সঙ্গে কি বাবার বিষে-ইচ্ছে?’

স্বাতী থতমত খেয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘হুঁ। তুই বুঝলি কী করে?’

‘বাবা বলেছে।’

‘কখন বলল?’

‘পরশুদিন রাতে।’

‘কথাটা কীভাবে বলল?’

‘বাবা বলল, তোর স্বাতী আন্টি মেয়েটা কেমনরে? আমি বললাম, খুউপ ভালো। তখন বাবা বলল, এই মেয়েটাকে আমাদের বাসায় রেখে দিলে কেমন হয়? আমি বললাম, খুব ভালো হয়। কীভাবে রাখবে? বাবা বলল, একদিন যখন বাসায় আসবে তখন দরজা-জানালা বন্ধ করে তাকে আটকে ফেলব আর যেতে দেব না। তখন আমি বুঝলাম বাবা তোমাকে বিয়ে করবে। বিয়ের কথা বলতে

লজ্জা লাগছে তো এইজন্য ঘুরিয়ে বলছে। আমার বুদ্ধি বেশি তো এজন্য ধরে ফেলেছি।’

‘বুদ্ধিমান কন্যা, এই নিন আপনার চা।’

‘থ্যাংক য়ু আন্টি।’

‘আর এই নিন আপনার উপহার।’

স্বাতী তার কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে গল্লের বই বের করল। একটা না কয়েকটা। জাহিনের চোখ চকচক করছে। মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে। স্বাতী বলল, ‘উপহার আরও আছে, এক প্যাকেট চকলেট আছে। এই চকলেটের নাম কি জানিস?’

‘না।’

‘এর নাম ‘সুইস গোল্ডবার’ আমার খুব প্রিয় চকলেট।’

‘এখন তুই বই নিয়ে পড়তে বোস। এক পাতা পড়বি, চকলেটে একটা কামড় দিবি।’

‘তুমি কি বাবার সঙ্গে গল্প করবে?’

‘হ্যাঁ।’

‘আজ তোমাকে দেখতে এত খারাপ লাগছে কেন?’

‘আজ আমার মনটা খারাপ। মন ভালো করার জন্য তোদের কাছে এসেছি।’

‘মন ভালো হয়েছে?’

‘এখনও হয় নি।’

‘বাবার কাছে গেলে মন আরও খারাপ হবে।’

‘কেন?’

‘বাবা খুব রেগে আছে। তার ছবি ভালো হচ্ছে না— এজন্য রেগে আছে। আমার সঙ্গেও গভীর হয়ে কথা বলেছে।’

‘সেটা অবশ্য একদিক দিয়ে ভালো। দু’জন মন খারাপ লোক পাশাপাশি থাকলে মন খারাপ ব্যাপারটা চলে যায়।’

স্বাতী দু’কাপ চা নিয়ে স্টুডিওতে ঢুকল। স্টুডিও অন্ধকার। জানালার দিক দিয়ে ঘরে কোনো আলো নেই। ঘরের ভেতরে সিগারেটের ধোঁয়া। কুয়াশার মতো জমে আছে। স্বাতী বলল, তুমি কোথায়?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। স্বাতী বলল, চা এনেছি।

ঘরের এক কোনা থেকে ক্লান্ত গলায় হাসনাত কথা বদল, এদিকে এসো।

হাসনাত শুয়ে আছে ক্যাম্পখাটে। এই গরমেও তাকে গায়ে চাদর। স্বাতী বলল, ‘তোমার কী হয়েছে?’

‘প্রচণ্ড মন খারাপ।’

‘কেন?’

‘তিন মাস ধরে একটা কাজ করলাম। দিনরাত কাজ করেছি। কাজটা নষ্ট হয়ে গেছে।’

‘নষ্ট হলো কীভাবে?’

‘কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। ছবি আঁকা হয়েছে। ছবিতে প্রাণ নেই।’

‘প্রাণ নেই কেন?’

‘সেটা জানি না। জানতে পারলে তো কাজই হতো। তুমি দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাছে এসো।’

স্বাতী ক্ষীণস্বরে বলল, ‘আজ আমার জন্মদিন।’

‘আমার কাছ থেকে কী উপহার চাও?’

‘এখনও বুঝতে পারছি না। সুন্দর একটা ছবি এঁকে দিতে পারো, যে ছবিতে প্রাণ আছে।’

‘প্রাণের ব্যাপারটা বাইরে থেকে আসে। আমি ইচ্ছা করলেই প্রাণ দিতে পারি না। তুমি কাছে আসছ না কেন? তোমার ভেতর কি এখনও কোনো দ্বিধা আছে?’

স্বাতী চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। ছোট নিশ্বাস ফেলে সে এগুচ্ছে। ভয়ঙ্কর একটা অন্যায় করতে যাচ্ছে। তার পেছনে ফেরার পথ নেই।



স্বাতী ফিসফিস করে বলল, এই, গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো আমার জ্বর কি-না। স্বাতীর যত উদ্ভট কথা। জহিরুল হক স্যারের ক্লাস চলছে। মাছিদের যেমন এক লক্ষ চোখ, স্যারেরও তেমনি। স্যারের মনে হয় দু’লক্ষ চোখ। কোথায় কি হচ্ছে সবই তিনি দেখেন। শুধু দেখেই ক্ষান্ত হন না, ক্যাট ক্যাট করে কথা বলেন। লিলি জ্বর দেখতে যাবে আর স্যার দারুণ অপমানসূচক কোনো কথা বলবেন না, তা কখনও হবে না। গত সপ্তাহে, দুলালী তাঁর ক্লাসে হাই তুলছিল। তিনি দুলালীর দিকে তাকিয়ে বললেন— ‘এই মেয়ে, হাই তোলার সময় মুখের সামনে বই-খাতা কিছু ধরবে। তুমি যে রকম বড় করে হাই তোলা— মুখের ভেতর দিয়ে একেবারে পাকস্থলী পর্যন্ত দেখা যায়।’

ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে হো হো করে হেসে উঠল। হাসিতে ব্যাপারটার ইতি হলে কথা ছিল— ইতি হয় নি। কয়েকটা ছেলে দুলালীকে মিস পাকস্থলী ডাকা শুরু করেছে। যতবার ডাকছে ততবারই দুলালীর চোখে পানি পড়ছে যাচ্ছে। কাজেই ছেলেরা এই ডাক সহজে ছাড়বে না। ইউনিভার্সিটিতে দুলালীকে আরও তিন বছর থাকতে হবে। এই তিন বছরে তার মিস পাকস্থলী নামে প্রায়ী হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কী ভয়াবহ সম্ভাবনা!

স্বাতী আবারও বলল, ‘এই লিলি, দেখ না আমার জ্বর আসছে কি না।’

লিলি ফিসফিস করে বলল, ‘এখন পারব না। ক্লাস শেষ হোক। তখন দেখব।’

স্বাতী বলল, ‘ক্লাস শেষ হতে হতে আমার জ্বর কমে যেতে পারে, এখনি দেখ। নাও অর নেভার।’

আর তখনই জহিরুল হক স্যার পড়া বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বললেন— ‘এই যে টু উইম্যান, দু’জনই উঠে দাঁড়াও।’

লিলির বুক ধড়ফড় করছে। স্যার কী বলেন কে জানে। ছাত্রীরা সবাই খুব আতঙ্কিত

নিয়ে তাকিয়ে আছে। স্যারের কাউকে দাঁড় করানো মানে মজাদার কিছু সময়। বিড়াল যেমন ইঁদুর মারার আগে ইঁদুর নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে, তিনিও করেন। সেই খেলা দেখতে ভালো লাগে। লিলির চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও স্বাভাবিক বেশ স্বাভাবিক। সে দাঁড়িয়েছে হাসি হাসি মুখে।

স্যার বললেন, 'তোমরা কী নিয়ে গল্প করছিলে?'

লিলির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করা হলেও জবাব দিল স্বাভাবিক গলায় বলল, 'স্যার, আমরা গল্প করছিলাম না। আমি লিলিকে বলছিলাম আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখতো জ্বর আসছে কি-না। ও রাজি হচ্ছিল না।'

'ও-টা কে?'

'ও হচ্ছে লিলি, রোল থার্ট টু।'

সবাই হেসে উঠল। জহিরুল হক স্যারের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। যে রসিকতা তাঁর করার কথা সেই রসিকতা অন্য একজন করছে, এটা হজম করা তাঁর পক্ষে মুশকিল।

'তোমার কি জ্বর নাকি?'

'বুঝতে পারছি না স্যার। রোল থার্ট টুকে বললাম দেখে দিতে। ও দেখল না।'

স্বাভাবিক ভঙ্গি করে কথা শেষ করল। সবাই আবারও হেসে উঠল। জহিরুল হক স্যারের মুখ রাগে ছাই বর্ণ হয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন কন্ট্রোল এই মুহূর্তে তাঁর হাতে নেই, পরিস্থিতি দ্রুত সামলে নিতে না পারলে ভবিষ্যতে এই মেয়ে ক্লাসে অনেক যন্ত্রণা করবে। তিনি লিলির দিকে তাকিয়ে কাঁঠন গলায় বললেন— 'এই মেয়ে, দেখো, তোমার বান্ধবীর জ্বর দেখো। কপালে হাত দিয়ে দেখো ভালো মতো।'

লিলি দারুণ অস্বস্তি নিয়ে স্বাভাবিক কপালে হাত দিল।

'কি, জ্বর আছে?'

'জি স্যার।'

'বেশি না কম?'

'মোটামুটি।'

'জ্বর নিয়ে ক্লাস করতে হবে না। যাও, চলে যাও।'

ক্লাস থেকে স্বাভাবিক বই-খাতা গুটিয়ে হাতে নিল। সে বেশ হাসিমুখে বের হচ্ছে। জহিরুল হক স্যার লিলির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমিও যাও। অসুস্থ বান্ধবীকে একা ছেড়ে দেবে, তা কি করে হয়।

স্বাভাবিক পেছনে লিলিকেও বের হতে হলো। স্বাভাবিক ওপর রাগে লিলির গা জ্বলে যাচ্ছে। কী ভয়ানক অস্বস্তির মধ্যে স্বাভাবিক তাকে ফেলল! ওর সঙ্গে চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে উঠছে।

স্বাভাবিক বলল, 'যাক, অল্পের ওপর দিয়ে পারি পাওয়া গেল। এখন কী করা যায় বল দেখি? সামথিং হাজার টু বি ডান। কিছু-একটা তো করা দরকার।'

লিলি জবাব দিল না। তাদের পরের ক্লাস বিকাল তিনটায়। মাঝখানের আড়াই ঘণ্টা কিছুই করার নেই। স্বাভাবিক বলল, 'আমার সঙ্গে চল এক জায়গায়।'

'আমি তোর সঙ্গে কোথাও যাব না।'

'দারুণ একটা জায়গায় নিয়ে যাব।'

‘বেহেশতে নিয়ে গেলেও যাব না।’

‘এই আড়াই ঘণ্টা করবি কী?’

‘যা-ই করি, তোর সঙ্গে যাব না।’

‘আমি জুরে মরে যাচ্ছি আর তুই আমাকে পরিত্যাগ করছিস। এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমার যে জুর সেটা তো মিথ্যা না।’

‘জুর নিয়ে ঘোরাঘুরিরই-বা দরকার কী? বাসায় চলে যা।’

স্বাতী নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘বাসাতেই যাব। জুর মনে হয় আরও বাড়বে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। তুই আমাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দে। না-কি তাও করবি না? বাসায় গিয়ে দুটো প্যারাসিটামল খেয়ে শুয়ে থাকব। তুই মা’র সঙ্গে গল্প করবি। ঘণ্টাখানেক রেস্ট নেয়ার পর আমার যদি শরীরটা ভালো লাগে তাহলে লাস্ট ক্লাসটা করব। কি, রাজি?’

লিলি রাজি হলো। রিকশায় বসে ছুড তুলতে তুলতে স্বাতী বলল, ‘পথে আমি এক জায়গায় জাস্ট এক মিনিটের জন্য থামব। একজনের সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা বলেই চলে আসব। তুই আমার সঙ্গে যেতে না চাইলে রিকশায় বসে থাকিস।’

রিকশায় বসে থাকার ব্যাপারটা হচ্ছে কথার কথা। লিলি খুব ভালো করেই জানে তাকেও নামতে হবে। স্বাতীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তার মনে যা আসে তা করবেই। লিলির ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছে— আজকের পুরো ব্যাপারটাই স্বাতীর সাজানো। হয়তো সে এক সপ্তাহ আগেই ঠিক করেছে— আজ জহিরুল হক স্যারের ক্লাসে একটা নাটক করে লিলিকে নিয়ে বের হয়ে আসবে...হয়তো...

স্বাতী বলল, ‘এ রকম মুখ ভোঁতা করে বসে আছিস কেন?’

‘ভালো লাগছে না।’

‘পৃথিবীতে কোন বাক্যটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় জানিস লিলি? সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বাক্য হচ্ছে— ‘ভালো লাগছে না’। ভালো লাগছে এ-রকম কথা আমরা প্রায় বলিই না।’

‘ভালো লাগার মতো কিছু ঘটে না, তাই বলি না।’

‘ভালো লাগার মতো অনেক কিছুই ঘটে। তারপরও আমরা বলি না— এই যে আজ জহিরুল হক স্যারকে কোণঠাসা করে ফেললাম— ‘তোর খুব ভালো লাগছিল কিন্তু তুই কি বলেছিস ভালো লাগছে?’

লিলি চুপ করে রইল। স্বাতী উৎসাহের সঙ্গে বলল, ‘আজ তিনটার ক্লাসটা যে আমরা করব না এটা ভেবেও তোর ভালো লাগছে। কিন্তু মুখ ফুটে তুই তা বলবি না।’

‘তিনটার ক্লাস করছি না?’

‘না?’

‘তুই না করলে না করবি। মরে গেলেও আমি ক্লাস মিস দেব না।’

স্বাতী হাসিমুখে বলল, ‘তোর সঙ্গে এক শ’ টাকা বাজি, তুই আজকের ক্লাস মিস করবি। আমি তোকে আটকে রাখব না বা কিছু করব না। তুই নিজ থেকেই বলবি— আজকের ক্লাস করব না। রাজি?’

‘আমি তোর কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছি না।’

‘বুঝতে পারছিস না কেন? আমি কখনও জটিল কথা বলি না। সহজ কথা বলি।

যারা মানুষ হিসেবে খুব জটিল তারা খুব সহজ জীবনযাপন করে, খুব সহজ কথা বলে। আমি খুব জটিল মেয়ে, এজন্যই আমার জীবনযাত্রা সহজ।’

লিলি বলল, ‘তোর ধারণা তুই জটিল মেয়ে, আসলে জটিল না। তুই সহজ ধরনের মেয়ে।’

‘তোকে যে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি সে-বাসায় পা দেয়া মাত্র তুই বুঝবি, আমি জটিল মেয়ে। সে-বাসায় একজন ভদ্রলোক থাকেন। বুড়ো বুড়ো টাইপের একটা লোক। বেঁটে-খাটো গাটাগোটা ধরনের। যার কোনো ফিক্সড ইনকাম নেই— দিনে-আনি-দিনে-খাই টাইপ মানুষ। বিপত্নীক। একটা মেয়ে আছে যে ক্লাস ফোর কিংবা ফাইভে পড়ে। মেয়ে অবশ্যি বাবার সঙ্গে থাকে না, নানার বাড়িতে থাকে। মাঝেমধ্যে বাবার কাছে আসে।’

লিলি বিরক্ত গলায় বলল, ‘ঐ ভদ্রলোকের বাসায় তুই আমাকে নিয়ে যাবি এবং সেই কারণেই তুই জটিল মেয়ে?’

‘না, আমি জটিল মেয়ে, কারণ ঐ ভদ্রলোককে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। মোটেই ঠাট্টা করছি না। সত্যি কথা বলছি। ক্রশ মাই হার্ট।’

লিলি তাকিয়ে রইল। স্বাতী যে সত্যি কথা বলছে এটা সে ধরতে পারছে। স্বাতী ঠোট সরু করে কাম সেক্টম্বরের মিউজিক আনার চেষ্টা করছে। আসছে না। সে শিস বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বলল— ‘বিয়ে কোথায় হবে, কিভাবে হবে সেটা উনি ঠিক করবেন। আজ আমাকে তা জানানোর কথা। দুপুরে ওখানে আমার খাওয়ার দাওয়াত। তুই ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে থাকতে পারিস, ইচ্ছা করলে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনটার ক্লাস করতে পারিস।’

‘ভদ্রলোক কী করেন?’

‘বললাম না দিনে আনে দিনে খায়।’

‘তার মানে কী?’

স্বাতী হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বলল, ‘জ্বরটা আরও বেড়েছে না-কি দেখ তো। মনে হয় টেনশনের জ্বর। যত টেনশন হচ্ছে তত জ্বর বাড়ছে।’

লিলি জ্বর দেখল না। তার হতভম্ব ভাব কাটছে না। কেমন ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে স্বাতী ভয়ঙ্কর কোনো বিপদে পড়ছে, অথচ সে তা বুঝতে পারছে না। স্বাতী যদি জেনেশুনে কোনো বিপদে পড়ে, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা লিলির নেই। স্বাতীকে ফেলে রেখে চলে যাবার ক্ষমতাও লিলির নেই।

কলাবাগানের এক গলির সামনে স্বাতী রিকশা থামাল। ভাড়া মিটাল। লিলির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুই ইচ্ছা করলে এই রিকশা নিয়েও চলে যেতে পারিস। চলে যাবি?’

‘না।’

‘জানতাম যাবি না। এ-রকম ভূতে-পাওয়া চেষ্টা করে আছিস কেন? সহজ হ দেখি। বিয়ে তো তোর হচ্ছে না। আমার হচ্ছে।’

তারা গেট খুলে একতলা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়িটা শেওলা ধরা, উঁচু দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের ভেতরে গাছপালা জঙ্গল হয়ে আছে। ঘাস হয়েছে হাঁটু-উঁচু। তবে বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দা তারের ঝালি দিয়ে ঘেরা। লিলি বলল, ‘বাড়িতে জনমানুষ নেই বলে মনে হচ্ছে। কত বড় ঠালা ঝুলছে দেখছিস’

স্বাতী বলল, ‘এসে পড়বে। ও জানে আমি একটার সময় আসব। একটা এখনও বাজে নি। একটা বাজতে এখনও পনেরো মিনিট।’

‘এতক্ষণ আমরা কী করব? বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব?’

‘দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, আমার কাছে চাবি আছে।’

স্বাতী হ্যান্ডব্যাগ থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে বলল— ‘আয়, ভেতরে আয়। লিলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। চাবি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। কত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তালা খুলেছে, যেন এটা তার নিজের ঘরবাড়ি। কতদিন থেকে সে স্বাতীকে চেনে। কিন্তু যাকে সে চেনে এই মেয়ে কি সেই মেয়ে!

‘লিলি, এটা হচ্ছে ওর বসার ঘর। এখানে বসবি, না ভেতরের বারান্দায় বসবি? ভেতরের বারান্দাটি খুব সুন্দর।’

লিলি জবাব দিল না। তার ঘোর এখনও কাটছে না। স্বাতী বলল, ‘আয় ভেতরে বারান্দায় গিয়ে বসি। না-কি চলে যাবি?’

‘চলে যাব।’

‘সত্যি চলে যাবি?’

‘হুঁ!’

‘আচ্ছা যা। তুই এত ভড়কে গেছিস কেন বুঝলাম না। যাই হোক, তোর নার্ভাস ভাব দেখে আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। পনেরো মিনিট বসে যা না। ও আসুক, ওকে দেখে চলে যাবি।’

‘আমি এখনই যাব।’

‘যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি তাকে চোখের দেখাও দেখবি না?’

‘আমার কাউকে দেখতে ইচ্ছা করছে না।’

‘আচ্ছা, তাহলে যা। ধরু এই নোটটা নে। তোর সঙ্গে এক শ’ টাকা বাজি ছিল।’

‘কীসের বাজি?’

‘এর মধ্যে ভুলে গেলি? বাজি ছিল না— তুই তিনটার ক্লাস করলে তোকে এক শ’ টাকা দেব। তুই ক্লাস করতে যাচ্ছিস। ইউ আর দ্য উইনার।’

‘আমি ক্লাস করব না। বাসায় চলে যাব।’

‘তাহলে তুই আমাকে এক শ’ টাকা দিয়ে যাবি। বাজি মানে বাজি...।’

স্বাতীর কথা শেষ হবার আগেই দরজার কড়া নড়ল। সামান্য কড়া নাড়ার শব্দ, অথচ লিলির মনে হচ্ছে তার বুকে কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে। স্বাতী বলল, ‘যাক ও এসে পড়েছে। তুই চলে গেলে একলা বাড়িতে আমার ভয় লাগত। এই বাড়িতে ভূত আছে। মেয়ে-ভূত। সব সময় ঘোমটা দিয়ে ঢেকে। আমি নিজে একদিন দেখেছি। ইন্টারেস্টিং স্টোরি, মনে করিয়ে দিস তোকে বলব।’

টিফিন করিয়ার হাতে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। লিলি তাঁকে কোনোদিন দেখেনি অথচ লিলির দিকে তাকিয়ে তিনি পরিচিত ভঙ্গিতে হাসলেন। সামান্যতম অবাকও হলেন না। যেন দুপুর একটায় এ বাড়িতে লিলি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

ভদ্রলোক সহজ গলায় বললেন, ‘খাবার আনতে দেরি হয়ে গেল। প্রেসক্লাবের সামনে এমন এক যানজট।’

স্বাতী বলল, ‘খাবার কোথেকে এনেছ? হোটেলের খাবার?’

‘না। সেগুনবাগিচায় আমার এক খালা থাকেন। উনাকে রোঁধে রাখতে বলেছিলাম।’

‘আচ্ছা শোনো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। ও হচ্ছে লিলি, তোমাকে অসংখ্যবার তার কথা বলেছি।’

‘হ্যাঁ বলেছ।’

স্বাতী আনন্দিত গলায় বলল, ‘লিলি সম্পর্কে তোমাকে কি বলেছি লিলিকে একটু বলো। ও শুনলে খুশি হবে।’

ভদ্রলোক আবারও লিলির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আর ঠিক তখনই লিলি এই ভদ্রলোকের আকর্ষণী ক্ষমতার কারণ বুঝতে পারল। ভদ্রলোক অসম্ভব সুন্দর করে হাসেন। তিনি শুধু চোখে-মুখে হাসেন না, সমস্ত শরীর দিয়ে হাসেন।

‘আহা বল না আমি লিলি সম্পর্কে কি বলেছি।’

‘তুমি বলেছ, লিলি কখনও মিথ্যা কথা বলে না।’

‘এটা তো বলেছিই, এটা ছাড়া আর কী বলেছি?’

‘বলেছ— লিলি হচ্ছে উপন্যাসের চরিত্রের মতো নিখুঁত ভালো মেয়ে।’

স্বাতী বিরক্তস্বরে বলল, ‘আসল কথাটা তুমি বলছ না। আসল কথাটা বলো যেটা শুনলে লিলি খুশি হবে। তুমি আসল কথা এড়িয়ে শুধু নকল কথা বলছ।’

‘ও বলেছে, পৃথিবীতে নিখুঁত সুন্দর বলে যদি কোনো মেয়ে থাকে সে লিলি।’

স্বাতী বলল, ‘আমি ঠিক বলেছি না নিজের বন্ধু বলে বাড়িয়ে বলেছি?’

ভদ্রলোক এই কথার জবাব দিলেন না। ব্যাপারটা লিলির পছন্দ হলো। লিলি যে অস্বস্তিবোধ করছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। এই অস্বস্তি তিনি আর বাড়াতে চাচ্ছেন না। সাধারণত মানুষ নিজের অস্বস্তির দিকেই লক্ষ রাখে, অন্যদের অস্বস্তির দিকে না।

লিলি বলল, ‘আমি এখন উঠব।’

ভদ্রলোক খুবই বিস্মিত হলেন। হাসির মতো তাঁর বিস্ময়ও সারা শরীরে ধরা পড়ল।

‘তুমি চলে যাবে কেন? তোমার না এখানে দুপুরে খাবার কথা। তিনজনের খাবার এনেছি।’

লিলি যা ভেবেছিল তাই। তাকে এখানে নিয়ে আসা স্বাতীর ঘৃণাপরিকল্পনার অংশ। হট করে এই ব্যাপারটা সে করে নি। ক্লাসের নাটকটায় সে হচ্ছে করেই করেছে।

ভদ্রলোক বললেন, ‘লিলি, আমি এফুনি খাবার দিয়ে দিচ্ছি। দু’মিনিটের বেশি লাগবে না। সবই গরম আছে। খেয়ে যাও।’

স্বাতী বলল, ‘তুমি খাবার বেড়ে ফেলো। ও যাবে না। দুপুর একটার সময় ও গিয়ে করবেই-বা কি। ক্লাস হচ্ছে তিনটায়। কি করে লিলি, থাকবি কিছুক্ষণ?’

‘আচ্ছা, থাকব।’

‘প্লিজ থাক। তিনজন মিলে জমিয়ে আড্ডা দেব। দু’জনে গল্প জমে না। গল্পের জন্য সব সময় তৃতীয় ব্যক্তির দরকার। তৃতীয় ব্যক্তি হলো প্রভাবক— দ্য ক্যাটালিস্ট।’

ভদ্রলোক টেবিলে খালা-বাসন রাখছেন। লিলির বোধহয় সাহায্য করা উচিত।

এই কাজগুলো সাধারণত মেয়েরাই করে। কিন্তু লিলি কিছু করল না। আগের মতোই চেয়ারে বসে রইল। তার হতভম্ব ভাব পুরোপুরি কাটে নি। সে সারাক্ষণই অবাক হয়ে স্বাতীকে দেখছে।

স্বাতী বলল, ‘গরমে আমার গা ঘামছে। ঘামা-গা নিয়ে আমি কিছু খেতে পারব না। আমি চট করে গোসল করে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি এর মধ্যে লিলিকে তোমাদের বাড়ির ঘোমটা-ভূতের গল্পটা বলো। সুন্দর করে বলবে। এক লাইনে বলবে না।’

লিলির মনে হলো- স্বাতী কি বাড়াবাড়ি করছে না? লোক-দেখানো বাড়াবাড়ি। লিলির চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যে এই বাড়ি এখন তার বাড়ি। সে এই বাড়িতে যা ইচ্ছা করতে পারে। করুক যা ইচ্ছা কিন্তু তাকে সামনে বসিয়ে কেন?

স্বাতী ভেতরের দিকে চলে গেল। ভদ্রলোক বসলেন স্বাতীর চেয়ারে। গম্ভীর গলায় বললেন— ‘লিলি, তুমি কি ঘোমটা-ভূতের গল্পটা শুনতে চাও?’

লিলি ক্ষীণস্বরে বলল, ‘বলুন।’

‘তোমার শুনতে ইচ্ছা করছে না বুঝতে পারছি। দু’জন চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে যে-কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ভালো— শোনো তাহলে, এই বাড়িটা আমার বাবার। তিনি ছিলেন একটা গার্লস স্কুলের হেডমাস্টার। খুব নীরস ধরনের মানুষ ছিলেন। আমার যখন তিন মাস বয়স তখন আমার মা মারা যান। তিনি আর বিয়ে করেন নি। মা’র মৃত্যুর পর ৩০ বছর বেঁচে ছিলেন। একাকী বেঁচে থাকা। এই ধরনের মানুষদের একসময় নানান টাইপের সমস্যা দেখা দেয়। বাবারও দেখা দিলো। তিনি একসময় বলতে শুরু করলেন— ঘোমটা পরা একটা ভূত তাঁকে বিরক্ত করে। রাতে বাবা যখন ঘুমুতে যান তখন সে আসে। খুব সাবধানে মশারি তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা চিৎকার করে উঠলে মিলিয়ে যায়। শেষের দিকে এমন হলো যে বাবা একা ঘুমুতে পারতেন না, আমাকে তাঁর সঙ্গে ঘুমুতে হতো। এই হলো ঘোমটা ভূতের গল্প।’

‘এই ভূতটাকে শুধু আপনার বাবাই দেখেছেন?’

‘না। আরও অনেকে দেখেছে। এ বাড়িতে যারা কিছুদিন থাকে বাবাই বেশি করে দেখেছে। স্বাতীও না-কি দেখেছে।’

‘আপনি ভূত-প্রেত এসব বিশ্বাস করেন না?’

‘দেখি নি তো, এজন্য বিশ্বাস করি না। দেখলে হয়তো করতাম।’

‘স্বাতীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কীভাবে?’

‘স্বাতী তোমাকে বলে নি?’

‘জি না।’

‘ওকে জিজ্ঞেস করলে ও তোমাকে সুন্দর করে বলবে। অবশ্যি সুন্দর করে বলার কিছু নেই— আমার মেয়ের মাধ্যমে ওর সঙ্গে পরিচয়।’

‘আপনাদের বিয়ে কবে হচ্ছে?’

‘সামনের সপ্তাহে— বুধবার।’

‘ও আচ্ছা।’

তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে স্বাতী বের হয়ে বলল, ‘দারুণ খিদে লেগেছে, এসো খেতে বসি। লিলি, তুই হাত-মুখ ধুবি?’

লিলি বলল, ‘না।’

স্বাতীর চুল ভেজা। শাড়ি অগোছালোভাবে পরা। সে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।
তাকে কী সুন্দর বউ-বউ লাগছে! এই নির্জন ছায়া ছায়া বাড়িটায় তাকে সুন্দর
মানিয়ে গেছে।

‘তোর খুব ক্ষিধে লেগেছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু আমি কিছু খাব না। আমি চলে যাব।’

‘এই না বললি— থাকবি।’

‘এখন আর থাকতে ইচ্ছা করছে না।’

‘আর পাঁচটা মিনিট থেকে খেয়ে গেলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়?’

‘মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। মহাভারত ঠিকই থাকে কিন্তু আমি এখন চলে যাব।’

‘যা, চলে যা।’

‘রাগ করেছিস?’

‘কথা বাড়াবার দরকার নেই— তুই চলে যা। তুমি ওকে রিকশায় তুলে দিয়ে
এসো।’

লিলি দরজার দিকে রওনা হলো।

ভদ্রলোক লিলির সঙ্গে সঙ্গে আসছেন।

রিকশা চলছে। রাস্তা খানা-খন্ডে ভরা। খুব ঝাঁকুনি হচ্ছে। লিলির মনে হচ্ছে
থেকে গেলেই হতো। স্বাতী খুব মন খারাপ করেছে। তা ছাড়া বাসায় ফিরতেও তার
ইচ্ছে করছে না। তাদের বাড়িটা কুৎসিত ধরনের বাড়ি। এই বাড়িতে বারবার ফিরে
যেতে ইচ্ছা করে না। লিলির মনে হচ্ছে তার নিজেরও জ্বর আসছে। স্বাতীর জ্বরটাই
চলে এসেছে তার গায়ে।



স্বাতীর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। পর্দা টানানো। ঘর অন্ধকার, সে অন্ধকার পর বাতি
জ্বালায় নি। নাজমুল সাহেব ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। তিনি স্বাতীর ঘরের বান্দারার
সামনে দিয়ে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করলেন। একবার ডাকলেন, ‘স্বাতী কী করছিস
মা?’

স্বাতী জবাব দিল না। নাজমুল সাহেব জবাবে জন্ম কান পেতে ছিলেন। তিনি
শুনলেন ভেতরে মিউজিক হচ্ছে। ট্রাম্পেট। স্বাতীর প্রিয় বাজনা। ট্রাম্পেট আনন্দময়
সঙ্গীত। মার্শাল মিউজিক, যে মিউজিক উৎসবের কথা মনে করিয়ে দেয়। দরজা
জানালা বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে আনন্দময় বাজনা শুনতে হবে কেন? নাজমুল সাহেব
চিন্তিত মুখে একতলায় নামলেন।

রওশন আরা রান্নাঘরে। তিনি বই দেখে একটা চাইনিজ স্যুপ তৈরি করছেন।
স্বাতী বিকেলে বলেছে তার শরীর ভালো লাগছে না, রাতে কিছু খাবে না। দুপুরেও

ভালোমতো খায় নি। ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়েছে। নাজমুল সাহেবকে রান্নাঘরে দেখে তিনি চোখ তুলে তাকালেন। রেলভারে হাড় ছড়ানো মুরগির মাংস দেয়া হয়েছে। রেল্ড করতে হবে। কড়াইয়ে সয়া সস মেশানো সবজি ফুটছে। রেল্ড করা মাংস কড়াইয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর হাতে সময় নেই। তিনি বিরক্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন।

নাজমুল সাহেব বললেন, ‘স্বাতীর কী হয়েছে বলো তো?’

‘কেন?’

‘সন্ধ্যা থেকে দেখছি— ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। ঘরে বাতি জ্বালে নি।’

রওশন আরা বললেন, ‘মাথা-টাথা ধরেছে। শুয়ে আছে।’

‘কিছুদিন থেকেই তার মধ্যে অস্থির ভাবটা লক্ষ করছি।’

‘এই বয়সে অস্থির ভাব আসে। আবার চলে যায়। এটা কিছু না।’

নাজমুল সাহেব চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। রওশন আরা বললেন, ‘তুমি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে থেক না। আমি কাজ করছি।’

‘কাজ করো। তোমার কাজ তো আমি নষ্ট করছি না।’

‘করছ। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে আমি রান্নাবান্না করতে পারি না।’

নাজমুল সাহেব বের হয়ে এলেন। আবার দোতলায় গেলেন। সন্ধ্যা থেকে তাঁর নিজেরও খুব একা একা লাগছে। স্বাতীর সঙ্গে গল্প করতে পারলে ভালো লাগত। সবচেয়ে ভালো হতো স্বাতীকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে। বেড়ানোর জায়গা তেমন নেই। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা সীমিত। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও যোগাযোগ নেই। তিনি কোথাও যান না। কেউ এলে আনন্দিত হন না। বিরক্তবোধ করেন। সারাজীবন কোর্টে বিচারকের চেয়ারে বসার এই হলো কুফল। এই চেয়ার মানুষের ভেতর থেকে মানবিক গুণ আন্তেআন্তে শুষে নিয়ে যায়। মানুষটা আর পুরোপুরি মানুষ থাকে না। মানুষের ছায়া হয়ে যায়।

তিনি স্বাতীর ঘরের দরজায় হাত রেখে ডাকলেন, ‘স্বাতী মা, কী করছিস?’

‘কিছু করছি না বাবা। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছি।’

‘কেন?’

‘এম্মি।’

‘তোর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা যাবে?’

‘হ্যাঁ যাবে।’

স্বাতী দরজা খুলে দিল। মিউজিক সেন্টারের নব ঘনিয়ে শব্দ কমিয়ে দিয়ে হাক্কা গলায় বলল, ‘তোমাকে গল্প করতে হবে অন্ধকারে বসে। অসুবিধা হবে না তো বাবা?’

‘না। ঘর অন্ধকার কেন?’

‘কেন জানি আলো চোখে লাগছে। বাবা তুমি খাটে এসে পা তুলে বসো। কী নিয়ে গল্প করতে চাও?’

‘তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?’

‘মোটামুটি। ভালো না।’

‘ভালো না কেন?’

‘স্যাররা ইন্টারেস্টিং করে পড়াতে পারেন না। একঘেয়ে বক্তৃতা দেন। গুনতে ভালো লাগে না। ক্লাসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতেই আমার বেশি ভালো লাগে। স্যার বক্তৃতা করেন, আমরা মজার মজার নোট নিজেদের মধ্যে চালাচালি করি।’

‘তোর কি অনেক বন্ধু-বান্ধব?’

‘আমার একজনই বন্ধু?’

‘লিলি?’

‘হ্যাঁ লিলি।’

‘ওকে তোর এত পছন্দ কেন?’

‘বাবা ও খুব বিশ্রী পরিবেশে বড় হচ্ছে— তারপরেও সে বড় হচ্ছে নিজের মতো করে। ও হচ্ছে এমন একটা মেয়ে যে জীবনে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলে নি।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ তাই। ও কেমন মেয়ে তোমাকে বুঝিয়ে বলি বাবা— ধরো, আমি ভয়ঙ্কর কোনো অন্যায় করলাম, তোমরা সবাই আমাকে ত্যাগ করলে। ও তা করবে না। ও আমার পাশে থাকবে।’

‘তুই কি কোনো অন্যায় করেছিস?’

‘না।’

‘তোর কি কোনো সমস্যা হয়েছে? তুই কি কোনো সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘সমস্যাটা কী?’

‘আমার সমস্যা আমি নিজেই মিটাতে চাচ্ছি। এইজন্য তোমাদের বলতে চাচ্ছি না। তেমন বড় কিছু সমস্যা না। সমস্যা যদি খুব বড় হয়ে দেখা দেয় তখন তোমাদের বলব।’

নাজমুল সাহেব অত্যন্ত চিন্তিতবোধ করছেন। স্বাতীর ব্যাপারটা তিনি ধরতে পারছেন না। তিনি অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে মেয়েকে টেনে নিয়ে কোমরে গলায় বললেন, ‘মা শোন! আমি তো পুরনো দিনের মানুষ। তোদের এ-কালের সমস্যার ধরন-ধারণ আমি জানি না। তারপরেও বলছি, তোর সমস্যা মেটাতেই চেষ্টার জুটি আমার দিক থেকে কখনও হবে না। মনে করা যাক তুই একটি ছেলেকে পছন্দ করেছিস, যাকে আমাদের পছন্দ না। যাকে কিছুতেই আমরা গ্রহণ করতে পারছি না— তারপরেও আমরা তোর মুখের দিকেই তাকাব।’

‘সেটা আমি জানি।’

‘তাহলে তুই এমন ঘর-দুয়ার অন্ধকার করে দিস আছিস কেন?’

‘বাতি জ্বালাব?’

‘হ্যাঁ।’

স্বাতী বাতি জ্বালাল। বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। নাজমুল সাহেব হাসিমুখে বললেন, ‘তোর কালেকশনে কোনো নাচের মিউজিক আছে?’

‘আছে।’

‘তাহলে সুন্দর একটা নাচের মিউজিক দে তো মা। ছোটবেলার ঐ নাচটা দেখাবি? মাই লিটল ড্যান্সার— ছোট নর্তকী।’
স্বাতী হাসছে। নাজমুল সাহেব হাসছেন।



আজ স্বাতীর বিয়ে। গোপন বিয়ে। অল্প কয়েকজন শুধু জানে। লিলি সেই অল্প কয়েকজনের একজন। সে স্বাতীদের বাসার সামনে ভয়ে ভয়ে রিকশা থেকে নামল। তার হাত-পা কাঁপছে। সে রিকশা থেকে নেমে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আজ স্বাতীদের বাসা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

লিলির স্বপ্নের বাড়ির সঙ্গে স্বাতীদের বাড়িটার খুব মিল আছে। শুধু একটাই অমিল, লিলির স্বপ্নের বাড়ি একতলা, স্বাতীদেরটা দোতলা। স্বাতীদের বাড়ির ছাদে ওঠার ব্যবস্থা নেই— সিঁড়িঘর করা হয় নি। আর লিলির স্বপ্নের বাড়িতে ছাদটাই প্রধান। সেই ছাদে একটা সিঁড়িঘর আছে। এই দুটি অমিল ছাড়া আর কোনো অমিল নেই।

স্বাতীর বাবা লিলির কল্পনার বাবার চেয়েও ভালো। তিনি রিটারার করে ঘরে আছেন। সারাক্ষণই কাজ নিয়ে থাকেন। লিলি কখনও তাঁকে কাজ ছাড়া বসে থাকতে দেখে নি। হয় বাগানে কাজ করছেন, নয় কাঠের কাজ করছেন। মুখে কোনো বিরক্তি নেই। স্বাতীর কোনো বন্ধু-বান্ধবকে দেখলে এত আগ্রহ করে কথা বলেন। হেন-তেন কত রসিকতা। আর লিলির বাবা লিলির বন্ধুদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকান। ভাবটা এ-রকম— এরা কেন এসেছে? কী চায়? লিলির বন্ধুরা যদি বলে— ম্লামালিকুম চাচা। তাহলে তিনি বিরক্ত মুখে বলেন— হুঁ। বলেই ওদের সামনেই নাক ঝাড়েন। নাক ঝাড়ার ব্যাপারটা দু’মিনিট পরেও করতে পারেন, তা করবেন না। মাঝে মাঝে লিলির মনে হয় ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত।

লিলি আজ স্বাতীদের বাড়িতে ঢুকল ভয়ে ভয়ে। স্বাতীর বাবা নাজমুল সাহেবের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। যদি তিনি বলেন এত সেজেগুজে বের হয়েছ— কী ব্যাপার? তাহলে লিলি কী বলবে? তাঁকে নিশ্চয়ই বলা যাবে— আজ আপনার মেয়ে গোপনে বিয়ে করবে। আমি তাকে নিতে এসেছি।

লিলি কিছু না বললেও একদিন তো সব জানাশুনা হবে। তখন যদি লিলির সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তিনি বলেন— মা, তুমি কি এত স্নেহ করি আর এত বড় একটা ঘটনা সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছুই বললে না? এটা তো মা তোমার কাছ থেকে আশা করি নি।

নাজমুল সাহেব বসার ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে বসেছেন। কেরোসিন কাঠ দিয়ে বক্সজাতীয় কি যেন বানাচ্ছেন। কাঠমিস্ত্রীদের মতো তাঁর কানে পেনসিল গোঁজা। হাতে ছোট্ট একটা করাত। লিলিকে দেখে তিনি হাসিমুখে বললেন, ‘কেমন আছ গো লিলি মামণি?’

লিলি বলল, 'ভালো। কী বানাচ্ছেন চাচা?'

'আগে বলব না। বানানো হোক তারপর সবাইকে চমকে দেব।'

'স্বাতী কি বাসায় আছে?'

'হ্যাঁ আছে। মেয়েটির কোনো সমস্যা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। খুব অস্থির। অকারণে একবার দোতলায় যাচ্ছে— একবার নামছে। সকালে নাশতা খায় নি— শরীর নাকি ভালো না। তোমাদের কি কোথাও যাবার কথা?'

স্বাতী জবাব দিল না। তার বুক টিপ টিপ করছে। বেশিক্ষণ জেরা করলে সত্যি কথা বলে ফেলবে। নাজমুল সাহেব বললেন, 'সোজা দোতলায় উঠে যাও মা। ও ঘণ্টাখানেক ধরে দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যাবার আগে আরেকটা কাজ করতে পারবে মা?'

'অবশ্যই পারব।'

'রান্নাঘরে গিয়ে তোমার চাচিকে বলো আমাকে এক কাপ চা দিতে। কড়া করে যেন বানায়।'

লিলি রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো। স্বাতীর মা রওশন আরা লিলির দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যেন লিলি তাঁরই একটা মেয়ে। অন্যের মেয়েদের দিকে এমন আপন করে তাকানো যে কত বড় গুণ তা-কি এই মহিলা জানেন?

লিলি বলল, 'চাচি খুব কড়া করে এক কাপ চা চাচাকে দিন।'

রওশন আরা বললেন, 'আচ্ছা দিচ্ছি। তোমাকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছে বলেই দিচ্ছি। তোমার চাচার চা নিষেধ হয়ে গেছে। ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। চিনি একেবারেই বন্ধ। আর এদিকে তার ঘনঘন চা খাবার অভ্যাস। শুধু লিকার হলে কথা উঠে— একগাদা চিনি দিয়ে চা বানাতে হয়।'

'বাজারে স্যাকারিন জাতীয় কি নাকি পাওয়া যায় চাচি?'

'পাগল হয়েছে, তোমার চাচা খাবে স্যাকারিনের চা? মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দেবে না? দিয়ে দেখেছিলাম। লিলি তুমি কী খাবে বলো?'

'আমি কিছু খাব না চাচি।'

'বললেই হবে? তুমি আজ সারাদিন থাকো। দুপুরে খেয়েদেয়ে অবশ্যই যাবে। স্বাতীর কি হয়েছে তুমি কিছু জানো লিলি?'

লিলি শঙ্কিত গলায় বলল, 'কেন চাচি।'

'ও কাল রাত থেকে কেমন ছটফট করছে। সকালেও কিছু খায় নি। আমাকে কিছু বলল না। তুমি জিজ্ঞেস করো তো ব্যাপার কী?'

'আচ্ছা চাচি, আমি জিজ্ঞেস করব।'

লিলি দোতলায় উঠে গেল। দোতলার টানা বারান্দার শেষ মাথায় স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে। লিলিকে তার দিকে আসতে দেখেও সে পাল্টে না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবে দাঁড়িয়ে রইল। লিলি যখন ডাকল, এই স্বাতী! তখনই সে নড়েচড়ে উঠল। গলায় বলল, 'তুই এত সুন্দর শাড়ি কবে কিনলি? আগে দেখি নি তো? তোকে এত লাগছে। মনে হচ্ছে কুইন অব সেবা।'

লিলি হকচকিয়ে গেল। স্বাতীর ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না। কেমন পাগলি-

চেহারা। মনে হচ্ছে দু'দিন চুলে চিরুনি দেয় নি, চুল জট ধরে আছে।

নিচে কালি। কিছুক্ষণ আগে মনে হয় পান খেয়েছে। দাঁত লাল হয়ে আছে।

পরে আছে সাধারণ একটা শাড়ি। লিলি বলল, ‘তুই এখনও রেডি হোস নি? সাড়ে এগারোটা বাজে। আমাদের না বারোটোর মধ্যে যাবার কথা?’

স্বাতী এমনভাবে তাকাল যেন লিলির কথা বুঝতে পারছে না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ‘মিষ্টি পান খাবি লিলি? আমার ছোট মামা কলকাতা থেকে এক গাদা মিষ্টি পান প্যাকেট করে নিয়ে এসেছে। আচ্ছা বল দেখি মিষ্টি পান কোনো আনার জিনিস? আমি অবশ্যি একটার পর একটা পান খেয়ে যাচ্ছি। দেখ, পান খেয়ে দাঁতের কী অবস্থা করেছে!’

লিলি বলল, ‘তোর ব্যাপারটা কী? আজ না তোর বিয়ে। ভুলে গেছিস?’

স্বাতী হাসল। লিলি বলল, ‘এ রকম অদ্ভুত করে হাসছিস কেন?’

‘একটা ব্যাপার হয়েছে। আয় ঘরে আয়, বলছি।’

স্বাতী হাত ধরে লিলিকে তার ঘরে নিয়ে গেল। চাপা গলায় বলল, ‘চুপ করে বোস। আমি আসছি। এক্ষুনি আসছি। তোকে এই শাড়িটাতে দারুণ লাগছে। দাম কত নিল? এক হাজারের উপরে নিশ্চয়ই।’

‘পনেরো শ’।

‘দাম বেশি নিয়েছে। তবু সুন্দর। আমায় গায়ের রঙ তোর মতো ফর্সা হলে আমিও কিনতাম।’

‘তোর ব্যাপারটা কি আগে শুনি।’

স্বাতী প্রায় ফিসফিস করে বলল, ‘আমি ঠিক করেছি যাব না।’

‘কখন ঠিক করলি?’

‘কাল রাতে। ঠিক এগারোটোর সময়। সারারাত আর ঘুম হয় নি। তাকিয়ে দেখ এক রাতে চোখে কালি পড়ে গেছে। সকালে এমন মাথা ঘুরছিল, মনে হচ্ছিল পড়ে যাব।’

‘হঠাৎ এ-রকম ডিসিশান নিলি কেন?’

স্বাতী আঙুল দিয়ে শাড়ি পেঁচাচ্ছে। খুব যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেছে।

‘কথা বলছিস না কেন?’

‘মন স্থির করতে পারছি না।’

‘বিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছিস?’

স্বাতী জবাব দিল না। আঙুলে চুলের জট সারাবার চেষ্টা করতে লাগল। লিলি বলল, ‘উনাকে জানিয়েছিস?’

‘কাকে? হাসনাতকে?’

‘হুঁ।’

‘না।’

‘উনি তো বসে অপেক্ষা করতে থাকবেন।’

স্বাতী বলল, ‘দাঁড়া তোর জন্য মিষ্টি পান নিয়ে আসি।’

‘মিষ্টি পান আনতে হবে না। তুই বোস।’

স্বাতী বলল, ‘আমার মনে হয় জ্বর এসেছে, দেখ তো গায়ে হাত দিয়ে।’

লিলি স্বাতীর কপালে হাত দিল। কপাল ঠাণ্ডা, জ্বর নেই। স্বাতী বলল, ‘লি। তুই আসায় খুব ভালো হয়েছে। আমি একটা চিঠি লিখে রেখেছি, ওর হাতে দি। চিঠিতে শুছিয়ে সবকিছু লেখা আছে।’

‘আমি কোনো চিঠি দিতে পারব না। তোদের এই হাইড্রামার মধ্যে আমি নেই। আমি এফুনি বিদেয় হচ্ছি।’

‘আচ্ছা থাক, চিঠি দিতে হবে না। মুখে বলবি। বলবি আমার ভয়ঙ্কর জ্বর। উঠে বসার উপায় নেই। বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছি। মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। জ্বরটা কমলেই আমি এসে সব গুছিয়ে বলব।’

লিলি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘আমি এসব কিছুই বলতে পারব না। আমি বাসায় যাচ্ছি।’

স্বাতী হাত ধরে লিলিকে বসিয়ে দিল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ‘তোর পায়ে ধরছি লিলি তুই গিয়ে বল। তুই তো আবার সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলতে পারিস না। আচ্ছা সত্যি কথাটাই বল।’

‘সত্যি কথাটা কী?’

স্বাতী নিচু গলায় বলল, ‘সত্যি কথাটা হচ্ছে আমি ওকে বিয়ে করব না। দ্য গেম ইজ ওভার।’

লিলি হতভম্ব গলায় বলল, ‘উনার অপরাধটা কী?’

‘কোনো অপরাধ নেই। আমি অনেক চিন্তাচিন্তা করে বের করেছি— ওকে আমার পছন্দ হয় নি। ওর সংসার পছন্দ হয়েছে, ওর মেয়েটা পছন্দ হয়েছে, ওর ছবি পছন্দ হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম মানুষটাকে ভালোবাসতে।’

‘চা খাব না।’

‘আহ খা-না কতক্ষণ লাগবে চা খেতে। আমি যাব আর আসব। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি? মা বড়া ভাজছে’

স্বাতী চা আনত গেল। গেল যে গেল আর আসার নাম নেই। অস্বস্তি নিয়ে লিলি অপেক্ষা করছে। সে বুঝতে পারছে না এখান থেকে বাসায় চলে যাবে, না কাজী অফিস হয়ে যাবে। উনার সঙ্গে তার পরিচয় এমন না যে নানান সান্ত্বনার কথাটথা বলে বিয়ে ভাঙার খবর দেবে। একদিনই সামান্য কথা হয়েছে। মানুষটাকে গম্ভীর ধরনের মনে হয়েছে। তবে অপছন্দ হয় নি। ভালো মানুষ বলে মনে হয়েছে। লিলি তাকে ঠিক করে বলবে— ‘স্বাতী ঠিক করেছে আপনাকে বিয়ে করবে না। দ্য গেম ইজ ওভার।’

স্বাতী প্লেটভর্তি বড়া আর চা নিয়ে এল। হাসিমুখে বলল, ‘একেবারে আগুন গরম। কড়াই থেকে নামিয়ে এনেছি। ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খাও আরেকটু ঝাল হলে ভালো হতো। ভাজাভুজি ঝাল না হলে ভালো লাগে না।’

স্বাতী এখন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে। শব্দ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। পা নাচাচ্ছে। তার পা নাচানোর বিশী অভ্যাস আছে।

লিলি বলল, ‘আমি উঠি?’

স্বাতী বলল, ‘চল আমি তোকে রিকশায় তুলে দিয়ে আসি।’

‘রিকশায় তুলে দিতে হবে না।’

‘আহা চল না।’

রিকশায় তুলে দেবার কথা বলেও বসার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে স্বাতী থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমার এখন আর তোকে এগিয়ে দিতেও ইচ্ছা করছে না— তুই একাই যা।’

স্বাতী বসার ঘরে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে তাকে কেমন ক্লান্ত এবং হতাশ লাগছে। লিলির মনে হলো এখন সে যদি একবার বলে— মন থেকে এসব ঝামেলা দূর করে চল তো আমার সঙ্গে। মানুষটা খারাপ না। বিয়ে করে তুই সুখী হবি। তাহলে স্বাতী বলবে— ‘আচ্ছা একটু দাঁড়া আমি কাপড় বদলে আসি।’

লিলি দেখল স্বাতীর চোখে পানি এসে গেছে। স্বাতীর বড় বড় চোখ। চোখভর্তি পানি। কী সুন্দর যে লাগছে!

মগবাজার কাজী অফিসের সামনে হাসনাত দাঁড়িয়ে আছে। সে একা না। তার সঙ্গে তিন/চারজন বন্ধুবান্ধব আছে। তাদের মুখ হাসি হাসি হলেও একধরনের চাপা টেনশন টের পাওয়া যায়। প্রত্যেকের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। প্যাকেট খুলে সবাই নিশ্চয়ই একসঙ্গে ধরিয়েছে।

হাসনাতের চুল সাধারণত এলোমেলো থাকে। আজ সুন্দর করে আঁচড়ানো। তাড়াহুড়া করে শেভ করায় খুতনির কাছে গাল কেটেছে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে। তার পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি স্বাতীর দেয়া উপহার। পাঞ্জাবি মাপমতো হয় নি, বড় হয়েছে। মৌলানাদের পাঞ্জাবির মতো লাগছে। হাসনাতকে কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

লিলি রিকশা থেকে নামতেই সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকাল। হাসনাত একটু এগিয়ে এসে বলল, ‘আমার কাছে ভাংতি আছে ভাড়া দিচ্ছি— তুমি ভেতরে চলে যাও লিলি। ভেতরে আমার বড় খালা আছেন। তুমি দেরি করলে কেন?’

লিলি কি বলবে চট করে বুঝে উঠতে পারল না। হাসনাত রিকশা ভাড়া দিতে দিতে বলল ‘তোমার বান্ধবী অবশ্যি এখনও আসে নি। দেরি করছে কেন বুঝলাম না।’

লিলি বলল, ‘হাসনাত ভাই, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।’

‘বলো কী ব্যাপার?’

লিলি ইতস্তত করছে। কথাটা বলার জন্য একটু ফাঁকা জায়গা দরকার। রাস্তার উপরে ফাঁকা জায়গা কোথায়?

হাসনাত বিস্মিত হয়ে বলল, ‘জরুরি কোনো কথা?’

‘জি।’

‘এসো রাস্তা ক্রস করে ঐ মাথায় যাই। তোমার বলতে কি সমস্যা লাগবে?’

‘জি না।’

তারা রাস্তা পার হলো। লিলির খুব খারাপ লাগছে। কথাটা শুনে উনি কি করবেন সে অনুমান করতে পারছে না। রেগে যাবেন না তো?

‘লিলি বলো।’

লিলি ক্ষীণস্বরে বলল, ‘আমি এখানে আসছি আগে স্বাতীর বাসা হয়ে এসেছি। আমার কথা ছিল আমি স্বাতীকে নিয়ে আসব। স্বাতী আমাকে বলেছে আপনাকে যেন বলি, সে আসতে পারবে না।’

হাসনাত তাকিয়ে আছে। লিলি চোখ নামিয়ে নিল। তার যা বলার সে বলে ফেলেছে। আর কি বলবে বুঝতে পারছে না।

‘স্বাতী আসবে না?’

‘জি না।’

‘ও, আচ্ছা।’

‘তোমার কাছে কি চিঠিপত্র কিছু দিয়েছে?’

‘জি-না।’

লিলি বলল, ‘আমি চলে যাই।’

‘এসো রিকশা করে দি। এখানে রিকশা পাওয়া মুশকিল।’

লিলি ভেবেছিল তার কথা উনি বিশ্বাস করবেন না। নানান প্রশ্ন-উত্তর করবেন। সে-রকম কিছু হলো না। হাসনাত লিলির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। লিলির বলতে ইচ্ছে করছে, আপনি চলে যান আপনাকে রিকশা ঠিক করে দিতে হবে না। আমি ঠিক করে নেব।

এতগুলো কথা বলার মতো শক্তি এখন তার নেই। মানুষটা যে রিকশার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে এটা একদিক দিয়ে ভালোই। তিনিও চিন্তা করার সময় পাচ্ছেন। তাঁকে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের ব্যাপারটা বলতে হবে। কি বলবে এটা ভাবার জন্যও সময় দরকার।

রিকশা না, বেবিট্যাক্সি পাওয়া গেল। হাসনাত দরদাম করে ভাড়া ঠিক করল। মগবাজার থেকে রাজিয়া সুলতানা রোড। কুড়ি টাকা। লিলির একটু আশ্চর্য লাগছে এ-রকম অবস্থায় কেউ বেবি ট্যাক্সিওয়ালাসহ সঙ্গে দরদাম করতে পারে। বেবিট্যাক্সি ভাড়াও হাসনাত ট্যাক্সিওয়ালাসহ হাতে দিয়ে দিলো দুটো চকচকে দশ টাকার নোট। মনে হয় বিয়ে উপলক্ষে কিছু চকচকে নতুন নোট ভদ্রলোক যোগাড় করেছেন।

বিদায় নেবার আগেই বেবিট্যাক্সিওয়ালা হস করে বের হয়ে গেল।

হাসনাতের হাতের সিগারেট নিভে গেছে। সে পান-সিগারেটের দোকান থেকে দেশলাই কিনে সিগারেট ধরাল। সে কাজী অফিসের দিকে যাচ্ছে।

লিলির নিজেদের বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। নতুন কোনো জায়গায় যেতে ইচ্ছে করছে। শান্ত নিরিবিলি ধরনের কোনো জায়গা। হইচই টেঁচামেটি নেই, ছায়া ছায়া ধরনের কোনো জায়গা। যেখানে প্রচুর গাছপালা। গাছপালায় ভিড়ের ছোট্ট একটা বাড়ি। বাড়ির খুব কাছেই নদী। নদীতে নৌকা-টোকা কিছু নেই। শুধুই নদী। কিংবা পুকুরও থাকতে পারে। বড় পুকুর, যার পানি কাচের মতো। এত সুন্দর সেই পানি যে, দেখলেই গায়ে-মাথায় মাখতে ইচ্ছা করে। নদীতে ঘাটটা থাকবে মারবেল পাথরে বাঁধানো।

সে তার স্বপ্নের বাড়ি নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাবল কিন্তু তার আগেই বাসার কাছে চলে এল। তার মনটা গেল খারাপ হয়ে। কী বিশেষ একটা বাড়ি! সদর দরজাটা খোলা। যার ইচ্ছা ভেতরে ঢুকছে। যার ইচ্ছা বের হচ্ছে।

একবার এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইতে একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। আজও দু’জন ফকিরণীকে দেখা গেল বারান্দায় বসে জমিয়ে গল্প করছে। দু’জন দু’জনের মাথার উকুন বাছছে। লিলিকে দেখে তারা এমনভাবে তাকাল যেন লিলি বাইরের একটা মেয়ে বিনা অনুমতিতে তাদের ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

একতলার বারান্দায় লিলি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ির পরিস্থিতি বোঝার জন্য এটা দরকার। কাজের বুয়া এক গাদা কাচের বাসন নিয়ে কলঘরের দিকে

যাচ্ছে। এক্ষুনি সে একটা-কিছু বনবান করে ভাঙবে। বাসন ভাঙা তার হবি। রোজই ভাঙে। লিলি বলল, 'বুয়া, মা কোথায়?'

'উপরে।'

'কী করছে?'

বুয়া নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'ছোট দুই আফারে দরজা বন্ধ কইরা মারতাকে।'

আশ্চর্য কাণ্ড! বড় বড় দুটো মেয়েকে দরজা বন্ধ করে মারা হচ্ছে— এটা যেন খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা।

'আফনেরে আইজ সুন্দর-মুন্দর লাগতাকে।'

'তুমি তোমার কাজে যাও বুয়া।'

লিলি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। মার হাত থেকে রুমু রুমুকে উদ্ধার করবে কি না বুঝতে পারছে না। আর ভালো লাগে না। দরকার কি উদ্ধার করার। যা ইচ্ছা হোক। লিলি নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে— ফরিদা তখন বের হয়ে এলেন। মেয়েদের শাস্তি দিয়ে তিনি খানিকটা ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছেন। লিলিকে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'ঐ মেয়েটা বার-বার টেলিফোন করছে।'

'কোন মেয়েটা?'

'ঐ যে শ্যামলা মতো— কি যেন নাম। তোর কাছে প্রায়ই আসে।'

'স্বাতী?'

'হুঁ। বলেছে খুব জরুরি।'

'তুমি কি আবার রুমু রুমুকে মারছিলে?'

'না মেরে করব কী?'

ফরিদা নিচে নেমে গেলন। কাউকে ফার্মেসিতে পাঠিয়ে তুলা স্যাভলন আনাতে হবে। মার খেয়ে রুমুর ঠোট কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।

টেলিফোন বাবার ঘরে। তিনি ঘরে নেই কাজেই ঘরে ঢুকে টেলিফোন করা যায়। বাবা থাকলে টেলিফোনের দশ গজের ভেতর যাওয়া যায় না। লিলি টেলিফোন করবে কি করবে না বুঝতে পারছে না। স্বাতীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। কথা না বলেও উপায় নেই। স্বাতী কিছুক্ষণ পর-পর টেলিফোন করে যাবে। তারচেয়ে কথা বলে ঝামেলা চুকিয়ে দেয়াই ভালো।

স্বাতী মনে হয় টেলিফোন সেট কোলে নিয়েই বসে ছিল। সিঁই হওয়া মাত্র স্বাতী বলল, 'কেমন আছিসরে লিলি?' সে ধরেই নিয়েছে লিলির টেলিফোন। লিলি শুকনো গলায় বলল, 'ভালো।'

'গিয়েছিলি?'

'কোথায় যাব?'

'কাজী অফিসে।'

'কাজী অফিসে আমার তো যাবার কথা না।'

'তারপরেও তো গিয়েছিলি। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ব্যাপারটা শুছিয়ে বলেছিস তো?'

'শুছিয়ে বলার কি আছে? তুই আসবি না— সেটা বললাম।'

'কীভাবে বললি?'

'সাধারণভাবে বলেছি। আমি তো আর তোর মতো নাটক করতে পারি না'
 'সাধারণভাবে মানে কী? এ্যাকজাক্ট ডায়ালগ কী?'
 'আমার মনে নেই।'
 'আমি যাব না এটা শোনার পর সে কী করল?'
 'কিছু করে নি।'
 'আচ্ছা, তুই ভালোমতো ব্যাপারটা বল না— এ-রকম করছিস কেন?'
 'ভালোমতো বলার কিছু নেই। আমি যা বলার বললাম, বেবিট্যাক্স নিয়ে চলে
 এলাম।'
 'তার রিএ্যাকশান কী ছিল?'
 'কোনো রিএ্যাকশান ছিল না।'
 'তুই ঠিকমতো বলতে পারছিস না। ওর গায়ে কী ছিল?'
 'এত খেয়াল করি নি।'
 'শার্ট ছিল, না— পায়জামা-পাঞ্জাবি ছিল?'
 'পায়জামা-পাঞ্জাবি।'
 'ক্রিম কালারের পাঞ্জাবি।'
 'ক্রিম কালারের পাঞ্জাবি? গলার কাছে হাতের কাজ?'
 'বললাম তো, আমি এত খেয়াল করি নি।'
 'এ পাঞ্জাবিটা আমি প্রেজেন্ট করেছিলাম। আড়ং থেকে কিনেছি— নয় শ' টাকা
 দাম নিয়েছে।'
 'টেলিফোন রাখি স্বাতী?'
 'আরে না, টেলিফোন রাখবি কি? আমি তো কথাই শুরু করি নি। আর কে কে
 এসেছিল।'
 'জানি না আর কে কে এসেছিল।'
 'ওর খালা এসেছিল?'
 'হুঁ।'
 'সুস্মিতা এসেছিল?'
 'সুস্মিতা কে আমি জানি না।'
 'সুস্মিতা ওর দূর সম্পর্কের মামি। আমার কি ধারণা জার্মানি? আমার ধারণা
 সুস্মিতার সঙ্গে ওর এক ধরনের সম্পর্ক আছে। তেমন কিছু না, প্লেটোনিক টাইপ।
 ওর সবকিছুতে কেউ থাকুক বা না থাকুক সুস্মিতা থাকবেই। কী কুৎসিত একটা
 মেয়ে চিন্তা কর— হাজব্যান্ড আছে, ছেলেমেয়ে আছে তার বড় মেয়ে হলিক্রস
 গ্রেজে এবার ইন্টারমিডিয়েট দিচ্ছে।'
 'তোর বকবকানি শুনে ভালো লাগছে না স্বাতী।'
 'তুই কি বাসায় থাকবি?'
 'বাসায় থাকব না তো যাব কোথায়?'
 'আমি তাহলে চলে আসি।'
 'না।'
 'না কেন?'
 'আমার বাসায় কেউ এলে আমার ভালো লাগে না।'

‘ভালো না লাগলেও আসছি। অনেক কথা আছে।’

‘প্লিজ, আসিস না। কাল তো ইউনিভার্সিটিতে দেখা হবেই।’

‘কাল ইউনিভার্সিটিতে দেখা হবে না। কারণ, কাল আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি না। কাজেই আজই দেখা হবে। আমি সন্ধ্যার পর আসব। বাবার কাছ থেকে গাড়ি ম্যানেজ করেছি। ছ’টা থেকে ন’টা— এই তিন ঘণ্টার জন্য গাড়ি পাওয়া গেছে। আমি কিন্তু আসছি সন্ধ্যার পর।’

‘না এলে হয় না?’

‘হবে না কেন হয়— তবে এলেই ভালো হয়।’

টেলিফোন রেখে লিলি দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তখনই কলঘর থেকে বনবন শব্দ। বুয়া কিছু ভেঙেছে। মা’র চিৎকারে এখন কান ঝালাপালা হয়ে যাবার কথা— চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। কেন শোনা যাচ্ছে না। এই রহস্য লিলির কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। সে দেখল ফরিদা ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছেন। তাঁর হাতে তুলা-স্যাভলনের শিশি। তিনি উদ্ভিন্ন গলায় বললেন, ‘লিলি তুই ঝুমুকে একটু ডাক্তারখানায় নিয়ে যা তো।’

‘কেন?’

‘ঠোঁট কেটে গিয়েছে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।’

‘খুব বেশি কেটেছে?’

‘খুব বেশি না। অল্প, কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। কামিজ রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।’

‘বলো কি!’

‘আমি কামিজ বদলে দেই, তুই ওকে নিয়ে যা।’

‘ঝুমু কোথায়?’

‘নিচে।’

ঝুমুকে দেখে লিলি হতভম্ব। আসলেই রক্তে সব ভেসে যাচ্ছে। তুলা ঠোঁটে চেপে বিব্রত ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই ঝুমু। তাকেও বিব্রত মনে হচ্ছে। লিলি বলল, ‘তোরা কি করেছিস যে মা এমন করে মারল?’

‘দু’জনই একসঙ্গে হাসল। লজ্জার চাপা হাসি।

কলতলায় আবার বনবন শব্দ। বুয়া আরেকটা কিছু ভেঙেছে। প্রথমবার ভাঙার কোনো রিএ্যাকশান হয় নি বলে বোধহয় দ্বিতীয়বার ভাঙা। এবার রিএ্যাকশান হচ্ছে— ফরিদা চোঁচাতে চোঁচাতে নামছেন।

ঝুমুর কামিজ বদলানো হয়েছে। কামিজ কাঁধের কাছে অনেকখানি ছেঁড়া। ফরিদা বললেন, ওড়না দিয়ে ঢেকে চলে যা। ঝুমু হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল, কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই। ঝুমু বলল, আমিও ঝুমুর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাব। ফরিদা তীব্র গলায় বললেন, জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলব। আর যেন কখনও দু’জনকে একত্রে না দেখি।

লিলি বলল, ‘মা ওরা করেছে কী?’

ফরিদা বিরক্ত গলায় বলল, ‘সব সময় যা করে তাই করেছে।’

‘কী করে সব সময়?’

‘এত কথা বলতে পারব না। ডাক্তারের কাছে নিতে বলছি নিয়ে যা।’

গাড়ি ছিল না। দরকারের সময় গাড়ি কখনও থাকে না। লিলি রিকশা নিল। রিকশায় উঠে লিলি বলল, ‘ব্যথা করছে নাকি রে?’

ঝুমু না সূচক মাথা নাড়ল।

লিলি বলল, ‘তোরা দু’জন কী করিস যে মা এ-রকম করে মারে?’

ঝুমু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। লিলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ঝুমুর কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তরে এর বেশি কিছু পাওয়া যাবে না।

সন্ধ্যাবেলা স্বাতীর আসার কথা। লিলি অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যার পর থেকে বাবা বাসায় থাকবেন। তিনি ব্যাপারটা কিভাবে দেখবেন কে জানে। মেয়েদের বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে বেড়াতে আসা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন। সন্ধ্যার পর কেউ আসবে এটা বোধহয় তাঁর স্বপ্নেও নেই। সম্ভাবনা খুব বেশি যে, স্বাতীকে দেখে তিনি রেগে যাবেন। সভ্য মানুষ মনের রাগ চেপে রেখে হাসিমুখে কথা বলে। নেয়ামত সাহেব তা পারেন না। পারার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

লিলি কলেজে পড়ার সময় তার এক বান্ধবী বিকেলে বেড়াতে এসেছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে থেকে গেল। হাসিমুখে খুব গল্প করছে, তখন বিনা নোটিসে নেয়ামত সাহেব তাদের ঘরে ঢুকে পড়লেন। থমথমে গলায় বললেন, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে বাসায় যাচ্ছ না কেন খুকি? সন্ধ্যাবেলা পাখির মতো সামান্য প্রাণীও ঘরে ফেরে। তুমি এখানে বসে আছ কেন? লিলির বান্ধবী আর কোনোদিন তাদের বাড়িতে আসে নি। এই ঘটনার পর সে লিলিকে পর্যন্ত অপছন্দ করত।

স্বাতী এলে সহজে যাবে না। রাত ন’টা দশটা পর্যন্ত থাকবে। সম্ভাবনা খুব বেশি যে রাত দশটার সময় সে বলবে, লিলি রাতটা তোর সঙ্গে থেকে যাই। সারা রাত জমিয়ে গল্প করব। লিলির আলাদা ঘর আছে ঠিকই কিন্তু রাতে সে একা ঘুমায় না। নেয়ামত সাহেব কোনো মেয়েকে একা রাখতে রাজি না। ফরিদা রাতে লিলির সঙ্গে ঘুমুতে আসেন। লিলির সেটা খারাপ লাগে না। ভালোই লাগে। ~~সে~~ অনেক রাত পর্যন্ত মা’র সঙ্গে গল্প করে। ভয়াবহ অস্বস্তির ব্যাপার হয় তখন— ~~তখন~~ মাঝরাতে বাবা এসে দরজায় টোকা দিয়ে গভীর গলায় ডাকেন— ফরিদা, এই এই।

ফরিদা সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসেন— লিলি ঘুমুচ্ছে কি-না তা দেখেন। লিলি গভীর ঘুমের ভান করে। ফরিদা লজ্জিত ভঙ্গিতে ~~উঠে~~ যান। আধ ঘণ্টার মতো সময় পার করে আবার ঘুমুতে আসেন। ফিরে এসেও লিলি ঘুমুচ্ছে কি-না পরীক্ষা করার জন্য দু’এক বার নরম গলায় ডাকেন লিলি, ~~লিলি~~। লিলি ঘুমুচ্ছে নিশ্চিত হবার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

মাঝরাতে মা’র উঠে যাবার এই ভয়াবহ অস্বস্তিকর সমস্যা থেকে লিলি অবশ্যি এখন মুক্ত হয়েছে। ঝুমু ঝুমুকে আলাদা রাখার ব্যবস্থার নতুন নিয়মে ঝুমু এখন লিলির সঙ্গে ঘুমায়। ফরিদা ঘুমান ঝুমুর সঙ্গে। লিলির অস্বস্তিকর মুহূর্ত এখন নিশ্চয়ই ঝুমু ভোগ করে কিভাবে সে কে জানে। লিলি ভেবে পায় না, মানুষ এত অবিবেচক হয় কী করে?

স্বাতী এলো রাত আটটার দিকে। সেজেগুজে একেবারে পরী হয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকেই সে বলল, 'তোরা ভাত খাস কখন? আমি আজ রাতে তোদের সঙ্গে খাব।'

লিলির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যেসব নাটক হয় তাদের খাবার টেবিলে, বাইরের কাউকে নিয়ে খেতে বসার প্রশ্নই আসে না।

নেয়ামত সাহেব দোতলার বারান্দায় রাখা জলচৌকিতে বসে তসবি পড়ছিলেন। তিনি সেখান থেকেই গম্ভীর গলায় বললেন, 'ফরিদা কে আসল? এত রাতে আসল কে?'

লিলির মুখ শুকিয়ে গেল। লিলি করুণ চোখে মা'র দিকে তাকাল। সে তাকানোর অর্থ— মা আমাকে বাঁচাও। ফরিদা তৎক্ষণাৎ দোতলায় উঠে গেলেন। লিলি মা'র ওপর তেমন ভরসা করতে পারছে না। স্ত্রীর কথায় প্রভাবিত হবার মানুষ নেয়ামত সাহেব না।

স্বাতী বলল, 'চল তোর বাবার সঙ্গে আগে দেখা করে আসি।'

লিলি ক্ষীণস্বরে বলল, 'বাবার সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। বাবা তসবি পড়ছেন— এখন গেলে বিরক্ত হবেন।'

'বিরক্ত হবেন না, আয় তো।'

স্বাতী তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। লিলিকে বাধ্য হয়ে তার পেছনে পেছনে যেতে হচ্ছে। বারান্দায় বাতি জ্বলছে। নেয়ামত সাহেব জলচৌকির উপর বসে আছেন। হাতে তসবি। লুঙ্গি পরা খালি গায়ের একটা মানুষ, মাথায় আবার টুপি।

স্বাতী নিচু হয়ে কদমবুসি করল, নরম গলায় বলল, 'চাচা ভালো আছেন?'

নেয়ামত সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। কদমবুসির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

'আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না। আমি লিলির বন্ধু। আমার নাম স্বাতী। আগেও কয়েক বার এসেছি। আপনি বোধহয় মনে করতে পারছেন না।'

'ও আচ্ছা।'

'আমিও অবশ্যি ইচ্ছে করে আপনার কাছ থেকে দূরে দূরে থেকেছি। আপনাকে যা ভয় লাগে। লিলি আপনাকে যতটা ভয় পায় আমিও ততটা পাই।'

নেয়ামত সাহেব খুশি হলেন। তবে খুশি প্রকাশ করলেন না। খুশি হইয়েছেন তা বোঝা গেল তাঁর পা নাড়া দেখে। খুশির কোনো ব্যাপার হচ্ছে কিনা পা নাচান। স্বাতী বলল, 'চাচা, আপনার কাছে আমি একটা নালিশ করতে এসেছি। লিলির বিরুদ্ধে কঠিন একটা নালিশ। আপনি আজ বিচার করে দেবেন।'

নেয়ামত সাহেব পা নাচানো বন্ধ করে শীতল গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'আমি তো দেশের বাইরে চলে যাব। আর ফিরব না। যাবার আগে আমি আমার সব বান্ধবীর বাসায় এক রাত করে থাকব বলে ঠিক করেছি। অনেকের সঙ্গে থেকেছি, সারা রাত গল্প করেছি। লিলি শুধু বাদ। ও কিছুতেই রাতে আমাকে থাকতে দেবে না।'

'সারারাত জেগে গল্প করার দরকার কি? শরীর নষ্ট। দিনে গল্প করলেই হয়।'

'না চাচা, রাতের গল্পের আলাদা আনন্দ— আপনি লিলিকে একটু বলে দিন। আজ আমি থাকব। মন ঠিক করে এসেছি।'

'তোমার বাবা-মা চিন্তা করবে।'

'তাদের বলে এসেছি। কিন্তু আপনি লিলিকে কড়া করে ধমক না দিলে ও রাখবে না।'

নেয়ামত সাহেব বিরক্ত-চোখে ফরিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি সংসারে কাজকর্ম ফেলে শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

ফরিদা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছেন। লজ্জায় লিলির মরে যেতে ইচ্ছা করছে। সে এখন নিশ্চিত যে বাবা স্বাতীকে বলবেন, নিজের বাড়িঘর ফেলে অন্যের বাড়িতে থাকা তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

নেয়ামত সাহেব হাত থেকে তসবি নামিয়ে রাখতে রাখতে স্বাতীর দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বললেন, ‘তোমাদের বাসায় টেলিফোন আছে?’

‘জি চাচা, আছে।’

‘লিলি টেলিফোনটা আন। আমি টেলিফোনে তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে নিই।’

‘আমি অনুমতি নিয়েই এসেছি চাচা।’

নেয়ামত সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, ‘তুমি নিয়েছ সেটা তোমার ব্যাপার। আমি তো নেই নাই। টেলিফোন নাম্বার কত?’

‘৮৬৫৬০০, এখন টেলিফোন করলে পাবেন না চাচা। বাবা-মা এক বিয়েতে গেছেন। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বাজবে।’

‘যে বাড়িতে গেছেন তাদের টেলিফোন নাই?’

‘জি আছে।’

‘দাও, ঐ নাম্বারটা দাও।’

স্বাতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

নেয়ামত সাহেব টেলিফোন করলেন। বিয়ে বাড়ির ভয়াবহ হাস্যামার ভেতরও স্বাতীর বাবা নাজমুল সাহেবকে টেলিফোনে ধরলেন। কথা বললেন। তারপর টেলিফোন নামিয়ে শুকনো মুখে বললেন, ‘তোমার বাবা থাকার অনুমতি দিয়েছেন। থাকো।’

লিলি স্বাতীকে নিয়ে দ্রুত তার বাবার সামনে থেকে সরে এলো। বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকলেন— ‘কে যাচ্ছে লিলি না, কি, শুনে যা তো!’ লিলি দাঁড়াল না, চট করে সরে গেল।

স্বাতী বলল, ‘তুই তো কঠিন এক বাড়িতে বাস করছিস।’

লিলি বলল, ‘হুঁ।’

‘আমার এত ঠাণ্ডা মাথা। সেই মাথাও তোর বাবা প্রায় এলোমেলো করে ফেলেছিলেন। তবে আমিও বাঘা তেঁতুল। থাকার অনুমতি আদায় করে ছাড়লাম।’

‘হুঁ।’

‘হুঁ হুঁ করিস না। প্রাণখুলে গল্প কর। তোর মত কখন খাস?’

‘একেকজন একক সময়। ধরাবাঁধা কিছু নেই।’

‘তাহলে তো সুবিধাই হলো। আমরা দু’জন রাত বারোটার দিকে চুপি চুপি এসে খেয়ে চলে যাব। সারা রাত গল্প চলবে। ফ্লাক্স ভর্তি চা বানিয়ে রাখব। ঘুম পেলে চা খাব, সিগারেট খাব।’

‘সিগারেট খাবি মানে?’

‘আকাশ থেকে পড়ার মতো ভঙ্গি করবি না। সিগারেট এক প্যাকেট নিয়ে এসেছি। মেয়েদের জন্য বানানো স্পেশাল আমেরিকান সিগারেট। নাম হচ্ছে কাট

সিদ্ধ। তামাক নেই বললেই হয়। আচ্ছা শোন, তোদের বাসার ছাদটা কেমন, ভালো?’

‘হুঁ।’

‘তাহলে ছাদে বসে গল্প করব। চাদর থাকবে, বালিশ থাকবে, মশার কয়েল জ্বালানো থাকবে। আমরা আকাশের তারা দেখতে দেখতে গল্প করব। তুই কি কখনও আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে গল্প করেছিস?’

‘না।’

‘দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হয়। ধর দু’জনে মিলে ছাদে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে গল্প করছিস। তারা ঝিলমিল করছে। হঠাৎ দেখছি তারাগুলো আকাশ থেকে নেমে চোখের সামনে চলে এসেছে। এত কাছে যে ইচ্ছা করলে হাত দিয়ে তারাদের ছোঁয়া যায়।’

লিলি অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘তুই কার সঙ্গে শুয়ে তারা দেখেছিস?’

স্বাতী হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, ‘তুই যা ভাবছিস তাই।’

‘কতক্ষণ তারা দেখেছিস?’

‘এত ইন্টারেস্টিং লাগছিল যে সারারাতই দেখলাম। খালার বাসায় যাবার কথা বলে ওর ওখানে চলে গিয়েছিলাম। তারপর কাণ্ড কি হয়েছে শোন, ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি ধুম বৃষ্টি হচ্ছে— আমরা দু’জনে বৃষ্টি মাখামাখি। হি হি হি।’

লিলির গা কাঁটা দিয়ে উঠল—‘কী সর্বনাশের কথা!’

স্বাতী বলল, ‘আমাকে তোর ঘরে নিয়ে চল। বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। রাত জাগার জন্য ব্যাটারি চার্জ করে নিতে হবে। গত দু’রাতেও ঘুমুই নি। আমাকে দেখে কি সেটা বোঝা যাচ্ছে?’

‘তোকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।’

‘ঠিক বলেছিস। আমি হলাম বরফের মতো— বারো ভাগের এগারো অংশই পানির নিচে, এক অংশ উপরে।’

লিলি স্বাতীকে তার ঘরে নিয়ে গেল। স্বাতী আসবে এই ভেবে তার ঘর কিছুটা গোছানো ছিল তারপরেও কি বিশ্রী দেখাচ্ছে। কতদিন দেয়ালে চুনকাম হয় না। উত্তর দিকের দেয়ালে নোনা ধরেছে। প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। খাটের নিচে রাজ্যের ট্রাক, অ্যালুমিনিয়ামের বড় বড় ডেকচি— সেগুলো বছরে একবার কোরবানির ঈদে বের হয়।

খাটের পাশে ড্রেসিং টেবিল একটা আছে— ঘাস আয়না নষ্ট হয়ে গেছে। চেহারা খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা দেখা যায় না। ড্রেসিং টেবিলের সঙ্গেই লিলির পড়ার টেবিল। পড়ার টেবিলে বইপত্রের সঙ্গে এক কোনায় শ্যাম্পুর বোতল, ক্রিমের কৌটা, চিরুনি। স্বাতী এই ঘরে রাত কাটাবে ভাবতেই কেমন লাগে। স্বাতীর নিজের ঘর ছবির মতো গোছানো। কে জানে হয়তো ছবির চেয়েও সুন্দর।

স্বাতীর ঘরের তিন দিকের দেয়াল দুধের মতো শাদা, একদিকের দেয়ালে নীল রঙ। সেই দেয়ালে পেইন্টিং ঝুলছে। নিচু একটা খাট। খাটটার পায়ের কাছে ছোট বারো ইঞ্চি রঙিন টিভি। পুরো দেয়াল ঘেঁষে মিউজিক সেন্টার সাজানো। সেখানে মনে হয় দিনরাতই গান বাজে। লিলি যতবারই ঘরে ঢুকেছে ততবারই শুনেছে গান

হচ্ছে। ঘরের মেঝে দেয়ালের মতোই ধবধবে শাদা। সেই শাদার উপর ছোট নীল রঙের সাইড কার্পেট। ঘরের এক কোনায় একটা পড়ার টেবিল আছে। ফাইবার পলিশ করা কাঠের চেয়ার টেবিল— দেয়ালের রঙের সাথে মেলানো।

সবচেয়ে সুন্দর স্বাতীর বাথরুম। যেন আলাদা একটা জগত। গোল বাথটাব লিলি স্বাতীর বাথরুমেই প্রথম দেখে। যেন ঘরের ভেতর ছোট দিঘি। বাথটাবের ভেতরটা নীল রঙ করা বলেই পানি দিয়ে ভর্তি করলে পানিটাকে নীল দেখায়।

যে স্বাতী এ-রকম জায়গায় থেকে অভ্যস্ত, সে লিলির ঘরে ঘুমুবে কি করে! তারচেয়ে ছাদে সারারাত জেগে থাকাই ভালো। স্বাতী অবশ্য লিলির ঘরে ঢুকে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার খাটটা তো বিরাট, হাত ছড়িয়ে শোয়া যায়। আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি বাতি নিভিয়ে চলে যাবি। আমাকে ডেকে তুলবি ঠিক বারোটায়। তখন ভাত খেয়ে গল্প শুরু করব।'

স্বাতী জুতা খুলে বিছানায় উঠে পড়ল। সহজ গলায় বলল, 'পাতলা একটা চাদর আমার গায়ে দিয়ে দে, ঘুমে চোখের পাতা মেলে রাখতে পারছি না।'

লিলি তার ঘরের বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে বের হয়েছে। তার কাছে মনে হচ্ছে এখন তার আর কিছু করার নেই। রাত বারোটো না বাজা পর্যন্ত তাকে অস্বস্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। ছাদে গিয়ে একবার ছাদটা দেখে আসা দরকার। তার মনে হচ্ছে ছাদে রাজ্যের ময়লা। বুয়াকে নিয়ে একটু বোধহয় পরিষ্কার করে রাখা দরকার। লিলি ছাদে উঠল।

ছাদের চিলেকোঠার ঘরে বাতি জ্বলছে। লিলির ছোট চাচা জাহেদুর রহমান এই সময় ঘরে ফেরে না। আজ ফিরেছে। ছোট চাচার ঘরটা আজ রাতের মতো নিয়ে নিতে পারলে খুব ভালো হতো, এই ঘরটা সুন্দর। স্বাতী এই ঘরে অস্বস্তিবোধ করবে না। তা ছাড়া এই ঘরে থাকলে যখন ইচ্ছা করবে তখন ছাদে আসা যাবে। লিলি খোলা দরজা ধরে দাঁড়াল। জাহেদ লিলির দিকে না তাকিয়েই বলল, 'কি খবর মাই ডিয়ার লিলি বেগম। হার এক্সেলেন্সি!'

'খবর ভালো ছোট চাচা। তুমি আজ সকাল সকাল ফিরলে যে। এগারোটো-বারোটোর আগে তো কখনও ফেরো না।'

'একদিন ফিরে দেখলাম কেমন লাগে। আয়, ভেতরে আয়। তোকে তো কখনও সন্ধ্যার পর ছাদে দেখা যায় না। আজ কি মনে করে?'

'তোমার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এসেছি, ছোট চাচা।'

'আবেদন গ্রান্টেড।'

'না শুনেই গ্রান্ট করে দিলে?'

'হুঁ। আজ আমার মনটা ভালো। এইজন্যই পেয়ে গেলি।'

'মন ভালো কেন?'

'এখন বলব না। যথাসময়ে বলব। আবেদনটা কি?'

'আমার এক বান্ধবী এসেছে— রাতে আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি কি আজ রাতে তোমার ঘরটা আমাদের ছেড়ে দেবে।'

'একি! তুমি দেখি রাজত্ব চেয়ে ফেললি। ঘরটাই আমার রাজত্ব।'

'শুধু এক রাতের জন্য চেয়েছি।'

'নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোনো ঘরে আমার এক ফোঁটা ঘুম হয় না। যাই হোক

বেকুঁবের মতো আগেই যখন গ্রান্টেড বলে দিয়েছি তখন গ্রান্টেড। এফুনি ঘর ছেড়ে দিচ্ছি।’

‘রাত বারোটোর সময় ছাড়লেই হবে। ছোট চাচা, থ্যাংক যু। তুমি এবারে অবশ্যই আমেরিকার ভিসা পাবে। আমি সত্যি সত্যি তোমার জন্য দোয়া করব।’

জাহেদুর রহমান বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, ‘দ্রুত হাত দিবি না। টেবিলের উপর কাগজপত্র আছে, ঘাঁটাঘাঁটি করবি না।’

‘কোনো কিছুতেই আমরা হাত দেব না।’

‘শুভ।’

রাত একটার দিকে লিলি স্বাতীকে নিয়ে ছাদে এলো। চিলেকোঠার কাছে এসে স্বাতী থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, ‘তোদের ছাদের এই ঘরটা তো সুন্দর। কে থাকে এখানে?’

‘আমার ছোট চাচা।’

‘বাহ, ঘরটাও তো খুব গোছানো। শুধু একটাই সমস্যা ব্যাচেলার ব্যাচেলার গন্ধ।’

‘লিলি বলল, ‘রাতে আমরা এই ঘরে ঘুমুব।’

স্বাতী বলল, ‘ঘুমবার জন্য তোর এখানে এসেছি না-কি? ঘুমুব না। আমার যা ঘুমানোর ঘুমিয়ে ফেলেছি। ছাদে বিছানা করতে বলেছিলাম, করিস নি?’

‘করেছি। ঐ কোনায়।’

‘বাহ সুন্দর তো! অসাধারণ।’

‘একটা শীতল পাটি বিছিয়েছি শুধু— অসাধারণের কি!’

‘এইটাই অসাধারণ। ছাদের উপর শীতল পাটি মানায়, গদির বিছানা মানায় না। বালিশ কোথায়?’

‘ছোট চাচার ঘর থেকে নিয়ে আসছি।’

‘উহঁ-ব্যাচেলার গন্ধওয়ালা বালিশে আমি ঘুমুব না। তুই তোর ঘর থেকে বালিশ নিয়ে আয়। ফ্লাস্কভর্তি করে চা আনতে বলেছিলাম, এনেছিস?’

‘আমাদের ফ্লাস্ক নেই।’

‘বলিস কি, তোদের ফ্লাস্ক নেই?’

লিলি হাক্কা গলায় বলল, ‘আমাদের কিছুই নেই।’

‘চা ছাড়া সারারাত জাগব কীভাবে?’

‘তোর যখন চা খেতে ইচ্ছা করবে বলবি, ছোট চাচার ঘরে ওয়াটার হিটার আছে, টি ব্যাগ আছে। চা বানিয়ে দেব।’

‘দেয়াশলাই আনবি। সিগারেট খেতে হবে। তুই আবার না না করে ঢং করতে পারবি না। তুইও খাবি।’

লিলি এবং স্বাতী পাটিতে শুয়ে আছে। মাথার উপর তারা ভরা আকাশ। স্বাতী বলল, ‘তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকবি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না, সাধারণভাবে। তারার দিকে তাকিয়ে গল্প করতে থাকবি।’

‘কী গল্প?’

‘যা মনে আসে।’

লিলি বলল, ‘তুই আমার গল্প শোনার জন্য এত যত্নগা করে আমার সঙ্গে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিস তা কি ঠিক? তুই এসেছিস তোর গল্প বলার জন্য। কী বলতে চাস বল, আমি শুনছি।’

স্বাতী নিচু গলায় বলল, ‘হাসনাতকে যখন বললি— আমি আসব না তখন সে কী বলল?’

‘টেলিফোনে তো একবার বলেছি।’

‘আবার বল। টেলিফোনে কি বলেছিস আমার মনে নেই।’

‘উনি কিছুই বলেন নি।’

‘কিছুই না?’

‘না।’

‘ভালো করে ভেবে বল। হয়তো কিছু বলেছে।’

‘বলেছেন— ও আচ্ছা।’

‘সেই ‘ও আচ্ছাটা’ কিভাবে বলল? ‘ও আচ্ছা’ বাক্যটা অনেকভাবে বলা যায়। হাই ড্রামা করে বলা যায়, গভীর বিষাদের সঙ্গে বলা যায়, রাগের সঙ্গে বলা যায়। ও কীভাবে বলল?’

‘খুব সাধারণভাবে বলেছেন।’

স্বাতী নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘আমার ধারণা ওর মধ্যে ড্রামা কম। আবেগ আছে— তবে তা আইসবার্গের মতো। চোখে পড়ে না।’

লিলি শান্ত গলায় বলল, ‘একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশলি, সারারাত জেগে তারা দেখলি, বিয়ে ঠিকঠাক করলি, তারপর ছুট করে সব ভেঙে দিলি?’

স্বাতী বলল, ‘আমার চায়ের পিপাসা হচ্ছে।’

‘তুই আমার প্রশ্নের জবাব দিস নি।’

‘প্রশ্ন কোথায়? প্রশ্ন না করলে জবাব দেব কী? বল, তোর প্রশ্ন বল।’

‘বিয়ে সত্যি সত্যি পুরোপুরি ভেঙে গেছে?’

‘হুঁ।’

‘কেন?’

‘আমি ঠিক যে রকম মানুষ চাচ্ছি সে রকম মানুষ ও না।’

‘তুই কী রকম মানুষ চাচ্ছিস?’

‘ব্যাখ্যা করতে পারব না।’

‘উনি যে সে রকম মানুষ না সেটা বুঝলি কী করে? মানুষ বুঝতেও তো সময় লাগে।’

‘তাকে সময় দিয়েছি। এত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে যে মিশলাম, কেন মিশলাম? তাকে ভালোমতো জানার জন্যই মিশলাম। লিলি চা খাব।’

লিলি চা বানানোর জন্য উঠে গেল। স্বাতী শুয়ে শুয়ে তারা দেখছে। ঐ রাতের মতো হচ্ছে না, তারাগুলো ঝট করে চোখের উপর নেমে আসছে না। কে জানে আকাশের তারা নামানোর জন্য একজন প্রেমিক পুরুষ হয়তো দরকার হয়।

লিলি চা নিয়ে এসেছে। স্বাতী উঠে বসতে বসতে বলল, ‘দেয়াশলাই এনেছিস?’

লিলি দেয়াশলাই সামনে রাখল।

স্বাতী বলল, ‘তুই দেয়াশলাইটা এমনভাবে ছুড়ে ফেললি যেন আমি দেয়াশলাই দিয়ে ভয়ঙ্কর কোনো পাপ করতে যাচ্ছি। তা কিন্তু করছি না। আমি অতি নিরীহ একটা সিগারেট সিগারেট আগুন দিয়ে পুড়াব। তুইও পুড়াবি।’

‘আমি না।’

‘আচ্ছা লিলি, তোর মধ্যে কি কৌতূহল বলে কিছু নেই? এই যে হাজার হাজার ছেলে, বুড়ো, জোয়ান ধুমসে সিগারেট খাচ্ছে, কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়ছে— ব্যাপারটা কি একবার জানারও ইচ্ছা হয় না?’

‘না।’

‘এই যে আমি সিগারেট টানছি, আমাকে দেখেও ইচ্ছা হচ্ছে না?’

‘না।’

‘থাক তাহলে, জোর করব না। খুব মানসিক চাপের মধ্যে আছি। ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে রাত জেগে, হইচই করে, সিগারেট টেনে চাপটা কমাব। তোর কাছে আসায় লাভের মধ্যে লাভ এই হয়েছে মনের চাপটা বেড়েছে। তুই তোর সুন্দর মুখ শ্বেতপাথরের মূর্তির মুখের মতো করে রেখেছিস। আমার সঙ্গে এ-রকম আচরণ করছিস যেন আমি সিদ্দাবাদের ভূত হয়ে তোর ঘাড়ে চেপে আছি। শুনুন ইয়াং লেডি, আমি কোনো সিদ্দাবাদের ভূত না। আমি কারোর ঘাড়ে চাপি না।’

‘তোর চাপটা কী জন্য? বিয়ে ভেঙে দেয়ার জন্য?’

‘না। ওর কাছে আমার একটা পেইন্টিং আছে। পেইন্টিংটা নিয়ে খুব দৃষ্টিস্তা হচ্ছে।’

লিলি ভীত গলায় বলল, ‘কী রকম পেইন্টিং?’

‘বুঝতেই তো পারছিস কি রকম।’

‘বুঝতে পারছি না।’

স্বাতী সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ‘নুড স্টাডি।’

‘সেটা আবার কী?’

‘ন্যাকামি করিস না তো লিলি। ন্যাকামি আমার অসহ্য লাগে। নুড স্টাডি কি তুই সত্যি জানিস না?’

‘না।’

‘ছবিটার নাম মধ্যাহ্ন। ছবিটা হচ্ছে এ-রকম— আমি উপুড় হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছি, খুব মন দিয়ে পড়ছি। আমার মাথার চুলে বইটার একটা পাতা ঢাকা। আর আমার গায়ে কোনো কাপড় নেই।’

লিলি আতঙ্কিত গলায় বলল, ‘গায়ে কাপড় নেই মানে কী?’

‘কাপড় নেই মানে কাপড় নেই।’

‘এ রকম ছবি আঁকার মানে কী?’

স্বাতী দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল— ‘খালি বাড়ি, ঝাঁঝা দুপুর। একটি তরুণী মেয়ের নগ্ন হয়ে বই পড়তে ইচ্ছা হয়েছে, সে বই পড়ছে। আর্টিস্ট সেই ছবি এঁকেছেন।’

‘কোনো মেয়ের এ-রকম নগ্ন হয়ে বই পড়ার অদ্ভুত ইচ্ছা হবে কেন?’

স্বাতী বিরক্ত হয়ে বলল, ‘তোর সঙ্গে ছবি নিয়ে আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। চুপ করে থাক।’

লিলি বলল, 'ঐ ছবির জন্য তোর দুশ্চিন্তা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। ছবিটা এত সুন্দর হয়েছে— আমার ধারণা শিল্পকলা একাডেমীতে ওর যে সলো এক্সিবিশন হবার কথা সেখানে ছবিটা থাকবে। হাজার হাজার মানুষ আমাকে নগ্ন দেখবে।'

'তোর অসম্মান হবে এ-রকম কাজ উনি কখনও করবেন না।'

'ও করবে। লেখক, কবি, শিল্পী এদের কাছে সৃষ্টিটাই প্রধান। সৃষ্টির পেছনের মানুষটা প্রধান না। আমার সম্মান হবে, না অসম্মান হবে তা সে দেখবে না। সে দেখবে তার ছবি সুন্দর হয়েছে। ছবিটা অন্যদের দেখানো দরকার।'

'এখন তাহলে কী করবি?'

'আমি কিছু করব না। যা করার তুই করবি। তুই তার সঙ্গে কথা বলে ছবিটা নিয়ে আসবি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ তুই। তুই ছাড়া এসব কথা আমি কি আর কাউকে বলতে পারি? দু'জনের মধ্যে যখন সমস্যা হয় তখন সমস্যা সমাধানের জন্য একজন মিডলম্যান লাগে। তুই সেই মিডলম্যান। নে, ফাঁসির আসামীর মতো চেহারা করবি না।'

'আমি একা একা ঐ বাড়িতে যাব?'

'হ্যাঁ— ও বাঘ-ভাল্লুক না। তোকে খেয়ে ফেলবে না।'

'আমাকে খুন করে ফেললেও আমি যাব না।'

'আচ্ছা বেশ। না গেলে না যাবি। নে সিগারেট খা। এখনও যদি না বলিস— আমি কিন্তু তোকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেব।'

লিলি কিছু বলল না। স্বাতী বলল, 'আয় আকাশের তারা দেখতে-দেখতে গল্প করি। বিপদ হয়েছে আমার আর তুই ভয়ে এত অস্থির হয়ে পড়েছিস কেন?'

লিলি তার বান্ধবীকে নিয়ে ছাদে কি করেছে এটা দেখার জন্য নেয়ামত সাহেব রাত তিনটার দিকে ছাদে এলেন। তিনি দেখলের দু'জন পাটি পেতে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। দু'জনের হাতেই জ্বলন্ত সিগারেট।



লিলির ঘুম ভাঙলো সকাল দশটায়।

তার সারা গায়ে রোদ। সে কোথায় ঘুমুচ্ছে? ছাদে? লিলি ধড়মড় করে উঠে এসল। টেনশনের সময় তার সব এলোমেলো হয়ে যায়। তার আজ এসএসসি পরীক্ষা না? জেনারেল ব্যাংক। কী সর্বনাশ, কেউ তাকে ডেকে দেয় নি কেন? প্রায় লাফিয়ে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মনে হলো— এসএসসি পরীক্ষার বামেলা অনেক আগে শেষ হয়েছে। এবং সে ছাদে ঘুমুচ্ছে না, নিজের ঘরে নিজের গছানাতেই ঘুমুচ্ছিল।

স্বাতী এবং সে দু'জনই ঘুমুচ্ছিল। স্বাতী নেই। সে কি চলে গেছে নাকি?
লিলি বারান্দায় এসে দেখে ফরিদা বারান্দার রেলিংয়ে ভেজা কাপড় মেলে
দিচ্ছেন। তাঁর মুখ ভাবলেশহীন। লিলিকে দেখেও তিনি কিছু বললেন না।

‘স্বাতী কোথায় মা?’

‘চলে গেছে।’

‘কখন চলে গেল?’

‘সকালে চলে গেছে। তুই ঘুমুচ্ছিলি বলে ডাকে নি।’

‘আজ কী বার মা?’

‘জানি না কী বার।’

‘কী সর্বনাশ! আজ তো বৃহস্পতিবার এগারোটার সময় টিউটোরিয়াল আছে।
তাড়াতাড়ি নাশতা দাও মা।’

ফরিদার ভেতর কোনো তাড়া দেখা গেল না। তিনি যেমন ভেজা কাপড়
মেলছিলেন ঠিক তেমনি মেলতে থাকলেন। লিলি অতি দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে নিচে
নেমে এলো। রুটি-ভাজি-টবিলে থাকবে। খেয়ে চলে গেলেই হবে।

‘বুয়া খুব তাড়াতাড়ি চা দাও।’

আটার রুটি শক্ত চামড়ার মতো হয়ে আছে। ছেঁড়া যাচ্ছে না। ভাজিতে আড়া
কোনো লবণ নেই। লবণ সম্ভবত দেয়াই হয় নি। ফরিদা খাবারঘরে ঢুকলেন।

লিলি বলল, ‘স্বাতী কি সকালে কিছু খেয়ে গিয়েছে মা?’

‘চা খেয়েছে।’

‘তুমি কিছু খেয়েছ?’

‘হাতের কাজই শেষ হয় নি। খাব কি?’

ফরিদা বসলেন। নাশতা খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ দেখা গেল না।

লিলি বলল, ‘বৃহস্পতিবারের ক্লাসটায় আমি রোজ লেট করি। আজও লেট হবে।’

ফরিদা বললেন, ‘তোর বাবা বলেছে তোকে ইউনিভার্সিটিতে না যেতে।’

‘কখন বলল?’

‘অফিসে যাবার আগে বলে গেল।’

লিলি অবাক হয়ে বলল, ‘ইউনিভার্সিটিতে যাব না কেন?’

‘তোর বাবা খুব রাগারাগি করছিল। তুই না-কি কাল রাতে ছান্দে সিগারেট খাচ্ছি।
তোর বাবা দেখেছে। তুই আর ঐ মেয়ে শুয়ে শুয়ে সমানে সিগারেট টানছিস।’

লিলির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রুটি এবং ভাজি ফিল্ম আটকে যাবার মত
হলো।

‘তোর বাবা তোকে কিছু বলে নি, আমার সঙ্গে রাগারাগি। মাথায় রক্ত উ
গেছে, ধাক্কা দিয়ে আমাকে ফেলে দিল।’

‘তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলল কেন? তুমি কী করেছ?’

‘রাগলে কি আর মাথার ঠিক থাকে? কে কি করে এসব মনে থাকে না।
সামনে থাকে রাগ গিয়ে পড়ে তার ওপর।’

‘স্বাতীকে বাবা কিছু বলেনি তো?’

‘উহঁ। আল্লাহর কাছে হাজার গুণুর বাইরের মেয়ের সামনে ইজ্জত রক্ষা হয়েছে
তুই সিগারেট খাচ্ছিলি কেন?’

‘মজা করার জন্য খেয়েছি মা।’

‘বাথরুমে দরজা বন্ধ করে খেলেই হতো। এখন কী যন্ত্রণার মধ্যে ফেলেছিস দেখ তো!’

‘আমার ইউনিভার্সিটি তো যাওয়া তাহলে বন্ধ?’

‘হুঁ।’

‘আমি কী করব? দিনরাত ঘরে বসে থাকব?’

ফরিদা হাই তুলতে তুলতে বললেন, ‘তোর বাবা বলছিল তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করবে।’

মতির মা বুয়া চা দিয়ে গেছে। লিলির চা খেতে ইচ্ছা করছে না। ফরিদা বললেন, ‘তুই বুঝুকে আজ আবার একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবি? ওর ঠোট ফুলে কি হয়েছে। মুখটা হাঁসের মতো হয়ে গেছে।’ বলেই ফরিদা হাসতে শুরু করলেন।

লিলি একদৃষ্টিতে মা’কে দেখছে। কী অদ্ভুত মহিলা! তার এক মেয়ের ইউনিভার্সিটিতে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, তাতে কোনো বিকার নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। বুঝুর ঠোট ফুলে হাঁসের মতো হয়ে গেছে এটাই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করছে।

‘চা ঠাণ্ডা হচ্ছে তো, খেয়ে ফেল।’

‘খেতে ইচ্ছা করছে না।’

‘না খেলে তোর বড় চাচাকে দিয়ে আয়। চা চেয়েছিল দিতে ভুলে গেছি।’

লিলি কাপ হাতে উঠে গেল। আজহার উদ্দিন খাঁ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। লিলিকে ঢুকতে দেখে কাগজ ভাঁজ করে রাখলেন। চোখের চশমা খুলে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘লিলি তুই নাকি কাল সারারাত ছাদে ধূমপান করেছিস?’

লিলি চুপ করে রইল।

‘সকালে নিয়ামত আমাকে বলল। এই ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি তাকে নিয়ে ছাদে গেলাম। নয়টা সিগারেটের টুকরো পেয়েছি। তোর কিছু বলার আছে লিলি?’

‘না।’

‘বোস এখানে। অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ বলে যে কথা আছে সেটাই হয়েছে। অসৎ সঙ্গে তোর সর্বনাশ হয়েছে। তুই এটা বুঝতে পারছিস না। মেয়েটার নাম কী?’

‘কোন মেয়েটার?’

‘তোকে যে ট্রেনিং দিচ্ছে। সিগারেট মদ এসব ধরছে।’

‘মদের কথা আসছে কেন চাচা?’

‘একটা যখন এসেছে অন্যটাও আসবে। কান্নাকাতি সাথেই মাথা আসে। কান আর মাথা তো আলাদা না। মেয়েটার নাম কী?’

‘স্বাতী।’

‘ওর সঙ্গে বিষবৎ পরিত্যাগ করবি। অসৎ সঙ্গে পরিত্যাগ করা যদিও খুব কঠিন। মন্দ জিনিসের আকর্ষণী ক্ষমতা থাকে প্রবল।’

‘চাচা আমার কি তাহলে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ?’

‘হ্যাঁ বন্ধ। তবে সাময়িকভাবে বন্ধ। তোর বাবাকে বলেছি দ্রুত তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে। বিয়ে হয়ে যাক। তারপর তোর স্বামী যদি মনে করে তোর

পড়াশোনা করা উচিত তাহলে আবার যাবি। তখন আর আমাদের কোনো দায়িত্ব থাকবে না।’

লিলি তাকিয়ে আছে। আজহার উদ্দিন খাঁ আবার চশমা খুলে চোখে পরলেন। খবরের কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন, ‘অনেকক্ষণ আগে চা চেয়েছিলাম। চা দিচ্ছে না। ব্যাপার কী খোঁজ নিয়ে আয় তো।’

‘চা আপনাকে দিয়েছি। আপনার সামনেই আছে।’

‘ও আচ্ছা, থ্যাংকস। জানালার পাল্লাটা একটু খুলে দিয়ে যা। ডান দিকেরটা।’

লিলি চাচার ঘর থেকে বের হলো। সে এখন কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে। তাতে লাভ কী হবে?

বারান্দায় ঝুমু বসে আছে। লিলি তাকে দেখে আঁতকে উঠল। তার ঠোট অনেকখানি ফুলেছে। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে, ঠিকই খানিকটা হাঁসের মতো লাগছে।

‘ব্যথা করছে ঝুমু?’

‘হুঁ।’

‘চল যাই, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। জামা পাল্টানোর দরকার নেই। স্যান্ডেল পরে আয়। ব্যথা কি খুব বেশি করছে?’

‘হুঁ।’

‘চা-নাশতা কিছু খেয়েছিস?’

‘না।’

‘যে অবস্থা— এই অবস্থায় কিছু খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তোকে দেখে তো আমারই ভয় লাগছে।’

ডাক্তার সাহেব ঠোট ড্রেসিং করে দিলেন। এন্টিবায়োটিক ইনজেকশনের কোর্স শুরু করতে বললেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ‘ভয়ের কিছু নেই, মুখের চামড়া খুব সেনসেটিভ তো অল্পতেই ফুলে যায়।’

রিকশায় ফেরার পথে ঝুমু বলল, ‘আপা কাল রাতে তুমি সিগারেট খেয়েছিলে, তাই না?’

‘হুঁ।’

‘যা কাণ্ড সকালে হয়েছে। বাবা মা’র সঙ্গে রাগারাগি করল। ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে ফেলে দিল, মা গড়াতে গড়াতে নিচে পড়েছে, শাড়িটাড়ি উল্টে বিশ্রী অবস্থা। পরনের শাড়ি একেবারে উঠে গিয়েছিল।’

‘বলিস কি!’

‘আমাদের স্যার, কাজের বুয়া— সবাই দেখেছে, মা যা লজ্জা পেয়েছে।’

‘লজ্জা পাবারই তো কথা।’

ঝুমু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘সিগারেট খেয়েছ ভালো করেছ। বাবার সামনে খেলে আরও ভালো হতো।’

বাসার সামনে দু’বোন রিকশা থেকে নামল। লিলি বলল, ‘ঝুমু তুই বাসায় চলে যা। আমি যাব না। আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব।’

‘বাবা তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে নিষেধ করেছে।’

‘করুক।’

‘দুটোর আগে ফিরে আসব। বাবা দুটোর সময় ফিরবে।’

‘দেখি, তোর ব্যথা কি একটু কমেছে?’

‘হুঁ।’

‘মা’কে বলিস আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি।’

‘বই-খাতা কিছু নেবে না?’

‘না।’

‘দুটোর আগে চলে এসো, নয়তো মা আবার মা’র খাবে।’

‘চলে আসব।’

লিলি ক্লাসে পৌঁছল আর তাদের টিউটোরিয়াল শেষ হলো। স্যার বললেন, Young Lady you are too early for the next class.

লিলি অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল। আজ আর কোনো ক্লাস নেই। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। স্বাতী তার টিউটোরিয়াল গ্রুপের না। সে অন্য গ্রুপে। সে কি আজ ইউনিভার্সিটিতে এসেছে? বৃহস্পতিবারে তার কি ক্লাস আছে? মনে পড়ছে না। লিলি কমন রুমের দিকে এগুলো। কমন রুমের দরজায় নীপা দাঁড়িয়ে আছে। নীপা বিচিত্র সব সাজসজ্জা করে। আজ রঙচঙ্গা আলখাল্লার মতো কি একটা পরে এসেছে। নীপা বলল, ‘এই লিলি, বাজারে একটা গুজব শোনা যাচ্ছে তোর জিগরি দোসত স্বাতী না-কি পঞ্চাশ বছরের এক ম্যারিডম্যানকে বিয়ে করে বসে আছে। তার আগের স্ত্রী না-কি বিষটিষ খেয়ে হাসপাতালে দাখিল হয়েছে। ভদ্রলোকের বড় মেয়ে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।’

‘জানি না।’

‘জানিস ঠিকই। বলবি না।’

লিলি কমনরুমে ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না। স্বাতী এসেছে কি-না জানার জন্য কমনরুমে যেতে চাচ্ছিল। নীপার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বোঝা গেল স্বাতী কমনরুমে নেই। স্বাতী কমনরুমে থাকবে আর নীপা কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলবে তা হয় না। নীপা বলল, ‘চলে যাচ্ছিস না-কি?’

‘হুঁ।’

‘আমাকে এক কাপ চা খাওয়া না লিলি। টাকা ছাড়া চলে এসেছি। চা খেতে পারছি না। খাওয়াবি এক কাপ চা?’

লিলি নিতান্ত অনিচ্ছায় নীপাকে চা খাওয়াতে নিয়ে গেল। যতক্ষণ চা খাবে ততক্ষণ নীপা আজীবনে কথা বলবে। এক মুহূর্তের জন্যও থামবে না।

নীপা গলা নিচু করে বলল, ‘তোর বান্ধবী না-কি পেট বাঁধিয়ে ফেলেছে? বিয়ে না করে গতিও ছিল না। তুই জানিস কিছু?’

‘না।’

‘জানিস ঠিকই। বলবি না। তবে এইসব খবর চাপা থাকে না। একসময় সবাই জানবে।’

‘জানুক।’

‘স্বাতীদের টিউটোরিয়াল গ্রুপের সবাই অবশ্যি জেনে গেছে। কী হয়েছে শুনবি?’

‘না।’

‘আহ শোন না। শুনতে অসুবিধা কি? টিউটোরিয়াল ক্লাসের মাঝখানে স্বাতী

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। স্যারকে বলল, স্যার আমার শরীর খারাপ লাগছে। বলেই প্রায় ছুটতে ছুটতে বের হয়ে গেল। সোজা বাথরুমের দিকে। বাথরুমের বেসিনে হড়হড় করে বমি।

নীপার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে লিলি খানিকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়ালো। বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না। একা একা ঘুরতেও ভালো লাগেছ না। ইউনিভার্সিটি ফাঁকা হয়ে আসছে। তবে মাঠে প্রচুর ছেলেমেয়ে আছে। এরা সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা দেবে। আড্ডা নানান ভঙ্গিমায় চলছে। কোথাও দল বেঁধে, কোথাও জোড়ায় জোড়ায়। স্বাভাবিকভাবে এদের দেখিয়ে মজার মজার কথা বলত—

‘যখন দেখবি একটা মেয়ে দু’জন ছেলের সঙ্গে গল্প করছে, তখন বুঝবি প্রেমের ডেভেলপিং স্টেজ চলছে। একটা ছেলে হচ্ছে ক্যাটালিস্ট। এই স্টেজে তৃতীয় ব্যক্তি লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে কথাবার্তা চলে।

যখন দেখবি দু’জন গল্প করছে, দু’জন হাসিখুশি, তখন বুঝবি প্রাথমিক স্তর তারা। অতিক্রম করে এসেছে। প্রেম শুরু হয়ে গেছে।

যখন দেখবি দু’জন আছে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না, মুখ গভীর করে বসে আছে, তখন বুঝবি প্রেম পেকে গেছে। পেকে টসটস করছে। খসে মাটিতে পড়ল বলে।

লিলির খুব একা একা লাগেছ। স্বাভাবিকভাবে বাসায় একটা টেলিফোন করে দেখবে। ইউনিভার্সিটি থেকে টেলিফোন করার নিয়ম-কানুনও স্বাভাবিকভাবে তাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

‘করবি কি শোন, যে-কোনো একটা অফিসে ঢুকে যাবি। অফিসের কেরানিকে বলবি ‘স্যার একটা টেলিফোন করব।’ ওদের তো কেউ স্যার বলে না— স্যার শুনে খুশি হয়ে যাবে। নিজেই টেলিফোনের তালা খুলে দেবে। আর তা যদি না হয় তাহলে কোনো ইয়াং টিচারের কাছে যাবি। তাঁর দিকে তাকিয়ে মোটামুটি রহস্যময় ভঙ্গি করে হাসতে থাকবি। হাসবি, চোখ নামিয়ে নিবি। আবার চোখ তুলে হাসবি। আবার চোখ নামিয়ে নিবি। স্যার তখন বলবে, কী খবর তোমার?’ তুই তখন বলবি, স্যার, বাসায় একটা টেলিফোন করব। আর দেখতে হবে না। স্যার টেলিফোনের ব্যবস্থা করে দেবে।

লিলি স্বাভাবিকভাবে টেলিফোন করাই ঠিক করল। স্বাভাবিকভাবে শেখানো পদ্ধতিতে কেরানিকে স্যার বলে চট করে টেলিফোন পেয়ে গেল।

স্বাভাবিকভাবে খুশি খুশি গলায় বলল, ‘লিলি তুই? ঘুম ভেঙেছে?’

‘হ্যাঁ’

‘তুই যে এমন কুন্ডকর্ণের মতো ঘুমুতে পারিস তা তো জানতাম না। সকালে চলে আসার সময় তোর ঘুম ভাঙানোর এত চেষ্টা করলাম। তুই এখন করছিস কী?’

‘টেলিফোন করছি।’

‘সেটা বুঝতে পারছি। তুই কি আজ সারাদিন বাসায় থাকবি?’

‘না। এখন আমি ইউনিভার্সিটিতে।’

‘সে কি! তুই ক্লাস করছিস। তুই ক্লাসে যাবি জানতে পারলে আমিও চলে আসতাম। আমার অবশিষ্ট শরীর খারাপ করেছে।’

‘বমি করছিস?’

‘বমি করব কেন শুধু শুধু? প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।’

‘তোমার নামে আজো সব কথা শোনা যাচ্ছে।’

‘কে বলছে, নীপা? ওয়ান ডে আই উইল স্টিচ হার লিপস। বস্তা সেলাই করার সূঁচ দিয়ে ওর ঠোঁট সেলাই করে দেব। নো কিডিং।’

‘টেলিফোন রেখে দিচ্ছি স্বাতী।’

‘পাগল, টেলিফোন রাখবি কেন? আমি তো কথাই শুরু করি নি।’

লিলি টেলিফোন নামিয়ে রাখল। তার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ভালো লাগছে না। কিছু ভালো রাগছে না। রিকশা নিয়ে সারাদিন শহরে ঘুরলে কেমন হয়? রাত আটটার আগে আজ সে বাসায় ফিরবে না। বাসার সবাই দুশ্চিন্তায় আধমরা হয়ে যাক। সবচেয়ে ভালো হয় বাসায় ফিরে না গেলে। কয়েক দিন যদি কোথাও পালিয়ে থাকা যেত।

ইউনিভার্সিটি এখন প্রায় ফাঁকা। দারোয়ান ক্লাসরুমে তালাচাবি দিচ্ছে। করিডোর ফাঁকা। লিলি সিঁড়ি দিয়ে নামছে— আবারও নীপার সঙ্গে দেখা। এখন নীপার চোখে সানগ্লাস। চুলগুলোকে এর মধ্যেই কিছু করেছে কি-না কে জানে। তাকে অন্য রকম লাগছে। নীপা চাপা গলায় বলল, ‘বোরকাওয়ালি এখন কোথায় জানিস?’

লিলি কিছু বলল না। বোরকাওয়ালি হলো তাদের ক্লাসের নূরজাহান বেগম। ক্লাসের একমাত্র মেয়ে যে বোরকা দিয়ে শরীর ঢেকে আসে। বোরকার ফাঁক দিয়ে সুন্দর দুটি চোখ ছাড়া এই মেয়ের আর কিছুই দেখা যায় না। মেয়েদের কমনরুমেও বোরকাওয়ালি গা থেকে বোরকা খোলে না।

নীপা লিলির কানের কাছে মুখ এনে বলল, ‘বোরকাওয়ালি এখন বোরকার নিচে খ্যামটা নাচ দিচ্ছে। বিশ্বাস না হয় ৬১১ নম্বর রুমে যা। ওরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ওর গায়ে এখন বোরকা কেন, কিছুই নেই। কে জানে কি করছে।’

লিলি বলল, ‘যা ইচ্ছা করুক।’

‘প্লিজ, আয় একটু। তোমার দেখা থাকলে আমার সুবিধা। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। শনিবার ক্লাসে এসে তুমি যখন বলবি তখন সবাই বিশ্বাস করবে।’

‘নীপা শোন, আমার কিছু দেখারও ইচ্ছা নেই, বলারও ইচ্ছা নেই। যার যা ইচ্ছা করুক।’

লিলি রিকশা নিল।

রিকশায় উঠে রিকশাওয়ালাকে বলা যায় না ‘আমি’ বিশেষ কোথাও যাব না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব।’ অথচ লিলির কোনো গন্তব্য নেই। আকাশের অবস্থা ভালো না। মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেঘের ধরনধারণ নেই। বৃষ্টি শুধু না, ঝড় হবারও কথা। হোক, প্রচণ্ড ঝড়, সব লগুভগু করে দিক।

‘আপা, যাইবেন কই?’

‘কলাবাগান।’

‘বাসস্ট্যান্ড?’

‘বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে একটু ভেতরে।’

‘দশ টাকা দেবেন।’

‘চলো, দশ টাকাই দেব।’

লিলি কলাবাগান যাচ্ছে কেন? কলাবাগান যাবার তার কোনো ইচ্ছা নেই। কলাবাগান বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে একটু ভেতরে গেলেই হাসনাত সাহেবের বাড়ি। ঐ বাড়িতে যাবার জন্য সে রিকশা নেয় নি। তার পরেও সে কলাবাগানের কথা কেন বলল? সবচেয়ে ভালো হতো আগামসি লেনে চলে গেলে। লিলির দু’নম্বর দাদিজান আগামসি লেনে থাকেন। লিলিকে দেখলে অসম্ভব খুশি হবেন। রাত আটটা পর্যন্ত আগামসি লেনে থাকা যায়। একবারে রাতে খেয়ে-টেয়ে বাসায় ফেরা।

রিকশাওয়ালা প্রাণপণে রিকশা টানছে। তার মনের ইচ্ছা মনে হয় যাত্রীকে বৃষ্টি নামার আগে আগে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া। কারণ একটু পরপর সে আকাশে মেঘের অবস্থা দেখতে চেষ্টা করছে।

কোথাও যাবার কথা বলে রিকশায় ওঠার বেশ কিছুক্ষণ পর যদি গন্তব্যস্থল বদল করা হয় তখন রিকশাওয়ালারা খুবই বিরক্ত হয়। তারা ভদ্রতার ধার ধারে না। ভদ্রলোকের মতো তারা তাদের বিরক্তি লুকিয়ে রাখে না। প্রকাশ করে। লিলি ঠিক করল প্রথম সে কলাবাগানেই যাবে। সেখান থেকে আরেকটা রিকশা নিয়ে আগামসি লেন।

লিলির রিকশাওয়ালাকে বৃষ্টি ধরে ফেলেছে। বৃষ্টি নেমেছে হুড়মুড় করে। রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে পিছন ফিরে বলল, ‘পর্দা লাগব আফা?’

‘না।’

‘ভিজতাছেন তো।’

‘একটু ভিজলে অসুবিধা হবে না।’

লিলি একটু না, অনেকখানি ভিজল। ভেজা শাড়ি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে কি অবস্থা হয়েছে। সিনেমার নায়িকারাও এ-রকম করে বৃষ্টিতে ভিজে নাচগান করে না। শাড়িটা সূতির হলেও গায়ের সঙ্গে এতটা লেপ্টা তো না। লিলির পরনে জর্জেটের শাড়ি। জর্জেট বৃষ্টি পছন্দ করে।

গলির ভেতর রিকশাওয়ালা রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে দশ মিনিট হয় নি, এর মধ্যেই গলিতে গলিতে হাঁটুর কাছাকাছি পানি। কোথেকে এল এত পানি?

রিকশাওয়ালা বলল, ‘আফা কোন বাড়ি?’

লিলি ভয়ে ভয়ে বলল, ‘ভাই শুনুন, আপনি কি আগামসি লেনে যাবেন?’

‘কই?’

‘আগামসি লেন?’

‘এইটা মিরপুরের রিকশা। পুরান ঢাকায় যাব না।’

লিলিকে নেমে যেতে হবে। অন্য একটা রিকশা নিতে হবে, কিংবা কোনো দোকানের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে। সবাই মহা আনন্দ নিয়ে ভেজা জর্জেটের শাড়ির ভেতর দিয়ে লিলিকে দেখবে।

লিলি বলল, ‘বাঁয়ের ঐ বাড়িটা। লোহার গেটওয়ালা বাড়ি।’

গেটের ভেতর রিকশা ঢুকল না। রিকশাওয়ালাকে দশ টাকার জায়গায় পনেরো টাকা দিয়ে লিলি লোহার গেট খুলে ঢুকে পড়ল। দরজায় হাত রাখতেই ফুটফুটে আট/ন’বছরের একটা মেয়ে দরজা খুলে বের হয়ে বলল, ‘আপনি কাকে চান?’

‘এটা কি হাসনাত সাহেবের বাসা?’
‘হ্যাঁ। আমি উনার মেয়ে।’
‘বাবা বাসায় নেই?’
‘না, এসে পড়বে। আপনি ভিজ়ে একেবারে কি হয়েছেন। ইশ। আসুন ভেতরে আসুন।’
‘বাড়িতে কি তুমি একা?’
‘হুঁ।’
‘বলো কি, এতবড় একটা বাড়িতে তুমি একা? ভয় লাগছে না?’
‘লাগছে। আপনি ভেতরে আসুন।’
‘পা যে কাদায় মাখামাখি, এই পা নিয়ে ঢুকব?’
‘ঢুকে পড়ুন। বাথরুমে পা ধুয়ে ফেলবেন। আপনার তো শাড়ি বদলাতে হবে। ঘরে শুকনা শাড়ি আছে।’
‘তোমার নাম কী?’
‘জাহিন।’
‘বাহ, খুব সুন্দর নাম তো।’
‘জাহিন নামের অর্থ হলো বিচক্ষণ।’
‘কোন ক্লাসে পড়ো?’
‘ক্লাস ফোর।’
‘এই যে তুমি অজানা অচেনা একটা মানুষকে ঘরে ঢুকালে আমি একটা খারাপ লোকও তো হতে পারতাম।’
জাহিন হাসিমুখে বলল, ‘আপনাকে আমি চিনি। বাবার যার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল স্বাতী আন্টি— আপনি উনার বন্ধু। আপনার নাম লিলি। স্বাতী আন্টি আপনার ছবি আমাকে দেখিয়েছে।’
‘দেখেই তুমি চিনে ফেললে?’
‘হুঁ। আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো। আমি সব সময় পরীক্ষায় ফাস্ট হুঁ, আপনি জানেন?’
‘না, জানি না তো।’
‘স্বাতী আন্টি আমার কোনো কথা আপনাকে বলে নি।’
‘না।’
‘আশ্চর্য তো!’ পরীর মতো বাচ্চা মেয়েটি খুবই অবাক হলো।
বাথরুমের দরজা খোলা, লিলি হাত-মুখ ধুচ্ছে। খোলা দরজার ধারে জাহিন দাঁড়িয়ে আছে।
‘শুকনা শাড়ি আপনার জন্য নিয়ে আসি?’
‘না, লাগবে না। যতটুকু ভিজ়েছে শুকিয়ে যাবে। ভেজা কাপড় মানুষের গায়ে খুব তাড়াতাড়ি শুকায়।’
‘কেন?’
‘মানুষের গা তো গরম। এইজন্য।’
‘আপনাকে কি আমি আন্টি ডাকব?’
‘হ্যাঁ, ডাকো।’

‘শুনতে পারছেন ঝড় হচ্ছে।’

‘তাই তো দেখছি।’

‘আপনি না এলে আমি ভয়েই মরে যেতাম।’

‘তোমার মতো একটা বাচ্চা মেয়েকে একা রেখে তোমার বাবা যে চলে গেলেন, খুবই অন্যায় করেছেন। তোমার বাবা আসুন আমি তাঁর সঙ্গে কঠিন ঝগড়া করব।’

লিলি বাথরুম থেকে বের হয়েছে। আসলেই ঝড় হচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড়। কালবোশেখি। বছরের প্রথম কালবোশেখি।

জাহিন বলল, আমাদের বাড়িটা ভেঙে পড়ে যাবে না তো আন্টি?’

‘না, ভাঙবে না।’

টিনের চালে শব্দ হচ্ছে। শব্দটা বৃষ্টির নয়। অন্যরকম। লিলি বলল, ‘জাহিন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। শিল কুড়াবে?’

‘হু।’

‘তাহলে মাথায় একটা তোয়ালে জড়িয়ে আসো, আমরা শিল কুড়াব।’

বিপুল উৎসাহে লিলি শিল কুড়াচ্ছে। বাগানে ছোট্টাছুটি করছে। তার সঙ্গে আছে জাহিন। কাদায়-পানিতে দু’জনই মাখামাখি। দু’জনেরই উৎসাহের সীমা নেই। লিলির নিজের বাড়ির কথা মনে নেই, সে যে সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে কিশোরীদের মতো ছোট্টাছুটি করছে তাও মনে নেই। তার মনে হচ্ছে এত আনন্দ সে তার সারা জীবনে পায় নি। আম গাছের ডালে মটমট শব্দ হচ্ছে-ডাল ভাঙছে বোধহয়। লিলি চেষ্টা করে বলল, ‘জাহিন ঘরে আয়, আয়।’ মেয়েটিকে সে তুই তুই করে বলছে। তা-ই তার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। দু’জন ছুটে যাবার সময় একটা গর্তের ভেতর পড়ে গেল। যেখান অনেকখানি পানি। জাহিন এবং লিলি দু’জই হি হি করে হাসছে। জাহিন কিছু ময়লা পানি খেয়েও ফেলেছে।

ভেজা শাড়ি লিলিকে শেষ পর্যন্ত পাল্টাতে হলো। কাদায় মাখামাখি হওয়া নোংরা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে থাকা যায় না। জাহিন শাড়ি এনে দিল। পুরনো শাড়ি। জাহিনের মা’র শাড়ি। এমন একজনের যে বেঁচে নেই কিন্তু শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে তার শরীরের গন্ধের কিছুটা হয়তো থেকে গেছে। লিলির অস্বস্তির সীমা রইল না।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। ইচ্ছে করলে লিলি চলে যেতে পারে। সেই ইচ্ছা করার উপায় নেই, মেয়েটি একা। বাবা যে এখনও ফিরছে না তা নিয়ে তার মাথা ব্যথাও নেই। মনে হচ্ছে সে নতুন পরিস্থিতিতে ভালোই আছে। বাবা একবারে না এলেই যেন ভালো। তাহলে নতুন আন্টিকে নিয়ে আরও অনেক মজা করা যায়।

লিলি বলল, ‘ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপছে। জাহিন, চলে যাক হবে।’

জাহিন বলল, ‘আন্টি আমি চা বানাতে পারি না।’

‘তোকে চা বানাতে হবে না। আমি বানাব। কোথায় চা কোথায় চিনি— এইসব দেখিয়ে দিলেই হবে।’

‘এইসবও তো আমি জানি না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা খুঁজে বের করব।’

‘আমিও চা খাব আন্টি।’

‘ঠিক আছে। আমাকে রান্নাঘর দেখিয়ে দে।’

রান্নাঘর দেখিয়ে দেবার আগেই হাসনাত এসে পড়ল। লিলিকে দেখে সে যতটানা চমকালো তার চেয়ে বেশি বোধ করল স্বস্তি।

‘তুমি কখন এসেছ?’

‘অনেকক্ষণ, ঝড়ের আগে।’

‘বাঁচা গেছে। আমি কি যে দুশ্চিন্তা করছিলাম। জাহিনকে একা বাসায় ফেলে গেছি, গুরু হলো বড় বৃষ্টি।’

‘একা ফেলে গেলেন কীভাবে?’

‘আধ ঘণ্টার জন্য গিয়েছিলাম। সেটাও ঠিক হয় নি। উপায় ছিল না। আধ ঘণ্টার জন্য গিয়ে এই যে আটকা পড়লাম, আর বের হতে পারি না। ঝড়ে আটকা পড়ি নি, ঝড় কোনো ব্যাপারই না। অন্য ঝামেলায় আটকা পড়েছি।’

লিলি খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, ‘আপনি আমাকে দেখে অবাক হন নি?’

‘হয়েছি। তবে তেমন অবাক হই নি। তুমি আসবে সেটা ধরেই নিয়েছিলাম। স্বাতী দূত পাঠাবে। তুমি ছাড়া তার আর দূত কোথায়?’

জাহিন বলল, ‘বাবা আন্টি চা খাবে। আমিও খাব।’

হাসনাত ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘চা বানিয়ে নিয়ে আসছি। তোমরা বসো।’

লিলি বলল, ‘আমাকে জিনিসপত্র দেখিয়ে দিন আমি বানিয়ে আনছি।’

‘না না, তুমি অতিথি। তুমি বসো। তুমি হলে ফরেন এ্যামবাসেডার। আমি ফরেন এ্যামবাসেডারকে দিয়ে চা বানাব, তা হয় না।’

লিলি স্বস্তিবোধ করছে। হাসনাত সাহেব সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করছেন। একজন সহজ হলে অন্যজনের সহজ হওয়া সমস্যা হয় না। লিলি বলল, ‘আপনি চা বানানোর সময় আমরা দু’জন যদি পাশে দাঁড়িয়ে দেখি তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে?’

‘না অসুবিধা নেই। ভালো কথা, লিলি তুমি মনে হয় দুপুরে খাও নি।’

‘দুপুরে খাই নি যে বুঝলেন কী করে?’

‘আর্টিস্টের প্রধান কাজ হচ্ছে দেখা। একজন আর্টিস্ট যদি ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে না পারে সে ক্ষুধার্ত, তাহলে সে কোনো বড় আর্টিস্টই না।’

‘আপনার ধারণা আপনি বড় আর্টিস্ট?’

হাসনাত হাসতে হাসতে বলল, ‘আমার সে-রকমই ধারণা। তবে অন্যদের ধারণা অবশ্যি তা না। লিলি শোনো, ঘরে খাবার কিছু নেই। পাউরুটি আছে টোস্ট করে দিতে পারি। ডিম আছে পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে ভেজে দিতে পারি। দেব?’

‘দিন।’

‘তুমি স্বাতীর হয়ে যেসব কথা বলতে এসেছ, তা কি জাহিনের সামনে বলতে পারবে নাকি তাকে দূরে সরিয়ে দেব?’

‘ও বেচারি একা একা কোথায় বসে থাকবে?’

‘ওকে গল্পের বই পড়তে পাঠিয়ে দেব। গল্পের বই ধরিয়ে দিলে ওর আর কিছুই লাগে না। আধ ঘণ্টার জন্য যে গিয়েছিলাম, জাহিনের হাতে গল্পের বই ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম।’

‘আপনার মেয়েটি খুব ভালো।’

‘মেয়ে সম্পর্কে আমার নিজেরও তাই ধারণা। ও তার মার মতো হয়েছে। স্বভাব-চরিত্র অবিকল তার মার মতো। অন্যকে নিজের করতে তার পাঁচ মিনিট লাগে। তবে তার মা সুন্দর ছিল না। তার চেহারাটা সাদামাটা ছিল। নাক-মুখ ছিল ভোঁতা ভোঁতা। জাহিনের ফিচারস খুব শার্প। ওর চোখ যদি একটু বড় হতো তাহলে সতেরো/আঠারো বছর বয়সে সে সেরা রূপসীদের একজন হতো— তোমাকে ছাড়িয়ে যেত।’

‘আপনারা আর্টিস্টরা মানুষের চেহারা খুব খুঁটিয়ে দেখেন, তাই না?’

‘সবাই দেখে না। আমি দেখি। আমি পোর্ট্রেটের কাজ বেশি করি, আমাকে দেখতে হয়।’

লিলি বেশ আগ্রহ নিয়েই হাসনাতের কাণ্ডকারখানা দেখছে। ভদ্রলোক বেশ নিপুণ ভঙ্গিতে ডিম ফেটলেন। চাকু দিয়ে পঁয়াজ, কাঁচামরিচ কুচিকুচি করে কাটলেন। লবণ মিশিয়ে ফুটন্ত তেলে ডিম ভাজলেন। ডিম কড়াইয়ে লেগে গেল না, গোলাপি হয়ে ফুলে উঠল।

হাসনাত বলল, ‘লিলি ঘরে মাখন আছে। রুটিতে মাখন লাগিয়ে দেব?’

‘দিন।’

‘রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো খেতে পারবে না। আমার স্টুডিওতে চলে যাও। জাহিন দেখিয়ে দেবে। জাহিন শোনো, তুমি উনাকে আমার স্টুডিওতে নিয়ে যাও। তারপর তুমি গল্পের বই নিয়ে বসো।’

জাহিন গম্ভীর গলায় বলল, ‘তোমরা গোপন কথা বলবে?’

‘গোপন কথা বলব না। এমন কিছু কথা যা ছোটদের শুনতে ভালো লাগবে না।’

‘আমার সব কথাই শুনতে ভালো লাগে।’

‘ভালো লাগলেও শোনা যাবে না।’

স্টুডিও বিশাল কিছু না। মাঝারি আকৃতির ঘর। ঘরে জানালা বন্ধ বলে গুমোট গুমোট ভাব। কড়া তার্পিন তেলের গন্ধ। ঘরময় রঙের বাটি। বেতের চেয়ার কয়েকটা আছে। চেয়ারের ধুলার আস্তুর দেখে মনে হয় চেয়ারগুলো ব্যবহার হয় না। এক কোনায় ক্যাম্প খাটে মশারি খাটানো। ঘুপচি ঘরের ক্যাম্প খাটে কে ঘুমায়?

লিলি চেয়ারে বসেছে। তার হাতে চায়ের কাপ। হাসনাত বসেছে মেঝের কার্পেটে। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে। বন্ধ জানালা খুলে দেয়াল গুমোট ভাবটা নেই। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। হাসনাতের হাতে সিগারেট। সে সিগারেটে টান দিয়ে বলল, ‘স্বাভী তোমাকে তার ছবিটার জন্য পাঠিয়েছে, তাই তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওর মনে ভয় ঢুকে গেছে আমি এই ছবি সবাইকে দেখিয়ে বেড়াব। তাই না?’

‘হুঁ।’

‘তুমি ওকে বুঝিয়ে বলবে যে, এ জাতীয় কাজ আমি কখনই করব না। আর্টিস্ট হিসেবে আমি পিকাসো না, কিন্তু মানুষ হিসেবে বড়। তুমি বরং এক কাজ করো আমি ছবিটা ভালোমতো র‍্যাপ করে দিচ্ছি। নিয়ে যাও, ওকে দিয়ে দেবে। তবে বড় ছবি নিতে তোমার হয়তো কষ্ট হবে।’

‘কষ্ট হবে না। আমি নিতে পারব।’

‘স্বাভী তোমার খুব ভালো বন্ধু, তাই না?’

‘হ্যাঁ। আমার একজনই বন্ধু। আপনি বোধহয় ওর ওপর খুব রেগে আছেন।’

‘আমি তার ওপর মোটেই রেগে নেই। আমার একটা ক্ষীণ সন্দেহ সব সময়ই ছিল যে, এই জাতীয় কিছু সে করে বসবে।’

‘এ রকম সন্দেহ হবার কারণ কি?’

‘হুট করে আসা আবেগ হুট করেই চলে যায়। স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তী মেয়ে, সে শেষ মুহূর্তে হলেও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। বোকা মেয়েগুলো ধরতে পারে না। স্বাভাবিক না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হলে কি করতে জানো? বিয়ে করে ফেলত তারপর নানান অশান্তি। আমি আমার মেয়েটাকে নিয়ে পড়তাম বিপদে।’

‘বিয়ে ভেঙে গিয়ে আপনার জন্যও ভালো হয়েছে।’

‘হ্যাঁ, আমার জন্য ভালো হয়েছে। আসলে একা থাকতে থাকতে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। নতুন করে সংসার শুরু করা আমার জন্য কষ্টকর হতো। আমার বিয়েতে রাজি হবার প্রধান কারণ কিন্তু আমার মেয়ে। ওর একজন মাদার ফিগার দরকার। মায়ের জন্য মেয়েটার ভেতর তৃষ্ণা জন্মেছে। যে-ই এ বাড়িতে আসে মেয়েটা তার মধ্যেই তার মাকে খোঁজে।’

‘স্বাভাবিক কাছে এই ব্যাপারটা কখনও বলেছেন?’

‘বলেছি। এও বলেছি জাহিন যে তার মা’কে খোঁজে তাই না, আমি নিজেও তার ভেতর আমার স্ত্রীকে খুঁজছি। এখন বুঝতে না পারলেও একদিন বুঝবে। তখন সে কষ্ট পাবে।’

‘ও বুঝতে চায় নি?’

‘না, বুঝতে চায় নি। তোমাদের মতো বয়েসী মেয়েদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে অন্যের যুক্তি ছোট করে দেখা। এই সময়ের মেয়েদের নিজেদের ওপর আস্থা থাকে খুব বেশি।’

‘এটা কি খারাপ?’

‘খারাপ না, ভালো। তবে শুধু নিজেদের ওপর আস্থা থাকবে অন্যদের ওপর থাকবে না এটা খারাপ। তুমি কি আরেক কাপ চা খাবে লিলি?’

‘জি-না, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে আমি এখন যাব। আপনি ছবিটা দেবেন বাসেছিলেন দিয়ে দিন।’

‘তুমিও দেখি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছ না।’

‘আমি পারছি।’

‘তাহলে ছবিটা সঙ্গে নেয়ার জন্য এত ব্যস্ত কেন?’

‘স্বাভাবিক খুব মানসিক চাপের ভেতর আছে। ছবিটা পেলে চাপ থেকে মুক্ত হবে। ও খুব খুশি হবে।’

‘ছবিটা দিয়ে তাকে খুশি করতে চাচ্ছ?’

‘জি।’

‘দিচ্ছি, ছবি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি না এলেও তার ছবি আমি তাকে দিয়ে দিতাম। ছবিটা হয়েছে খুব সুন্দর। দেখতে চাও?’

‘জি-না।’

‘দেখতে পারো। নগ্নতা তো কোনো লজ্জার বিষয় হতে পারে না। লজ্জার বিষয় হলে প্রকৃতি আমাদের কাপড় পরিয়ে পৃথিবীতে পাঠাত। আমরা নগ্ন হয়ে

পৃথিবীতে এসেছি। নগ্নতার জন্য লজ্জিত হবার বা অস্বস্তিবোধ করার আমি কোনো কারণ দেখি না।’

লিলি নিচু গলায় বলল, ‘আমি ছবিটা দেখতে চাচ্ছি না।’

‘লজ্জা পাচ্ছ যখন আমার সামনে দেখার দরকার নেই কিন্তু স্বাতীর কাছ থেকে একবার দেখে নিও।’

‘ওকে কি কিছু বলতে হবে?’

‘ওকে শুধু বলব, ছবিটা যেন নষ্ট না করে। একদিন সে বুড়ো হয়ে যাবে। দাঁত পড়বে, চুলে পাক ধরবে, তখন যদি ছবিটা দেখে তীব্র আনন্দ পাবে। লোকে বলে যৌবন ধরে রাখা যায় না— এটা ঠিক না। আমি তার যৌবন ধরে রেখেছি। আলোর একটা খেলা ছবিটাতে আছে। এত সুন্দর কাজ আমি খুব কম করেছি। চলো তোমাকে রিকশায় তুলে দিয়ে আসি। এ-রকম বিশাল ছবি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে অস্বস্তি লাগবে না তো?’

‘না।’

‘তুমি বললে স্বাতীদের বাড়ির গেট পর্যন্ত আমি ছবিটা পৌঁছে দিতে পারি। আমি গেট থেকে বিদায় নেব। গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত তুমি নিয়ে গেলে।’

‘না না, আপনি থাকুন। জাহিনের সঙ্গে গল্প করুন। আপনার মেয়েটা অসম্ভব ভালো।’

‘আগে একবার বলেছি।’

‘আবারও বললাম। একটা মিথ্যা একবারের বেশি দু’বার বলা যায় না। সত্য কথা অসংখ্যবার বলা যায়।’

স্বাতী লিলিকে দেখে আকাশ থেকে পড়ল। ভর সন্ধ্যায় রিকশায় পাঁচ ফুট বাই চার ফুট ছবি নিয়ে লিলি একা একা উপস্থিত হবে এটা ভাবাই যায় না। লিলির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। হাত দিয়ে ছবি সামলাতে তার মনে হয় কষ্টও হয়েছে।

লিলি বলল, ‘নে তোর ছবি।’

স্বাতী বলল, ‘থ্যাংকস, থ্যাংকস, মেনি থ্যাংকস। থ্যাংকস ছাড়া আর কি ছবি বল?’

‘আর কিছু চাই না।’

‘চাইতে হবে। কিছু-একটা চাইতে হবে। তোর মুখটুকু শুকিয়ে কি হয়ে গেছে-খুব ঝামেলা গেছে, তাই না।’

‘ঝামেলা হয় নি।’

‘চাইতেই দিয়ে দিল?’

‘হু।’

‘আয়, ঘরে এসে বোস। তোকে দেখে মনে হচ্ছে খুব টেনশনে আছিস।’

‘সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমি বাসায় চলে যাব।’

‘পাগল হয়েছিস? তোকে আমি এখন ছাড়ব নাকি? গল্প শুনব না? তোর কোনো ভয় নেই, আমি তোকে গাড়ি করে বাসায় পৌঁছে দেব। আয়।’

লিলির নিজেকে যন্ত্রের মতো লাগছে। বাড়ির কথা তার এতক্ষণ মনে হয় নি। এখন মনে হচ্ছে। বাড়িতে কোন নাটক হচ্ছে কে জানে। সে বাড়িতে পা দেয়ামাত্র নাটক কোন দিকে মোড় নেবে তাও জানে না।

স্বাতী বলল, ‘এ রকম মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন আয়।’

লিলি ছোট নিশ্বাস ফেলে রওনা হলো। স্বাতীর হাতে ফ্রেম করা ছবি। বিশাল দেখালেও তেমন ওজন নেই। নাজমুল সাহেব বসার ঘরের সোফায় বার্নিশ দিচ্ছিলেন। তার নাকে রুমাল বাঁধা। তিনি বললেন, ‘লিলি সন্ধ্যাবেলা কোথেকে?’

স্বাতী বলল, ‘ও আমার জন্য একটা গিফট নিয়ে এসেছে বাবা। একটা পেইন্টিং। আমার জন্মদিনের উপহার। জন্মদিনে আসতে পারে নি। আজ উপহার নিয়ে এসেছে।’

‘এত বড় পেইন্টিং?’

‘হুঁ, বিশাল। এখন তোমরা দেখতে পাবে না। কোনো এক শুভক্ষণে শুভ উদ্বোধন হবে।’

‘লিলি মা কি আজ থাকবে আমাদের বাসায়?’

‘লিলি বলল, ‘জি না চাচা।’

‘থেকে যাও মা। থেকে যাও। হইচই করো। গল্পগুজব করো। বসয়সটাই তো হইচইয়ের। গল্পগুজবের। কিছুদিন পর হইচই করতেও ভাল লাগবে না। গল্পগুজব করতেও ভালো লাগবে না। সময় কাটবে রান্নাঘরে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা আছে না—

‘রাঁধার পর খাওয়া

খাওয়ার পর রাঁধা

এই টুকুতেই জীবনখানি বাঁধা।’

স্বাতী বলল, ‘তোমাকে কবিতা আবৃত্তি করতে হবে না বাবা। তুমি বার্নিশ চালিয়ে যাও। আমরা অনেকক্ষণ গল্প করব। তারপর তুমি তোমার গাড়িটা ধার দেবে আমি লিলিকে পৌঁছে দেব।’

স্বাতী ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। ব্যস্ত ভঙ্গিতে ছবির ওপর ভাঁজ করে রাখা কাগজ সরাতে লাগল। খুশি খুশি গলায় বলল, ‘তুই একটু দূরে গিয়ে দাঁড়া লিলি। দূর থেকে দেখ কত সুন্দর ছবি। ‘একটু দূরে না দাঁড়ালে বুঝতে পারবি না। ঘরে আলো কম। আরেকটু আলো থাকলে ভালো হতো। তুই দরজার কাছে যা লিলি। দরজার কাছ থেকে দেখ।’

লিলি দেখছে।

সে নড়তে পারছে না। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। লিলি মেয়েটিকে দেখতে মোটেই অস্বাভাবিক লাগছে না। মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক। খোলা জানালার আলো এসে মেয়েটির পিঠে পড়ছে। বই পড়তে পড়তে একটু আগে মনে হয় মেয়েটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। মধ্যাহ্নের সেই দীর্ঘনিশ্বাস আটকে আছে ছবির ভেতর।

স্বাতী মুগ্ধ গলায় বলল, ‘ছবি দেখে বুঝতে পারছিস আমি কত সুন্দর?’

লিলি জবাব দিল না। সে এখনও চোখ ফেরাতে পারছে না।

‘কি রে, ছবিটা কেমন তাতো বলছিস না।’

‘সুন্দর!’

‘শুধু সুন্দর? আর কোনো বিশেষণ ব্যবহার করবি না?’

লিলি মুগ্ধ গলায় বলল, ‘ছবিটা উনার কাছ থেকে আনা ঠিক হয় নি। উনি ছবিটা খুব মমতা দিয়ে একেঁছেন।’

স্বাতী বলল, ‘তুই কি চাস তোর এ-রকম একটা ছবি আঁকা হোক?
‘চুপ কর।’

‘আচ্ছা যা চুপ করলাম। যদিও তোর চোখে তৃষ্ণার ছায়া দেখতে পাচ্ছি। তোর মন বলছে, আহারে আমার যদি এ-রকম একটা ছবি থাকত। বুঝলি লিলি, মানুষের পুরো জীবনটাই হলো এক গাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ণ তৃষ্ণার সমষ্টি। A collection of unfulfilled desires. অধিকাংশ তৃষ্ণা মেটানো কিন্তু কঠিন না। মেটানো যায়। সাহসের অভাবে আমরা মিটাতে পারি না।’

‘বেশি বেশি সাহস কি ভালো?’

‘সাহস হলো মানুষের প্রধান কিছু গুণের একটি।’

‘স্বাতী আমি বাসায় যাব। আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি একা একা বাসায় যেতে পারব না।’

‘দেব, বাসায় পৌঁছে দেব। এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? তুই আরাম করে একটু বোস। গুছিয়ে বলত গুনি ছবির ব্যাপারটা ওকে কিভাবে বলেছিস।’

‘সাধারণভাবে বলেছি।’

‘তোরা দু’জনে মিলে কি অনেকক্ষণ গল্প করেছিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘মানুষটাকে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে না?’

‘হ্যাঁ।’

‘ইন্টারেস্টিং কেন মনে হয়েছে বলত?’

‘জানি না। আমি তোর মতো এত বিচার বিশ্লেষণ করি না।’

স্বাতী গম্ভীর গলায় বলল, ‘লোকটাকে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে কারণ তার মধ্যে একটা গৃহী ভাব আছে। অধিকাংশ পুরুষমানুষের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এদের মন পড়ে আছে বাইরে। হাসনাতের বেলায় উল্টোটা মনে হয়। ওকে বিয়ে করলে জীবনটা ইন্টারেস্টিং হতো।’

‘তা হলে বিয়ে করলি না কেন?’

স্বাতী জবাব দিল না। হাসতে লাগল। হাসি থমিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, ‘বুধবার বিয়ে হবার কথা মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ মনে হলো আসলে আমাকে ও ভালোবাসে না। ও আমার মধ্যে অন্য কাউকে খুঁজছে। প্রকৃতভাবেই খুঁজছে। ওকে বিয়ে করলে সুখী একটা পরিবার তৈরি হতো। এর বেশি কিছু না।’

লিলি বলল, ‘সুখী পরিবার তুই চাস না?’ স্বাতী মিলির দিকে ঝুঁকে এসে বলল, ‘আমাদের পরিবারটা দেখে তোর মনে হয় না কি সুখী একটা পরিবার? মনে হয় কি-না বল?’

‘হয়।’

‘বাবাকে দেখে মনে হয়, বাবা মা’র জন্য কত ব্যস্ত। মা’কে দেখে মনে হয় স্বামী অন্তঃপ্রাণ। স্বামী কী খেয়ে খুশি হবে এই ভেবে এটা রাঁধছে, ওটা রাঁধছে। তার ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে এইজন্য চা খেতে দিচ্ছে না। আসলে পুরোটাই ভান।’

‘ভান?’

‘অবশ্যই ভান। এক ধরনের প্রতারণা। ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা।’

‘বুঝলি কী করে খেলা?’

‘বোঝা যায়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। যে জন্য বাবা দিনরাত নিজের কাজ নিয়ে থাকে। এই ফার্নিচারের বার্নিশ ঘষছে, ঐ করাত নিয়ে কাঠ কাটছে। মা আছে রান্নাঘরে। অথচ কথা বলার সময় একজনের জন্য অন্যজনের কী গভীর মিথ্যা মমতা!’

‘মিথ্যা মনে করছিস কেন? মমতা তো সত্যিও হতে পারে।’

‘আমি জানি সত্যি না। তারা খেলছে পাতানো খেলা। পৃথিবীটাই পাতানো খেলার জায়গা। এই খেলা তুই হয়ত খেলবি। আমি খেলব না।’

লিলি বলল, ‘তোর দার্শনিক কথাবার্তা শুনতে আমার এখন ভালো লাগছে না। আমি বাসায় যাব।’

‘চল তোকে দিয়ে আসি। ও আচ্ছা, তোকে বলতে ভুলে গেছি। এর মধ্যে কতবার যে তোর খোঁজে তোর বাবা টেলিফোন করেছেন। তুই নেই বলার পরেও বিশ্বাস করেন নি। একবার নিজে এসে দেখে গেছেন। তুই কি বাসায় কাউকে না বলে এসেছিস?’

‘হুঁ।’

‘তাহলে তো বাসায় গেলে আজ সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

‘হুঁ।’

‘তোর বাবা তোকে কিমা বানিয়ে ফেলবে।’

লিলি ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার হাত কাঁপতে শুরু করেছে।

লিলি বাসায় পৌঁছল রাত দশটার একটু আগে। স্বাতী তাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়েছে। সে বাড়ির সামনে নামে নি, লন্ড্রির সামনে নেমে হেঁটে হেঁটে বাসায় গিয়েছে। বাড়ির সদর দরজা খোলা, প্রতিটি বাতি জ্বলছে। বাড়িতে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে তা আলো দেখলে বোঝা যায়। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটলে মানুষ যেখানে মৃত বাতি আছে জ্বলে দেয়।

লিলি ভয়ে ভয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তাকে প্রথমে দেখা গেল মিতির মা। সে একগোছা বাসন-কোসন নিয়ে কলঘরের দিকে যাচ্ছিল। লিলিকে দেখেই— ‘ও আফাগো’ বলে বিকট চিৎকার দিল। হাত থেকে সম্ভবত হুঁচক করেই সব বাসন-কোসন ফেলে দিল। ঝনঝন শব্দ হলো। দোতলা থেকে রুমু রুমু একসঙ্গে নিচে নামছে।

বড় চাচা তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসেছেন।

তিনি বললেন, ‘কোথায় লিলি, আয় দেখি আমার ঘরে আয়।’

লিলি রুমুর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মা কোথায় রে?’

রুমু বলল, ‘মা’র বিকেল থেকে বুকে ব্যথা হচ্ছে। মা শুয়ে আছে। মা’র ধারণা তুমি আর ফিরে আসবে না।’

‘বাবা! বাবা কোথায়?’

‘বাবা তোমাকে খুঁজতে গেছে।’

‘কোথায় খুঁজতে গেছে?’

‘কোথায় আর খুঁজবে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। আর ছোট চাচা গেছে হাসপাতালে।’

ঝুমু বলল, ‘আমার এতক্ষণ ভয় লাগে নি। এখন ভয় লাগছে। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে আপা।’

‘কেন?’

‘মনে হচ্ছে বাবা ফিরে এসে তোমাকে খুনটুন করে ফেলবে।’

বড় চাচা বারান্দা থেকে আবারও ডাকলেন, ‘লিলি কোথায়?’

লিলি বলল, ‘চাচা আপনি ঘরে যান। আমি আসছি।’

‘তাড়াতাড়ি আয়।’

লিলি মা’র ঘরে গেল। সব ঘরের বাতি জ্বলছে। শুধু এই ঘরের বাতি নেভানো। লিলি দরজা থেকে ডাকল— ‘মা।’

ফরিদা বুকে তীব্র ব্যথা নিয়ে অনেক কষ্টে পাশ ফিরলেন। চাপা গলায় বললেন, ‘বাতি জ্বালা।’

লিলি বাতি জ্বালাল। মায়ের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। একদিনে মানুষটা কেমন হয়ে গেছে। যেন একজন মরা মানুষ। তিনি বললেন, ‘তুই ভাত খেয়েছিস?’

লিলির খুবই অবাক লাগছে। তাকে দেখে তার মা’র প্রথম যে কথাটা মনে হতো তা হচ্ছে, সে ভাত খেয়েছে কিনা। সব মা কি এ-রকম? না শুধু তার মা? ফরিদা বললেন, ‘তুই আলুভাজি পছন্দ করিস, তোর জন্য আলুভাজি করেছি।’

‘তোমার কি বুকে ব্যথা খুব বেশি মা?’

‘হ্যাঁ।’

‘হাত বুলিয়ে দেব?’

‘দে।’

নেয়ামত সাহেব বাড়ি ফিরলেন রাত এগারোটার দিকে। লিলি তার ঘরে শুয়ে ছিল। ঝুমু দৌড়ে এসে খবর দিল। ভয়ে কাঁঠ হয়ে লিলি অপেক্ষা করছে। কখন তার ডাক পড়ে। তার ডাক পড়ছে না।

ঝুমু কিছুক্ষণ পর আবার এসে জানালো, ‘বাবা বারান্দায় বসে কান দিচ্ছে।’

হ্যাঁ, কান্নার শব্দ লিলি শুনছে। কী বিশ্রী শব্দ করে কান্না!

কান্না থামার পরেও নিয়ামত সাহেব তার মেয়েকে ডাকলেন না। তিনি এক বৈঠকে এক শ’ রাকাত নামাজ মানত করেছিলেন। তিনি মানত আদায় করতে জলচৌকিতে উঠে বসলেন।

শুধু নামাজ না, দুটি খাসিও মানত করা হয়েছিল। জাহেদুর রহমান রাতেই আমিনবাজার থেকে খাসি কিনে এনেছে। খাসি দুটি ব্যা ব্যা করেই যাচ্ছে।

লিলিদের যেখানে যত আত্মীয়স্বজন ছিল সবাই আসতে শুরু করেছে। সবাই কাছেই খবর গিয়েছে লিলিকে পাওয়া যাচ্ছে না। এমদাদিয়া মাদ্রাসার এক হাফেজ সাহেবকে সন্ধ্যাবেলায় খবর দিয়ে আনা হয়েছিল কোরান খতম করার জন্য। তিনি পারা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছেন। এখন অষ্টম পারা শুরু করেছেন। বাড়িতে হইচই! কোনো কিছুই তাঁকে বিচলিত করছে না। তিনি একমনে কোরান পাঠ করে যাচ্ছে।



রাতে লিলি মরার মতো ঘুমিয়েছে একবার শুধু ঘুম ভেঙেছে, তখন দেখে মা তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। সে ঘুমঘুম গলায় ডাকল, ‘মা!’ ফরিদা তৎক্ষণাৎ বললেন, ‘কি গো মা।’

‘কিছু না ঘুমাও।’ বলেই লিলি ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভাঙল সকাল দশটায়। ঘরের ভেতর আলো, বিছানায় চনমনে রোদ। ঘুম ভাঙার পরেও অনেকক্ষণ সে বিছানায় শুয়ে রইল। এক ফাঁকে ঝুমু এসে উঁকি দিল। ঝুমুর চোঁটের ফোলা কমেনি— আরও মন হয় বেড়েছে। তার মুখ লালচে হয়ে আছে। কাল রাতে লিলি এটা লক্ষ করে নি।

‘তোর চোঁটের অবস্থা তো খুব খারাপ।’

‘হুঁ।’

‘ব্যথা করছে না?’

‘করছে’

‘ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার তো।’

ঝুমু সহজ গলায় বলল, ‘বড় চাচা হোমিওপ্যাথি করতে বলেছেন। সামছুদ্দিন চাচা ওষুধ দিয়েছেন।’

‘ইনজেকশন দেয়ার কথা যে ছিল দেয়া হচ্ছে না?’

‘না। হোমিওপ্যাথি কাজ না করলে তখন দেয়া হবে।’

‘এর মধ্যেই তো মনে হয় গ্যাংগ্রিন ফ্যাংগ্রিন হয়ে তুই মরে যাবি।’

‘হুঁ।’

লিলি বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা শরীরে নিয়ে সে কত স্বাভাবিকই না আছে। ঝুমু বলল, ‘আপা তুমি চা খাবে? তোমার জন্য চা নিয়ে আসি?’

‘হাত-মুখ ধুইনি তো এখনও।’

‘তুমি হাত-মুখ ধোও আমি চা নিয়ে আসছি।’

হাত-মুখ ধুতে যাবার কোনো ইচ্ছা করছে না। বিছানায় শুয়ে আরও খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করতে ইচ্ছা করছে। বারান্দা থেকে ঝুমুর গলা শোনা যাচ্ছে ‘খবরের কাগজ কোথায়? এখনও দেয় নাই? হারামজাদ! ঝুমুরকে আমি খুন করে ফেলব।’

বাবা আজ তাহলে অফিসে যান নি। লিলির সঙ্গে তাঁর এখনও দেখা হয় নি। লিলি জানে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ডাক পড়বে। কাল সারাদিন কোথায় ছিল, এত রাতে কোথেকে এসেছে, কে তাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে, অন্য একটা শাড়ি পরে সে বাসায় ফিরেছে, শাড়িটা কার? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হবে।

লিলি ঠিক করেছে সব প্রশ্নের জবাব সে দেবে। শান্ত ভঙ্গিতেই দেবে। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে পারে না। আজ বলবে।

বাবার সঙ্গে কথা বলার পর সে যাবে বড় চাচার ঘরে। বড় চাচাকে বলবে, ঝুমুর ঠোঁটের এই অবস্থা আর আপনি তাকে হোমিওপ্যাথি করাচ্ছেন। তাকে এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। ভালো কোনো ডাক্তার। বড় চাচা যদি বলেন, ‘ডান দিকের জানালার পাল্লাটা একটু টেনে দে।’ তখন সে বলবে, ‘চাচা পাল্লাটা তো আপনার হাতের কাছেই। আপনি নিজেই একটু টেনে নিন।’

তারপর সে নিচে নামবে। ঝুমু ঝুমুর স্যার যদি ইতিমধ্যেই এসে থাকেন তাহলে তাঁকে বলবে, ‘এই যে ভদ্রলোক শুনুন, সবার সামনে বিশ্রী ভঙ্গিতে নাকের লোম ছিঁড়বেন না। আবার কখনও যদি আপনাকে এই কাজ করতে দেখি তাহলে আপনার নাক আমি কেটে ফেলব।’

ঝুমু চা নিয়ে এসেছে। লিলি বাসি মুখেই চায়ে চুমুক দিচ্ছে। চা-টা খেতে ভালো লাগছে। ঝুমু পাশে দাঁড়িয়ে আগ্রহ নিয়ে চা খাওয়া দেখছে। লিলি বলল, ‘কিছু বলবি ঝুমু?’

‘না।’

‘কাল ফিরতে দেরি করায় তোরা খুব চিন্তা করছিলি?’

‘আমি আর ঝুমু বাদে সবাই চিন্তা করছিল।’

‘তোরা চিন্তা করিস নি?’

‘না। তুমি যদি রাতে না ফিরতে তাহলে আজ সকালে আমি আর ঝুমু পালিয়ে যেতাম।’

‘কোথায়?’

ঝুমু কিছু বলল না, হাসতে লাগল। লিলি শঙ্কিত গলায় আবার বলল, ‘কোথায় পালাতি?’

ঝুমু হাসছে। মাটির দিকে তাকিয়ে হাসছে। সে অনেক কথা বলে ফেলেছে। আর বোধহয় কিছু বলবে না। লিলিকে অবাক করে দিয়ে ঝুমু আবারও কথা বলল, তবে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ।

‘মা কাল তোমার জন্য খুব মার খেয়েছে।’

‘মা মার খেয়েছে?’

‘মা তোমাকে বাঁচাবার জন্য বলেছিল সেই তোমাকে ইউনিভার্সিটিতে যেতে বলেছে বলে তুমি গেছ। আর তাতেই বাবার মাথায় আগুন ধরে গেল। কিল চড় ঘুসি—ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।’

‘তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি?’

‘হুঁ।’

‘মাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলি না?’

‘না।’

‘আশ্চর্য, তোরা চূপ করে দেখলি?’

ঝুমু আবার হাসল। লিলি তীব্র গলায় বলল, ‘তুই হাসছিস?’

ঝুমু বলল, ‘তখন একটা মজার কাণ্ড হলো, আমাদের মতির মা বুয়া মাছ কাটার বাঁটি হাতে নিয়ে ছুটে গেল। চিৎকার করে বলল, আম্মারে ছাড়েন। না ছাড়লে বাঁটি দিয়া কল্লা নামাইয়া ফেলমু। তখন বাবা মা’কে ছেড়ে দিল।’

‘অনেক কাণ্ড তাহলে হয়েছে?’

‘হুঁ। আরও অনেক কাণ্ড হবে।’

‘কী হবে?’

‘তোমার বিয়ে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে হবে। বাবা আর বড় চাচা মিলে ঠিক করেছে।’

‘কার সঙ্গে হবে?’

‘সেটা পুরোপুরি ঠিক হয় নি। বাবার এক বন্ধুর ছেলে আছে। পুরনো ঢাকায় মোটর পার্টসের দোকান। আজ সন্ধ্যাবেলা সে আসবে। বড় চাচা তার ইন্টারভু নেবেন।’

লিলি বিস্ময় নিয়ে ঝুমুর কথা শুনছে। কথার বিষয়বস্তুর চেয়েও ঝুমুর কথা বলার উৎসাহ দেখেই সে বেশি অবাক হচ্ছে। লিলি বলল, ‘তুই হঠাৎ এত কথা বলা শুরু করলি ব্যাপারটা কী? তুই একাই কথা বলা শুরু করেছিস না ঝুমুও শুরু করেছে?’

ঝুমু আবারও হাসল।

লিলি বলল, ‘ঝুমু কোথায়?’

‘স্যারের কাছে পড়ছে। আপা তোমার চা খাওয়া হয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে চলো, বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য বাবা আজ অফিসে যান নি।’

‘আচ্ছা তুই যা আমি আসছি।’

লিলি দাঁত মাজল, হাত-মুখ ধুল, চুল আঁচড়াল। কি মনে করে শাড়িও পাল্টাল। তার ঘর থেকে বাবার ঘরে যেতে হলে বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়। এই প্রথম বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন না— কে যায়, লিলি না? একটু শুনে যা তো।

নেয়ামত সাহেব খবরের কাগজ নামিয়ে রাখলেন, চশমা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, ‘বোস’। লিলি বসল এবং বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, চোখ নামিয়ে নিল না। নেয়ামত সাহেব সিগারেট ধরালেন।

‘তুই কাল কোথায় গিয়েছিলি?’

‘ইউনিভার্সিটিতে’।

‘তারপর কোথায় গিয়েছিলি?’

‘একটা বাসায় গিয়েছিলাম। কলাবাগানে।’

‘তোর কোন বান্ধবীর বাড়িতে?’

‘না।’

‘তাহলে কার বাড়িতে?’

‘হাসনাত সাহেব নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে।’

‘উনি কী করেন?’

‘উনি একজন পেইন্টার। ছবি আঁকেন।’

‘ঐ বাড়িতে আর কে কে থাকে?’

‘উনি একাই থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁর মেয়ে এসে থাকে।’

‘তাঁর স্ত্রী কোথায়?’

‘বোধহয় মারা গেছেন।’

‘বোধহয় বলছিস কেন?’

‘উনার মেয়েটা বলছিল মারা গেছেন। আমার তা মনে হয় নি। আমার মনে হয়েছে ভদ্রলোক ডিভোর্সড!’

‘তুই কি প্রায়ই ঐ বাড়িতে যাস?’

‘আগে একবার গিয়েছিলাম।’

‘তোর মা বলছিল অন্য কার একটা শাড়ি পরে তুই ফিরেছিস।’

‘বৃষ্টিতে শাড়ি ভিজে গিয়েছিল সে জন্য বদলেছি।’

নেয়ামত সাহেব চুপ করে আছেন। লিলি অবাক হয়ে লক্ষ করল— বাবা এখন আর তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছেন না। চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর হাতের সিগারেট অনেক আগেই নিভে গেছে। তিনি নেভা সিগারেটেই টান দিচ্ছেন। লিলি বলল, ‘বাবা সিগারেট নিভে গেছে।’

নেয়ামত সাহেব লিলির এই কথাতেও চমকালেন। সিগারেট ধরালেন না। নেভা সিগারেটে আবার টান দিলেন। লিলি বলল, ‘বাবা আমি যাই।’

নেয়ামত সাহেব হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। লিলি বাবার সামনে থেকে উঠে এলো। তিনি অদ্ভুত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লিলির খিদে পেয়েছে। নাশতার জন্য নিচে নামতে তার ইচ্ছা করছে না। সে ছাদে উঠে গেল। ছোট চাচার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। সহজভাবে কিছুক্ষণ কথা বলবে। হাসি-তামাশা করবে।

জাহেদুর রহমান জুতা পলিশ করছিল। সে লিলির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, ‘তোর জন্য কাল আমার যে যন্ত্রণা হয়েছে। রাত দুপুরে খাসি কিনতে গেছি আমিনবাজার। ঠেলে ঠেলে দুটিকে বেবিট্যাক্সিতে তুললাম। এরা সারাপথ কী চিৎকার যে করেছে! ভাবটা এ-রকম যেন আমি এদের চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি। পিঠে আদর করি, গলা চুলকে দেই— কিছুতেই কিছু হয় না, ভ্যা ভ্যা। সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে পুলিশ বক্সের কাছে পুলিশ এসে ধরল।’

‘কেন?’

‘আমারও প্রশ্ন, কেন? আমি তো ইন্ডিয়ান গরু স্মাগল করে আনি নি। আমি এনেছি খাঁটি বঙ্গদেশীয় ছাগল।’

‘তারপর?’

‘আমি যে নগদ পয়সায় ছাগল কিনেছি পুলিশ বিশ্বাস করে না। বলে রসিদ দেখান। আরে ছাগলের আবার রসিদ কি? এটা কি মিথি? যে রসিদ নিয়ে আসব লাইসেন্স করাতে হবে।’

‘শেষে কী করলে?’

‘পান খাওয়ার জন্য পঞ্চাশটা টাকা ধরে দিলাম। আর মনে-মনে তোকে এক লক্ষ গালি দিলাম। কাল তুই কোথায় ছিলি? বান্ধবীর বাসায় লুকিয়ে ছিলি?’

লিলি হাসল।

জাহেদুর রহমান বলল, ‘আমিও ভাইজানকে তাই বললাম। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ের দৌড় হলো বান্ধবীর বাড়ি পর্যন্ত। ভাইজান আমার কথা বিশ্বাস করল না— এমন হইচই।’

‘তোমার আমেরিকা যাবার নতুন কিছু হয়েছে?’

‘বৃহস্পতিবার আবার ইন্টারভিউ দিচ্ছি। মরমন পান্ডি কথা দিয়েছে সাহায্য করবে। কাকে নাকি বলে দেবে।’

‘তুমি কি খ্রিস্টান হয়ে গেছ?’

‘এখনও হই নি। ব্যাটার নাকের সামনে মুলা ঝুলিয়ে রেখেছি। একবার খ্রিস্টান হয়ে গেলে তো আর পাত্তা দেবে না। ঠিক না?’

‘হুঁ।’

‘দেশ ছেড়ে দেবার এখন হাই টাইম। ভেরি হাই টাইম।’

‘কেন?’

‘খবর কিছু জানিস না।’

‘না।’

‘বড় ভাইজান ভোম মেরে বসে আছে সেটা দেখেও কিছু বুঝতে পারছিস না?’

‘না।’

‘আমাদের সৎ মা দি গ্রেট লেডি মোসাম্মত আফরোজা বেগম যার নামে আমাদের এই বাড়ি ‘রহিমা কুটির’ তিনি তাঁর বাড়ি ফেরত চেয়েছেন।’

‘তাই না-কি?’

‘হ্যাঁ। মুখের কথায় চাওয়া না, উকিলের চিঠিফিঠি পাঠিয়ে বেড়াচ্ছে। বড় ভাইজানের পালপিটশন শুরু হয়ে গেছে। ক্রমাগত ঠাণ্ডা পানি খাচ্ছে আর বাথরুমে যাচ্ছে।’

‘আমাদের এখন হবে কী?’

‘হবে আবার কি? তোরা কমলাপুর রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকবি।’

‘তুমি মনে হচ্ছে ব্যাপারটায় খুশি?’

‘আমার অখুশি হবার কি আছে। আমি তো আর দেশে থাকছি না। তুইও থাকছিস না।’

‘আমি যাব কোথায়?’

‘তোমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না? কে নাকি আজ সন্ধ্যায় তোকে দেখতে আসবে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর ডিসগ্র্যাডভানটেজ যেমন আছে, গ্র্যাডভানটেজও আছে। বিপদের সময় অন্যের গলা ধরে ঝুলে পড়ার সুযোগ আছে।’

জাহেদুর রহমান প্রবল বেগে জুতা ব্রাশ করছে। বৃহস্পতিবারের ভিসা ইন্টারভিউর প্রস্তুতি।

সন্ধ্যাবেলা গাঁফওয়ালা এক ছেলে সত্যি সত্যি বৃষ্টি এসে উপস্থিত। তার গা দিয়ে সেটের গন্ধ বেরুচ্ছে। বর্তমান কালের স্টাইল শার্টের সামনে দুটি বোতাম খোলা। শরীরের তুলনায় তার মাথাটা ছোট এবং মনে হয় স্প্রিং বসানো। সারাক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ফরিদা সেমাই রান্না করতে বসেছেন। মতির মাকে টাকা দিয়ে পাঠানো হয়েছে মিষ্টি আনতে।

লিলি এসে মা’র পাশে দাঁড়াল। সহজ গলায় বলল, ‘মা ছেলেটাকে দেখেছ?’

ফরিদা চোখ না তুলেই বললেন, ‘হুঁ’।

‘ছেলেটাকে তোমার কেমন লাগছে মা?’

‘ভালোই তো।’

‘বেশ ভালো, না মোটামুটি ভালো?’

‘বেশ ভালো— তবে চোখ দুটো ভালো না। রুমু রুমুর মাস্টারের মতো। শকুন
শকুন চোখ।’

‘তার জন্য চা নিয়ে কি আমাকে যেতে হবে?’

‘হুঁ।’

‘এই শাড়ি পরে যাব, না ভালো কোনো শাড়ি পরব?’

‘সবুজ শাড়িটা পর। রুমুকে বল চুল বেগি করে দিতে।’

‘আচ্ছা।’

লিলি বলল, ‘মা তোমার কাছে মনে হচ্ছে না, ছেলেটার মাথা শরীরের তুলনায়
ছোট?’

ফরিদা চুলায় ডেকচি বসাতে বসাতে বললেন, ‘ভারী জামা-কাপড় পরেছে তো।
এইজন্য মাথাটা ছোট লাগছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলে দেখবি মাথা ঠিকই
লাগছে।’

লিলি হাসছে। খিলখিল করে হাসছে। ফরিদা লিলির হাসির কারণ ঠিক ধরতে
পারছেন না।



হাসনাত সকাল থেকেই স্টুডিওতে। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য বের হয়েছিল। প্যান্টের
করে স্যান্ডাইচ এবং দড়িতে বেঁধে এক ডজন কলা দিয়ে ফিরেছে। জাহিনে
বলেছে, মা খেয়ে নাও তো। রাতে আমরা খুব ভালো কোনো জায়গায় খাবি। হোটেলে
সোনারগাঁও, কিংবা শেরাটন এই জাতীয় জায়গায়। বলেই সে অপেক্ষা করল।
স্টুডিওতে ঢুকে পড়েছে। জাহিন স্টুডিওর দরজা ধরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, নানা
তুমি কিছু খাবে না। হাসনাত কিছু বলল না। কিন্তু তাকাল বিস্ময়মুখে। যে বিরান
অর্থ— খবরদার আর ডাকাডাকি করবে না।

গভীর মনোযোগে হাসনাত কাজ করছে। ব্রাশের কাজ শুরু হয়েছে। এবং
রঙ ব্যবহার করা হবে— নীল। নীলের সঙ্গে শাদা মিশিয়ে নানান ধরনের
ছবির বিষয়বস্তু সাধারণ। ছাঁদে শাড়ি শুকাতো দিয়েছে একটা মেয়ে। দড়িতে
মেলছে। ভেজা শাড়ি থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। যে
আকাশ ঘন নীল। রঙের ধর্ম হলো রঙ এক জায়গায় স্থির থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে।
আকাশের নীল ছড়িয়ে পড়েছে ছাদে, ভেজা শাড়িতে, শাড়ির গা থেকে গড়িয়ে পড়া
পানির ধারায়। রঙকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার এই প্রক্রিয়াটিই সবচেয়ে জটিল
প্রক্রিয়া। সমস্ত ইন্দ্রিয় এই প্রক্রিয়ার সময় সূঁচের মতো তীক্ষ্ণ করে রাখতে হয়।
সাধকের একাগ্রতা তখনই প্রয়োজন হয়।

হাসনাত হাজার চেষ্টা করেও মন বসাতে পারছে না। বারবার সুতা কেটে যাচ্ছে। যদিও তার আপাতত কোনো কারণ নেই। জাহিন বিরক্ত করছে না। সে ঘরে আছে কি ঘরে নেই তাও বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে গল্পের বই নিয়ে মগ্ন। স্টুডিওর দরজা-জানালা বন্ধ। বাইরের আওয়াজ কানে আসছে না। ইজেলের উপর আট শ' ওয়াটের আলো ফেলা হয়েছে। তেমন আলো হয় নি, ঘর গরম হয়ে গেছে।

হাসনাত শার্ট খুলে ফেলল। গরমের কারণেই কি বারবার তার একাত্মতায় বাধা পড়ছে? না-কি অন্য কিছু— স্টুডিওতে ফ্যান নেই। ফ্যানের শব্দে তার অসুবিধা হয়। তাছাড়া ফ্যান রঙে মেশানো তার্পিন তেল দ্রুত উড়িয়ে নেয়। এই ঘরে দামি একটা এয়ারকুলার ফিট করা থাকলে ভালো হতো। ঘরটা এক্সিমোদের ইগলুর মতো ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে। সেই হিম হিম পরিবেশে সে কাজ করবে। হাত চলবে যন্ত্রের মতো। আজ হাত চলছে না। মনে হচ্ছে হাতের মাংসপেশিতে টান পড়ছে। এক শ' মিটার দৌড়ের শেষ মাথায় যখন কোনো খেলোয়াড়ের পায়ের মাংসপেশিতে টান পড়ে, দু'হাতে পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে সে তাকায় অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। হাসনাত এখন ঠিক সেই দৃষ্টিতেই তার হাতের দিকে তাকাচ্ছে।

‘বাবা!’

হাসনাত হাতের ব্রাশ নামিয়ে রেখে মেয়ের দিকে তাকাল। তার মুখের দিকে তাকাল না, তাকাল পায়ের দিকে। মুখের দিকে তাকালে মেয়েটা মন খারাপ করবে। সে তার বাবার রাগ বুঝে ফেলবে। হাসনাত বলল, স্যান্ডউইচ খেয়েছ মা?

‘না।’

‘খেলে না কেন? ভালো হয় নি?’

‘আমার খেতে ইচ্ছা করছে না বাবা।’

‘একটা কলা খাও।’

‘কলা খেতেও ইচ্ছা করছে না।’

‘তাহলে শুয়ে শুয়ে গল্পের পই পড়ো। ঠিক যখন পাঁচটা বাজবে, আমাকে ডেকে দেবে।’

‘পাঁচটা বাজে।’

‘পাঁচটাতো বাজে, বলো কি? তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও। খুব তাড়াতাড়ি। আমরা এক জায়গায় বেড়াতে যাব। তারপর রাতে বাইরে খাব। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা শেষ হবার পর ফেরার পথে আইসক্রিম কিনে দেব।’

‘আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না বাবা। শরীর ঠাণ্ডা লাগছে।’

‘যখন বেড়াতে যাব তখন আর শরীর খারাপ লাগবে না। মন খারাপ থাকলেই শরীর খারাপ হয়। মন যখন ভালো হবে তখন আপন আপনি শরীর ভালো হবে।’

‘বাবা, একজন ভদ্রলোক এসেছেন। আমি তাকে বারান্দায় চেয়ারে বসিয়ে রেখেছি।’

‘ভালো করেছে। দাঁড়াও তার সঙ্গে কথা বলছি। তুমি তৈরি হয়ে নাও তো মা। তোমার যে পরী পরী ধরনের শাদা ফ্রকটা আছে এটা পরো।’

‘আমার একদম যেতে ইচ্ছা করছে না বাবা।’

‘কাপড় পরো তারপর দেখবে যেতে ইচ্ছা করবে।’

জাহিন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। হাসনাত শার্ট গায়ে দিয়ে উঠে এল, মেয়ের

হাত ধরে সে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেল। জ্বরে জাহিনের গা প্রায় পুড়ে যাচ্ছে। এত জ্বর নিয়ে মেয়েটা যে তার সঙ্গে কথা বলছে, সহজভাবে দাঁড়িয়ে আছে এটাই একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

‘মা, তোমার শরীর তো খুবই খারাপ।’

‘হুঁ।’

‘এসো শুইয়ে দি।’

হাসনাত কোলে করে মেয়েকে নিয়ে শুইয়ে দিল। ওয়ার্ডরোব খুলে মেয়ের গায়ে কমল দিল। জ্বর কমানোর জন্য মেয়েকে এনালজেসিক কিছু খাওয়ানো দরকার। ফার্মেসি থেকে নিয়ে আসতে হবে। সোনারগাঁও হোটেলের এ্যাপয়েন্টমেন্টটা কিছুতেই মিস করা যাবে না। হাসনাত কি করবে ধাঁধায় পড়ে গেল। জাহিন বলল, ‘বাবা একজন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় বসে আছেন।’

‘আচ্ছা আমি উনাকে বিদায় করে আসছি। তোর হট করে এত জ্বর উঠে গেল কীভাবে?’

জাহিন হাসল। লজ্জার হাসি। যেন হট করে জ্বর ওঠায় সে খুব বিব্রত ও লজ্জিত।

বারান্দা ঘিনি বসে আছেন হাসনাত তাকে চিনল না। স্মার্ট পোশাকের এক ভদ্রলোক, তবে গলায় সোনার চেইন চকচক করছে। সোনার চেইনের কারণে যে ভদ্রলোকের সব স্মার্টনেস ধুয়েমুছে গেছে তা তিনি জানেন না।

‘আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।’

‘আমার নাম জাহেদুর রহমান। আমি লিলির ছোট চাচা।’

‘কিছু মনে করবেন না। আমি এখনও চিনতে পারছি না।’

‘লিলি! ও আপনার এখানে এসেছিল। একটা শাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। ফেরত পাঠিয়েছে আর জাহিনের জন্য একটা গল্পের বই পাঠিয়েছে।’

‘ও আচ্ছা আচ্ছা, লিলি! আমার মেয়েটার হঠাৎ খুব জ্বর এসেছে। আমার নিজের মাথা গেছে এলোমেলো হয়ে। প্লিজ কিছু মনে করবেন না। প্লিজ।’

‘না না, মনে করব কি? জ্বর কত?’

‘জ্বর যে কত তাও তো বলতে পারছি না। ঘরে থার্মোমিটার নেই।’

‘আমি কি একটা থার্মোমিটার কিনে নিয়ে আসব?’

হাসনাত জাহেদুর রহমানের দিকে তাকিয়ে আছে। জাহেদুর রহমান সোনার চেইনের কারণে শুরুতে ভদ্রলোককে যতটা খারাপ লাগছিল এখন ততটা খারাপ লাগছে না। মানুষের চেহারা তার আচার-আচরণের ওপরও নির্ভরশীল। চিত্রকর ছবিতে চেহারা ধরতে পারেন। আচার-আচরণ ধরতে পারেন না। সবাই যে পারেন না, তা না। মহান চিত্রকরদের কাউকে কাউকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

জাহেদুর রহমান বলল, ‘একটা থার্মোমিটার আর জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল সিরাপ জাতীয় কিছু নিয়ে আসি।’

হাসনাত বিনীত ভঙ্গিতে বলল, ‘এনে দিলে খুব ভালো হয়। সো কাইন্ড অব ইউ। একটু দাঁড়ান আমি আপনাকে টাকা এনে দিচ্ছি।’

‘টাকা পরে দেবেন।’

জাহেদুর রহমান ব্যস্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেল।

জ্বর এক শ' তিন পয়েন্ট পাঁচ।

হাসনাতের মুখ শুকিয়ে গেল। জাহেদুর রহমান বলল, 'আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। বাচ্চা ছেলেমেয়ের এক শ' তিন/চার জ্বর কোনো জ্বরই না। ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। এফুনি এ্যাকশান শুরু হবে। মাথায় পানি ঢালতে হবে। নন স্টপ পানি ঢেলে জ্বর যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে এক শ'তে নামিয়ে আনতে না পারি তাহলে আমার নাম জাহেদুর রহমান না, আমার নাম হামেদুর রহমান। বালতি কোথায় বলুন দেখি? রবার ক্লথ আছে? না থাকলে নাই। নো প্রবলেম, ব্যবস্থা করছি।'

হাসনাত অবাক হয়ে দেখল এই নিতান্ত অপরিচিত ভদ্রলোক নিজেই ছোট্টাছুটি করে পানি ঢালার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তার মধ্যে কোনো রকম দ্বিধা নেই। কৃতজ্ঞতাসূচক কিছু এই ভদ্রলোককে বলা উচিত। হাসনাতের মুখে কোনো কথা আসছে না। না আসাই ভালো। এই জাতীয় মানুষ কৃতজ্ঞতাসূচক কিছু শোনার জন্য কাজ করেন না।

হাসনাত মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন কেমন লাগছে মা?'

'এখন ভালো লাগছে। বাবা, তোমার না কোথায় যাবার কথা।'

'তোকে এভাবে রেখে যাব কীভাবে?'

'উনি তো আছেন। তোমার জরুরি কাজ, তুমি যাও।'

জাহেদুর রহমান বলল, 'সিরিয়াস জরুরি কাজ থাকলে কাজ সেরে আসুন। আমি আছি। জ্বর নিয়ে চিন্তা করবেন না। জ্বর এর মধ্যে দুই ডিগ্রি নামিয়ে ফেলেছি। আরও নামাব। মাপুন তো দেখি জ্বরটা আরেকবার।'

আবার জ্বর মাপা হলো। সত্যি সত্যি জ্বর দু'ডিগ্রি নেমে গেছে। এখন এক শ' এক পয়েন্ট পাঁচ।

হাসনাত লজ্জিত গলায় বলল, 'আপনার কাছে মেয়েটাকে রেখে এক ঘণ্টার জন্য কি যাব? আমার যাওয়া খুব জরুরি। একজন অপেক্ষা করে থাকবে। রাতে ডিনারের নিমন্ত্রণও ছিল। ডিনার-টিনার না, আমি শুধু খবরটা দিয়ে চলে আসব।'

'আপনি চলে যান। মেয়েকে নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না।' জাহেদুর রহমান হাসনাত ইতস্তত করছে। জাহিন বলল, 'বাবা তুমি যাও। আমি উনি সঙ্গে গল্প করব। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

হাসনাত খুব মন খারাপ করে বের হলো।

জাহিন বলল, 'আপনার নিশ্চয়ই পানি ঢালতে ঢালতে ইচ্ছা ব্যথা হয়ে গেছে। হয় নি?'

'উহুঁ।'

'আর পানি ঢালতে হবে না। আমার জ্বর এখন কমে গেছে।'

'আরও দশ মিনিট পানি ঢালব তারপর রেস্ট নেব। তোমার মা কোথায় গেছেন?'

জাহিন লজ্জিতস্বরে বলল, 'আমি যখন ছোট তখন মা মারা গেছেন।'

জাহেদুর রহমান প্রশ্নটা করে লজ্জায় পড়ে গেল। ঘটনা এ-রকম জানলে সে এই প্রশ্ন করত না।

জাহিনের চোখে এই মানুষটার অস্বস্তি ধরা পড়েছে। জাহিনেরও খারাপ লাগছে।

জাহিন বলল, 'সত্যি কথাটা আপনাকে বলি— মা আসলে বেঁচেই আছে। বাবার সঙ্গে রাগ করে মা আমাদের ফেলে চলে গিয়েছিল। অন্য একটা লোকের সঙ্গে গিয়েছিল। সেটা তো খুব লজ্জার ব্যাপার এইজন্য মা'র কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে আমরা দু'জনই মিথ্যা কথা বলি। বাবা যখন মিথ্যা বলে তখন বাবার পাপ হয়। বড়দের মিথ্যা বললে পাপ হয়। আমি যখন মিথ্যা বলি তখন পাপ হয় না। আমার বয়স তো বারোর নিচে, এইজন্য পাপ হয় না। বারো বছরের নিচের কেউ মিথ্যা কথা বললে পাপ হয় না কেন সেটা জানেন?'

'না।'

'বারো নিচের সব ছেলেমেয়ে হলো ফেরেশতা। এজন্য তাদের পাপ হয় না। তবে পাপ না হলেও যখন মিথ্যা করে বলি মা মারা গেছে তখন খুব কষ্ট হয়।'

জাহেদুর রহমানে চোখে পানি চলে এসেছে। সে চোখের পানি আড়াল করার জন্য মাথায় পানি ঢালা বন্ধ রেখে বারান্দায় চলে গেল।

সব জায়গায় সব পোশাকে যাওয়া যায় না। গ্রামের হাটে থ্রি পিসসুট পরে হাঁটলে নিজেকে সঙের মতো রাগবে। আবার সোনারগাঁও হোটেলে আধ ময়লা শার্ট (যার অর্ধেকটা ভেজা এবং বুকের কাছে নীল রং লেগে আছে) বেমানান। হাসনাত লক্ষ করল সবাই তাকে দেখছে। ভুরু কুঁচকাচ্ছে না, কারণ সভ্য মানুষ ভুরু কুঁচকায় না। কুঁচকালেও তা চোখে পড়ে না।

হোটেলের রিসেপশনিস্ট অবশ্য স্পষ্টতই ভুরু কুঁচকালো। প্রায় অভদ্রের মতোই বলল, 'কাকে চান?'

'রুবি। রুবি হক। রুম নং তিন শ' চার।'

'এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'আছে।'

'দাঁড়ান, জিজ্ঞেস করে দেখি।'

জিজ্ঞেস করে দেখি বলেও সে দেখছে না। হাতের কাজ সারছে। ভেজা শার্টের একটা মানুষকে অপেক্ষা করানো যায়। এক সময় রিসেপশনিস্টের দৃষ্টি হলো। ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করল।

'যান, সিঁড়ি দিয়ে চলে যান। সেকেন্ড ফ্লোর। ম্যাডাম যেতে বলেছেন।'

'ধন্যবাদ।'

রিসেপশনিস্ট ধন্যবাদের জবাব দিল না। বড় হোটেলের কর্মচারীদের এটিকেই শেখার জন্য দীর্ঘ ট্রেনিং নিতে হয়। তবে সেই এটিকেই সবার জন্য না।

ডোর বেলে হাত রাখতেই ভেতর থেকে শুধু এবং পরিষ্কার ইংরেজিতে বলা হলো, Door is open, come in please. হাসনাত ঘরে ঢুকল। রুবি চেয়ারে বসে ছিল। সে উঠে দাঁড়াল। শান্ত গলায় বলল, 'এসো ভেতরে এসো। জাহিন কোথায়?'

'ও আসে নি। শরীর ভালো না। জ্বর।'

'আমার তো মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই আন নি।'

হাসনাত শান্ত গলায় বলল, রুবি, 'আমি কখনও ট্রিকস করি না।'

'সরি I know that. বসো।'

রুবিকে দেখে চমকের মতো লাগছে। তার চেহারা পাল্টে গেছে। খাড়া নাক।
ঠোঁটের কোথায় যেন কি একটা পরিবর্তন হয়েছে, সূক্ষ্ম পরিবর্তন। যেহেতু
পরিবর্তনটা ঠোঁটে সেহেতু ছোট পরিবর্তনও বড় হয়ে চোখে লাগছে। শাড়ি পরেছে।
সেই শাড়ি পরাতেও কিছু আছে। ঠিক বাঙালি মেয়ের শাড়ি পরা বলে মনে হচ্ছে না।

রুবি বলল, 'কী দেখছ?'

'তোমাকে চেনা যাচ্ছে না।'

'ছোট দুটি প্লাস্টিক সার্জারি করিয়েছি। চেহারা আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছে, না?
তুমি আর্টিস্ট মানুষ তোমার তো আগেভাগে ধরতে পারার কথা।'

'তোমার আগের চেহারাটাও খারাপ ছিল না।'

'খুব ভালোও ছিল না। তুমি তো প্রায়ই বলতে ভোঁতা ধরনের চেহারা। এখন
আর নিশ্চয়ই তা বলবে না।'

'না, তা বলব না।'

'আরাম করে বসো। তুমি এমনভাবে বসেছ মনে হচ্ছে আমার কাছে ইন্টারভ্যু
দিতে এসেছ।'

হাসনাত লক্ষ করল রুবি জড়ানো স্বরে কথা বলছে। বিকেলে কেউ মদ্যপান করে
না। মেয়েরা তো নয়ই। রুবি কি-ইচ্ছে করেই প্রচুর মদ্যপান করে তার জন্য অপেক্ষা
করছে?

হাসনাত সহজ ভঙ্গিতেই বলল, 'তুমি দেশে কতদিন থাকবে?'

'এক সপ্তাহ। এক সপ্তাহের মধ্যে চার দিন পার হয়ে গেছে, আছে মাত্র তিন
দিন।'

'এখান থেকে যাবে কোথায়?'

'যেখান থেকে এসেছি সেখানে যাব। আর কোথায় যাব? সানফ্রান্সিসকো। শুধু
শুধু এই প্রশ্ন করার মানে কি?'

'তুমি তো নামি-দামি মানুষ, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও। এইজন্যই জিজ্ঞেস
করছি।'

'ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠাট্টা করছি না। আমি অনেক জিনিস পারি না, ঠাট্টা হচ্ছে তার মধ্যে
একটা। তোমার নাচের ট্রুপের অবস্থা কী?'

'অবস্থা ভালো। দেশে দেশে নেচে বেড়াচ্ছি। এবার দুটি জিপসি মেয়ে দলে
এসেছে। অসাধারণ। কী যে অপূর্ব নাচে তুমি না দেখলে কিশাস করবে না!'

'তোমার চেয়েও ভালো?'

'হ্যাঁ, আমার চেয়েও ভালো।'

'ফারুক কেমন আছে?'

'ভালো। ও প্রায়ই তোমার কথা বলে।'

হাসনাত হাসল। রুবি বলল, 'তুমি কি কিছু খাবে? ড্রিন্‌কস?'

'না।'

'মদ্যপান তো করতে। এখন ছেড়ে দিয়েছ?'

'সাদা পানি খাওয়ার পয়সা জোটে না, আর লাল পানি।'

'তোমার অবস্থা ভয়াবহ এটা বুঝানোর জন্যই কি তুমি ময়লা এবং ভেজা শাট

পরে এসেছে? ময়লা শার্টের একটা কারণ থাকতে পারে— লজ্জিতে পাঠানোর পয়সা নেই। শার্ট ভেজার কারণটা বুঝলাম না।’

‘জাহিনের মাথায় পান ঢালছিলাম। শার্ট ভিজ়ে গেছে খেয়াল করি নি।’

‘ওর মাথায় পানি ঢালতে হচ্ছে কেন?’

‘তোমাকে শুরুতেই বলেছি ওর জ্বর। তুমি খেয়াল করো নি।

রুবি উঠে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ‘চল আমি ওকে দেখতে যাব।’

হাসনাত বলল, ‘তুমি আজ যেও না। অন্য কোনো সময় যেও।’

‘আজ গেলে অসুবিধা কী?’

‘তুমি প্রচুর মদ্যপান করেছ। তোমার পা টলছে। আজ না যাওয়াই ভালো।’

রুবি বসে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘আমি কেন দেশে এসেছি তোমাকে বলা হয় নি। আমি জাহিনকে নিয়ে যেতে এসেছি।’

রুবি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।

হাসনাত বলল, ‘কাঁদছ কেন? আমি তো বলিনি তুমি ওকে নিয়ে যেতে পারবে না।’

‘আমি অন্য কারণে কাঁদছি। তোমার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে আমি তারা দেখতাম। তোমার মনে আছে? একসময় আকাশের তারাগুলো চোখের সামনে নেমে আসত। মনে আছে?’

‘আছে।’

‘আমি গত বারো বছর ধরে তারা নামিয়ে আনতে চেষ্টা করছি, পারছি না।’

রুবি কাঁদছে। হাসনাত চুপচাপ বসে আছে। তার একবার ইচ্ছা হলো এগিয়ে গিয়ে রুবির মাথায় হাত রাখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই পারল না। বাসায় ফেরা দরকার। জাহিন একা আছে। তার জ্বর কমেছে কি-না কে জানে।

‘রুবি, আমি উঠি?’

‘বসো, একটু বসো।’

‘জাহিনের জ্বর।’

‘জানি জ্বর। তুমি ইতিমধ্যে দু’বার বলে ফেলেছ। বসো, একটু বসো।’

হাসনাত বসল। রুবি বলল, ‘তুমি বুড়ো হয়ে গেছ কেন?’

‘বয়স হয়েছে। এইজন্য বুড়ো হচ্ছি।’

‘না, তুমি বয়সের চেয়েও বুড়ো হয়েছে। ছবি আঁকছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘এখনও কি তোমার ধারণা তুমি ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারো?’

‘হ্যাঁ, পারি।’

‘তুমি পারো না। তোমার সেই ক্ষমতা নেই। জীবন্ত মানুষের প্রাণ নষ্ট করে দেয়, সে ছবিতে প্রাণ আনবে কী করে? তুমি আমার জীবন পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছিলে।’

হাসনাত চুপ করে আছে। রুবি তীব্র গলায় বলল, ‘নাচ ছিল আমার কাছে আমার জীবনের মতো। তুমি কোনোদিন আমাকে নাচতে দাও নি। তুমি আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলে।’

‘শিকল তো ভেঙেছ।’

‘হ্যাঁ, শিকল ভেঙেছি। অবশ্যই ভেঙেছি।’

রুবির চোখ চকচক করছে। সে মনে হয় আবার কাঁদবে।

হাসনাত উঠে দাঁড়াল।



দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষের যত ঘুম ভাঙে, সুন্দর স্বপ্ন দেখে বোধহয় তারচেয়ে বেশি ভাঙে। রওশন আরার ঘুম ভেঙেছে সুন্দর এটা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে তিনি নৌকায় করে কোথায় যেন যাচ্ছেন। তাঁর বয়স খুব অল্প। তাঁর পাশে লাজুক লাজুক চেহারার একজন যুবক। স্বপ্নে তিনি অবাক হয়ে টের পেলেন এই যুবকটি তাঁর স্বামী। তিনি লজ্জিত এবং বিব্রতবোধ করতে লাগলেন। তার এই ভেবে কষ্ট হলো যে, তিনি এমন চমৎকার ছেলেটিকে ফেলে এতদিন কোথায় কোথায় ঘুরছিলেন। ইশ, খুব অন্যায় হয়েছে। যুবকটি তার গা ঘেঁষে বসতে চাচ্ছে কিন্তু লজ্জা পাচ্ছে। তিনি যুবকটিকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে তার গা ঘেঁষে বসার সুযোগ দেবার জন্য বললেন— এই শোনো, আমাকে একটা পদ্মফুল তুলে দাও না। নদীতে পদ্ম ফোটে না, কিন্তু স্বপ্নের নদীতে সব ফুল ফোটে। যুবকটি তার গা ঘেঁষে বসল। নদীতে ঝুঁকে পড়ে পদ্মফুল তুলতে লাগল। ছেলেটি যেন পড়ে না যায় এজন্য তিনি তার হাত ধরে রাখলেন। কি যে ভালো লাগল হাত ধরে থাকতে। স্বপ্নের এই পর্যায়ে গাড় তৃপ্তিতে তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। নাজমুল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘কী হয়েছে?’

‘কিছু না।’

তিনি খাট থেকে নামলেন। নাজমুল সাহেব বললেন, ‘এক ফোঁটা ঘুম আসছে না। কী করি বলো তো? দশটা থেকে শুয়ে আছি। এখন বাজছে তিনটা।’

রওশন আরা বললেন, ‘বয়স হয়েছে, এখন তো ঘুম কমবেই। ঘুমের ওষুধ খাবে?’

‘দাও।’

রওশন আরা স্বামীকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিলেন। তিনি বিছানায় ফিরে আসছেন না, বারান্দার দিকে যাচ্ছেন। নাজমুল সাহেব বললেন, ‘যাচ্ছ কোথায়?’ রওশন আরা নিচু গলায় বললেন, ‘স্বাতীকে দেখে আসি।’

‘রাত দুপুরে চুরি করে মেয়ের ঘরে ঢোকা ঠিক না। প্রাইভেসির একটা ব্যাপার আছে। মা হলেই যে প্রাইভেসি নষ্ট করার অধিকার হয় তা কিন্তু না।’

রওশন আরা শীতল গলায় বললেন, ‘এটা কোর্ট না। আইনের কচকচানি বন্ধ রাখো। ঘুমানোর চেষ্টা কর।’

রওশন আরা একটু আগে যে স্বপ্ন দেখেছেন বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। স্বপ্নের যুবকটি তাঁর পাশে এসে বসায় তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন— পঁচিশ বছর এই মানুষটির সঙ্গে বাস করার সব আনন্দ যোগ করেও তার সমান হবে না। স্বপ্ন ও বাস্তব এত আলাদা কেন?

স্বাতীর ঘর অন্ধকার। সে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে নি। মিউজিক সেন্টার নিঃশব্দ। রওশন আরা মেয়ের বিছানার দিকে চুপি চুপি এগোলেন। মেয়ের গায়ে চাদর আছে। আজ অবশ্যি গরম পড়েছে। গায়ে চাদর না থাকলেও চলত। মেয়েটা অদ্ভুত হয়েছে, যেদিন ঠাণ্ডা পড়ে সেদিন তার গায়ে চাদর থাকে না। গরমের সময় কমল মুড়ি দিয়ে ঘুমায়। রওশন আরা ঘরের জানালার দিকে তাকালেন। জানালা খোলা। বৃষ্টি এলে খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাট আসবে। মেয়েটার বিছানাটা জানালা থেকে একটু সরিয়ে দিতে হবে। রোজ রাতেই একবার করে ভাবেন। দিনে মনে থাকে না।

তিনি ঘর ছেড়ে বেরুতে যাবেন তখন স্বাতী পাশ ফিরল। শান্ত গলায় বলল, ‘মা তোমার ইন্সপেকশন শেষ হয়েছে?’

রওশন আরা লজ্জিত গলায় বললেন, ‘তুই জেগে ছিলি?’

‘তুমি যতবার এসেছ ততবারই আমার ঘুম ভেঙেছে। আমি ঘুমের ভান করে তোমার কীর্তিকলাপ দেখছি। আজ ঠিক করেছিলাম হাউ করে একটা চিৎকার দিয়ে তোমাকে ভয় দেখাব।’

রওশন আরা লজ্জিত গলায় বললেন, ‘আমি যে রাতে এসে তোকে দেখে যাই তোর খুব রাগ লাগে, তাই না?’

‘মাঝে মাঝে খুব রাগ লাগে, আবার মাঝে মাঝে এত ভালো লাগে যে বলার না।’

‘আজ রাগ লাগছে না— ভালো লাগছে?’

‘খুব ভালো লাগছে। আজ আমার ঘুমই আসছিল না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কখন তুমি আসবে। মা, আমার পাশে এসে বসো। তোমার যদি ঘুম না পেয়ে থাকে তাহলে আমার সঙ্গে গল্প করো।’

রওশন আরা মেয়ের বিছানায় বসলেন। স্বাতী বলল, ‘পা তুলে আরাম করে বসো।’

রওশন আরা বললেন, ‘বাতি জ্বালা। অন্ধকারে কী গল্প করব? মুখ না দেখে গল্প করে মজা নেই।’

‘বাতি জ্বালাতে হবে না। অন্ধকারের গল্পের আলাদা মজা আছে। অন্ধকারে যত সহজে গল্প করা যায় আলোতে তত সহজে গল্প করা যায় না।’

‘বেশ অন্ধকারেই তোর গল্প শুনি। কী গল্প বলবি?’

‘শুধু আমি একা গল্প করব কেন? দু’জনে মিলে করব। আমি কিছুক্ষণ গল্প করব। তুমি কিছুক্ষণ করবে। লিলির মহা বিপদের গল্প শুনবে মা?’

‘বলো শুনি।’

‘ওর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আগামী শুক্রবার জুমা শাহজের পর পবিত্র শুভ বিবাহ।’

‘এতে বিপদের কী হলো? বিয়ের বন্ধন হয়েছে বিয়ে হবে এটাই তো স্বাভাবিক।’

‘ওর বিয়েটা অবশ্য খুব স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে না। বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সবাই ধরে-বঁধে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। লিলি যে খুব আপত্তি করছে তা না। দিব্যি মায়ের সঙ্গে গয়নার দোকানে গিয়ে গয়নার অর্ডার দিয়ে এসেছে।’

‘ভালোই তো!’

‘ঝটপট তার বিয়ে কেন দিয়ে দিচ্ছে জানো মা?’

‘না।’

‘তার বাবা-মা’র ধারণা হয়েছে মেয়ে তাদের কন্ট্রলের বাইরে চলে যাচ্ছে। একদিন তাকে দেখা গেছে ছাদে তার বান্ধবীর সঙ্গে সিগারেট খাচ্ছে। তারপরে সে আরেকটা ভয়াবহ অন্যায় করল, নিষেধ সত্ত্বেও ইউনভার্সিটিতে গেল। বাসায় ফিরল রাত দশটায়। এই গুরুতর অপরাধে তার শাস্তি হয়েছে— যাবজ্জীবন স্বামীর হাতে বন্দী।’

‘তোর কি ধারণা স্বামীরা বন্দী করে ফেলে?’

‘সব স্বামী হয়তো করে না। তখন সংসার বন্দী করে ফেলে। ছেলেমেয়ে জন্মায়— তারা বন্দী করে ফেলে। আমার বন্দী হতে ইচ্ছে করে না।’

‘তোকে তো আর কেউ জোর করে বন্দী করতে চাচ্ছে না। কাজেই দৃষ্টিভ্রম কিছু নেই। তবে বন্দী ভী’বনেও আনন্দ আছে।’

স্বাতী শান্ত গলায় বলল, ‘তুমি যে বাবার সঙ্গে বাস করছ, ধরাবাঁধা একটা জীবনযাপন করছ, রাঁধছ-খাচ্ছ-ঘুমুচ্ছ, আবার রান্না, আবার খাওয়া, আবার ঘুমানো— এই জীবনটা তোমার পছন্দের? আমার তো মনে হয় দারুণ একঘেঁয়ে একটা জীবন।’

‘এক ঘেঁয়েমি তো সব জীবনেই আছে। তুই যদি একা বাস করিস, সেই একার জীবনেও তো এক ঘেঁয়েমি চলে আসবে।’

‘দু’জনের জীবনের এক ঘেঁয়েমি অনেক বেশি। দু’জনেরটা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একঘেঁয়েমি ডাবল হয়ে যায়।’

‘তোর যত অভূত কথা!’

‘মোটাই অভূত কথা না। আমি খুব ইন্টারেস্টিং একটা জীবন চাই মা। আমি একা থাকব। কিন্তু আমার একটা সংসার থাকবে। আমার একটা মেয়ে থাকবে। মেয়েটাকে সম্পূর্ণ আমার মতো করে আমি বড় করব। সে হবে আমার বন্ধুর মতো। আমার মতো স্মার্ট একটা মেয়ে সে হবে। খানিকটা জাহিনের মতো।’

‘জাহিন কে?’

স্বাতী একটু থতমত খেয়ে বলল, ‘তুমি চিনবে না মা। একজন আর্টিস্টের মেয়ে।’

স্বাতী চুপ করে গেল। রওশন আরাও চুপ করে রইলেন। একসময় তিনি নিচু গলায় বললেন, ‘কোন আর্টিস্ট, যে তোর ছবি ঐঁকেছে?’

স্বাতী প্রায় অস্পষ্টস্বরে বলল, ‘হ্যাঁ।’

রওশন আরা বললেন, ‘তোর লুকিয়ে রাখা ছবিটা আমি দেখে ফেলেছি এইজন্য ক’তুই রাগ করেছিস?’

‘না। তুমি তালা খুলে আমার ঘরে ঢুকে আমার জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করো সেটা আমি জানি। ছবিটাও দেখবে তাও জানতাম। তোমার দেখার জন্যই ছবিটা ঘরে রাখি। আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তুমি ছবিটা দেখে আমার কাছে জানতে গাইবে তখন পুরো ব্যাপারটা বলা আমার জন্য সহজ হবে। তুমি ছবি দেখেছ অথচ মামাকে কিছুই বল নি।’

‘জাহিন ঐ ভদ্রলোকের মেয়ে?’

‘হ্যাঁ, খুব চমৎকার একটা মেয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ঐ ভদ্রলোকের

প্রেমে পড়িনি। মেয়েটার প্রেমে পড়েছি। এতক্ষণ যে মা-মেয়ের সংসারের গল্প করলাম এই ভেবেই বোধহয় করেছি।’

‘ভদ্রলোকের স্ত্রী আছেন?’

‘না।’

‘তুই কি তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিস?’

‘হঁ।’

‘খুব ঘনিষ্ঠভাবে?’

‘হঁ।’

রওশন আরা ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখ ভিজ্জে উঠেছে। এখন হয়তো চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়বে। ঘর অন্ধকার, মেয়ে দেখতে পাবে না। এই টুকুই যা সান্ত্বনা।

‘মা তুমি কি আমাকে ঘেন্না করছ? আমার সঙ্গে এক বিছানায় বসে থাকতে তোমার কি ঘেন্না লাগছে?’

‘তুই কি ঘেন্নার মতো কোনো কাজ করেছিস?’

‘হ্যাঁ। মাঝে মাঝে মনে হয় খুব ঘেন্নার কাজ করে ফেলেছি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় না। মা, তুমি কি লক্ষ করেছ আমার শরীর খারাপ করেছে? কিছু খেতে পারছি না, ঠিকমতো ঘুমুতে পারছি না।’

‘লক্ষ করেছে।’

‘ঘর অন্ধকার করে আমি তোমার সঙ্গে খুব সহজভাবে কথা বলছি। তুমি কিছু মনে করো না। সহজভাবে কথা বলা ছাড়া আমার উপায় নেই। তুমি রাগ যা করার পরে করো। এখন আমার কথা শোনো।’

‘শুনছি।’

‘মা দেখো, ছেলে এবং মেয়ের ভালোবাসাবাসি প্রকৃতি খুব সহজ করে নি। কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। ভালোবাসতে গেলেই কাঁটা ফুটবে। অথচ দেখো, মেয়ে এবং মেয়ের ভেতর কি চমৎকার বন্ধুত্ব হতে পারে। দু’জন ছেলের ভেতর বন্ধুত্ব হতে পারে। দু’জন ছেলের ভেতর বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু যেই একটি ছেলে একটা মেয়ের কাছে যায় তাকে কাঁটা বিছানো পথে এগোতে হয়। কাঁটার কথা একসময় মনে থাকে না—পায়ে তখন কাঁটা ফোটে।’

রওশন আরা ক্লান্ত গলায় বললেন, ‘এত কাব্য করে কিছু বলার দরকার নেই, যা বলার সহজ করে বল। নোংরা কোনো ব্যাপার যত সুন্দর ভাষা দিয়েই বলা হোক সেটা নোংরাই থাকে। সুন্দর হয়ে যায় না।’

‘মা প্লিজ, তুমি আমার কথাগুলো আমার মতো করে বলতে দাও। প্লিজ! প্লিজ!’

‘বল, কী বলতে চাস?’

‘কাঁটার কথাটা বলছিলাম মা। কাঁটা যখন ফোটে তখন কাঁটাটাকে ফুল বানানোর জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠি। তড়িঘড়ি করে একটা বিয়ের ব্যবস্থা হয়। সবাই তখন ভান করতে থাকে কাঁটা ফুল হয়ে গেছে।’

‘তুই ঠিক করেছিস বিয়ে করবি?’

‘তাই ঠিক করা হলো মা। কাঁটার ভয়ে ঠিক করা হলো। তোমাদের না জানিয়ে

বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করা হয়ে গেল। তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনে খুব অবাক হচ্ছে।’

‘তুই তোর কথা বলে যা। আমি অবাক হচ্ছি না, সেটা পরের ব্যাপার।’

‘বিয়ের ঠিক আগের রাতে আমার ঘুম হচ্ছিল না, আমি ছটফট করছিলাম, তখন হঠাৎ মনে হলো, এই বিয়েটা তো কোনো আনন্দের বিয়ে না। সমস্যার বিয়ে। সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিয়ে। একদিন আমাদের সংসারে একটা শিশু আসবে। যতবার তার দিকে তাকাব ততবার মনে হবে সে সংসারে ঢুকেছিল কাঁটা হিসেবে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হবে। হবে তো বটেই। তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা, বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা, তোমরাই দু’জন দু’জনকে সহ্য করতে পারো না। আমরা কি করে সহ্য করব। মা, কি হবে জানো? কুৎসিত সব ঝগড়া হবে, দু’জন দু’জনের দিকে ঘৃণা নিয়ে তাকাব— সেই ঘৃণার সবটাই গিয়ে পড়বে আমার সন্তানের ওপর। মনে হবে তার কারণেই আমরা ঘৃণার ভেতর বড় হচ্ছি। মা ঠিক করে বলো তো, আমার সঙ্গে এক খাটে বসে থাকতে তোমার কি ঘেন্না লাগছে?’

‘লাগছে।’

‘লাগলেও আর একটুক্ষণ বসো। আমার কথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কথা শেষ হলেই আমি তোমার জন্য কফি বানিয়ে আনব।’

‘স্বাভী, কথা অনেক শুনে ফেলেছি। আমার আর কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে না।’

শেষটা খুব ইন্টারেস্টিং মা। শেষটা তোমাকে শুনতেই হবে—

‘আমি অনেক বয়স পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে ঘুমাতে। আমি হলাম খুব আদরের মেয়ে, নক্ষত্রের নামে নাম। বাবা মা’র সঙ্গে তো ঘুমুবেই। আমি মাঝখানে, তোমরা দু’জন দু’দিকে। একটা হাত রাখতে হতো তোমার ওপর একটা হাত রাখতে হতো বাবার ওপর। তোমার দিকে তাকিয়ে ঘুমুলে বাবা রাগ করত, বাবার দিকে তাকিয়ে ঘুমুলে তুমি রাগ করত। নকল রাগের মজার খেলার ভেতর দিয়ে আমি বড় হচ্ছি— চার বছর থেকে পাঁচ বছরে পড়লাম, তারপর প্রচণ্ড রকম ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আলাদা থাকার জন্য, আলাদা ঘরের জন্য। আমার প্রচণ্ড ভূতের ভয়, তারপরেও আলাদা থাকার জন্য কি কান্না— তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। মনে আছে স্বামী?’

‘হ্যাঁ, মনে আছে?’

‘ভূতের ভয়ে কাতর ভীতু একটা মেয়ে আলাদা থাকার জন্য কেন এত ব্যস্ত সেটা নিয়ে তোমরা কখনও মাথা ঘামাও নি। কারণ, কখনও জানতে চাও নি। ধরেই নিয়েছ বাচ্চা মেয়ের খেয়াল। ব্যাপারটা কিন্তু তা না। মা’র তোমরা মাঝে মাঝে চাপা গলায় কুৎসিত ঝগড়া করতে। ঝগড়ার মূল কারণ ধরেতে পারতাম না। শুধু বুঝতাম রহস্যময় একটা ব্যাপার। তুমি বিয়ের আগে ভয়ঙ্কর একটা অন্যায় করেছিলে। সে অন্যায় চাপা দিয়ে বাবাকে বিয়ে করেছ। প্রতারণা করেছ। লোক লজ্জার ভয়ে বাবা সেই অন্যায় হজম করছেন। আবার হজম করতে পারছেনও না। পাঁচ বছরের একটা মেয়ের বাবা মা’র ঝগড়া থেকে সেই অন্যায় ধরতে পারার কোনো কারণ নেই। আমি ধরতে পারি নি। তবে স্মৃতিতে সব জমা করে রেখেছি। একসময় আমার বয়স বেড়েছে। আমি একের সঙ্গে এক মিলিয়ে দুই করতে শিখেছি। তারপর হঠাৎ বুঝতে পেরেছি। বিয়ের আগে আগে তোমার একটা এবোরসান হয়েছিল। কাঁটা সরিয়ে তুমি

বিয়ে করেছে। বিয়ের পর দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসার প্রবল ভান করেছে। আমি অবাক হয়ে তোমাদের দু'জনের ভালোবাসাবাসির ভান দেখতাম। মনে মনে হাসতাম। হাসির শব্দ যেন তোমরা শুনতে না পাও সে জন্য উঁচু ভল্যুমে গান ছেড়ে দিতাম।'

'তোমার যেমন নিশিরাতে চাবি খুলে আমার ঘরে ঢুকে আমাকে দেখার অভ্যাস, আমার তেমনি মাঝে মাঝে তোমাদের ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তোমাদের কথা শোনার অভ্যাস হয়ে গেল।'

'আমি যে অন্যায়টা করেছি খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও সেই অন্যায়ের পেছনে তোমার একটা ভূমিকা আছে, সত্যি আছে। তুমি তোমার প্রথম যৌবনে যে অন্যায়টা করেছিলে— আমি সব সময় ভেবেছি সেই অন্যায় আমিও করব। এ-রকম অদ্ভুত ইচ্ছার কারণ তোমার প্রতি ভালবাসাও হতে পারে, আবার তোমার প্রতি ঘৃণাও হতে পারে। ঠিক কোনটা আমি জানি না।

মা, তোমাকে সত্যি কথা বলি। ঐ ভদ্রলোকের জন্য আমার ভেতর সাময়িক প্রবল মোহ অবশ্যই তৈরি হয়েছিল। তা না হলে এত বড় অন্যায় করা যায় না। তবে সত্যিকার ভালোবাসা বলতে যা তা বোধহয় আমার তাঁর প্রতি হয় নি। কাজেই তাকে বিয়ে না করলেও কিছু যায় আসে না। বিয়ে না করাটাই বরং ভালো। আমার বর্তমান যে শারীরিক সমস্যা তা আমি তোমার মতো করে মিটাতে পারি। ভালো একটা ক্লিনিকে ভর্তি হতে পারি। পনেরো-কুড়ি মিনিটের ব্যাপার। কেউ কিছু বুঝতেও পারবে না। আমি কিন্তু তা করব না মা।'

রওশন আরা ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'তুই কী করবি?'

স্বাতী শান্ত গলায় বলল, 'যে শিশুটি পৃথিবীতে আসতে চাচ্ছে আমি তাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসব। তাকে বড় করব। তাকে গুরুতম মানুষ হিসেবে বড় করব।'

'তার কোনো বাবা থাকবে না?'

স্বাতী সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'আমার কথা শেষ হয়েছে। বাতি জ্বালাব?'

'না।'

'এখনও কি তোমার আমার বিছানায় বসে থাকতে ঘেন্না লাগছে?'

রওশন আরা জবাব দিলেন না। স্বাতী বলল, 'কফি খাবে মা? কফি বানিয়ে আনব?'

রওশন আরা সেই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। স্বাতী হাসছে। গুরুত্ব অস্পষ্টভাবে হাসলেও শেষে বেশ শব্দ করেই হাসতে শুরু করল। সেই হাসির শব্দ পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষের শব্দের মতো না। কোথাও যেন এক ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে। রওশন আরা চমকে চমকে উঠলেন। স্বাতী হঠাৎ হাসি থামিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'মা যাও, ঘুমুতে যাও।'

রওশন আরা উঠলেন। প্রায় নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হলেন। নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন। নাজমুল সাহেব বললেন, 'তুমি কী ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছ কে জানে? এক ফোঁটা ঘুম আসছে না। জেগেই আছি।' রওশন আরা জবাব দিলেন না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। নাজমুল সাহেব বললেন, এতক্ষণ কী গল্প করছিলে? আশ্চর্য! এসো, ঘুমুতে এসো।'

রওশন আরা শোবার ঘরের দরজা লাগিয়ে বিছানায় এলেন আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বাতী এসে দরজায় টোকা দিল। করুণ গলায় ডাকল, বাবা!

নাজমুল সাহেব চমকে উঠে বসলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'কী হয়েছে মা?'

স্বাতী কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'আমার কেন জানি ভয় ভয় লাগছে। বাবা, আমি কি শুধু আজ রাতের জন্য তোমাদের দু'জনের মাঝখানে ঘুমুতে পারি? শুধু আজ রাতের জন্য?'



জাহিন খুব অবাক হয়ে দেখছে। এত সুন্দর কোনো মেয়ে সে বোধহয় এর আগে দেখে নি। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, মাথাভর্তি চুল ঢেউয়ের মতো নেমে এসেছে। এমন চুল যে হাত দিয়ে ছুঁয়ে না দেখলে মন খারাপ লাগে। মেয়েটা মুখ টিপে কি সুন্দর ভঙ্গিতেই না হাসছে।

'তোমার নাম জাহিন, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার জ্বর হয়েছিল, সেরেছে?'

'হ্যাঁ!'

'আমি কে তা কি তুমি জানো?'

জাহিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। সে জানে। অবশ্যই জানে। এই পরীর মতো মেয়েটা তার মা।

'তুমি এত রোগা কেন?'

'জানি না।'

'তোমার মাথায় চুল এত কম কেন? দেখো তো আমার মাথায় কত চুল। হাত ছুঁয়ে দেখো। আমি ভেবেছিলাম তোমারও মাথাভর্তি চুল থাকবে। তোমার বাবা কি বাসায় আছে?'

'আছে।'

'ছবি আঁকছে?'

'না। ছবি আঁকার ঘরে চুপচাপ বসে আছে।'

'চুপচাপ যে বসে আছে সেটা বুঝলে কি করে?'

'পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি মাঝে মাঝে দেখি।'

'পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখার দরকার কী? স্টুডিওতে সরাসরি ঢুকে যাও না কেন? বাবা রাগ করে?'

'রাগ করে না। কঠিন চোখে তাকায়।'

'আমি তোমার দিকে কোন চোখে তাকাচ্ছি বলো তো?'

জাহিন হাসল। লজ্জার হাসি। তার হঠাৎ অসম্ভব লজ্জা লাগছে। আবার অসম্ভব ভালো লাগছে। সে হাত বাড়িয়ে মা'র চুল স্পর্শ করল।

'জাহিন, বলো তো আমি কে?'
 'মা।'
 'কার মা?'
 জাহিন আবার লজ্জা পেয়ে হাসল। কিন্তু কার মা তা বলল না।
 'তুমি কি আমার নাম জানো?'
 'জানি।'
 'বলো, আমার নাম কী বলো?'
 'আপনার নাম রুবি।'
 'আমার সম্পর্কে আর কী জানো?'
 'আপনি খুব সুন্দর নাচতে পারেন।'
 'তুমি কি আমার কোলে আসবে?'
 জাহিন না সূচক মাথা নাড়ল। যদিও তার খুব ইচ্ছা করছে কোলে উঠতে। রুবি
 বলল, 'আমার কোলে আসবে না কেন, আমি কি খারাপ মেয়ে?'
 জাহিন ক্ষীণস্বরে বলল, 'অল্প খারাপ।'
 'কেন? তোমার বাবাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম সেই জন্য?'
 'হুঁ।'
 'আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?'
 'কোথায়?'
 'তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানেই যাব। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন,
 বুড়িগঙ্গা নদী।'
 'আপনি কি স্বাতী আন্টিদের বাসা চেনেন?'
 'না, চিনি না। ঠিকানা বের করে সেখানে অবশ্যই যেতে পারি। স্বাতী আন্টি কে?'
 'বাবার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। তারপর হয় নি।'
 'হয় নি কেন?'
 'আমি জানি না।'
 'তবু তোমার অনুমানটা কী?'
 'স্বাতী আন্টির বাবাকে পছন্দ হয় নি। বাবাকে কেউ পছন্দ করে না।'
 'আর কে পছন্দ করে নি?'
 'আপনি করেন নি।'
 'ও হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। তুমি তাকে খুব পছন্দ করো।'
 'হুঁ।'
 'কেন?'
 'বাবাকে তো পছন্দ করতেই হয়। বাবা-মা কে পছন্দ না করলে পাপ হয়।'
 'শুধু পাপের ভয়ে বাবাকে পছন্দ করো?'
 'বাবা ভালো।'
 'বাবা তোমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায়। শিশু পার্কে নিয়ে যায়?...'
 'কোথাও নিয়ে যায় না তবু ভালো।'
 'তুমি কি জানো, আমি তোমাকে আমেরিকা নিয়ে যেতে এসেছি?'
 'জানি। বাবা বলেছে।'

‘তুমি যাবে আমার সঙ্গে?’

জাহিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। রুবি বলল, ‘আমি জানি বাবাকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে। খুব কষ্ট হবে। কিন্তু এখানে থাকার চেয়ে আমার সঙ্গে যাওয়াই তোমার ভালো। কেন সেটা জানো?’

‘জানি। বাবা বলেছে।’

‘কী বলেছে?’

‘এখানে আমার একা একা থাকতে হয়। বাবা সারাদিন ছবি আঁকে। আমার দেখার কেউ নেই।’

‘আমার কাছে তুমি খুব ভালো থাকবে। তুমি আরও দু’জন ভাইবোন পাবে। এরা ভীষণ দুষ্ট আবার ভীষণ ভালো। তুমি হবে তাদের সবার বড় বোন। তাদের দেখেশুনে রাখবে। তোমাকে খুব বড় স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। খুব আনন্দ নিয়ে বড় হবে। তারপর যদি বাবার কাছে ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়, ফিরে আসবে।’

জাহিন কিছু বলছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এখন তার একটু কান্না কান্নাও লাগছে। রুবি বলল, ‘তুমি আমার সঙ্গে গেলে তোমার বাবার জন্যও ভালো হবে। সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে তার যে দুশ্চিন্তা সেটা থাকবে না। সে নিজের মনে কাজ করতে পারবে। সে হয়তো ভালো একটা মেয়েকে বিয়ে করে আবার সংসার শুরু করবে। কে জানে, তোমার স্বাভাবিক আন্টি হয়তো ফিরে আসবে। অনেক সময় আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে সংসারে থাকলে মেয়েরা তাকে বিয়ে করতে চায় না।’

জাহিন খুব মন দিয়ে কথা শুনছে। কথাগুলো তার কাছে সত্যি বলে মনে হচ্ছে। রুবি বলল, ‘চলো এখন আমরা বেড়াতে বের হই। তোমার বাবাকে হ্যালো বলে যাই। তুমি কাপড় বদলে ভালো একটা জামা পরো।’

‘এটাই আমার সবচেয়ে ভালো জামা।’

‘এটাও অবশ্য মন্দ না। তবে আজ আমরা অনেকগুলো ভালো জামা কিনব। তোমার চুলগুলোও সুন্দর করে কেটে দিতে হবে। অনেক কাজ। আমরা আজ প্রথম কোথায় যাব?’

‘স্বাভাবিক আন্টিদের বাড়িতে।’

‘ও হ্যাঁ। তোমার বাবার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে নিতে হবে।’

স্বাভাবিক আন্টিদের দেখা হলো না।

নাভিমুল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, ‘আমরা মেয়েটার শরীর ভালো না। তোমরা আরেক দিন এসো।’ জাহিন বলল, ‘আমি শুধু দূর থেকে উনাকে একটু দেখেই চলে যাব।’

নাভিমুল সাহেব তারপরেও বললেন, ‘আজ না। আজ না। আরেক দিন।’

জাহিন স্বাভাবিক আন্টিদের বাড়ি থেকে মন খারাপ করে বের হয়েছে। রুবি বলল, ‘আমরা আবার আসব। দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে দেখা করে যাবই, তাই না’ জাহিন?’

‘হ্যাঁ।’

‘একটা কবিতা আছে না, একবার না পারিলে দেখ শতবার। আমরা শতবার দেখব। কি বলো জাহিন?’

‘হুঁ।’

‘এখন কোথায় যাওয়া যায়। চিড়িয়াখানায়?’

‘হুঁ।’

‘চিড়িয়াখানার কোন প্রাণীটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?’

‘জানি না।’

‘জানো না কেন?’

জাহিন জবাব দিল না। রুবি বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে তোমার চিড়িয়াখানায় যাবার তেমন ইচ্ছা নেই।’ এর উত্তরেও জাহিন কিছু বলল না। রুবি বলল, ‘অন্য কোথাও যেতে চাও?’

‘হুঁ।’

‘বলো কোথায়। তুমি যেখানে যেতে চাও, আমি নিয়ে যাব।’

‘লিলি আন্টিদের বাড়িতে যাব।’

‘লিলি আন্টি কে?’

জাহিন উৎসাহের সঙ্গে বলল, ‘উনি একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখন খুব ঝড়-বৃষ্টি হলো। আমরা ঝড়-বৃষ্টিতে খুব ছটোপুটি করেছি। শিল কুড়িয়েছি। বাড়ির সামনে পানিভর্তি একটা গর্ত আছে না? আমরা দু’জন ধপ করে গর্তে পড়ে গেলাম। আমরা দু’জন খুব বন্ধু।’

‘উনি কি একদিনই এসেছিলেন?’

‘হুঁ।’

‘একদিনেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল?’

‘হুঁ।’

‘বন্ধুত্ব অবশ্যি হবার হলে একদিনেই হয়। হবার না হলে কখনই হয় না। তোর বাবার সঙ্গেও আমার একদিনেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। খুব মজার ঘটনা। শুনবে?’

জাহিনের শুনতে ইচ্ছা করছে না। কারণ, এই মহিলা তাকে লিলি আন্টিদের বাড়িতে নিয়ে যাবে কি না তা সে বুঝতে পারছে না। লিলি আন্টির ঠিকানা তার কাছে আছে। তিনি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি তো ঠিকানাটা চাচ্ছেন না।

‘হয়েছে কি শোনো। ছবির একটা এক্সিবিশন হচ্ছে। আমি আমার বাবার সঙ্গে এক্সিবিশন দেখতে গেলাম। একটা ছবির সামনে থমকে দাঁড়িয়েছি। কী যে সুন্দর ছবি! টিনের ঘরের বারান্দায় একটি তরুণী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির পানি দিয়ে মেয়েটি মুখ ধুচ্ছে। ছবিটবি তো আমি বুঝি না। জীবনে কোনো ছবি দেখে এত অবাক হই নি। আমি ছবির আর্টিস্টের কাছে গিয়ে বললাম, ছবিটা আমার এত ভালো লাগছে কেন বুঝিয়ে দিন।’

‘আর্টিস্ট হেসে ফেলল। তোর বাবা যে খুব সুন্দর করে হাসে সেটা নিশ্চয়ই তুই জানিস?’

‘জানি।’

‘সেই হাসিও দেখি ছবির মতোই সুন্দর। এই যে তোর বাবাকে ভালো লাগল, লাগলই। গল্পটা সুন্দর না জাহিন?’

‘হুঁ। আমরা লিলি আন্টিদের বাসায় কখন যাব?’

‘এখনই যাওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে তো ঠিকানা নেই।’
‘আমার কাছে ঠিকানা আছে।’
জাহিন কাগজের টুকরাটা বের করল।

কোনো বাড়ির সদর দরজা এমন করে খোলা থাকতে পারে তা রুবির ধারণায় ছিল না। দরজা খোলা। তারা কলিং বেল বাজাচ্ছে। কেউ আসছে না। অথচ ভেতরে মানুষের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। জাহিন তার মা’র দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমরা কি ভেতরে ঢুকে যাব?’

রুবি বলল, ‘সেটা কি ঠিক হবে? অপরিচিত একটা বাড়ি। কেউ এলে পরিচয় দিয়ে তারপর ভেতরে যাওয়া উচিত।’

‘কেউ তো আসছে না।’

‘তাই তো দেখছি। চলো ঢুকে পড়ি।’

তারা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রুবি অবাক হয়ে দেখল অবিকল পরীর মতো মেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে তাদের দেখে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে আসছে। এসেই মেয়েটি জাহিনকে কোলে তুলে নিল। জাহিন মেয়েটির শাড়িতে মুখ চেপে রেখেছে। তার ছোট্ট শরীর কাঁপছে। সে কাঁদছে। রুবির বিস্ময়ের সীমা রইল না।

প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যাবার পর লিলি লজ্জিত ভঙ্গিতে রুবির দিকে তাকাল। রুবি বলল, ‘যে মেয়েটি আপনার কোলে বসে কাঁদছে আমি তার মা। হট কর ঢুকে পড়েছি।’

‘খুব ভালো করেছেন।’

লিলি কিশোরীদের মতো গলায় চঁচিয়ে বলল, ‘মা দেখো! দেখো কে এসেছে।’ ফরিদা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বললেন, ‘কে এসেছে?’

‘জাহিন এসেছে। জাহিন।’

‘জাহিনটা কে?’

লিলি জবাব দিতে পারছে না। সে লজ্জিত ও বিব্রত মুখে মা’র দিকে তাকিয়ে আছে। জাহিন মেয়েটা তাকে খুব লজ্জায়ও ফেলে দিয়েছে। কেন্দ্রে তার শাড়ি প্রায় ভিজিয়ে ফেলেছে। এত কাঁদছে কেন মেয়েটা?

বাড়ির সবাই এসে ভিড় করেছে। রুমু রুমু এসেছে, বড় চাচা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, ছোট চাচাকেও দেখা যাচ্ছে। কাজের দুই বুয়াও রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। রুবি বলল, ‘আমার মেয়েটা কিছুক্ষণ থাকুক আপনার কাছে। আমি পরে এসে নিয়ে যাব।’

লিলি ইঁা না কিছুই বলতে পারল না। জাহিনের কান্নার কারণে তার নিজেরও এখন কান্না এসে গেছে।

জাহিনের মা চলে যাচ্ছেন, সে তাঁকে এগিয়ে দিতে পর্যন্ত গেল না। অভদ্রের মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। ফরিদা বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘ব্যাপারটা কি! এই মেয়ে কে?’

‘একজন আর্টিস্টের মেয়ে মা, হাসনাত সাহেবের মেয়ে?’

‘তুই কাঁদছিস কেনরে লিলি। মেয়েটা কাঁদছে, তুইও কাঁদছিস। ব্যাপারটা কি?’
ফরিদার বিস্ময় কিছুতেই কমছে না।



সকাল বেলাতেই নেয়ামত সাহেবের ঘরে লিলির ডাক পড়েছে। লিলি ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হলো। নেয়ামত সাহেব অস্বাভাবিক কোমল গলায় বললেন, ‘মা বসো।’

লিলি বসল।

‘মা, কাছে এসে বসো।’

লিলি বাবার কাছে একটু সরে এলো। খুব কাছে আসতে লজ্জা লাগছে। বাবা তুমি তুমি করে বলছেন। তাতেও লজ্জা লাগছে।

‘তোমার বিয়ের কার্ড ছাপা হয়েছে দেখো। হাতে নিয়ে দেখো। লজ্জার কিছু নেই। হারামজাদারা একটা বানান ভুল করেছে। শুভ লিখেছে দস্ত্যে স দিয়ে, ধরে চাবকানো দরকার। তবে ছেপেছে ভালো। কার্ড পছন্দ হয়েছে মা?’

‘জি বাবা।’

‘শুভ বানানটার জন্য মনের ভিতর একটা খচখচানি রয়ে গেল। যাই হোক কি আর করা! তোমার কয়টা কার্ড দরকার বল তো মা।’

‘আমার কার্ড লাগবে না বাবা।’

‘কার্ড লাগবে না মানে। অবশ্যই লাগবে। বন্ধু-বান্ধবদের নিজের হাতে দাওয়াত দিয়ে আসবে। এইসব ব্যাপারে আমি খুব আধুনিক। ড্রাইভারকে বলে দিয়েছি সারাদিনের জন্য গাড়ি তোমার। বিশটা কার্ডে হবে মা?’

‘জি হবে।’

‘ফ্যামিলিসুদ্ধ দাওয়াত দেবে। দাওয়াতে কার্পণ্য করবে না। নাও মা, কার্ডগুলো নাও— হারামজাদারা শুভ বানানে গুণগোল করে মনটা খারাপ করে দিয়েছে। যাই হোক, কি আর করা। মা, দাওয়াত দেয়ার সময় মুখে বলবে, উপহার অপ্রত্যাশিত হবে না। দোয়াই কাম্য। কার্ডে লিখে দেয়া উচিত ছিল। অনেকেই আরব্য এসব লিখলে মাইন্ড করে বলে লেখা হয় নাই।’

‘বাবা, আমি যাই?’

‘আচ্ছা মা, যাও। যেসব বাড়িতে যাবে সেখানে মুরুব্বি কেউ থাকলে পা ছুঁয়ে সালাম করবে। মুরুব্বিদের দোয়া যে কত কাজে লাগে তা তোমরা জানো না। জগৎ সংসার টিকেই থাকে মুরুব্বিদের দোয়ায়।’

স্বাতী গভীর আগ্রহে বিয়ের কার্ড দেখছে। লিলি তাকিয়ে আছে স্বাতীর দিকে। কী চেহারা হয়েছে স্বাতীর! যেন সে কতদিন ধরে ঘুমুচ্ছে না, খাচ্ছে না।

‘তুই এমন হয়ে গেছিস কেন স্বাতী?’

‘কেমন হয়ে গেছি? পেত্নী?’

‘প্রায় সে-রকমই।’

‘রাতে ঘুম হয় না, বুঝলি লিলি, এক ফোঁটা ঘুম হয় না। গাদা-গাদা ঘুমের ওষুধ খাই। তারপরেও ঘুম হয় না। মা’র ধারণা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।’

‘তোর নিজের কী ধারণা?’

‘আমারও সে রকমই ধারণা। কাল রাত তিনটার সময় হঠাৎ হো হো করে এমন হাসি শুরু করলাম— আমি হাসি মা কাঁদে। মা যত কাঁদে, আমি ততই হাসি।’

‘তোর সমস্যা কী?’

‘আমার অনেক সমস্যা। তোকে সব বলতে পারব না।’

‘আমি তোকে একটা পরামর্শ দেব?’

‘দে।’

‘তুই হাসনাত সাহেবের কাছে ফিরে যা।’

স্বাতী রাগী গলায় বলল, ‘কেন ফিরে যাব? ভালোবাসার জন্য ফিরে যাব? ওকে ভালোবাসি তোকে কে বলল? ভালোবাসা কখনও এক तरফা হয় না। ও কি ভালোবাসে আমাকে? কখনও না। আমার একটা ছবি ঐঁকেছে। ছবিটা তুই ভালো করে লক্ষ করেছিস? ভালো করে দেখ। ছবির মেয়েটার চিবুকে লাল তিল আছে। আমার চিবুকে লাল তিল আছে? কোথেকে এই তিল এল? তার স্ত্রীর চিবুকে তিল ছিল। ওর কোনো প্রেমিকা দরকার নেই। ওর দরকার জাহিনের দেখাশোনার জন্য একজন মা। ওকে বিয়ে করলে আমাকে কী করতে হবে জানিস? ওর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আমি কোনোদিনও তা করব না।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। তুই শান্ত হ।’

স্বাতী চুপ করল। বড় বড় করে নিশ্বাস নিতে লাগল। লিলি বলল, ‘আমি এখন যাই স্বাতী?’

‘কোথায় যাবি? হাসনাতের ওখানে?’

লিলি কিছু বলল না, চুপ করে রইল। স্বাতী বলল, ‘আমি তোর চোখ দেখেই বুঝেছি তুই তার কাছে যাবি। বিয়ের দাওয়াতের অজুহাতে যাবি। তাই না?’

লিলি চুপ করে রইল।

স্বাতী তীব্র গলায় বলল, ‘তোর সাহসের এত অভাব কেনরে লিলি। একটু সাহসী হ। আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও তোর সাহস হলো না এটাই আশ্চর্য। আমি কী প্রচণ্ড সাহসী একটা কাজ করতে যাচ্ছি তা কি জানিস?’

‘না।’

‘মাকে জিজ্ঞেস করিস। মা বলবে। নাও বলতে পারে। মাও তো তোর মতোই একটা মেয়ে। শাড়ি দিয়ে শরীর ঢাকতে ঢাকতে সবকিছু দাঁকার অভ্যাস হয়ে গেছে।’

‘স্বাতী, আমি যাই।’

‘যা। ওকে জিজ্ঞেস করিস তো কোন সাহসে তোর চিবুকে সে লাল তিল আঁকল?’

লিলি সিঁড়ি দিয়ে নামছে। একতলায় স্বাতীকে মা’র সঙ্গে তার দেখা হলো। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ‘মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত খারাপ হচ্ছে। আমি কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। ও প্রায়ই আমাকে চিনতে পারে না।’

‘এইসব কী বলছেন খালা!’

‘সত্যি কথা বলছি মা। সত্যি কথা বলছি। ও আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজে শাস্তি পাচ্ছে।’

তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

হাসনাত বাসায় ছিল। লিলিকে দেখে সে খুব অবাক হলো। লিলি বলল, 'জাহিন কোথায়?'

'ও তার মা'র হোটেল। ওর মা এসেছে ওকে নিয়ে যেতে।'

'আমি জানি। জাহিন আমাকে সব বলেছে।'

'ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে জানি না তো। জাহিন আমাকে কিছুই বলে নি। ভেতরে এসো লিলি।'

'আমি আপনাকে একটা কার্ড দিতে এসেছি।'

'বিয়ের কার্ড।'

'হ্যাঁ। বুঝলেন কী করে বিয়ের কার্ড?'

'অনুমান করেছি।'

'আপনি বিয়েতে এলে আমি খুব খুশি হব।'

'আমি যাব, আমি অবশ্যই যাব।'

'আরেকটা কাজ যদি করেন তাহলেও আমি খুব খুশি হব।'

'বলো, আমি অবশ্যই করব।'

'স্বাতীর সঙ্গে যদি একটু দেখা করেন। ও ভয়াবহ সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।'

'লিলি, আমি সেটা জানি। আমি গিয়েছিলাম ওর কাছে। স্বাতী আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয় নি।'

'লিলি এসো, ভেতরে এসে বসো।'

'জি না, আমি বসব না।'

হাসনাত ক্লান্ত গলায় বলল, 'স্বাতীর ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। রুবিয়া ব্যাপারটাও বুঝি নি। কাউকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। এইটুকু শুধু জানি। বাস্তবে কাউকে ধরে রাখতে পারি না বলেই বোধহয় ছবিতে ধরে রাখতে পারি।'

লিলি বলল, 'আমি যাই?'

হাসনাত বলল, 'তুমি কি ঘন্টাখানেক বসতে পারবে? ঘন্টাখানেক বসলে আঁত দ্রুত একটা ছবি এঁকে ফেলতাম। মাঝে মাঝে আমি খুব দ্রুত কাজ করতে পারি।'

'জি না। আমি এখন যাব।'

হাসনাত গেট পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে এল। হঠাৎ তাকে অবাক করে দিয়ে লিলি নিচু হয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

হাসনাত বলল, 'আমি প্রার্থনা করছি তোমার জীবন মঙ্গলময় হবে।'



বিংশ শতাব্দীর সপ্তম আশ্চর্যজনক ঘটনাটা ঘটে গেছে।

জাহেদুর রহমান আমেরিকান ভিসা পেয়েছে। সে অসম্ভব অবাক হয়ে লক্ষ কণাক তার কোনো রকম আনন্দ হচ্ছে না। বরং হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেছে। মনে ২০১৯ আর কিছুই করার নেই। সে গুলশান থেকে বাসায় ফিরল হেঁটে হেঁটে এবং প্রথম

বারের মতো এই নোংরা দেশের সবকিছুই তার অসম্ভব ভালো লাগতে লাগল। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রিকশা যাচ্ছে— কী সুন্দর লাগছে দেখতে! রাস্তার দু'পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছে ফুল ফুটেছে— আহা কী দৃশ্য! আকাশজোড়া ঘন কালো মেঘ। বর্ষা আসি আসি করছে। আসল কালো মেঘগুলো বের হবে বর্ষায়। দিনরাত বর্ষণ হবে। রাস্তায় পানি জমে যাবে। সেই পানি ভেঙে বাসায় ফেরা। এই আনন্দের তুলনা কোথায়?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো— সমস্যার আনন্দ। চারদিকে সমস্যা কি কম? লিলির বিয়ে হচ্ছে। কত রকম ঝামেলা, রুম জুম বড় হচ্ছে, এদের বিয়ে দিতে হবে। সমস্যার কি কোনো শেষ আছে? বাড়িটা নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। সেই ঝামেলাও মেটাতে হবে। সব ছেড়ে বিদেশে গিয়ে পড়ে থাকলে হবে? কী আছে শাদা চামড়ার দেশে? সমস্যাহীন ঐ দেশে থেকে হবেটা কী?

বাড়ি ফেরার পথে জাহেদুর রহমান বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল। যাকে বলে রুম বৃষ্টি। এত ভালো লাগছে বৃষ্টিতে ভিজে হাঁটতে। পাসপোর্টটা ভিজে জবজবে হয়ে যাচ্ছে। ভিজুক। হু কেয়ারস? শালার পাসপোর্ট।

কাকভেজা হয়ে জাহেদুর রহমান বাড়িতে ঢুকল। প্রথমই দেখা হলো লিলির সঙ্গে। লিলি শঙ্কিত গলায় বলল, 'ভিসা এবারও হয় নি, তাই না?'

জাহেদুর রহমান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, না।

লিলি বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তুমি মন খারাপ করো না ছোট চাচা। তোমার মনটা এত খারাপ দেখে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে।'— আহারে, মেয়েটা তো সত্যি কাঁদছে!

জাহেদুর রহমানের চোখ ভিজে উঠছে— বিদেশ বিভুঁইয়ে কে তার জন্য চোখের জল ফেলবে। কেউ না।

'ছোট চাচা!'

'কী রে!'

'মন খারাপ করো না ছোট চাচা, প্লিজ।'

'আচ্ছা যা মন খারাপ করব না।'

'পরের বার নিশ্চয়ই হবে।'

'আর এ্যাপ্লাই করব না। যথেষ্ট হয়েছে, এখন কস্টটস্ট করে দেশেই থাকব।'

জাহেদুর রহমান তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার দিকে যাচ্ছে। এত ভালো লাগছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে।

বিয়ে উপলক্ষে অনেকদিন পর লিলিদের বাড়ি চুনকাম হচ্ছে। পুরনো বাড়ি সাজতে শুরু করেছে নতুন সাজে। বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে মাটিরগুলোও কি বদলাচ্ছে? নেয়ামত সাহেব মেয়ের সঙ্গে যে অস্বাভাবিক নরম গলায় কথা বলেন সেই কথায় লিলির চোখে প্রায়ই পানি এসে যায়। সেদিন হঠাৎ বললেন, মাগো কাছে বস তো একটু।

লিলি কাছে বসল। নেয়ামত সাহেব মেয়ের মাথায় হাত রেখে কিছুক্ষণ পর কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, তোর ঐ বাস্কবী কি যেন নাম স্বাতী। আসে না কেন? বিয়ের সময় বন্ধুবান্ধব আশপাশে থাকলে মনটা ভালো থাকে। ওকে খবর দিয়ে নিয়ে আয়, থাকুক কয়েক দিন তোর সাথে।

লিলি বলে না যে স্বাভী অসুস্থ। স্বাভী এখন তাকে পর্যন্ত চেনে না। লিলি তাকে গত কালও দেখতে গিয়েছিল। স্বাভী তাকে দেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলেছে, বসুন। মা উনাকে বসতে দাও। রওশন আরা লিলির দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বললেন, কেন আমার মেয়েটা এ-রকম হলো? কেন হলো? লিলি এখন নিজের মতো তার বিয়ের প্রস্তুতি দেখে। তার ভালোও লাগে না, মন্দও লাগে না।

রাতে মা তার সঙ্গে ঘুমতে আসেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকেন। লিলির তখনই শুধু খুব একা লাগে। তখন খুব অন্যায় একটা ইচ্ছার ছায়া মনে ভাসে। মনে হয়, ইশ কেউ একজন যদি স্বাভীর মতো একটা ছবি তার ঐকে দিত। কেউ একজন যদি তাকে দেখাতো কি করে আকাশের তারা নামিয়ে আনা যায়। সে খুব সন্তর্পণে কাঁদে। এমনভাবে কাঁদে যেন তার শরীর না কাঁপে। যেন তাঁর মা কিছু বুঝতে না পারেন। কিন্তু তিনি বুঝে ফেলেন। মেয়েকে প্রবলভাবে বুকে জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলেন, মা রে তোর যদি সত্যি সত্যি মনের মানুষ কেউ থাকে তুই পালিয়ে চলে যা তার কাছে। কী আর হবে? তোর বাবা আমাকে ধরে মারবে। এটা তো নতুন কিছু না।

লিলি অস্পষ্ট স্বরে বলে, মনের মানুষ কেউ নেই মা।

লিলির মা লিলির চেয়েও নিচু গলায় বলেন, সত্যি নেই? একদিন যে কোথায় গেলি। অনেক রাত করে ফিরলি...

লিলি হাসে। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসে। অনেকটা স্বাভীর মতো করেই হাসে। লিলির মা মেয়ের সেই হাসির মানে ধরতে পারেন না। তাঁর বড় কষ্ট হয়।

লিলি মা'কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি এত ভালো কেন মা? তুমি, বাবা, ছোট চাচা, বড় চাচা, রুমু রুমু। তোমরা যদি আরেকটু কম ভালো হতে তাহলে আমার এত কষ্ট হতো না।

লিলি কাঁদে।

মা তাঁর গায়ে-মাথায় ক্রমাগতই হাত বুলিয়ে দেন।



রুবিদের ফ্লাইট রাত আটটায়। জাহিনের জিনিসপত্র গোছানো হয়েছে একদিন আগেই। যাবার দিনে তার কিছু গোছানোর নেই। সে ঠিক করে রেখেছিল যাবার দিনটা সারাক্ষণ সে বাবার সঙ্গে গল্প করবে। কিন্তু হাসনাত সকাল থেকেই স্টুডিওতে। দরজা বন্ধ করে কাজ করছে। গত রাতের পুরোটাই কেটেছে স্টুডিওতে। গভীর রাতে জাহিনের ঘুম ভেঙেছে। সে দেখে বিছানা খালি। স্টুডিওতে আলো জ্বলছে। একবার সে ভাবল বাবাকে ডাকে। শেষ পর্যন্ত ডাকল না। স্টুডিওর দরজার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার পাশে কোলবালিশ। বালিশটাকে বাবা ভেবে সে জড়িয়ে ধরে থাকল।

স্টুডিও থেকে হাসনাত বের হলো দুপুরে। সে ভেবে রেখেছিল ভালো কোনো

রেস্টুরেন্টে মেয়েকে নিয়ে যাবে। তার হাতে তেমন সময় নেই। তার খুব ইচ্ছা পেনে ওঠার সময় মেয়ের হাতে একটা ছবি তুলে দেবে। বেশ কিছু কাজ এখনও বাকি রয়েছে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে নষ্ট করার সময় নেই। হাসনাত বলল, 'টোস্ট আর ডিমভাজা খেয়ে ফেললে কেমন হয় মা?'

জাহিন বলল, 'খুব ভালো হয়।'

হাসনাত ডিম ভাজল। রুটি টোস্ট করার সময় নেই। এমনি খেয়ে নিলেই হয়।

'জাহিন!'

'জি বাবা।'

'আজ একটু খারাপ খেলে কিছু হবে না। পেনে কত ভালো ভালো খাবার দেবে। তাই না?'

'হুঁ।'

'আমি ছবিটা শেষ করতে থাকি, তুই কাপড়-টাপড় পরে তৈরি হতে থাক।'

'আচ্ছা।'

জাহিন একা একা একা বারান্দায় হাঁটল। বাগানে কিছুক্ষণ ঘুরল। এবং মাঝে মাঝেই স্টুডিওর দরজার পাশে এসে দাঁড়াতে লাগল। একবার মনে-মনে ডাকল, বাবা। মনের ডাক কেউ শুনতে পায় না। হাসনাত শুনল না। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় ছবিতে।

সন্ধ্যায় রুবি যখন গাড়ি নিয়ে এসে হর্ন বাজাচ্ছে তখন হাসনাতের ছবি শেষ হলো। সে কাগজে মুড়ে ছবিটা মেয়ের হাতে দিয়ে হাসল।

হাসি দেখেই জাহিন বুঝেছে, বাবা খুব সুন্দর ছবি আঁকেছে। তবে ছবিটা সে এখন দেখবে না। পেনে উঠে দেখবে।

হাসনাত বলল, 'মা, তুমি তোমার পড়ার ঘরে ছবিটা টানিয়ে রেখো।'

জাহিন বলল, 'আচ্ছা।'

হাসনাত বলল, 'তাহলে আর খুশি করে লাভ নেই, তোমরা রওনা হয়ে যাও।'

রুবি বিস্মিত হয়ে বলল, 'রওনা হয়ে যাও মানে? তুমি সি অফ করতে যাবে না?'

'ইচ্ছে করছে না। খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'ক্লান্ত লাগলেও চলো।'

হাসনাত বিষণ্ণ গলায় বলল, 'বিদায়ের দৃশ্য আমার ভালো লাগে না।'

'কারোই ভালো লাগে না। তারপরেও তো লোকজন বিদায় দিতে যায়। যায় না?'

এয়ারপোর্টে গাদাগাদি ভিড়। কী ভয়ানক ব্যস্ততা চারদিকে! কেউ যেন কাউকে চেনে না।

জাহিনের কাঁধে একটা হ্যান্ডব্যাগ, এক হাতে মা'কে ধরে রেখেছে। অন্য হাতে কাগজে মোড়া ছবি। ছবিটা সে বুকের কাছে শক্ত করে ধরে আছে।

হাসনাত এক কোনায় দাঁড়িয়ে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে। জাহিন মা'র হাত ধরে গটগট করে এগুচ্ছে। নতুন কেনা গোলাপি ফ্রকে তাকে লাগছে পরীদের কোনো শিশুর মতো। সে একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না।

রুবি বলল, 'মা তুমি বাবার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে এসেছ। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, তুমি যাও বাবাকে চুমু দিয়ে আসো।'

জাহিন শান্ত গলায় বলল, 'না।'

‘না কেন মা?’

‘বাবাকে চুমু খেলে বাবা কাঁদতে শুরু করবে। বাবাকে কাঁদাতে ইচ্ছা করছে না।’

‘কিন্তু তোমার বাবা হয়তো তোমাকে চুমু দেয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তুমি না গেলে কষ্ট পাবেন।’

‘বাবা জানে আমি কেন যাচ্ছি না। বাবার অনেক বুদ্ধি।’

‘বেশ চলো, আমরা তাহলে যাই। বাবাকে কি একবার হাত নেড়ে বাই. বাই বলবে?’

‘না।’

‘ছবিটা তুমি আমার কাছে দাও। এত বড় একটা ছবি তোমার নিতে কষ্ট হচ্ছে।’

‘আমার কষ্ট হচ্ছে না।’

প্লেন আকাশে ওঠার পর জাহিন বলল, ‘আমি ছবিটা একটু দেখব মা।’

রুবি মোড়ক খুলে ছবিটা মেয়ের হাতে দিলেন। জাহিন শান্ত গলায় বলল, ‘একবার বাবা আমাকে স্কুল থেকে আনতে ভুলে গিয়েছিল। বারোটোর সময় ছুটি হয়েছে। বাবা আনতে গেছে তিনটার সময়। বাবাকে দেখে আমি ছুটতে ছুটতে গিয়েছিলাম। সেই ছবিটা বাবা একেঁছে। মা, দেখো।’

ছবিতে ছোট্ট একটা মেয়ে দু’হাত বাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, স্কুল ব্যাগ উড়ছে। মেয়েটার চোখভর্তি জল।

রুবি অবাক হয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর কাছে হঠাৎ মনে হলো অপূর্ব এই ছবিটা রঙ দিয়ে আঁকা হয় নি। আঁকা হয়েছে চোখের জলে।

জাহিন চোখ মুছছে। রুবি দু’হাতে মেয়েকে কাছে টানলেন। জাহিন ফিসফিস করে বলল, ‘এয়ারপোর্টে বাবা কি রকম একা একা দাঁড়িয়ে ছিল।’

রুবি বললেন, ‘সব মানুষই একা রে মা। তারা সংসার, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে বাস করে। তার পরেও তারা একা।’

জাহিন প্লেনের জানালা দিয়ে তাকাল। তার খুব ইচ্ছা করছে অনেক অনেক দূর থেকে বাবাকে একটু দেখবে। কিন্তু প্লেন আকাশে উঠে গেছে। শাদা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে নিচের পৃথিবী।

জাহিন কাঁদছে। কাঁদছে ফ্রেমে বন্দী স্কুলের পোশাক পরা বাচ্চা মেয়েটি।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG